শনিবারের চিঠি

১৭ম বর্ষ

প্রথম ভাগ

কার্তিক—চৈত্র ১৩৫১

ষাণ্মাসিক সূচী

শনিবারের চিঠি
১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

"All great doctrine, as it recurs periodically in the course of the centuries, is coloured by reflections of the age wherein it appears; and it further receives the imprint of the individual soul through which it runs. Thus it emerges anew to work upon men of the age. Every idea as a pure idea remains in an elementary stage, like electricity dispersed in the atmosphere, unless it find the mighty condenser of personality"—M. Romain Rolland : *The life of Vivekananda.*

বিবেকানন্দের চরিত-কথা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহার পর তাঁহার বাণীর কিছু পরিচয় দিলেই আমার প্রয়োজন সমাধা হইবে। সে বাণীর বিশেষত্ব এই যে, তাহা কেবল ভাবুকতা, চিন্তাশক্তি, অথবা যাহাকে উৎকৃষ্ট প্রতিভা বা মনীষা বলে—তাহারই জীবন-বিচ্ছিন্ন, বস্তুসম্পর্কহীন তত্ত্ব বা সত্য-প্রতিষ্ঠার বাণী নয়; তাহাতে বাস্তব জীবনের গূঢ়তম ও বৃহত্তম সমস্যার সম্মুখীন সত্ত্বপরিত্রাণপ্রয়াসী এক অতিশয় শক্তিমান পুরুষের দুর্দ্দমনীয় উদ্যম স্ফুরিত হইয়াছে; বিবেকানন্দের জীবনও সেই বাণীকে সপ্রমাণ করিয়াছে। সেই সমস্যা মূলে এক হইলেও তাহার শাখা-প্রশাখা আছে, এই বাণীতেও তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। আমি বিশেষ করিয়া তাহার একটা দিকই লইব—যে দিকটির সহিত বর্ত্তমান আলোচনার সাক্ষাৎ যোগ আছে, যে দিকটি তাঁহার বাণীর খুব প্রয়োজনীয় ও সার্থক দিক বলিয়া মনে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে, শাস্ত্র ও দর্শনঘটিত নানা তত্ত্বের মৌলিক ব্যাখ্যাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে—সে সকলও তাঁহার বাণীর অন্তর্গত, চিন্তার দিক দিয়া তাহাদের মূল্য কম নয়। কিন্তু মানব-ইতিহাসের এই মহাযুগান্তরকালে, তিনি নব জীবন-যজ্ঞের উদ্গাতারূপে যে প্রাণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃত 'বাণী'; আমি সেই বাণীরই যথাসাধ্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

আমার মনে হয়, এই ভারতবর্ষেই—এই অতি-দুর্গত, মোহগ্রস্ত, ভয়ার্ত্ত ও বহু-শৃঙ্খলিত মানবাত্মার দেশেই,—সর্ব্বমানবের মুক্তিসংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে; এই দেশেই তাহার ক্রুশবিদ্ধ বিরাট দেহের অবতারণ ও পুনরুত্থানের মন্ত্রোচ্চারণ হইতেছে—এই মহাশ্মশানই যে মানুষের সেই নবজন্মের সূতিকাগাররূপে ক্রন্দন-শেষে হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তমের দর্শন এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষই অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া ভূমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল—তমসার পারে হিরণ্যবর্ণ মহান্ পুরুষের চকিত দর্শন লাভ করিয়া, "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং

invalid for that activity of mind." ইহার পর যে কথাটি বলিয়াছেন তাহার মত গভীর ও মূল্যবান কথা আর নাই—"In poetry, qua poetry, there are neither particulars, or universals, abstracts or concretes." ইহা শুধুই কাব্যের তত্ত্ব নয়—জগৎ-ব্রহ্মের এই অভেদ-তত্ত্বই পরমতত্ত্ব বলিয়া, এতকাল পরে ভারতবর্ষের সেই পুরাতন বাণীই এক নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—জ্ঞান ও প্রেম, কাব্য ও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব, অস্তি-ভাতি ও নামরূপ, এক অখণ্ড সত্যের অধীন হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও একটু গোল থাকিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'বিশ্বমানব'-বাদ নামে এক অভিনব তত্ত্ব সুলভ কুলচুর-বিলাস ও অজ্ঞতামূলক প্রাজ্ঞতার পক্ষে বড়ই উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বমানব' নামটার কোন দোষ নাই—বরং আমরা যে 'মানব'-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি, ঐ নাম তাহার খুবই উপযোগী; কিন্তু যে-অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাতে 'ভাবের ঘরে চুরি' আছে। একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী দার্শনিক-পণ্ডিত বোধ হয় উহারই অনুবাদ করিয়াছেন—'Cosmic Man', যদিও তাহার অর্থ ঠিক রাখিয়াছেন। বিবেকানন্দের Humanity যে অর্থে Universal, সে অর্থে Particular-ই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ও পরিচয়; তাহাতে বৈচিত্র্যও যত বেশি, সেই একের মহিমাও তত প্রকট; 'অনেকে'র মধ্যেই সেই 'একে'র গভীরতর উপলব্ধি সম্ভব—বিশেষই নির্ব্বিশেষের নামাঙ্কিত পাদপীঠ। কিন্তু ঐ 'বিশ্বমানব'—সর্ব্বমানবের একটা পিণ্ডীভূত সত্তা, একটা বর্ণহীন রূপহীন ভাবনির্য্যাস মাত্র। বিবেকানন্দে ধ্যান-ধৃত যে বিশ্বমানব তাহা ইতিহাসের ধারায়, দেশ-কাল-পাত্রের নানা রূপে ও নানা অবস্থায় নিত্য-নব প্রকাশশীল; তাই অতি প্রাচীন হইতে অতি-আধুনিক পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই 'বিচিত্র ও বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি Universal-এর চক্ষে Particular-কে দেখিতেন না, Particular-এর মধ্যেই Universal-কে দেখিতেন। এই দেখার দুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিব। ইটালি-ভ্রমণকালে রোমের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন সকল তাঁহাকে যেমন অভিভূত করিয়াছিল, তেমনই, খ্রীষ্টীয় উপাসনা-মন্দিরের অভ্যন্তর দৃশ্য ও উপাসনার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ কিছুমাত্র বিজাতীয় বলিয়া মনে হয় নাই—"He was profoundly touched by the memories of the first Christians and martyrs in the Catacombs, and shared the tender veneration of the Italian people for the figures of the infant Christ and the Virgin Mother." তেমনই, একবার ইংলণ্ড যাত্রাকালে তাঁহার জাহাজ যখন জিব্রাল্টার প্রণালীতে প্রবেশ করিল, তখন, ঐখানে আফ্রিকা হইতে আরব-মুরগণের স্পেন-আক্রমণের সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সেই মুরগণের সহিত 'দীন্ দীন'-শব্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি উক্তি বড়ই যথার্থ, তিনি লিখিয়াছেন—

"That which emerges most clearly is his 'universal sense'—he had hopes of democratic America; he was enthusiastic over the Italy of art, culture, and liberty. He spoke of China as the treasury of the world. He fraternised with the martyred Babists of Persia. He embraced in equal love the India of the Hindus, the Mahomedans and Buddhists. He was fired by the Moghul Empire."

তাঁহার জীবনচরিতকার (*Life of the Swami Vivekananda*, by His Disciples) লিখিয়াছেন—

"In Egypt he was specially interested in the Cairo Museum, and his mind often reverted, in all the vividness of his historic imagination, to the reigns of those Pharaohs who made Egypt mighty and a world-power in the days of old....And here in Egypt it seemed as if he were turning the last pages in the Book of Experience."

এই সকল হইতে বিবেকানন্দের "Universal Sense" যে কি অর্থে Universal তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই যে 'Book of Experience', ইহা কিসের 'experience'?—কোন্ মানুষের পরিচয়-কাহিনী? 'বিশ্বমানব' যদি একটা ভাবগত বস্তু হয়—বাস্তব মানব-সত্তা হইতে কতকগুলি সাধারণ মানবীয় গুণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সেইগুলির সমবায়ে গঠিত একটা নির্ব্বিশেষ আইডিয়াল বা মানস-বিগ্রহকে 'বিশ্বমানব' নাম দিয়া, যদি তাহারই পূজা করা হয়, তবে তাহা এই Universal মানুষ নয়,—যে মানুষ এক হইয়াও বহু,—যে মানুষ সর্ব্বত্র Concrete বা রূপময়। এজন্য ঐ 'বিশ্বমানব' নামটির অর্থবিভ্রাট নিবারণের জন্য আমি উহার নাম দিব 'মহামানব' এবং ইহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিবার জন্য, ইহার একটা সাহিত্যিক ব্যাখ্যাও দিব।

৩

মহাকবি শেক্স্পীয়রের কবি-দৃষ্টিতে (কবিরও এই দৃষ্টির কথা আগে বলিয়াছি) এই Humanity বা মহামানবই কত অপরূপ রূপে ধরা দিয়াছিল! তাঁহার সৃষ্ট সেই ব্যষ্টি-মানবের অগণিত অনন্য-সদৃশ চরিত্ররাজিতে সেই এক মানুষই সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ কাব্যসমালোচক সেই কথাই বলিয়াছেন, যথা—

It was Shakespeare's prerogative to have the universal which is potential in each particular, opened out to him, the *homo generalis*, not as an abstraction from observation of a variety of men, but as the substance capable of endless modifications.

এই *home generalis*-ই সেই মহামানব—যাহা পিণ্ডীভূত সমষ্টির abstraction বা ভাবনির্য্যাস নয়, বরং এমন একটা বস্তু যাহার ব্যষ্টি-রূপের অন্ত নাই। তথাপি শেক্স্পীয়র particular-এর মধ্য দিয়াই সেই universal-এর উপলব্ধি

করিয়াছিলেন, কারণ, উহাই খাঁটি কবি-কল্পনার জ্ঞানযোগ; এবং "whoever has a living grasp of this particular grasps the universal with it, knowing it either not at all, or long afterwards"। আমাদের রবীন্দ্রনাথেরও কবিজীবনের পূর্ণযৌবনে—particular হইতে universal নয়, universal হইতে particular-এ তাঁহার কল্পনার আসক্তি লক্ষ্য করা যায়; তাঁহার সুবিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতাটি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। সেখানে কবি তাঁহার ব্যষ্টি-জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই, যাহা সর্ব্ববৈচিত্র্যের মূল উৎস—বিরাট প্রাণধারার সেই মূলাধার 'বসুন্ধরা'য় নিমজ্জিত হইয়া, বহুত্বের—particular-এর রস আস্বাদন করিতে অধীর হইয়াছেন—

ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিয়া বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত।···
···শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে।

তার পর—

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্ম-অনুরত; সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।

—কিন্তু এই ইচ্ছাও সেই দৃষ্টিসম্ভূত নয়, যাহাতে—"there are neither particulars or universals, abstracts or concretes"। ইহাতে universal-এর চেতনাই প্রবল ও মুখ্য—ইহা সেই শেকসপীরীয় দৃষ্টি নয়। কিন্তু এই সঙ্গে শেলীর কাব্যমন্ত্রের

তুলনা করিলে আমাদের ঐ জগৎ-ব্রহ্ম-অভেদের তত্ত্ব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। শেলীর কল্পনা খাঁটি বৈদান্তিক—সর্ব্বপ্রকার Concrete ও particular-এর বিরোধী। শেলীর আদর্শ 'মানুষ' সর্ব্ববন্ধন ও সর্ব্ব-উপাধিমুক্ত 'মানবাত্মা'—

> The loathsome mask has fallen, the man remains
> Sceptreless, free, uncircumscribed, but man
> Equal, unclassed, tribeless, and nationless,
> Exempt from awe, worship, degree, the king
> Over himself ; just, gentle, wise : but man
> Passionless ;

—এই গুণগুলি সব একত্র অবস্থান করার উপায় না থাকিলেও, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, মানবাত্মার আদর্শ-হিসাবে ইহা চূড়ান্ত বটে ; ইহাকে বিবেকানন্দের আদর্শও বলা যায়, আবার আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীর আদর্শও প্রায় এইরূপ বটে ; কিন্তু সৃষ্টি-সত্যের সহিত কোনরূপ বোঝাপড়া ইহাতে নাই—যাহা বিবেকানন্দের বাণীতে আছে ; ইহার জন্য অপর সম্প্রদায়ের কোন মাথাব্যথাই নাই, কারণ শেলীর যাহা আদর্শ তাহাই তাহাদের বাস্তব ; তাহাদের চিন্তাভিত্তিও শেলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। শেলীর ঐ আদর্শ বাস্তব-নিরপেক্ষ হইলেও, শেলী বাস্তবের বাধাকে অস্বীকার করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্ষেপের অন্ত নাই। মানুষের দেহটাই তাহার আত্মার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির একটা বড় বাধা ; 'Chance and death and mutability'-র নিয়তি-নিগড় যদি না থাকিত তাহা হইলে ঐ আত্মা—

> Might oversoar
> The loftiest star of unascended heaven,
> Pinnacled dim in the intense inane.

—এমন একটা ভাবনার প্রশ্রয় দিতে আধুনিক মহাবস্তুবাদীরা শিহরিয়া উঠিবে, যদিও, আত্মাহীন বস্তু যে-মানুষ, তাহার অধিকার ঘোষণায় শেলীর কবিতার ঐ বিশেষণগুলিকে অগ্রাহ্য করিবে না।

৪

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা এই পর্য্যন্ত, এখন সেই 'বিশ্বমানব' ও এই 'মহামানব'-বাদের পার্থক্য-বিচার শেষ করিব। একটিতে দেহদশাধীন মানুষকে বাস্তব নিয়তি-নিয়মের বন্ধনে, বিশিষ্ট গুণে ও রূপে, নানা অবস্থায় দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে ; অপরটিতে দেশকাল প্রভৃতির উর্দ্ধে তুলিয়া তাহার একটা ভাব-রূপের ধ্যান মাত্র আছে ; এজন্য এই অপরটিতে—বিশ্বমানবের ঐ মানস-বিগ্রহ-পূজায়—মানুষ-হিসাবেই মানুষকে যে শ্রদ্ধা, তাহারি প্রতি প্রেমের যে বাস্তব-অনুভূতি—সেই বিশেষের প্রীতি নাই। বিবেকানন্দের বাণী যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি ; তিনি সকল জাতির সকল

মানুষকেই একথা abstract, তথা universal মানবতার আইডিয়াল দ্বারা বিচার করিতেন না ; প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই মানবতার বিশিষ্ট বিকাশকে বুঝিতে চাহিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। উপরে মূরগণকর্ত্তৃক স্পেন-বিজয়ের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া বিবেকানন্দের যে ভাবোল্লাস হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি—তাহার কারণ ইহাই। তিনি মূরগণের সেই ধর্ম্মোন্মাদ-প্রজ্বলিত বীরত্ব-বহ্নিকে তাহাদের জাতিসুলভ একটা গুণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া, তাহাতেও মানবতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একবার পরিব্রাজক-বেশে কাশ্মীরভ্রমণকালে পিপাসার্ত্ত হইয়া তিনি এক কৃষক-রমণীর কুটীরে জল চাহিয়াছিলেন ; পিপাসানিবৃত্তির পর তিনি গৃহস্বামিনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'মাঈ, তোমার ধর্ম্ম কি ?' তাহাতে সে এমন কণ্ঠে উত্তর করিল, 'খোদাকে ধন্যবাদ—আমি মুসলমানী' যে, বিবেকানন্দ তাহাতে মুগ্ধ হইলেন ; তাহার কণ্ঠে ও মুখে চক্ষে একটি শান্ত গভীর সাত্ত্বিক আবেগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, সেই সরল ভক্তির অন্তরালে একটি খাঁটি ভারতীয় মনোভাব রহিয়াছে ; সম্প্রদায় যাহাই হউক—রক্তের ভারতীয় সংস্কৃতি মুছিবার নয়। এখানেও সেই একই কারণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের Humanism বা মানবপ্রীতিও যে কিরূপ তাহার দৃষ্টান্তও প্রচুর আছে। যেমন জাতি, যেমন সমাজই হউক—তিনি মানুষের অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। আমেরিকায় তাঁহার গাত্রবর্ণদৃষ্টে অনেকে তাঁহাকে নিগ্রো বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সেজন্য পথেঘাটে তাঁহাকে অনেক অসুবিধাও সহ্য করিতে হইয়াছে। নিগ্রোগণও তাহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বহু সম্মানে তাহাদের সমাজে আহ্বান করিয়াছে এবং তাঁহার খ্যাতিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। তিনি একদিনের জন্য তাহাদের সেই ভুল ভাঙিয়া দেন নাই। কেহ কেহ এ বিষয়ে অনুযোগ করিলে তিনি সরোষে বলিয়াছিলেন, 'কি ! আমি মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করিয়া নিজের মান বাড়াইব !" একবার কথাপ্রসঙ্গে কোন আদিম অসভ্য জাতির পাথর-পূজা সম্পর্কে একজন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহাতেও বিবেকানন্দ ব্যথিত হইয়া সেই জাতির পক্ষ সমর্থন করেন ; সেই জাতির অপরিণত জ্ঞানবুদ্ধির দিক দিয়া দেখিলে ঐরূপ আচরণ যে দূষ্য নয়, বরং উহাতে মানব-মনের শৈশব-সারল্যের এমন একটি কল্পনা ও বিশ্বাস-প্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে যে, উহাও শ্রদ্ধার যোগ্য—এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা সত্যই বলিয়াছেন—

It was his love of Humanity, and his instinct on behalf of each in his own place, that gave to the Swami so clear an insight.

There was the perpetual study of caste, the constant examination and restatement of ideas ; and above all, the vindication of Humanity, never

abandoned, never weakened, always rising to new heights of defence of the undefended, of chivalry for the weak. Our Master has come and he has gone, and in the priceless memory he has left with us who knew him, there is no other thing so great, as this his love of man.

মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধা, এই প্রেম—ইহার মূলে, কেবল একটা বিশাল হৃদয় নয়, একটা বিরাট সত্যোপলব্ধি ছিল; সেই সত্যও কোন শাস্ত্রবচন, ভগবদ্বাণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়: যে তত্ত্বের উপরে তাহা প্রতিষ্ঠিত মানুষের জ্ঞান তাহার উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। আমি এতক্ষণ সেই তত্ত্বেরই আলোচনা করিয়াছি; সেই 'মহামানব'-বাদই মানুষের চিন্তার ইতিহাসে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক দান। এ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থে যে একটি অতি মূল্যবান সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এই—

"Did Buddha teach that the many was real and the ego unreal, while Orthodox Hinduism regards the One as the Real, and the many as unreal?" he was asked. "Yes," answered the Swami, "And what Ramakrishna Paramahansa and I have added to this is, that the Many and the One are the same Reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes."

—আইনষ্টাইনের Theory of Relativity-র তখনও জন্ম হয় নাই—এখানে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন-মীমাংসায়, এক বেদান্তবাদী সেই তত্ত্বের ঘোষণা করিতেছে।

৫

বিবেকানন্দের এই বাণী শুধুই নবযুগের বাংলার বাণী নয়—পৃথিবীতে যে নবযুগ আসন্ন হইয়াছে তাহারই বাণী। মানুষকে, মানুষের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা—বৈরাগ্যব্যাধিকে মানুষের মনের কোণ হইতেও দূর করিয়া, এই জগৎকেই মহাতীর্থভূমিতে পরিণত করার যে প্রয়াস ইদানীন্তনকালে নানা আকারে দেখা দিতেছে;—মানুষের শুধুই দুঃখ মোচন নয়, এই জীবনেই তাহাকে স্বমর্য্যাদা ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার যে আকুল কামনা জাগিয়াছে, আমার মনে হয়, বিবেকানন্দই তাহার প্রথম প্রফেট বা প্রবক্তা। মানুষ যে পাপী নয়—তাঁহার গুরুর এই মহাশিক্ষায় প্রবুদ্ধ হইয়া, হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ চিন্তার দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া, এবং নিজের পৌরুষ-বিশ্বাসের অসীমশক্তি তাহাতে যুক্ত করিয়া, তিনিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিত্রাণ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন; মানুষকে এমন দৃষ্টিতে পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। তাঁহার সেই মন্ত্র এক অভিনব শক্তি-মন্ত্র, মানুষকেই আত্মার অনন্ত শক্তির আধার বলিয়া বিশ্বাস করার মন্ত্র। তিনি বলিতেন, "I have never quoted anything but the Upanishads, and of the Upanishads, it is that one idea, *strength*"। এই শক্তিও মানুষের দুষ্প্রাপ্য বা সাধনলভ্য কিছু নয়; সে তাহার birthright, তাহার আজন্ম জন্মগত অধিকার—প্রাপ্ত-প্রাপ্তির মত। অতএব এই শক্তিলাভ কালসাপেক্ষ নয়, কোনরূপ

শিক্ষার দ্বারা তাহাকে ধীরে জাগাইতে হয় না; চাই কেবল চরিত্র-বল—দৃঢ় সংকল্প, তাহাতেই দুর্ব্বলতার বন্ধনপাশ নিমেষে ছিন্ন হইয়া যাইবে। কবি শেলীর উক্তি যদি এই হয় যে, "Man has but to will it, and there shall be no evil in the world," তবে বিবেকানন্দের উক্তি হইবে, "জগতে যত দুঃখ যত অমঙ্গলই থাক, মানুষ যদি বলবান বীর্য্যবান হয়, তবে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না"। বিবেকানন্দের নিকটে এই শক্তির চেতনাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—অশক্তির নামই অজ্ঞান; এই শক্তি হইতেই যে প্রেমের জন্ম হয় তাহাতেই মানুষের মধ্যে দেবতার দর্শন হয়। কবিদের চিত্তেও আর এক পথে যখন সেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তখন তাঁহারাও তাঁহাদের ভাষায়, সেই দিব্য-দর্শনের আভাস দেন, সেও যেন এক একটি ঋকমন্ত্রের মত—'the human face divine'; 'They seek no wonder but the human face', অথবা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'; তাহারই গভীরতর প্রেরণায় মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসীও বলিয়া উঠেন—

"Above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races."

এই শেষের কথাগুলিতে মানুষের নামেই এ যুগের 'তারকব্রহ্ম নাম' রচিত হইয়াছে। অধুনা যে নূতন মানবকল্যাণবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা যতই বিলক্ষণ বা বিসদৃশ হউক —জগদ্ব্যাপী যে অন্যায় ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান, তাহার ঘোষণা এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ করে নাই। সেই সমস্যাকেই বিবেকানন্দ সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টি অনুযায়ী তাহার সমাধান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এত গূঢ় ও ব্যাপক না হইলেও তাহাতে জড়তত্ত্বের আস্ফালন অপেক্ষা মানুষেরই মাহাত্ম্যবোধ ছিল—পূরা আধ্যাত্মিক না হইলেও তাহা অধ্যাত্মমুখী ছিল; তিনিও মানুষের মনুষ্যত্বের উৎকর্ষকেই সর্ব্ববিধ জাগতিক উন্নতির মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা অতি গভীর ও আন্তরিক ভাবনার বিষয় ছিল, বিবেকানন্দ তাহার বাস্তব মূর্ত্তিকে আরও প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, কেবল উপায়-নির্দ্দেশ নয়— প্রতিকারের জন্য একটা কর্ম্মযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তাহাই ছিল তাঁহার সকল বাণী ও সকল কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। সত্য বটে এই সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি জগৎ ও জীবনের একটা পারমার্থিক মূল্যই স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতেও তিনি তাঁহার সেই দুর্দ্ধর্ষ অধ্যাত্মবাদকে মানবহিতবাদেরই অধীন করিয়াছিলেন। দুঃখকে স্বীকার করিলেও, তাহার দ্বারা মানুষের আত্মার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র তাহার বিপরীত—সে মন্ত্র যেমন একান্তভাবে আত্মধর্ম্মী, এ মন্ত্র তেমনই অনাত্মধর্ম্মী। ইহাতে মানুষমাত্রের বাস্তবদশা-নিরপেক্ষ কোন মাহাত্ম্যই স্বীকার্য্য নয়, এবং ভিতরের সাম্য

অপেক্ষা বাহিরের সমানাধিকারই সর্ব্বাগ্রে গণনীয়।' দুঃখেরও কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, অর্থাৎ তাহার অনুভূতি হয় দেহে ; উহাও সামাজিক কুব্যবস্থার ফলে ঘটিয়া থাকে ; ঐ দুঃখ দর্শনে যে দুঃখবোধ হয় তাহাও মিথ্যা, তাহাও অসুস্থ দেহের স্বাভাবিক ব্যাধি মাত্র, অথবা, প্রকারান্তরে একরূপ আত্মপূজা ; এই 'আত্মা'ই সর্ব্ববিধ ভণ্ডামি ও প্রবঞ্চনার আবরণ ও আশ্রয়। অতএব এই তত্ত্ব ও ইহার প্রয়োগবিধি সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি ইহার উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, সমস্যার নিদান ও তাহার চিকিৎসা যতই বিসদৃশ হউক, এই সমস্যাই এ যুগের প্রধান সমস্যা, এবং বিবেকানন্দের জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মমন্ত্রের মূল প্রেরণা ছিল ইহাই। আজিও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক মুক্তিসাধনার যিনি কর্ম্মগুরু—তাঁহার ধর্ম্ম যেমনই হউক, কর্ম্মমন্ত্র প্রায় অক্ষরে অক্ষরে বিবেকানন্দের এই বাণীমন্ত্রের অনুবাদ ; ভারতবাসীর পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া বা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব নয়, কিন্তু বাঙালীও যে তাহা ভুলিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য ! অতঃপর আমি বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিব—তাহাদের ভাষা ইংরেজী, তথাপি সেই ভাষারও মূল্য আছে, কারণ সেই ভাষাতেও বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন এমন পরিস্ফুট হইয়াছে যে, বাংলা অনুবাদে তাহার কিছুই থাকিবে না। তথাপি অনুবাদের হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু উপস্থিত তাহার স্থানাভাব। বিবেকানন্দের ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সম্যক পরিচয় এইরূপ বিচ্ছিন্ন বাক্যসমষ্টিতে মিলিবে না, নতুবা, তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে সকলেই মঃ রোলাঁর সহিত একমত হইবেন ; তিনি স্বামিজীর ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of Handel choruses. I cannot touch these sayings of his...without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the hero !

[প্রথমেই বিবেকানন্দের এমন এক উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহাতে তাঁহার একটি অতিশয় মৌলিক চিন্তা ব্যক্ত হইয়াছে]

Oh how calm would be the work of one who really understood the divinity of man. For such there is nothing to do save to open men's eyes. All the rest does itself.

*

He who does not believe in himself is an athiest.

* *

One may desire to see again the India of one's books, one's studies, one's dreams. My hope is to see again the strong points of that India, reinforced by the strong points of this age, only in a natural way. The

new state of things must be a *growth* from within (এই শেষের বাক্যটি আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।)

* * *

And here is the test of truth—anything that makes you weak physically, intelectually and spiritually, reject as poison ; there is no life in it, it cannot be true.

* * *

Individuality is my motto, I have no ambition beyond training individuals.

* * *

No religion on earth preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, and no religion on earth treads upon the necks of the poor and the low in such a fashion, as Hinduism. Religion is not at fault, but it is the Pharisees and Saducees.

* * *

If your brain and your heart come into conflict, follow your heart.

* * *

Man never progresses from error to truth, but from truth to truth.

* * *

The greatest men in the world have passed away unknown. Silently they live and silently they pass away ; and in time their thoughts find expression in Buddhas and Christs.

* * *

Fools put a garland of flowers around Thy neck, O Mother, and then start back in terror and call Thee "The Merciful'. ("One realised the infinitely greater boldness and truth of the teaching that God manifests through evil *as well as* through good."—Sister Nivedita.)

* * *

The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves, That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself, and then in Cod.

* * *

Europe is on the edge of a volcano. If the fire is not extinguished by a flood of spirituality, it will erupt.

* * *

The next upheaval that is to usher in another era, will come from Russia or from China. I cannot see clearly which, but it will be either the one or the other. (ইহার অর্থ এই নয় যে, অতঃপর পৃথিবীতে, তথাকথিত কম্যুনিজম্ জয়ী হইবে—রুশ জাতি এখনও তাহার সাধনা শেষ করে নাই।)

* * *

As I grow older, I find that I look more and more for greatness in little things...Anyone will be great in a great position, even the coward will grow brave in the glare of the footlights. The true greatness

seems to me that of the worm doing its duty silently, steadily from moment to moment and hour to hour.

Everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Do even evil like a man ! Be wicked, if you must, on a great scale !

*   *   *

A strong and true, type is always the physical basis of the horizon. It is all very well to talk of universalism, but the world will not be ready for that for millions of years.

*   *   *

[সর্ব্বশেষে আমি একটি অপূর্ব্ব কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—শুধু বাণী নয়, কাব্য-হিসাবেও ইহা অনবদ্য]

Awake, arise and dream no more !
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,
Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease.
Or, if you cannot, dream but truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

গৃহিণীর স্বপ্ন

পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহিণীর জীবনে একটা অঘটন ঘটিল। আজ একুশ দিন হইল, গৃহিণী শয্যাগতা। শৈশবে একবার নাকি তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু সেসব এখন রূপকথার ন্যায় মনে হয়। চারিটি সন্তানের মা হইয়াছেন, কিন্তু কখনও অসুস্থা হন নাই। শীতই হউক আর গ্রীষ্মই হউক, ঘড়িতে চারিটা বাজিতে না বাজিতে গৃহিণী শয্যাত্যাগ করেন, প্রথমেই প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন। মিনিট পনরো পরে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাইয়া তরকারি কুটিতে বসেন। কবে যেন কোন্ শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছিলেন, পরিপাটিরূপে সংসারধর্ম্ম পালন করিলেই নারীজাতির দেবপূজা হইল; সেই হইতে সংসারপূজা করিয়াই তিনি দেবপূজার ত্রুটি সারিয়া লইতেছেন।

তরকারি কোটা সম্পন্ন হইলে গৃহিণী রন্ধনঘরে প্রবেশ করেন। ছেলেদের তরকারিতে পেঁয়াজ পড়িবে, কর্ত্তার তরকারিতে পেঁয়াজ পড়িবে না, মেয়েদের মাছে খুব ঝাল দিতে হইবে, ছেলেদের মাছে ঝাল পড়িবে না, ছোট ছেলের তরকারিতে বেগুন পড়িলে অনর্থ হইবে, আর ছোট মেয়ের তরকারিতে লাউ—পাচক-ঠাকুরটি পাঁচ বৎসর এ বাড়িতে কাজ করিয়াও রন্ধনের পাঠটি এখনও কণ্ঠস্থ করিয়া উঠিতে পারে নাই;

গৃহিণী চক্ষের আড়াল হইলেই সে অন্ধকার দেখে। বেলা একটার সময় কর্ত্তা এবং ছেলেদের খাওয়া হইয়া গেলে মেয়ে ও বউকে লইয়া গৃহিণী খাইতে বসেন। বড় বড় মাছগুলি সকলকে দিয়া গৃহিণীর ভাগে কিছুই থাকে না। বউ বলে, এ কি অন্যায় মা! আমাদের দিলেন এতগুলো মাছ, আর আপনার ভাগে কিছুই রইল না? গৃহিণী বলেন, মাছে বড় অরুচি ধ'রে গেছে, বুড়ো হয়েছি কিনা, ভাল লাগে না। বুড়া কিন্তু গৃহিণী হন নাই, মাথার চুল অধিকাংশই ঘন কৃষ্ণবর্ণ, নজর না দিলে পাকা চুল চোখে পড়ে না, পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা গৃহিণীর একটিও দাঁত পড়ে নাই। সারা দুপুর রোদে ব'সিয়া বড়ি দিতে, এ ঘরের ভারী জিনিস ও ঘরে টানিয়া লইতে, গৃহিণীর একটুকু কষ্ট হয় না।

এ-হেন গৃহিণী আজ একুশ দিন ধরিয়া শয্যাগতা। প্রথম কয়েকদিন দেহের উত্তাপ বিপজ্জনকভাবে বাড়িতেই চোখ লাল করিয়া ত্রস্তে গৃহিণী উঠিয়া ব'সলেন, এই যা! মটরডালের বড়ির সঙ্গে মুসুরডালের বড়ি মিশিয়ে ফেললে কে? ও বউমা! ওলটা যে শুকিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিল।

আজও গৃহিণী শুইয়া আছেন, গত কুড়ি দিন পর কাল রাত্রে জ্বরের তাপ স্বাভাবিক হইয়াছে, দেহের অস্বস্তি-ভাব কাটিয়াছে; চোখ বুজিয়া ললাটের উপর একটা শিথিল বাহু রাখিয়া গৃহিণী শুইয়া আছেন।

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দুই মেয়ে প্রবেশ করিল। গৃহিণী চোখ খুলিয়া সেই দিকে চাহিলেন। মেয়েরা কাছে আসিল, মায়ের কপালে করস্পর্শ করিয়া কহিল, না, জ্বর নেই, আর একটু ঘুমোলে না কেন মা? শ্রান্ত দুই চোখ টানিয়া টানিয়া গৃহিণী কহিলেন, আর কত ঘুমোব, একুশ দিন ধ'রে তো খালি ঘুমোচ্ছি। ছোট মেয়ে রমা কহিল, কি স্বপ্ন দেখছিলে মা, চমকে উঠছিলে? রান্নাঘরের মাছ বেরালে খেয়ে গেল? না, বাঁদরে তোমার বড়ি নিয়ে উধাও হ'ল? মায়ের ঘরে কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছোট ছেলে ছুটিয়া আসিল, মাকে আবার কে জাগালে, অ্যাঁ? দুর্ব্বল বাহু দিয়া গৃহিণী ছোট ছেলের বলিষ্ঠ হাতটা ধরিলেন, আমায় তো কেউ জাগায় নি, আমি তো জেগেই ছিলাম। ছেলে কহিল, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এইবার উঠে রান্নাঘরে ছোট, তারপর পঞ্চ ব্যঞ্জন রেঁধে পুত্রকন্যাকে—। বাধা দিয়া রমা কহিল, হ্যাঁ মা, জান তো? ডাক্তারবাবু ব'লে গিয়েছেন, সাত দিন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না, আর চোদ্দ দিন তুমি রান্নাঘরে যেতে পাবে না। একটা রেকাবিতে কিছু ফল লইয়া বড় বধূ প্রবেশ করিল, ওষুধটা কি খেয়েছেন মা? তা হ'লে এই ফলটুকু এখুনি খেয়ে নিন। ছোট ছেলের হাত হইতে ঔষধ লইয়া গৃহিণী চক্ষু বুজিয়া খাইয়া ফেলিলেন, তাহার পর একটা ফল মুখে দিয়া বিকৃত মুখে কহিলেন, ফল আর কত খাব বাছা, একেবারে অরুচি ধ'রে গেছে, কুড়ি দিন ধ'রে তো এই গিলছি, মুখটা ভারী বিস্বাদ লাগছে। ছোট ছেলে চীৎকার করিয়া কহিল, উঁহু উঁহু, ওসব হচ্ছে না, দু ঘণ্টা পর পর তোমায় ফল খেতে হবে। এই বউদি, দাও তো আঙুরগুলো আমার হাতে।

ওপাশের দরজার কাছে খুট করিয়া শব্দ হইল—প্রথম একটি ছোট হাত, তাহার পর একটি ছোট্ট দেহ বাহির হইয়া আসিল। বড় ছেলের কনিষ্ঠ পুত্র নোটন। বড় চুপে চুপে নোটন আসিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, গৃহিণীর ঘরে বুঝি কেহ নাই, এখন এতগুলি লোক দেখিয়া অত্যন্ত ভীত চক্ষে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা পিছন দিকে লুকাইল। বড়বধূ ফল রাখিয়া ত্রস্তে ছুটিয়া আসিল। ও মা! খেতে খেতে উঠে এসেছে, কি দস্যি ছেলে বাবা! ছুঁস নি, ছুঁস নি, এঁটো মুখে ঠাকমাকে ছুঁস নি। নোটন কাহাকেও ছুঁইল না, কেবল ডান হাতটা আরও ভাল করিয়া লুকাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণীর কনিষ্ঠ পুত্র হাবল এইবার খাট হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে নোটনের কাছে গিয়া বলিল, ও সোনা! সোনা! বলি তোমার ও ডান হাতখানাতে কি সোনা? দৃপ্তকণ্ঠে নোটন কহিল, তোমার জন্যে নয়, কখনও তোমার জন্যে নয়, ঠাক্‌মার জন্যে। বড় বধূ কহিল, ঠাকুরপো, ওকে ধ'রে দিয়ে এস না ভজুয়ার কাছে, হাত-মুখ ধুইয়ে দেবে। নোটন এই কথা শুনিয়া তাহাকে ধরার অপেক্ষা না রাখিয়াই পিছন ফিরিয়া ছুট দিল, কিন্তু তাড়াহুড়াতে এত যত্নের জিনিস হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল, কয়েকটা চিংড়িমাছের ঠ্যাং। রমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ও মা দেখেছ? নোটন তোমার জন্যে চিংড়িমাছের ঠ্যাং এনেছিল। বড় বউ হাসিতে হাসিতে কহিল, ওঃ, তাই তো! আজ ভাত খাচ্ছে আর বলছে, মা, ঠাক্‌মা চিংড়িমাছও খেতে পাবে না; কিছুই খেতে পাবে না, খালি শুয়ে শুয়ে ওষুধ খাবে? গৃহিণীও হাসিলেন, ফলগুলি খাইতে খাইতে বলিলেন, যাও বউমা, তুমি ও পাগলাটাকে দেখগে। হাবল, রমা সবাই রয়েছে; তুমি যাও। বড়বউ চলিয়া গেলে গৃহিণী বড় মেয়েকে প্রশ্ন করিলেন, আজ চিংড়ি পেলি কি ক'রে? বড় মেয়ে কহিল, সত্যি, আশ্চর্য্য মা! আজ এত বছর এ পোড়া দেশে এসেছি, চিংড়ির মুখ কখনও দেখি নি, কাল একটা লোক নিয়ে এসেছিল, বিশ্বাস করবে না, এই প্রকাণ্ড, তিনটেতে এক সের হ'ল। আমি বলছিলুম, আহা! মা ভাল থাকলে নিজে আজ রাঁধতে বসতেন। ধীরে ধীরে গৃহিণী বলিলেন, ঠাকুর সব ঠিকমত রাঁধতে পেরেছে তো? বড় মেয়ে কহিল, বড্ড দেরিতে মাছ এল মা। রাঁধতে রাঁধতেই দাদার খাওয়ার সময় হয়ে গেল, দেরি হ'লে বাবাও রাগ করবেন; মুড়ো আর ঠাকুর ভেজে দিতে পারলে না; দাদাই খেতে পেলে না মুড়ো ভাজা, তাই আমি বললাম, কারুরই খেয়ে কাজ নেই, ভেজে রেখে দাও, ওবেলা খাওয়া হবে। সেই ছোটবেলায় মুড়ো ভাজা নিয়ে দাদা আমার সঙ্গে কি রকম ঝগড়া করত, মনে আছে মা? রান্নাঘরের দিক হইতে ডাক আসিল, বড়দিদি, ছোটদিদি, আপনারা সব খেয়ে যান। ছেলে-মেয়েরা সকলে উঠিল। ছেলে কহিল, দিদি, রান্নাঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে যেও, নইলে দুপুরে মা গিয়ে চিংড়ি রাঁধতে বসবেন। মেয়েরা হাসিতে হাসিতে খাইতে গেল। ফলগুলি সব খাওয়া হয় নাই, গৃহিণী বিরক্ত মুখে ফলের পাত্রটা এক ধারে

সরাইয়া রাখিলেন, আজ একুশ দিন ধরিয়া গৃহিণী কেবল এই খাইতেছেন, ফলের পর ঔষধ, ঔষধের পর ফল।

মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করিয়া নাকের ডগায় চশমাটি বসাইয়া, খবরের কাগজ হাতে লইয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিলেন। রোজ কর্ত্তা এই সময়টিতে আসেন, ক্ষীণকণ্ঠে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী বলেন, খাওয়া হ'ল? অতিরিক্ত আহারজনিত একটা শব্দ করিয়া কর্ত্তা বলেন, হ্যাঁ, বড় গুরুভোজন হয়ে গেছে। জ্বরতপ্ত মুখে গৃহিণী একটু তৃপ্তির হাসি হাসেন। আবার বলেন, তোমায় যেন বড় রোগা দেখাচ্ছে, স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ বড় বউমা সব দিচ্ছে তো ঠিক ঠিক? কর্ত্তা মাথা হেলাইয়া বলেন, হ্যাঁ, সব ঠিক। গৃহিণী চুপ করেন। এবার কর্ত্তা প্রশ্ন করেন, তোমার জ্বরটা কি এখন একটু কম মনে হচ্ছে? জ্বর কিন্তু এ সময়ে বাড়ে। গৃহিণী বলেন, হ্যাঁ, বেশ কম মনে হচ্ছে। কর্ত্তা বলেন, মাথার যন্ত্রণাটা? গৃহিণীর মাথায় এই সময় হাতুড়ি-পেটা চলে। বলেন, হ্যাঁ, যন্ত্রণাটা আর নেই। কর্ত্তা তৃপ্ত মুখে নাকের ডগায় চশমাটা আর একবার ঠিক করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যান।

আজও কর্ত্তা আসিলেন, গৃহিণী শুইয়া আছেন, নড়িলেন না। এই সময় গৃহিণী কখনও ঘুমান না। কর্ত্তা অবাক হইয়া গৃহিণীর কপালে হাত দিলেন,—আজ সত্যই জ্বর নাই। গৃহিণী তবুও কোন কথা বলিলেন না। কর্ত্তা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

মেয়েদের যাওয়ার পর সকলেই এক-একবার মাকে দেখিয়া গেল। মা অঘোরে ঘুমাইতেছেন। ছোট ছেলে এক ঘণ্টা কলেজ ফাঁকি দিয়া, ফল লইয়া মাকে ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়াছিল, এ-ঘর ও-ঘর করিয়া সেও চলিয়া গেল। তাহার পর রান্নাঘরে ভৃত্যদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল কিছুক্ষণ, তারপর বাসন মাজার ঠুংঠাং শব্দ, অবশেষে সব চুপ। গ্রীষ্মের শ্রান্ত মধ্যাহ্নের প্রশান্তিতে সকল কোলাহলের অবসান হইল।

গৃহিণী এতক্ষণ শুইয়া ছিলেন, ললাটের উপর দুর্ব্বল বাহু রাখিয়া ঠিক একই ভাবে শুইয়া ছিলেন। এইবার গৃহিণী উঠিলেন, খাটের বাজুর উপর বাহুতে ভর দিয়া, গৃহিণী নামিলেন। না, বেশ জোর পাইতেছেন দেহে। গৃহিণীর শুইবার ঘরের পিছনে ভাঁড়ার, তাহার পর রান্নাঘর। ভাঁড়ারঘরের দরজা এদিক হইতে খোলা ছিল, পা টিপিয়া টিপিয়া ভাঁড়ার পার হইয়া গৃহিণী রান্নাঘরের দরজা খুলিলেন। উনুন নিবানো রহিয়াছে, এক পাশে জালের বড় আলমারির ভিতর অনেক কিছু দেখা যাইতেছে। গৃহিণী আলমারি খুলিলেন, একটি বড় থালা চিংড়িমাছের মুড়া ভাজায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গৃহিণী ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে একবার এদিক চাহিলেন, ওদিক চাহিলেন, তাহার পর একটি মুড়া লইয়া, চক্ষু বুজিয়া মুখে পুরিলেন।

একুশ দিন জ্বরের পর পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা গৃহিণী আজ সারা দুপুর চিংড়িমাছের মুড়ার স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

শ্রীঅলক রায়

সপ্তর্ষি

এক

হংস-শুভ্র

ক

শ্রীযুক্ত হংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায় চিঠিখানা পেয়ে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। বিরক্ত হ'লে তিনি গম্ভীর হবার চেষ্টা করেন। বিরক্তি প্রকাশ করাটা, তাঁর মতে, হার-স্বীকার করারই নামান্তর। কার সাধ্য তাঁকে বিচলিত করতে পারে? তাঁকে, যাঁকে মহাকালের নিষ্ঠুর প্রহার পর্য্যন্ত একচুল বিচলিত করতে পারে নি, তিন-তিনজন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু যিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করেছেন—এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে, এত বড় পরিবারের এত বিভিন্ন রকম বিপর্য্যয় যিনি অবিচলিত হয়ে সহ্য করছেন, ধৈর্য্য হারান নি ক্ষণকালের জন্য, সারা জীবনের আদর্শ চোখের সামনে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েও যাঁকে কাবু করতে পারে নি—হঠাৎ কুন্দর মুখখানা মনে পড়ল তাঁর, গড়গড়ার ডাক বন্ধ হয়ে গেল, গম্ভীরভাবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন তিনি।

সত্যি, বেশ বড় পরিবার তাঁর—এ অঞ্চলে শুভ্র-পরিবার নামে খ্যাত। পিতামহ যোগীশ্বর মুখোপাধ্যায় শুদ্ধ শান্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন ব'লেই বোধ হয় একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন শিব-শুভ্র। তারপর থেকেই এ বংশে সকলের নামের সঙ্গে 'শুভ্র' শব্দটি যুক্ত হয়ে আসছে, এমন কি মেয়েদের নামের সঙ্গেও আ-কার যোগ দিয়ে—কুন্দ-শুভ্রা, ইন্দু-শুভ্রা, শুক্তি-শুভ্রা, মুক্তা-শুভ্রা ইত্যাদি।

শিব-শুভ্র ভদ্রলোক ছিলেন যদিও, কিন্তু ঠিক শিব-প্রকৃতির ছিলেন না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি মৃত্যুকালে নগদ বিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁর দুই পুত্র হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক যোগীশ্বরের পুত্র কি উপায়ে এত বড় সম্পত্তি হস্তগত করলেন তার ইতিহাস এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ইংরেজ-শাসনের প্রথম আমলে যেসব কৃতী পুরুষ এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের যোগ স্থাপনের মধ্যবর্ত্তিতা ক'রে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, হংস এবং সোম, সে-যুগের লক্ষ্মী-সরস্বতীর সে-যুগীয় প্রভাব পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়। সাহেব মাস্টারের কাছে সাহেবী কেতায় কেবল ইংরেজী লেখাপড়াই শেখেন নি, পণ্ডিতের কাছে

শিখেছিলেন সংস্কৃত, ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন গান-বাজনা, পালোয়ানের কাছে শিখেছিলেন কুস্তি, গুরুজনদের কাছে শিখেছিলেন সহবৎ এবং সে-যুগের 'ইয়ংবেঙ্গল'দের সাহচর্য্যে শিখেছিলেন সে-যুগের রাজনীতি-চর্চ্চা। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা হংস-শুভ্রকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখনকার কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, সুরেন বাঁড়ুজ্যেরা যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রভাব হংস-শুভ্র এড়াতে পারেন নি। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মন এসব ব্যাপারে সাড়া দিত। আই. সি. এস. সুরেন বাঁড়ুজ্যের যখন চাকরি গেল (আইনত যদিও সেটা তাঁর নিজের ত্রুটির জন্যই), তখন তা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে যে ক্ষোভ মথিত হয়ে উঠেছিল, কিশোর হংস-শুভ্রের মনেও ছাপ পড়েছিল তার। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে, যে অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল সে অপরাধ হামেশাই সকলে ক'রে থাকে, তিনি শাস্তি পেলেন স্বাধীনচেতা বাঙালী ব'লে। কিন্তু এ নিয়ে আইন-সঙ্গত আন্দোলন ক'রেও যখন কোন ফল হ'ল না, তখন হংস-শুভ্রের মনে ধারণা হয়েছিল যে, দোষটা বোধ হয় সুরেনবাবুরই বেশি, কারণ বিলেতের সাহেবরাও যখন সব শুনে এর কোন প্রতিকার করলেন না, এমন কি ব্যারিস্টারি পড়বারও অনুমতি দিলেন না তাঁকে, তখন অপরাধটা লঘু নয় নিশ্চয়ই। সাহেবদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কল্পনাই কেউ করত না তখন। পরে এই সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে এসে—(তাঁর কাছে ফ্রী চার্চ কলেজে প'ড়েই-ছিলেন তিনি)—তাঁর বাগ্মিতা-বিদ্যাবত্তা-স্বদেশপ্রাণতার যে পরিচয় পেয়ে-ছিলেন, তা আজও যদিও তাঁর জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে, কিন্তু একজন খাঁটি সাহেবের তুলনায় যে তিনি নিম্নতর স্তরের জীব এ বোধের জন্য লজ্জিত হন নি তিনি তখন, কারণ দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনায় দেবতাকে উচ্চতর স্থান দিতে কারও লজ্জা হয় না। সদ্য-আগত পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে সকলেই মুগ্ধ তখন। তখন রামগোপাল, রাধানাথ, রসিকমোহনরাই সকলের আদর্শ। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত লোকেরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগানে পঞ্চমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রদীপ্ত প্রতিভায় জ্বলছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উদীয়মান। রাধাকান্ত দেব, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের দল শিক্ষিত-সমাজে উপহাসেরই খোরাক যোগাতেন তখন। স্বয়ং সুরেনবাবু মনে-প্রাণে সাহেব ছিলেন, তাঁর বন্ধু রমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসুও। তখনকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সমাজের উন্মুখ মনোবৃত্তিকে রূপ দেবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ যে

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত করেছিলেন, তাতেও যেসব বক্তৃতা হ'ত তা ইংরেজী কেতায় ইংরেজী ভাষায়। তখনকার দেশ-প্রেমের নিদর্শন ছিলেন রাণা প্রতাপ নয়, ম্যাৎসিনি। তাঁর বিপ্লববাদকে গ্রহণ করবার কল্পনাও কেউ করত না অবশ্য—তাঁর স্বদেশ-প্রেম, তাঁর আত্মত্যাগ নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন সবাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন ব'লেই তাঁরা যে প্রত্যেকে ইংরেজের দাসখৎ-লেখা গোলাম ছিলেন, ঠিক তা নয়। বস্তুত একটা জাগরণের সাড়াই জেগেছিল তখন দেশে—প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের আতপ্ত আবহাওয়ায় একটা অস্পষ্ট অধীরতাই যেন অনুভব করছিল সকলে এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশও ক'রে ফেলছিল তা। সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলের উত্তেজনাটা আজও ভোলেন নি হংস-শুভ্র। মারকুইস্ অব স্যালিস্‌বেরি আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার বয়স বাইশ থেকে কমিয়ে উনিশ ক'রে দিয়েছিলেন কেবল ভারতীয়দের জন্য। তখনকার কালে প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল—রাজসরকারে অধিক-সংখ্যক চাকরি পাবার জন্যে আবেদন-নিবেদন করা। স্যালিস্‌বেরির এই ব্যবহারে দেশের লোক ক্ষেপে উঠলেন যেন। সিভিল-সার্ভিস-বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ এই সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলকে দেশ-ব্যাপী আন্দোলন ক'রে তুললেন। কংগ্রেস হবার বহুপূর্ব্বে এই আন্দোলনেই সর্ব্বপ্রথম নিখিল-ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায়। সেই সূত্রে হংস-শুভ্র প্রথমে নাম শুনেছিলেন পাঞ্জাবের দয়াল সিং মাঝিটিয়ার, পণ্ডিত রামনারায়ণের, ডাক্তার সুরযবলের, উকিল কালীপ্রসন্ন রায়ের। সেদিনকার সার্ সৈয়দ আহমদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, রাজা আমীর হোসেন, বাবু ঐশ্বর্য্যনারায়ণ, বাবু হরিশ্চন্দ্র, রামকালী চৌধুরী, বিশ্বনারায়ণ মাণ্ডলিক, কাশীনাথ তেলাং, ফিরোজ শা মেটা, রাণাডেকে এখনও দেশের লোক মনে ক'রে রেখেছে কি না হংস-শুভ্র জানেন না, কিন্তু তখন এঁরাই ছিলেন দেশের অগ্রণী এবং এঁরা সবাই সেদিন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে যে ভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তা হংস-শুভ্রের অন্তরে আজও স্পন্দন তোলে। আজকালকার বাঙালী-বেহারী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত কুৎসিত জিনিস তখনকার দিনে ছিল না—সার্ সৈয়দ আহমদ যদিও মুসলমান-সম্প্রদায়েরই মুখপাত্র ছিলেন এবং বিশেষ ক'রে মুসলমানদেরই উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতেন, তবু তিনি সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলে সই করেছিলেন।

জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রতিবাদ করেছিল ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের। এই সিভিল সার্ভিস আন্দোলন ভারতেই নিবদ্ধ থাকে নি কেবল। লালমোহন ঘোষ এ' নিয়ে বিলেত পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। টাকা দিয়েছিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী। বৃটিশ গভর্মেণ্ট দেশের দাবি মেনে নিয়ে উনিশ বছর কেটে যখন বাইশ বছর করলেন, তখন ইংরেজদের ন্যায়পরতার ওপর বিশ্বাস আরও অগাধ হয়ে উঠল সকলের। ভারতবর্ষের সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষিত-সমাজের প্রথম বাঙ্ময় বিদ্রোহ যে কর্ত্তৃপক্ষের ভাল লাগে নি, তার প্রমাণ মিলল অবশ্য কিছুদিন পরেই। স্যালিস্‌বেরি কিছুদিন পরেই পাঠালেন লর্ড লিটনকে, ছুটি সংঘাতিক 'অ্যাক্ট' তাঁর হাতে দিয়ে—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং আর্ম্‌স অ্যাক্ট। 'সাধারণী' 'সমাজ দর্পণ' 'সোমপ্রকাশ' 'হিন্দু হিতৈষিণী' উঠে গেল। পুলিস সবার হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নিলে। হংস-শুভ্রের বাড়িতে যতগুলো বন্দুক, সড়কি, বল্লম ছিল সমস্ত বাজেয়াপ্ত হ'ল। দেশী ইংরেজী কাগজগুলোতে কড়া-মিঠে মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। হতভম্ব হয়ে পড়ল যেন সবাই। কিন্তু দেশের শিক্ষিত-সমাজের মনে ইংরেজ-ভক্তি তখনও অটুট। হংস-শুভ্রেরও মনে হ'ল যে, যে-ইংরেজ সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে প্রকাশ্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নি, তারা নিশ্চয়ই অকারণে ভারতবাসীকে এমন নিরস্ত্র ও নির্ব্বাক ক'রে রাখবে না। নিশ্চয়ই ভেতরে কোন একটা কারণ আছে, হয়তো আফগান যুদ্ধ, হয়তো দাক্ষিণাত্যের কৃষক-বিদ্রোহ বা ওই রকম একটা কিছু। ওপরে 'মুভ' করলেই যথাকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। 'মুভ' করাও হ'ল। এই সময়ে একটা বিষয়ে তাঁর খটকা লেগেছিল, দেশের জমিদার-সম্প্রদায় এ বিষয়ে কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না। জমিদারদের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একেবারে চুপ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গভর্মেণ্টের পক্ষে ভোট দিয়ে এলেন। কাউন্সিলে তখন জনসাধারণের ভোট নিয়ে সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ত না, গভর্মেণ্ট যাঁকে মনোনীত করতেন তিনিই সভ্য হতেন। এ রকম সভ্য যে কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধিতা করবেন, এ আশা দুরাশা হ'লেও, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। বিরোধিতা করেছিলেন রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি। হংস-শুভ্রের কাছে ওই খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি আজও পূজ্য হয়ে আছেন। তাঁর মত ইংরেজী-নবিস অথচ ভারতীয়, তাঁর মত স্পষ্টবক্তা অথচ মিষ্টভাষী, তাঁর মত বিধর্ম্মী অথচ ধর্ম্মপ্রাণ লোক আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না হংস-শুভ্রের। তখন

যদিও পলিটিকাল সভা রাজদ্রোহসূচক ব'লে গণ্য হ'ত না, তবু ইনি এবং রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড থাকাতে সবাই যেন নির্ভয় হয়েছিল—তা ছাড়া এই দুজন গণ্যমান্য খ্রীষ্টান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ দেওয়াতে প্রতিবাদের মূল্যও ঢের বেড়ে গিয়েছিল। টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, তার ছবিটা এখনও মনে পড়ে হংস-শুভ্রের। তিলধারণের স্থান ছিল না। তখন সবাই, এমন কি রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। সি-আই-ডি ব'লে কিছু ছিল না। সেদিনকার সভার ভিড়ে আর উত্তেজনায় হংস-শুভ্র সোনার ঘড়ি ঘড়ির-চেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চিঠি লেখা হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোনকে। চিঠি মুসাবিদা করেছিলেন সুরেন ব্যানার্জি, সংশোধন করেছিলেন কে. এম. ব্যানার্জি। স্বয়ং গ্ল্যাড্‌স্টোনকে চিঠি লিখতে পারাটাই মস্ত বড় একটা পৌরুষ ব'লে মনে হয়েছিল সেদিন এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে সমস্ত দেশে যে উত্তেজনা জেগেছিল, আজকালকার সস্তা ওপেন লেটারের ছড়াছড়ির দিনে সে উত্তেজনার মূল্য কেউ বুঝবে না। ফল ফলেছিল সে চিঠির, কিন্তু আংশিকভাবে। গ্ল্যাড্‌স্টোন তাঁর 'মিড্‌লোথিয়ান ক্যাম্পেনে' দুটো অ্যাক্টের বিরুদ্ধেই যদিও বক্তৃতা করেছিলেন, কার্য্যকালে কিন্তু দেখা গেল, প্রাইম মিনিস্টার গ্ল্যাড্‌স্টোন একটা অ্যাক্টকেই বাতিল করেছেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট উঠে গেল, আর্ম্‌স অ্যাক্ট উঠল না। রিপন সাহেব এই শুভবার্ত্তাটি নিয়ে এলেন। এই উপলক্ষ্যে যেসব কৃতজ্ঞতা-গদগদ সভাসমিতি হ'ল, তাতে হংস-শুভ্র খুব প্রসন্নচিত্তে যোগ দিতে পারেন নি। আর্ম্‌স অ্যাক্টটা থেকে যাওয়াতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তিনি। ক্ষোভ কিন্তু বেশিদিন রইল না। লর্ড রিপনের মত বড়লাটকে বেশিদিন অগ্রাহ্য ক'রে থাকা সম্ভব ছিল না। সত্যিই তিনি ভারতের বন্ধু ছিলেন। তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়েছিল লোকাল সেল্‌ফ-গভর্মেণ্ট। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গড়বার ধুম প'ড়ে গেল। সুরেনবাবু এই নিয়ে মেতে উঠলেন একেবারে। স্বায়ত্তশাসনের কিঞ্চিৎ অধিকার পেয়ে শিক্ষিত-সমাজ আকাশের চাঁদই হাতে পেলে যেন। হংস-শুভ্রকেও এই সময় একটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানগিরি করতে হ'ল দিনকতক। প্রথম প্রথম তাঁরও মনে হয়েছিল, সত্যি সত্যি আমরা স্বাধীনতার পথে কিছুটা এগোলাম বুঝি। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। লোকাল সেল্‌ফ-গভর্মেণ্টের ওপর নয়,

দেশের লোকের ওপর। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র ক'রে যে জঘন্য দলাদলি স্বার্থপরতা নীচতা শঠতা অসাধুতা কুৎসিত আকারে আত্মপ্রকাশ করল, তা আরও বেশি ক'রে তাঁর ইংরেজ-ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলল যেন। ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা ক'রে নেটিভদের অযোগ্যতাই যেন তিনি দেখতে পেলেন প্রতি পদে। বিরক্ত হয়ে শেষে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক ত্যাগই করলেন। তাঁর ধারণা হ'ল, এমন একটা সুযোগ পেয়েও যখন দেশের লোক কিছু করতে পারলে না, তখন এদের আর কোন আশা নেই। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন ইংরেজ হবার। মাঝে মাঝে দু-একটা বদখত ইংরেজ তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিত অবশ্য। একটা নীলকর সাহেব এবং দুর্দ্দান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের জ্বালাতেই নিজের জমিদারি বিক্রি ক'রে দিয়ে কলকাতায় চ'লে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ইংরেজ-ভক্তি কমে নি তাঁর। কারণ আদালতে মকদ্দমা ক'রে উক্ত নীলকর সাহেবের কাছে তিনি খেসারৎ আদায় করেছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও বদলি করিয়েছিলেন। ব্রিটিশ জাস্টিসের ওপর ভক্তি অচলা ছিল তাঁর। সে ভক্তিও অবশ্য কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিল সুরেন বাঁড়ুজ্যের কোর্ট-কন্‌টেম্‌প্‌ট কেসে। কিন্তু সেটাকেও একটা ব্যক্তি-বিশেষের দোষ ব'লেই মনে হয়েছিল—ইংরেজ-জাতের ওপর চটবার কোন কারণ ঘটে নি। বরং এ নিয়ে আন্দোলন করলে যে ফল হবে, এও তাঁর আশা ছিল। আন্দোলন হয়েওছিল খুব। শালগ্রামশিলার ওপর যে খুব একটা ভক্তি ছিল তা নয়, কিন্তু জাস্টিস নরিস সেটাকে আদালতে নিতে বাধ্য করাতে সকলের আত্মসম্মানে যেন ঘা লেগেছিল। সুরেনবাবু তা নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী'তে যখন বেশ কড়ারকম একটা 'লিডারেট' লিখলেন, তখন সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। এই অপরাধে তাঁর দু মাস জেল হয়ে গেল। সমস্ত দেশে যেন ঝড় উঠল একটা। যেদিন তাঁর বিচার হয় আদালত-প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছিল সেদিন। কলেজের সমস্ত ছেলেরা গিয়েছিল, হংস-শুভ্রও ছিলেন সে ভিড়ের মধ্যে। যখন রায় বার হ'ল, তখন সে কি উদ্দাম উত্তেজনা! আদালতের জানলার একটি কাচও অক্ষত থাকে নি। শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও সাড়া জেগেছিল। সুরেনবাবুর অপমান সারা ভারতেরই অপমান ব'লে গণ্য হয়েছিল সেদিন। জাতীয়ত্ব-বোধ জাগছিল ধীরে ধীরে। জেল থেকে বেরিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আরও জাগিয়ে তুললেন সেটাকে। কিছুদিন আগে থেকে

ইলবার্ট বিল নিয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী একটা গাত্রদাহ ছিলই—এ সম্পর্কে আলাব্যার্টি হলে সুরেনবাবুর বক্তৃতা ভোলবার নয়— এই সুরেনবাবুর অপমানে সারা দেশ যেন জেগে উঠল। সুরেনবাবু আর একবার ঘুরে এলেন ভারতের নানা স্থানে, ন্যাশনাল ফাণ্ডের জন্যে টাকা উঠল। জাষ্টিস নরিসের বিশেষ কিছু হ'ল না যদিও, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে দেশের লোকের আত্মসম্মান-বোধ প্রবুদ্ধ হ'ল যেন। ঠিক এর পরই বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স। সভাপতিত্ব করলেন আনন্দমোহন বসু। এ ঠিক বিদ্রোহীয় সভা নয়, উপযুক্ত পুত্র পিতার কাছে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে বৈষয়িক ব্যাপারে অধিকার দাবি করে যে ভাষায়, ভারতবাসীরাও ঠিক তেমনই ক'রে অধিকার দাবি করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের কাছে। দাবি করেছিলেন— শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাবার, স্বায়ত্তশাসনের, শিক্ষাবিস্তারের, শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের কর্ত্তব্য পৃথক পৃথক লোকের হাতে দেওয়ার এবং অধিক-সংখ্যক ভারতবাসীকে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করবার। এর কিছুদিন পরে যা ঘটল, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই। ইংরেজরা সত্যিই যে এই অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করতে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও। কিছুদিন আগে রিপন সাহেব চ'লে গেছেন, এসেছেন লর্ড ডাফরিন। তাঁর আনুকূল্যে এবং হিউম সাহেবের প্রেরণায় বম্বেতে বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ডব্লিউ. সি. বনার্জি হলেন তার সভাপতি এবং ইংরেজী ভাষায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-বিষয়ে যা বললেন, তাই তখনকার দিনে কাম্য ছিল—ইংরেজ গভর্মেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ভারতকে সভ্য করা। এইই সকলে তখন চাইত এবং হবে ব'লে বিশ্বাস করত। হংস-শুভ্রেরও ধারণা ছিল, ভারতের উন্নতি-সৌধ উঠবে রাজ-ভক্তির বনিয়াদের ওপর এবং সে সৌধ অলঙ্কৃত হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে। হোয়াইট ম্যান্‌স বার্ডেনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর। তাই কংগ্রেসের প্রথম কয়েক বছর তিনিও নিষ্ঠাভরে দেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে এই বার্ষিক পিক্‌নিকে যোগ দিতে যেতেন এবং রাজ-ভক্তির সঙ্গে দেশ-ভক্তি 'পাঞ্চ' ক'রে যে বক্তৃতা-সুরা প্রস্তুত হ'ত তারই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন সারাটা বছর। এ নেশাও কিন্তু ছুটে যেতে লাগল মাঝে মাঝে। লর্ড ডাফরিন যাবার সময় কংগ্রেসকে ঠাট্টাই ক'রে গেলেন, শিক্ষিত-সমাজকে ব'লে গেলেন—'মাইক্রস্‌কপিক মাইনরিটি'! দিনকতক পরে এক

সার্কুলারে গভর্মেণ্ট-অফিসারদের কংগ্রেসে যোগ দিতে মানা করা হ'ল। এলাহাবাদে কংগ্রেস করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল প্রায়—তাঁবু গাড়বার জায়গাই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু এঁরা ভগ্নোদ্যম হলেন না। ইংরেজদের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার ওপর আস্থা রেখে তাঁদের কনস্টিট্যুশনাল আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন মোলায়েম ভাষায় এবং এর ফলেই সম্ভবত শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত জনকয়েক দেশী সভ্যের স্থান হ'ল, শিক্ষারও বিস্তার হ'ল কিছু। কিন্তু কিছুদিন পরেই এলেন লর্ড কার্জন, তারপর ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট এবং তারই পিঠোপিঠি বেঙ্গল পার্টিশন। হংস-শুভ্রের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন হঠাৎ। তিনি আরও হতাশ হলেন পরবর্ত্তী নেতাদের সুর শুনে। তিলক নিজেকে 'ন্যাশনাল' ব'লে ঘোষণা করলেন এবং যে 'নেটিভ' কুপ্রথাগুলোকে এতকাল তাঁরা বিদ্রূপ ক'রে এসেছেন, সেইগুলোকে আস্ফালন ক'রেই 'ন্যাশানালিজ্‌ম' জাগাতে চাইলেন সকলের। তিনি বাল্য-বিবাহের সপক্ষে দাঁড়িয়ে কন্‌সেণ্ট-বিলের বিরোধিতা করলেন, গো-হত্যা-নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, গণেশ-পূজো নিয়ে মাতলেন, এবং ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্‌ডি, নেল্‌সন, নেপোলিয়নকে ছেড়ে শুরু করলেন শিবাজী-উৎসব। বাংলা দেশেও ধর্ম্ম-বাই জেগেছিল কিছুদিন আগে—ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিল অনেকে, পরমহংসকে নিয়ে নরেন দত্তর দল হৈ-হৈ করছিল, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনেরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করছিলেন। এসব জিনিস হাসিরই খোরাক যোগাত হংস-শুভ্রের বিলিতী মদের আড্ডায়। কিন্তু এই সব জিনিসেরই পলিটিকাল রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই সব কুসংস্কারগুলোই যেন নূতন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে অরন্ধন আর রাখীবন্ধনের হিড়িকে, কালীপূজো করবার আর 'সন্তান' হবার আগ্রহে। বঙ্গভঙ্গের জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি, সাময়িকভাবে বিদেশী জিনিস বয়কট করবার চেষ্টাও যে করেন নি তা নয়, কিন্তু বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে পিসীমা সাজতে প্রস্তুত ছিলেন না মোটেই। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যে 'আর্য্যামি' আত্মপ্রকাশ করছিল, তা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না তিনি। তখনকার স্বদেশী সভা, সে সভা ভেঙে দেবার জন্যে পুলিসের বলপ্রয়োগ, রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী গান, পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা, সেকালের 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' 'বন্দেমাতরম্‌', ফুলার সাহেবের হুমকি, সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা তাঁর দেশ-

ভক্তিকে খুবই উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছিল, যে স্বদেশী তখন বাংলা দেশের আকাশে-বাতাসে, যে স্বদেশীতে তাঁর নিজের বন্ধুরা মেতেছেন, সে স্বদেশীকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেন নি—কিন্তু প্রথম যৌবনে যে কব্‌ডেন ডিজ্‌রেলি বার্ক শেরিডন, যে শেক্‌স্‌পিয়র মিল্টন স্কট ডিকেন্স, যে ম্যাল্‌থস মিল কাণ্ট হেগেল, যে নিউটন ডারবিন ওয়াট কেলভিন তাঁর চিত্তকে আলোকিত করেছিল, এই নতুন ঝড়ের ঝাপটায় তাদের শিখা নিবে যাবে এ কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। মাইকেলের কাব্য পড়ার পর হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা'ও যেমন তাঁর ভাল লাগল না, দেবেন ঠাকুরের ছেলের মিহি-সুরের ছড়াও তেমনই কানে লাগল না। ঝড় এলে লোকে যেমন ঘরদোর সামলাতে ব্যস্ত হয়, তিনিও তেমনই নিজের আদর্শ বাঁচাতে ব্যস্ত হলেন। ভিক্টোরীয় সভ্যতার যে উদাত্ত গম্ভীর আদর্শে তিনি মানুষ, কোন কারণেই তা যে বর্জ্জন করা সম্ভব, এ কথা ভাবতেই পারলেন না তিনি। মুখে স্বীকার করতে না পারলেও মনে মনে সাহেবই তখনও তাঁর কাছে দেবতা ছিল। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন 'বম' পড়ল মজঃফরপুরে। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে লাগল না—মারা গেলেন দুজন নিরীহ মেমসাহেব। এর পর আর কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। কংগ্রেসের খাতায় অবশ্য নাম রইল, কিন্তু 'মডারেট' দলে। এই মডারেটরাও কিছুদিন পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেদের নতুন দল গড়লেন—গোখলের সঙ্গে তিলকের বনল না। তাতে যোগ দেবার আর উৎসাহ পান নি হংস-শুভ্র। নিজের আদর্শ নিয়ে একান্তভাবে নিজের পারিবারিক জীবনেই নিবদ্ধ হয়ে রইলেন তিনি। দেশে আন্দোলন অবশ্য চলছিলই এবং তার ফলাফলও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। বয়সও বাড়ছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর ইংরেজ-প্রীতি অনেকটা ক'মে গেছে যেন। ইংরেজ-ভক্তির যে দুর্গে তিনি আত্মরক্ষা করছিলেন, ইংরেজরা নিজেরাই একটার পর একটা গোলা ছুঁড়ে সে দুর্গকে ভূশায়ী ক'রে ফেললেন ক্রমে। সিডিশাস মীটিং অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, মর্লি-মিণ্টো বিলের কৃপণতা, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই আইনটার জোরে বিনা-বিচারে দেশের লোককে আটক রাখা—প্রত্যেকটি এক-একটি গোলা। খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে তিলকের ছ বছর জেল হয়ে গেল—ম্যাণ্ডালেতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁকে। বাংলা দেশের কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনীকুমার

দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধ মল্লিক, শচীন বোস, সতীশ চ্যাটুজ্যে, ভূপেন নাগ, অরবিন্দ ঘোষ সবাই জেলে। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' সব উঠে গেল। দেশ ছেয়ে গেল সি-আই-ডির গুপ্তচরে। কিছুদিন পরে হঠাৎ আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করলেন। তাঁর সমসাময়িক যেসব নেতারা বড় বড় স্বদেশী ছিলেন, এখন তাঁদের অধিকাংশই বড় বড় চাকরে হয়েছেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার থেকে শুরু ক'রে মাদ্রাজের যত আয়ার এবং নায়ারের দল, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, এ. চৌধুরী, এস. পি. সিন্‌হা, প্রভাস মিত্তির, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, হাসান ইমাম সকলেই গভর্মেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারী। মনে হ'ল, এই মোক্ষ-লাভের জন্যেই যেন এঁরা এতদিন আন্দোলন করছিলেন। ফিরোজ শা মেটাও 'সার্' হলেন। হলেন না কিছু কেবল গোখলে। তিনিই শুধু গোপালকৃষ্ণ গোখলে থেকে গেলেন। কিন্তু গোখলে কটা আছে? গোখলের সগোত্র যাঁরা, গভর্মেণ্টের বিরোধিতা করেছিলেন ব'লে তাঁরা সবাই জেলে। এর কিছুদিন পরে উপর্য্যুপরি কয়েকখানা বই তাঁর হাতে এসে পড়ল। ওয়েডারবার্নের লেখা হিউমের জীবনী, ডব্লিউ. সি. বনার্জির লেখা "ইন্‌ট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্‌স', লায়ালের লেখা 'লর্ড ডাফ্‌রিনের জীবনচরিত'। প'ড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন, আমাদের দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে নয়, আমাদের দেশের উদীয়মান স্বাধীনতা-স্পৃহাকে একটা ভদ্র গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখবার জন্যেই হিউম সাহেব লর্ড ডাফ্‌রিনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন। এর পর ইংরেজদের ওপরও আর ভক্তি রাখা গেল না। কিন্তু কংগ্রেসেও আর ফিরতে পারলেন না তিনি—তাঁর কাছে সমস্তই যেন বাজে হুজুক ব'লে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এরা সব সুবিধাবাদীর দল, চাকরি বা বকশিশ পেলেই সব লম্ফঝম্ফ থেমে যাবে এদেরও।

ইংরেজ এবং দেশের লোক দুয়েরই ওপর আস্থা হারিয়ে হংস-শুভ্রের অবলম্বনহীন মন যখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন হঠাৎ একদিন নজর পড়ল বুড়ো দরোয়ানটার ওপর। দেশের বড়লাট কে হ'ল, না হ'ল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই ওর। ও ঠিক ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান করে, তুলসী-তলায় জল ঢালে, পূজোপাঠ করে, রামায়ণ পড়ে, তিলক কাটে, ভজন গায়। বড়লাট রিপনই হোক বা মিণ্টোই হোক, ওর স্বাধীনতা হরণ করতে পারে নি কেউ। বাইরের উত্তেজনার অভাবে আমাদের মন যেমন ক্ষণে ক্ষণে নিরাশ্রয়

হয়ে পড়ে, ওর তেমন হয় না। ওর দিনচর্য্যা ঠিক আছে—কার্জনের আমলেও যেমন ছিল, হার্ডিঞ্জের আমলেও তেমনই আছে। অথচ মানুষ হিসেবে ও কারও চেয়ে ছোট নয়। হংস-শুভ্র ওকে যত বিশ্বাস করেন, নিজের ছেলে শশাঙ্ককে তত করেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, ভুল করেছি, এতদিন তিলকই ঠিক বলেছিল। হিন্দুধর্ম্মই আমাদের সনাতন আশ্রয়—ওই আমাদের 'ন্যাশনালিজ্‌ম'—বাদ বাকি "সব ঝুটা হ্যায়"। গীতা মহাভারত প'ড়ে সে মত আরও দৃঢ় হ'ল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সনাতন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অবশেষে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। যেগুলোকে আগে কুসংস্কার ব'লে মনে হ'ত, সেইগুলোরই নূতন নূতন অর্থ যেন প্রতিভাত হতে লাগল তাঁর মানসচক্ষে। উগ্র সাহেব ছিলেন যিনি একদিন—খানসামা-বাবুর্চ্চী-ডিনার-লাঞ্চ-স্যুট-সিগারেট-সর্ব্বস্ব সাহেবই নয়, মনে-প্রাণে সাহেব, স্ত্রী কাঞ্চনমালাকে মেম মাস্টারনী রেখে মেমসাহেব করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত যিনি করেছিলেন (সফল হন নি যদিও, কাঞ্চনমালা পানের বাটা ত্যাগ করতে রাজি হলেন না কিছুতে), ছেলেদের বিলেত পাঠিয়েছিলেন, মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলেন, কোর্টশিপ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন, বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পর্য্যন্ত ত্রুটি করেন নি, তিনি শেষ বয়সে একেবারে উলটে গেলেন। এখন পাঁজি ছাড়া এক মুহূর্ত্ত চলে না। নামাবলী গায়ে, কানে খড়কে গোঁজা, তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি অলঙ্কৃত এই লোকটির মধ্যে প্রাক্তন মিস্টার এইচ. এস. মোকার্জিকে খুঁজে বার করা সত্যিই অসম্ভব এখন।

একই শিক্ষার ফলে এবং এক রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে দু ভাই কিন্তু ঠিক এক রকম হন নি। সোম-শুভ্রের ওপর এই শিক্ষার ফল ফলেছিল একটু ভিন্ন রকমের। তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সে-যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের যে দুর্ভোগ, তা সবই ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। পিতা বেঁচে থাকলে হয়তো ত্যাজ্যপুত্রই করতেন, বিষয় থেকেও বঞ্চিত হতে হ'ত, কিন্তু সে লাঞ্ছনাটা সইতে হয় নি, বিষয়ের অর্দ্ধেক ভাগ ঠিকই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছিল। উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র ব্রাহ্মদের দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না, বিশেষ ক'রে কেশব সেনের মেয়ের বিয়ের পর থেকে। তাঁর কেমন যেন ধারণা জন্মেছিল, ওরা সবাই ভণ্ড। দাড়ি রেখে চশমা প'রে বেদ-উপনিষদের মুখস্থ বুলি আওড়ায় কেবল, মনের এতটুকু প্রসারতা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনী-শক্তি নেই,

চিবিয়ে চিবিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে চারদিক বাঁচিয়ে ওজন-করা কথা বলার প্রয়াসেই ওদের জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হয়েছে। হয়তো হংস-শুভ্রের ধারণাটা ভুল, কিন্তু সেটা তাঁর বদ্ধ ধারণা হওয়াতে কিছুতেই তিনি সোম-শুভ্রের আকস্মিক ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি। সোম-শুভ্রকে পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্নই করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের পরিবারও গ'ড়ে ওঠে নি, কারণ তিনি বিবাহই করেন নি। বিহার-অঞ্চলে খানিকটা জমি কিনে কৃষি-কর্ম্ম ক'রেই কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় সারা জীবনটাই। তাঁর এক কলেজী বন্ধু সুরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিবারের সঙ্গেই সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সুরেশ্বরও ব্রাহ্ম। প্রায় বছর দশেক আগে তিনি মারা গেছেন একটিমাত্র ছেলে রেখে। ছেলেটির মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। কৃষিকর্ম্ম এবং এই পিতৃমাতৃহীন পরমানন্দই সোম-শুভ্রের মনের আশ্রয় ছিল। পরমানন্দকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন একটি মনোমত পাত্রীর সঙ্গে তার বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। পাত্রী অনামিকা তাঁর এক বন্ধুরই মেয়ে। এদের কেন্দ্র ক'রে সোম-শুভ্রের জীবন এক রকম কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের খবর তিনি নিতেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। শশাঙ্ক-শুভ্র, মৃগাঙ্ক-শুভ্র এবং কুন্দ-শুভ্রাকে তিনি কোলে করেছেন, কিন্তু বাকি কজনের—সিতাংশু-শুভ্র, হিমাংশু-শুভ্র, সুধাংশু-শুভ্র, ইন্দু-শুভ্রা—এদের সংস্পর্শ পান নি তিনি। সিতাংশুর জন্ম হবার আগেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তার পর থেকেই ছাড়াছাড়ি। দেখা হয়েছে অবশ্য বহুবার। সেদিনও শশাঙ্ক তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল। হিমাংশু যেবার ডি. এস-সি. হ'ল, সেবার সে নিজেই এসে কাকামণির সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছিল। সিতাংশু ব্যারিস্টারি পাস ক'রে কলকাতায় এসে নামল যেদিন, সেদিন তিনি নিজেই স্টেশনে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। সুধাংশুও অক্সফোর্ড থেকে বরাবর চিঠি লিখত তাঁকে। হিমাংশু, সিতাংশু কেউ নেই আজ, সব অকালে মারা গেছে। কুন্দও নেই—হয়তো সেও মরেছে, বেঁচে থাকলেও ভদ্রসমাজে তার অস্তিত্ব আর স্বীকার করা সম্ভব নয়। কুন্দর চিঠিখানা কিন্তু সোম-শুভ্রের কাছে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চিঠিখানা এখনও খুলে দেখেন তিনি। ছোট চিঠি, দুটি ছত্র মাত্র লেখা—"কাকামণি, চললুম। আপনার বিদ্রোহ সমাজ মেনে নিয়েছে—আমার বিদ্রোহও যেদিন নেবে সেদিন ফিরে আসব, যদি বেঁচে

থাকি।" যদিও তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে নীতিবাগীশ ব'লে বিখ্যাত, তবু কুন্দর জন্যে অন্তরের নিভৃত কন্দরে তিনি বেশ একটু দুর্ব্বলতা পোষণ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—আহা, মেয়েটার ঠিকানাটা যদি পেতাম, দেখা ক'রে আসতাম গিয়ে। তার কচি সুন্দর মুখটা মনের ওপর ভেসে ওঠে। তাকে যখন তিনি শেষবার দূর থেকে দেখেছিলেন, তখন তার বয়স বছর দুই হবে। দূর থেকেই তিনি এতকাল দাদার পরিবারের খবর নিয়েছেন এবং ভেবেছিলেন, চিরকালই তাই হয়তো নিতে হবে, কিন্তু বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন হংস-শুভ্রের এক চিঠি পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একটু পুলকিতও যে না হলেন তা নয়, কিন্তু একটু দুঃখও হ'ল। যে সংসার থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, সে সংসার তো আর নেই। সে সংসারের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বস্তু ছিলেন যিনি, সেই বউদিদিই নেই, হঠাৎ মারা গেছেন সেদিন।... হংস-শুভ্র রীতিমত সনাতন পদ্ধতিতে পত্র লিখেছিলেন।—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

আশীর্ব্বাদভাজন শ্রীমান্ সোম-শুভ্র মুখোপাধ্যায়
পরমকল্যাণবরেষু,

গতকল্য আমার আশী বৎসর পূর্ণ হইল। অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। তোমার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাও একটা ভুল। ইহার জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কখনও অনুতপ্ত হই নাই। কারণ মনে একটি সান্ত্বনা ছিল, যাহা করিয়াছি তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছি। আজ কিন্তু আর সে সান্ত্বনা নাই, তাই অনুতপ্তচিত্তে ভুল সংশোধন করিতে বসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এতকাল যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আজ তাহাই বেঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। হিন্দু কখনও পরমত-অসহিষ্ণু নয়। হিন্দুধর্ম্মে যত মত তত পথ এবং সব পথই এক লক্ষ্যাভিমুখী। হিন্দুধর্ম্মে মতের বিভিন্নতা আছে, অভিনবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আছে—কলহ নাই। বাস্তবধর্ম্মী পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া তোমার সহিত মনোমালিন্য করিয়াছিলাম। সে মোহ কাটিয়াছে। তুমি আবার ফিরিয়া এস, আমি অনুতপ্তচিত্তে আমার নিষেধ প্রত্যাহার করিতেছি। তুমি সত্যই ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা অবশ্য তোমার বিচার্য্য। বলা বাহুল্য, আসিলে আমি অতিশয় সুখী হইব।

সংসারে কাহারও সহিত মতের মিল হয় না। ছেলেরা এবং নাতিরা যাহার যাহা খুশি করিতেছে। সৎ পরামর্শ দিলে কেহ শোনে না। নিজের মতামত আস্ফালন করিয়া অপরের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন জন্মাইবারও প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি দমদমের বাড়িতে তারাপদকে লইয়া একাই থাকি। ইন্দুও আমার কাছে থাকে। কেন যে থাকে, বুঝি না। বার বার তাহাকে বলি, তুমি একাই যদি থাকিতে চাও, পার্ক স্ট্রীটে তোমার আলাদা একটা বাড়ি আছে, সেইখানেই যাও না, আমার কাছে কেন? সে কোন উত্তর দেয় না. যায়ও না, আমার বকুনি শুনিবার জন্য আমার কাছে পড়িয়া থাকে।

তুমি যদি এ অঞ্চলে আস, আমার সহিত দেখা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই। আমার আশীর্ব্বাদ লও। আশা করি ভাল আছ। ইতি আশীর্ব্বাদক

শ্রীহংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

এ বছর দুই আগের ঘটনা।

তার পর থেকে সোম-শুভ্র মাঝে মাছে দাদার কাছে যান। গেলে দাদা মনে মনে আনন্দিতই হন নিশ্চয়ই, অন্তত সোম-শুভ্রের তাই ধারণা, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ বা প্রমাণ বড় একটা পান নি তিনি। হংস-শুভ্র তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন, তাঁর যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। ঠিক ভাইয়ের মত নয়, সম্মানিত অতিথির মত আলাপ করেন তাঁর সঙ্গে। সোম-শুভ্রের মনে হয়, ঠিক সুর যেন মিলছে না, কোথায় কিসের যেন একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। তবু তিনি যান মাঝে মাঝে।

বাসন্তীর চিঠিখানা আর একবার প'ড়ে, হংস-শুভ্র অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, ছেলেটাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—

পাশের ঘরেই ইন্দু ছিল। বাবার অনুচ্চ কণ্ঠস্বরও তার কর্ণ এড়ায় না, সে বেরিয়ে এল।

কিছু বলছ বাবা?

না।—একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হংস-শুভ্র।

ডাক এল নাকি? কার চিঠি ওখানা?

তোমার বড়বউদিদির।—মুখে হাসি ফুটিয়ে গড়গড়ার নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন, এমন একটা ভাব করলেন যেন খুব কৌতুকজনক একটা সংবাদ আছে চিঠিখানাতে। স্মিত মুখে নীরবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন। ইন্দুর বুঝতে বাকি রইল না যে, বাবা বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল। বাবা যদি বুঝতে পারেন যে, সে তাঁর মনোভাব টের পেয়েছে, তা হ'লে আরও বিরক্ত হবেন তিনি। তাই সে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হ'ল।

আজকের কাগজখানা দেখেছ? হিন্দু মহাসভা—

না, দেখি নি।

তারপর ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, কোন দিনই দেখি না। দেশের লোক দুটো পয়সা পাবে ব'লে কিনি।

সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দুকে বলতে হ'ল, তা বটে, একটা খবরও সত্যি নয়।

কি করবে বেচারারা? পিঠের চামড়ার মায়া তো সবাই ত্যাগ করতে পারে না, মানুষের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মত শক্তও নয়, চাবকালে বেশ লাগে।

তোমার খড়মের ফিতেটা তারাপদ ঠিক ক'রে দেয় নি দেখছি এখনও।

ইন্দু একটু ঝুঁকে খড়মটা তুলে নিলে।

একটা ছোট পেরেক দিয়ে দিলেই তো হয়, আমিই দিচ্ছি, তারাপদর অবসর হবে না কোনও কালে।

খড়মটা নিয়ে ইন্দু চ'লে গেল। হংস-শুভ্র হাসলেন একটু। মেয়েটা সর্ব্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, ও অদরকারী নয়, খড়মের ফিতে থেকে আরম্ভ ক'রে বালিশের ওয়াড়ের ঝালর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিজের প্রতিপত্তিটুকু জাহির ক'রে রাখা চাই সর্ব্বক্ষণ। সহসা হংস-শুভ্রের কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়ল। সব সময়ে সুযোগ পেত না যদিও, কিন্তু সেও সর্ব্বদা নিজের আয়ত্তের মধ্যে সব জিনিস রাখতে চাইত। খাওয়া-শোওয়া আসবাব পোশাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, গামছা-খড়মের দরকার হ'লেও তার শরণাপন্ন না হ'লে পাওয়া যেত না। পুরুষদের স্বাধীনতা-হরণের এ কৌশলটা আজকালকার মেয়েদের ঠিক জানা নেই বোধ হয়। অনেক বাড়িতেই পুরুষদের আলাদা আলমারি, আলাদা ওয়াড্রোব স্ত্রী-সংস্পর্শ-বর্জ্জিত হয়ে খানসামার তদারকে থাকে। শঙ্কর যেমন।

হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, বিয়ে করলেই স্ত্রী-লাভ হয় না সকলের ভাগ্যে,—কনকের মত অমন—

এই নাও। খড়মটা ঠিক ক'রে ইন্দু নিয়ে এল। হংস-শুভ্র পায়ে দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে! খড়মটা পরতে গিয়ে চিঠিখানা কোল থেকে মেঝেতে প'ড়ে গেল। সেটা তুলে নিয়ে পাশের তেপায়াতে রাখলেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

কি লিখেছেন বউদিদি?

প'ড়ে দেখ।

ইন্দু চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।—

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আগামী রবিবারে আমাদের ছোট্ট খোকনের মুখে ভাত দেব ঠিক করেছি। রবিবার ছাড়া অন্য দিনে হওয়ার অসুবিধে। কারও ছুটি নেই। সেদিন মনে করেছি সবাইকে বলব। ছোটঠাকুরপোর বম্বে চ'লে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাকে ধ'রে রেখেছি। কাজলের বাবা দানাপুর থেকে এসে পৌঁছবেন—মানে, পৌঁছবার কথা—আগামী শুক্রবারে। কাল তাঁকে টেলিগ্রাফ করেছি, ঠিক যেন আসেন। বিয়ের পর থেকে তিনি তো আসেনই নি, হয়তো ভাবছেন, আমরা কিছু মনে করেছি, এই উপলক্ষ্যে এসে তাঁর সে ধারণাটা দূর হোক। কনককে অনেক ক'রে লিখেছিলাম আসবার জন্যে, কোন উত্তর পাই নি। মুক্তা আর শুক্তিকে বোর্ডিং থেকে আনিয়ে নেব সেদিন, সে দুদিন ওরা আমার কাছেই থাকবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি পাওয়া গেছে, শুনলাম ঠাকুরপোর কাছে। ভারী কড়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমি 'ফোন' করাতে বললেন যে, গার্জেনের চিঠি না পেলে ছুটি দিতে পারবেন না। ভাগ্যিস ঠাকুরপো এখানে ছিল। ঠাকুরপোকে কতবার বলেছি, আমাকে ওদের লোকাল গার্জ্জেন ক'রে দাও, ওদের মাসীর চেয়ে তো আমি বেশি আপনার—ঠাকুরপো মুখে প্রত্যেক বারই বলে, আচ্ছা, তাই ক'রে দেব, তোমরা ঝঞ্ঝাটে পড়বে ব'লেই করি নি। এতে ঝঞ্ঝাটটা কি বলুন তো? আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন, কাকামণিও ঠিক সেই সময় এদিকে আসছেন। তিনি তো আমাদের পারিবারিক উৎসবে বড় একটা যোগ দেন নি কখনও, এবার আসবেন লিখেছেন। আমার বাবাকেও চিঠি লিখেছিলাম আসবার জন্যে। তিনি বুড়ো হয়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, তিনি

যে আসতে পারবেন সে আশা অবশ্য করি নি, তবু লিখতে হয়, লিখেছিলাম। টুনি লিখেছে, তিনি নাকি আসবার জন্যে ক্ষেপেছিলেন, গাড়ি রিজার্ভ করতে লোক পর্য্যন্ত পাঠিয়েছিলেন নাকি, শেষে মণি কর্নেল হাউডকে ডেকে এনে থামায় তাঁকে। তিনি আসবেন না বটে, কিন্তু কত জিনিস যে পাঠিয়েছেন নাতির ব্যাটার জন্যে, তা এলে দেখতে পাবেন। দিল্লী শহরের যত মেওয়া ছিল সব ঝুড়ি ঝুড়ি, তা ছাড়া কত রকম টফি লজেন্‌জ বিস্কুট, কত হরেক ধরনের শিশি বাক্স কৌটো—একটা ঘর ভ'রে গেছে একেবারে। এর ওপর পাঁচশো টাকার চেকও পাঠিয়েছেন একখানা। চেকটা ভাগ্যে ওঁর হাতে পড়ে নি, পড়লেই ফুট-কড়াই হয়ে যেত। ও আমি খরচ করব না, খোকনের নামে জমা ক'রে দেব। উপহার আরও অনেক এসে জুটেছে। ওঁর বন্ধু মেজর চণ্ডা চমৎকার একটা দোলনা কিনে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো একরাশ রেশমের খদ্দরি বিছানা এনে হাজির করেছে। বললাম, যা মুতুড়ে ছেলে হয়েছে, ওকে রেশম কেন, এক গাদা অয়েল-ক্লথ কিনে দাও বরং। সুক্তি-মুক্তা দুজনে মিলে একটা পেরাম্বুলেটার দেবে বলেছে। নবনী তো বড় একটা আসে না, সেও সেদিন সুন্দর একটা ঝারা কিনে দিয়ে গেছে। ছেলের পাওনা-ভাগ্য খুব। শঙ্খ বলছে, আমি কিচ্ছু দেব না। কেবল কান ম'লে দিচ্ছে ব্যাটার। বেশ জোরে জোরে ম'লে দেয়—সেদিন তো ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। হিমু-ঠাকুরপো ঠিক অমনই ক'রে হীরুর কান ম'লে দিত—মনে আছে আপনার? কোথায় আজ হিমু-ঠাকুরপো, কোথায় বা হীরু! ভগবান যাদের নিয়ে নিয়েছেন, তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু হীরু যে আমার থেকেও নেই। কবে যে জেল থেকে ছাড়া পাবে, কে জানে! দাদার ছেলে হয়েছে শুনে কি আনন্দ তার, কি চমৎকার চিঠি লিখেছে! কি নামই রেখেছিলেন ওর আপনি—হীরকের মতই উজ্জ্বল, হীরকের মতই কঠিন! আপনার দেওয়া নামের মর্য্যাদাও রেখেছে। সবই বুঝি, তবু কষ্ট হয়—মনে হয়, ও যদি কঠিন না হয়ে আর একটু কোমল হ'ত, হয়তো ওকে ধ'রে রাখতে পারতাম। রজতের ব্যাপার তো জানেন, সে এখানে থেকেও নেই, কাজল মাঝে মাঝে আসে, সে কিন্তু ঘর থেকে আর বেরোয় না। সেদিন গিয়ে, অনেক ক'রে ব'লে এসেছি, যা খামখেয়ালী ছেলে আসবে কি না জানি না।

আপনি ইন্দুকে নিয়ে নিশ্চয় আসবেন। আমি আগের দিন বিকেলে

গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বিকেলে মানে দুপুরবেলাই পাঠাব, আপনি যাতে তিনটে নাগাদ এখানে এসে পৌঁছতে পারেন। পাশাপাশি আরও দুখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি—অনেকে আসবে তো, একটা বাড়িতে কুলোবে না। আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলো আপনার জন্যে ঠিক ক'রে রাখছি, ওপরে আপনার কষ্ট হবে। বেশি কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে না, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়গুলো আনবেন কেবল। পূজোর জিনিসপত্র আনবার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যে এক সেট সব কিনে রেখেছি, এমন কি শ্বেতপাথরের বাসন পর্য্যন্ত। আপনাকে আসতেই হবে, অমত করবেন না। আপনার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশনে আপনি না থাকলে চলে? ইন্দুকে আর আলাদা চিঠি লিখলাম না। আর তারাপদকেও আলাদা নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে হবে না আশা করি।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ দেবেন। ইতি—প্রণতা বাসন্তী

ক্রমশ

"বনফুল"

মাধুকরী

এক

এস সখি, চল যাই দূরে—
যেথা পাহাড়ের পথ ঘুরে
দূরান্তরে মিশে গেছে আকাশের কোলে,
তীব্র বায়ু-স্রোতে ঝাউ দোলে,
বন-মধুগন্ধভরা আকাশ-লতিকা
আঁকিয়াছে বনস্পতি-শিরে রাজটীকা
বহুবর্ণ অর্কিড-কুসুমে,
শৈবাল-আচ্ছন্ন দেহে ঘুমন্ত নিঝুমে
অতিকায় মহাশিলা যেথা—
চল সখি, চল যাই সেথা।

তারপর আরও দূরে ধরি মোর হাত
হে প্রেয়সি, অবহেলি সহস্র সংঘাত
ঝঞ্ঝা বৃষ্টি তুষারের বাধা না মানিয়া
ভয় ক্লান্তি কোন কিছু মনে না জানিয়া
চ'লে যাব মোরা দুইজনে
দুর্গম অরণ্যপথে গভীর গহনে
সহস্র শিখর লঙ্ঘি ;
তুমি শুধু চিরসঙ্গী ;
নব কিশলয়ে শয্যা রচিব শয়নে,
লক্ষ তারা চমকিবে তোমার নয়নে,
ঊষার রক্তিম আলো রাঙাইবে
মসৃণ কপোল ; ঘুম ভাঙাইবে
অজানা পাখীরা কলরবে,
হইলে প্রভাত তুমি যবে
হাসিয়া চাহিবে মোর পানে,
সলজ্জে কহিবে কানে কানে
প্রণয়ের বাণী,
হাতে ল'য়ে তব হাতখানি
চলিব আবার আরও দূরে
অনন্তের পথে ঘুরে ঘুরে ।

দুই

হে সখা, নীরবে এস দখিনের বাতায়ন-পথে
যখন চন্দ্রমা যাবে পশ্চিমের বিশ্রাম-আলয়ে—
দীর্ঘ অভিসার তব অতিক্রমি নিস্তব্ধে নির্জ্জনে—
যেথা বায়ু বাজায় কঙ্কণ তার শিরিষের শুকানো কুসুমে,
আমের মঞ্জরী ঝরে প্রণয়ের অভিষেক সম ;
সহসা-জাগ্রত পাখী কলরব করে হেথা সেথা,
পুরানো দীঘির পাড়ে তাল শোভে প্রহরীর মত,
স্তব্ধ চরাচর, সুপ্ত প্রকৃতি-মায়ের কোলে যেন ।
সেই পথে এস সখা, দখিনের বাতায়ন-পথে ;

জ্বালিয়া প্রদীপ আমি বিরহের উৎকণ্ঠায় একা
তোমার চরণশব্দ না শুনিয়া শুনিব অন্তরে'।
আসিবে যখন সখা, পথক্লান্ত উত্তপ্ত নিশ্বাসে
ভাষিবে অস্পষ্ট ভাষে মোর কর্ণে প্রণয়-বারতা
শুনিবে না কেহ তাহা, জানিবে না যবে তুমি ধীরে
ভোরের আলোকরশ্মি-রঞ্জিত সে পুরাতন পথে
চ'লে যাবে আর বার শেফালি-বিকীর্ণ বনপথে ॥

তিন

তড়িৎ বহিয়া যায় অঙ্গে প্রিয়া, তুমি থাক যদি সঙ্গে,
এ কথা জেনেও সখি দূরে যদি চ'লে যাও
নিদয়ার সেরা তুমি রঙ্গে।
কি মায়া মাখানো তব হাস্য, নব নব রূপে ঢালা লাস্য,
স্তব্ধ মোহিত চোখে তোমারে হেরিয়া আমি
মেনে যে নিয়েছি চির-দাস্য।
বাক্যে তোমার মোহমন্ত্র, ও নয়ন মায়াবীর যন্ত্র,
নাগপাশে বেঁধেছ যে ওগো মায়াবিনী মোর,
সব হতে তুমি যে স্বতন্ত্র।
সাগরের ঢেউ মৃদুমন্দ, লীলায়িত চলনের ছন্দ,
হে রূপসী প্রিয়া মোর, প্রথমেই পরাজিত
তব সনে হ'লে কভু দ্বন্দ্ব।
আমি উন্মাদ তুমি শান্ত, তুমি নির্ভুল আমি ভ্রান্ত,
জীবনের সংঘাতে আহত পরাণে সখি,
তব পাশে যাই হয়ে ক্লান্ত।
দিনশেষে হয়ে আসে সন্ধ্যা, ওগো সুন্দরী মধুগন্ধা,
আজ নিশি ভোর হ'লে নবজীবনের উষা
হবে না মোদের তরে বন্ধ্যা।
আবার জাগিবে তব বক্ষে সে জীবনে সহসা অলক্ষ্যে
প্রণয় আমারই তরে স্থির দীপশিখা সম,
দেখিব সে আলো তব চক্ষে ॥

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

বঙ্গে কৌলীন্যপ্রথা

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে সাধারণ মানুষ কি চায়? চায়, পিতামাতার স্নেহচ্ছায়াশীতল সংসারে, ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবৃত হয়ে, যথাসম্ভব দুপয়সা রোজগার ক'রে, যথাসম্ভব তাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রেখে নিজেও সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে থেকে, জীবনটা কাটিয়ে দিতে। কিন্তু বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদির মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা নামে যে এক অদ্ভুত প্রথা গজিয়ে উঠেছিল, তার প্রভাবে, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে, ওই শান্তিময় স্বাভাবিক গৃহস্থজীবন একেবারে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। কুলীন ব্রাহ্মণগণ, পরিবার প্রতিপালনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে অর্থলোভে একাদিক্রমে দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, এমন কি শতাধিক বিবাহ করতে কুণ্ঠিত হতেন না, এবং সমাজও এমনই মোহগ্রস্ত হয়েছিল যে তাদের কাছে মেয়ে দেবার লোকেরও অভাব হ'ত না। এই বহুবিবাহকারীগণের স্ত্রীদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। স্বামীসুখে বঞ্চিত হয়ে, প্রায় বিধবার মত জীবনযাপন ক'রে, মাতুল বা ভাইয়ের সংসারে দাসীপনা ক'রে, দুঃখে, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায় সারাজীবন এঁরা চোখের জল ফেলে চলতেন এবং পশুর অধম জীবনযাপন ক'রে অবশেষে মরণের কোলে এঁরা শান্তিলাভ করতেন। যে আমলে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সে আমলে আরও চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। স্বামীর মৃত্যু হ'লে, সে স্বামীকে জীবনে হয়তো চেনবার সুযোগও যাদের হয় নি, আর্য্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করতে তার মৃতদেহের সঙ্গে পুড়ে মরতে তখন সেই স্ত্রীগণের ডাক পড়ত। অনেক সময় জোর ক'রে, বা আফিম খাইয়ে বিবশ ক'রে, এক কুলীন স্বামীর সঙ্গে তার বহুসংখ্যক স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হ'ত। আর সমাজ এমনই হৃদয়হীন ও বিকৃতবুদ্ধি হয়েছিল যে, এই বীভৎস ব্যাপারের ঘৃণ্য কুশ্রীতা, হীন কাপুরুষতা কারও চোখেও পড়ত না। শুনতে পাই, আমাদের শাস্ত্রে নাকি বলে, এক নারীর অভিশাপে রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে সময় সময় ভাবি, ভাবতে ভাবতে আপাদমস্তক শিউরে ওঠে যে, বাঙালী আমরা শত সহস্র নারীকে যে যুগ যুগ ধ'রে আজীবন অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করেছি, বিধাতা আমাদের কপালে না জানি কত শতাব্দব্যাপী কত দুঃখ-দুর্গতি লিখে রেখেছেন!

এই অদ্ভুত প্রথা সমাজে কি ক'রে গ'ড়ে উঠল, অতি সংক্ষেপে এবার তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। আদৌ বাংলা দেশ অনার্য্য দেশ ছিল, তীর্থযাত্রা ছাড়া এদেশে এলে নাকি আর্য্যদের জাত যেত। ক্রমশ কিন্তু আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হতে হতে আসামের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে গেল। সদিয়ারও পঞ্চাশ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত আর্য্যদের এক তীর্থস্থান হয়ে উঠল। বাংলা দেশ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল এবং মহাভারতের বর্ণনা যদি সত্য হয়, তবে ভারত-যুদ্ধের আগেই বাংলা দেশে ও আসামে আর্য্য-রাজ্যসমূহ ও আর্য্য-সভ্যতা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর্য্য-সভ্যতার ভাণ্ডারী

ব্রাহ্মণরাও যে এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন, সেই বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম লৌহিত্য। সেই প্রাচীন যুগে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কারও কারও গোত্র ছিল লৌহিত্য। লৌহিত্য গোত্রের এক ব্রাহ্মণ পালকাপ্য হস্তীবিদ্যা শাস্ত্রের রচয়িতা। ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী একখানা তাম্রশাসনে ভূমি-গ্রহীতা ব্রাহ্মণের গোত্র ছিল লৌহিত্য। এঁরা যে খাঁটি পূর্ব্বভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তা তাঁদের লৌহিত্য গোত্র দেখেই বোঝা যায়। অনেকেরই সম্ভবত জানা আছে, প্রাচীন আমলে তামার পাতের ওপর দানপত্র লিখে গোত্র-বেদ উল্লেখপূর্ব্বক রাজা ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। এই দানপত্র-সম্বলিত তামার পাতগুলিকেই তাম্রশাসন বলে। তাম্রশাসনগুলি প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। গুপ্তযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে হিন্দু আমলের শেষ পর্য্যন্ত বহু তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। ঢাকা মিউজিয়মে এইরকম তাম্রশাসন এগারোখানা আছে। রাজশাহী মিউজিয়মে, কলকাতার বড় মিউজিয়মে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মিউজিয়মে, আশুতোষ মিউজিয়মে এবং মালদহ মিউজিয়মে আরও অনেকগুলি তাম্রশাসন সংগৃহীত আছে। এই সমস্ত তাম্রশাসন থেকে নানা গোত্রের বহু ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভূতিবর্ম্মা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক তাম্রশাসনে দেখা যায়, তিনি বহু বিভিন্ন গোত্রের তিনশতের বেশী ব্রাহ্মণকে ভূমি দান ক'রে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড পরগণায় উপনিবিষ্ট করিয়েছিলেন।

এই ভাবে বাংলা দেশে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি হয়েছিল। কিন্তু বাংলা দেশে আদিশূর নামে একজন রাজা হয়ে যখন বৈদিক যজ্ঞ করতে চাইলেন, তখন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেন, ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যাগযজ্ঞ সব ভুলে ব'সে আছে। ভারতবর্ষে মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জ সদাচারী ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ব'লে চিরপ্রসিদ্ধ। কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন আদিশূরের শ্বশুর। তিনি যজ্ঞ করার জন্যে শ্বশুরের কাছে পাঁচজন ব্রাহ্মণ চেয়ে পাঠালেন। কান্যকুব্জরাজ পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলা দেশে পাঠিয়ে দিলেন। কথিত আছে যে, এই ব্রাহ্মণেরা মল্লবেশে ঘোড়ায় চ'ড়ে জুতো পায়ে দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে রাজার দরজায় এসে হাজির হন। দ্বারী তাঁদের এই বীরবেশ দেখে রাজাকে গিয়ে জানায় এবং রাজা অশ্রদ্ধায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন না। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের আশীর্ব্বাদী ফুল জল হাতী বাঁধবার একটা গজারী-খুঁটির ওপর রেখে বাসায় ফিরে যান। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের এমনই জোর যে, দেখতে দেখতে সেই গজারী-খুঁটি পাতা ছেড়ে বেঁচে উঠল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে রাজা নূতন-আগত ব্রাহ্মণদের মহিমা বুঝতে পারলেন এবং তাঁদের সমাদরের আর সীমা রইল না। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে এঁরা বাংলায় এসেছিলেন।

ক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ বাড়তে লাগল। কিছুদিন পরে উত্তরবঙ্গে পাল-রাজাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। আদিশূরের বংশধরেরা গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ়া প্রদেশে

এসে রাজ্য স্থাপন করলেন। কতক ব্রাহ্মণ তাঁদের সঙ্গে গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ়ায় চ'লে এলেন, কতক আবার পাল-রাজাদের অধীনস্থ দেশ বরেন্দ্রীতেই রয়ে গেলেন। এই ভাবে ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। রাঢ়া দেশে ৫৬জন এসেছিলেন, আর বরেন্দ্রীতে রয় গিয়েছিলেন ১০০জন। এঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজার নিকট থেকে এক একখানা গ্রাম দান লাভ করেন। পরবর্তী কালে এঁদের বংশধরেরা এই গ্রামের নামে খ্যাত হয়ে পদবী নিলেন অমুক গ্রামীন্। এ ভাবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ৫৬টি গাঞী বা পদবী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ১০০টি গাঞী বা পদবীর সৃষ্টি হয়। প্রকাণ্ড গঙ্গানদীর ব্যবধানে ক্রমশ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে বিবাহাদি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এইরূপে আদৌ এক হয়েও দেশান্তরে ও রাজ্যান্তরে বাস করার দরুন ব্রাহ্মণেরা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে পরিণত হ'য়ে পড়েন।

প্রথমে সমস্ত ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয় ব'লে পরিচিত ছিলেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে দুই ভাগ দেখা দিলে। যাঁদের ধন মান কুল উচ্চতর, তাঁদের নাম হ'ল কুলাচল, বাকি সব শ্রোত্রিয়ই রইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে প্রাচীন শূর-বংশের মেয়ে বিয়ে ক'রে সেন-বংশের বিজয় সেন রাঢ়ায়, অর্থাৎ বাংলা দেশের ভাগীরথী-পশ্চিমস্থ অংশে প্রবল হয়ে ওঠেন। এই সেন বংশ দাক্ষিণাত্য থেকে এসে বাংলায় প্রবল হচ্ছিলেন। এই বিদেশী বংশ দেখলেন, বাংলায় ব্রাহ্মণেরা বেশ প্রবল, কিন্তু তাদের কুলে নানা দোষ প্রবেশ করেছে। পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসবার আগে বাংলা দেশে যে ব্রাহ্মণ ছিল, তারা সাতশতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ এই সাতশতীদের সঙ্গে ক্রমশ মিশে যাচ্ছিল। বিজয় সেনের ছেলে বল্লাল সেন ভারী কূটবুদ্ধি লোক ছিলেন। তিনি রাজা হয়েই বাংলা ও বিহার থেকে পাল-রাজত্বের শেষ চিহ্ন লোপ ক'রে দেন। এই ভাবে বাংলা ও বিহারে একচ্ছত্র হয়ে তিনি ব্রাহ্মণ দমনে মনোনিবেশ করলেন। রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী মিশে এক সমাজে পরিণত হ'লে তাদের জোর অনেক বেড়ে যেত। বল্লাল ব্রাহ্মণদের ডেকে বল্লেন, তোমাদের কুলে নানা দোষ প্রবেশ করছে, এস, তোমাদের কুল যাতে বিশুদ্ধ থাকে তার উপায় ক'রে দিই। ঘটকদের বইতে আছে, কুল বিচারের জন্যে রাজা একদিন এক সভা আহ্বান করলেন। সভায় কেউ এক প্রহরে, কেউ দ্বিপ্রহর-কালে, কেউ বা দিনের তৃতীয় প্রহরে উপস্থিত হলেন। রাজা স্থির করলেন, যিনি যত দেরি ক'রে এসেছেন, তিনিই তত সদাচারশীল ব্রাহ্মণ। কারণ ব্রাহ্মণের আচারনির্দিষ্ট পূজা-অর্চ্চা করতে যে সময় লাগে, তা তো আর এক প্রহরে হবার কথা নয়, তিন প্রহর লাগাই স্বাভাবিক। কাজেই যাঁরা এক প্রহর কালে এসেছেন তাঁরা সদাচারী নন, দ্বিপ্রহরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কিছুটা সদাচারী, তিন প্রহরে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই পূর্ণ সদাচারী। ঢাকায় দেখি, নাটক-নৃত্যাদি উৎসবে নিমন্ত্রিতদের যিনি যত দেরি ক'রে আসেন, তিনিই তত এগিয়ে বসতে পারেন, কারণ এঁদের জন্যে সামনে অনেকগুলি জায়গা

খালি রাখা হয়। বল্লালী পদ্ধতিতে তেমনই ধারায় যেন কুলের বিচার হয়েছিল। তিন-প্রহরীরা হলেন কুলীন, দ্বিপ্রহরীরা হলেন গৌণকুলীন, আর একপ্রহরীরা শ্রোত্রিয়ই রয়ে গেলেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, বেশির ভাগ ব্রাহ্মণই রাজার এই অদ্ভুত ব্যবস্থা মানতে রাজি হলেন না, কিন্তু ৫৬ গাঞীর মধ্যে ২২ গাঞীকে রাজা কুলের লোভ দেখিয়ে হস্তগত ক'রে ফেললেন। তাঁদের মধ্যে ৮ গাঞী কুলীন, আর বাকি ১৪ গাঞী গৌণকুলীন হলেন। প্রতিবাদকারী ৩৪ গাঞী ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় রয়ে গেলেন। প্রতিবাদকারী অনেকে নাকি বল্লালের রাজ্য ছেড়ে উড়িষ্যা রাজ্যে মেদিনীপুর জেলায় চ'লে গেলেন। বর্ত্তমানে এঁদের বলা হয় মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এঁদের মধ্যে বল্লালের কুলবিধি চলে না।

নিজের রাজ্যমধ্যে বল্লাল কিন্তু কুলবিধি চালিয়েছিলেন, এবং তার ফলে অখণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজ ভেঙে শতধা হয়ে গিয়েছিল। বল্লাল নিয়ম করলেন, শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কন্যাদান করলে তাদের সমাজে সম্মান বৃদ্ধি হবে। গৌণকুলীনের কন্যা কুলীনে গ্রহণ করলে কুলীনের কুল নষ্ট হবে বটে, তবে গৌণকুলীনের সম্মান বৃদ্ধি হবে। এই ব্যবস্থার ফলে কুলীনের বহুবিবাহের পথ খুলে গেল, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয় সমাজের পুরুষদের জন্যে পাত্রীর অভাব ঘটতে লাগল। এদিকে কুলীনগণ গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মেয়ে বিয়ে করতে ব্যস্ত হওয়ায় কুলীনের ঘরের মেয়েরা অবিবাহিত থাকতে লাগল।

ব্রাহ্মণ-সমাজে এই ব্যবস্থার ফলে গোলযোগ বেড়েই চলল। সেন-বংশের পতন হ'লে দেশে ক্রমশ মুসলমান-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশৃঙ্খলা আরও বেড়েই গেল। এই সময় সমাজে ঘটকদের বড় প্রতাপ ছিল, কারণ তারা ছিল কুলবিধির ও বংশ-মর্য্যাদার লিপিকার বা রেকর্ড-কিপার। তাদের কথায় লোকের জাত থাকত বা যেত। ঘটক-বংশে এই সময় দেবীবর ঘটক নামে একজন প্রতাপশালী ঘটক ছিলেন। তিনি দেখলেন, কুলীন-সমাজ নানাপ্রকার দোষে দুষ্ট হয়েছে। এই দেখে দোষ যাতে আরও না ছড়ায়, সেজন্যে দোষ বিচার ক'রে কতকগুলি পরিবার নিয়ে এক-একটি মেল বা সার্কল সাব্যস্ত করলেন। এ যেন আমের দিনে আমের দোকানে দাগ ও পচার পরিমাণ দেখে আম বাছাইয়ের মত। চারি-দোষযুক্ত পরিবারগুলি শান্তিপুরের নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামের নাম অনুসারে ফুলে মেল হ'ল। এইরূপে সমান-দোষযুক্ত আরও কতকগুলি পরিবার নিয়ে খড়দহ গ্রামের নামানুসারে খড়দহ মেল হ'ল। এইভাবে বিরাট কুলীন-সমাজকে ৩৬টি মেলে ভাগ করা হ'ল। নিয়ম হ'ল, বিবাহ-ব্যাপারে নিজ মেলের বাইরে কেউ যেতে পারবে না, তা হ'লেই দোষ আর ছড়াবে না।

এই নিতান্ত ছেলেমানুষী সংস্কার-চেষ্টার বিষময় ফল দুই-এক পুরুষেই ফলতে আরম্ভ করল। কোন মেলে হয়তো পাত্র কম; কন্যা বেশি। এদিকে শ্রোত্রিয়েরা এবং গৌণ-কুলীন বা বংশজেরা অবিরাম কুলীন পাত্র সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। ফলে

কুলীনের ঘরে ক্রুত পাত্রের অভাব ঘটতে লাগল। মেলের বাইরে গিয়ে বিয়ে করবার নিয়ম না থাকাতে, বহু কুলীন কন্যা অবিবাহিতা থাকতে লাগল, অথবা এক পাত্রে শত কন্যা নামেমাত্র বিবাহিতা হতে লাগল। অবস্থা গুরুতর দেখে ঘটকেরা অবশেষে দুটি দুটি ক'রে মেল জোড় বেঁধে দিলেন ; নিয়ম হ'ল, ওই দুটি মেলে আদান-প্রদান চলতে পারবে। কিন্তু মেল-বন্ধনের বিষময় ফল এতে নিবৃত্তি হ'ল না, কুলীন-সমাজের নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হ'ল। অনেক কুলীনের বিবাহ করাই ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল, এবং অম্লান-বদনে তাঁরা আজীবন ৫০-৬০-৭০-৮০টা বিয়ে করতে লেগে গেলেন। কুলীন কন্যাগণের চোখের জলে বাংলার মাটি ভিজতে লাগল।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষার ফলে জনসাধারণের হৃদয়ের এই অসাড় পঙ্গু ভাব কেটে যেতে লাগল;—কুলীন কন্যাগণের এই ভয়ানক দুর্দ্দশার প্রতিকারের উপায় অনেক সহৃদয় ব্যক্তি চিন্তা করতে লাগলেন। এই চিন্তার প্রথম ফল রামনারায়ণ তর্করত্ন নামক একজন পণ্ডিতের প্রণীত "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক। পরবর্ত্তীকালে "নীলদর্পণ" যেমন নীলকরগণের অত্যাচার লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছিল, এই নাটকও তেমনই কুলীন কন্যাগণের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে বাঙালী জনসাধারণকে সজাগ ক'রে তুলতে লাগল। এই নাটক দেশময় অভিনীত হতে আরম্ভ হ'ল এবং এর কশাঘাতে সমাজ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। এই নাটক প্রকাশের ১৩।১৪ বছর পরে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর "বহুবিবাহ" পুস্তক প্রচার করেন। এ পুস্তকে দেশময় প্রবল আন্দোলন জেগে উঠল। ঠিক এই সময়েই মহাপ্রাণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গে তাঁর "বল্লাল সংশোধিনী" নামক পুস্তক প্রচার ক'রে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

রাসবিহারী চমৎকার গান রচনা করতে পারতেন। কুলীনের বিবাহের আসরে তিনি অনাহুত গিয়ে উপস্থিত হতেন, এবং লাঞ্ছনা অপমান স'য়েও গানে গানে আসর মাতিয়ে তুলতেন। একবার শোনা গেল, এক কুলীনপুঙ্গব বিশ বছর পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চিনতে না পেরে নিজের স্ত্রীকেই 'মা' ব'লে সম্বোধন ক'রে ফেলেছেন। অমনই রাসবিহারী গান রচনা করলেন—

বহুদিন পরে এসেছি, চিনি নাকো শ্বশুরবাড়ি,
কোন্ পথে যাইব মা গো বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যের বাড়ি ?
যারা ছিল ছেলেপেলে
তাদের হ'ল ছেলেপেলে
বিয়ে ক'রে গেছি ফেলে, ব'য়ে গেছে বছর কুড়ি।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আর তো হাসি রাখতে নারি।
ওহে, যাঁকে তুমি মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী।

রাসবিহারীর এই রকম কৌতুকবিয়ে পূর্ণ অনেক গান আছে, এর মাঝে সমাজের বিবশ বিবেক ক্রমশ সচেতন হতে লাগল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ আইনবলে নিষেধ করবার জন্তে রাজদ্বারে আবেদন পেশ করলেন, পূর্ব্ববঙ্গে রাসবিহারীর নায়কতায় অনুরূপ আবেদন প্রেরিত হ'ল। নানা কারণে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় নি বটে, কিন্তু কৌলীন্য-প্রথার বিষদাঁত ভেঙে গেছে। মেলবন্ধন সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে, বহুবিবাহও দেশ থেকে প্রায় লুপ্ত। স্ত্রীশিক্ষার দ্রুত প্রচারে মেয়েদের মেরুদণ্ডে জোর হয়েছে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা সেই শক্তিশালী সমাজ-সংস্কারকের পথ চেয়ে ব'সে আছি, যিনি বজ্রকণ্ঠে এসে প্রচার করতে পারবেন যে, সমস্ত বল্লালী কৃত্রিম ভেদবন্ধন একান্ত মিথ্যা ও মূল্যহীন, সমস্ত ব্রাহ্মণ পদমর্য্যাদায় সমান এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র মাপকাঠি।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

জেলিমাছ ও আনুরূপ্য

একটু ভাববার চেষ্টা *

১

অদ্ভুত এক ধরনের জীব জগতে আছে, যা আঁকবার জন্তে, কলাভবনে শিক্ষালাভ করবার দরকার নেই; সে হ'ল জেলিমাছ। একটা জ্যামিতিক গোলই আঁকুন, আর সেই গোলকে বাঁকিয়ে তুবড়ে অক্টাগন বা 'অষ্টাবক্র' ক'রেই আঁকুন, তলায় লিখে দিলেই হ'ল 'জেলিমাছ'। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী কেউ নিন্দে করতে পারবেন না। হয়তো প্রথম চেষ্টায় কেউ ফল আঁকবার সাধনায় নিযুক্ত। দামী পুরু কাগজের ওপর পেন্সিলের সরু ডগা দিয়ে তাঁকে আমদানি করতে হচ্ছে আম জাম কলা লিচু, কখনও বা বেগুন। যে ফলগুলির চেহারা উতরে গেল, ভালই; কিন্তু যদি কোন ফলের চেহারা ভয়ানক অবাধ্যতা করে এবং এঁকে বেঁকে দুষ্টু ছেলের মত শরীর ভ্যাংচাতে থাকে, তখন তার উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে, তলায় লিখে দেওয়া—'এটা একটা জেলিমাছ'।

* ইংরেজী 'essay'র বাংলা কি? আধুনিক ঘরোয়া সুরে লেখা যে রসরচনা 'essay' নামে খ্যাত, আমাদের 'প্রবন্ধ' বা 'নিবন্ধ' তার নামকরণের পক্ষে গুরুভার। 'জল্প' বা 'জল্পিতা' নাম দিলে যদি তা পাঠকপাঠিকার হাস্যোদ্রেক করে, এবং সম্পাদক মশায় যদি সেই সংবাদ সংগ্রহ ক'রে জানান, তবে ভবিষ্যতে সেই নামই দেওয়া যাবে; কারণ, পাঠকপাঠিকার মুখে একটু হাসি ফুটলে লেখকের লাভ বই ক্ষতি নেই।—লেখক

ঠাট্টা নয়, জীবসৃষ্টি-মহাভারতের আদিপর্বেই জেলিমাছের আবির্ভাব। তখনও পৃথিবী ছিল সমুদ্র মুড়ি দিয়ে। জন্মানো এবং বাঁচা সহজ কাজ ছিল না। যদি বা সেই আকৃতিহীন একাকারের মধ্যে কোনক্রমে বিন্দু-জীবন লাভ করা যেত, সেই অনাসৃষ্টির তাড়নে একটা নির্দিষ্ট মূর্তি রক্ষা করা ছিল দুরূহ। রূপের যুগ সে নয়, সে ছিল উচ্ছ্বাসের যুগ, তীব্র ঘোলাটে অনুভূতির যুগ। কি অগঠিত আনন্দে বেদনায় ভয়ে উত্তেজনায় সেই সমুদ্র সীমা থেকে সীমা পর্যন্ত কেঁপে উঠত, টলমল ক'রে উঠত, তার ঠিকানা নেই। সেই অপ্রকৃতিস্থ সমুদ্রের গর্ভে জন্মলাভ করল যে জেলিমাছ, সে বুঝে নিয়েছিল, চেহারা নিয়ে খুঁতখুঁত করাটা তার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হবে না, বরং জলের বেগ আর চাপের খেয়ালের কাছে চেহারার দায়িত্ব সমর্পণ ক'রে দেওয়াই তার প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। হোক না চেহারাটা কখনও লম্বা কখনও বেঁটে কখনও ফুলো কখনও চ্যাপ্টা, প্রাণটা তো বাঁচবে।

এই মানিয়ে নেবার ক্ষমতাকেই নাম দিচ্ছি আত্মরূপ্য। আধুনিক চিন্তাধারায় এই আত্মরূপ্য-ক্ষমতা বা adaptability মানুষের পক্ষেও একটা খুব বড় গুণ ব'লে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। অবশ্য আত্মরূপ্যেরও স্তরবিভাগ আছে। মানুষ যখন নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে, তখন তার প্রক্রিয়াটা জেলিমাছের প্রক্রিয়ার চেয়ে নিশ্চয় স্বতন্ত্র আর উন্নত। তবু ভাবতে ব'সে মনে খট্‌কা লাগে, সত্যিই কি আত্মরূপ্য একটা বাঞ্ছনীয় গুণ? যদি তাই হয়, কোন্ ধরনের আত্মরূপ্য? মানুষের সভ্যতার প্রধান লক্ষণ কি এই আত্মরূপ্য-চেষ্টা, না তার ঠিক বিপরীত?

সর্বদেশের মানুষদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সভ্য, সবচেয়ে শিক্ষিত, তাদের দিকে লক্ষ্য করুন। দেখবেন, তারা দাঁতে দাঁত চেপে ভীষণ-প্রতিজ্ঞায় নিজের নিজত্ব বাঁচাচ্ছে, শুধু উদ্ভিদ পশু থেকে নয়, অপর মানুষ থেকেও; সদম্ভে নিজের শরীর-মনের চেহারা বাঁচাচ্ছে, পাছে তা মিশিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। তাই দেহের কত প্রসাধন আয়না সামনে রেখে, মনের কত প্রসাধন বই সামনে রেখে। এদের এই চেহারা আর চরিত্র তৈরির চেষ্টাকে কে নিন্দে করবে? কে চায়, সমস্ত মানুষ সমস্ত স্বাতন্ত্র্য, সব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে একেবারে একরকম পিণ্ডাকার হয়ে যাক?

আবার অপর পক্ষে বলা যায়, নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দেওয়ারও একটা আনন্দ আছে। শুধু আনন্দ নয়, বাঁচতে হ'লে অনেক সময় এ ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। এ পৃথিবী অহরহ নানা ভাব, নানা রীতিনীতি, নানা ইচ্ছা, চেষ্টার আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ। এর বিরুদ্ধে সব সময় মনকে পাহাড়ের মত কঠিন, একগুঁয়ে ও উদ্ধত ক'রে রাখতে গেলে দিনের পর দিন বহু আঘাত নিতে হবে বুক পেতে। সইতে হবে অনেক ভূকম্প, অনেক ভূ-স্খলন, সযত্নে রক্ষিত চেহারার জায়গায় জায়গায় পড়বে প্রহারচিহ্ন, গভীর গহ্বরের মত ক্ষতগুলি কেড়ে নেওয়া বস্তুটুকুকে ফিরে পাবার আশায় হাঁ ক'রে থাকবে চিরকাল।

তার চেয়ে নিজেকে নরম, তরল ক'রে দেওয়াই ভাল। ঠেলা পেলে চল, বাধা পেলে থাম; আঁকাবাঁকা পথকে দাও বঙ্কিম আলিঙ্গন, সোজা খোলা রাস্তায় নিজেকে দাও ছড়িয়ে, যদি দেখ সামনে হঠাৎ ফাঁক—লাফিয়ে পড় দুরন্ত প্রপাতে।

সত্যি, ভাবতে ভাল লাগে, যেন পুরাণের দেবতাদের মত আমাদের নব নব রূপগ্রহণের ক্ষমতা হয়েছে। শুধু দেবতা কেন, রাক্ষসরাও আমাদের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ছিল; খেত অবশ্য অসভ্যের মত, কিন্তু তাদের শরীর ছিল ইণ্ডিয়া রবারের চেয়েও স্থিতিস্থাপক। ঘটোৎকচ পড়ল কুরুকুল চেপে; আর আজকের দিনে এমন একটা প্রাণী নেই, যে, মিছামিছি যারা জগৎ-জোড়া যুদ্ধ বাধালে, তাদের চাপা দেয়। আর মনে কর, দেবতা বা রাক্ষসরা কোন অভিনয় করবে। ওই ষ্টেজের ভাড়াটা যা লাগবে, নইলে সাজপোশাক আর চেহারা-তৈরি বা মেক্-আপের জন্তে ভাবনা নেই। আর ফিমেল পার্ট—, থাক; আধুনিক নাট্য-সম্প্রদায়রা ভাববেন, বুঝি তাঁদের কটাক্ষ করা হচ্ছে।

২

আমার এই গোলমেলে ধরনের সাক্ষ্য দেবার চেষ্টা দেখে যদি ভারতীয় কোন মনীষীকে বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয় ও আমাকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয়, তবে যে কথোপকথন হবে, তা অনেকটা এইরকম—

মনীষী—ঘটোৎকচের কথা কি বলছ? ওইরকম রূপগ্রহণ ক্ষমতাকে তুমি আনুরূপ্য বল নাকি?

আমি—আজ্ঞে, ওটা আমি একটা রূপক হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি। সত্যি কি আর শরীরটা কমাতে বাড়াতে চাই, বা একবার জন্তু, একবার মানুষ, একবার জার্মান, একবার আমেরিকান হয়ে দেখতে চাইছি! সহানুভূতি ও কল্পনা দিয়ে নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা যায়, মনের দ্বারাই জগতের সব কিছুর রূপ পরিগ্রহ করা যায়, তারই কথা বলছিলুম।

মনীষী—কিন্তু তার আগে ঝরনা আর পাহাড়ের উপমা দিয়ে যে কথাটা বললে, তার সঙ্গে তো এর কোনই মিল নেই। কোন্‌টা তোমার আনুরূপ্য?

আমি—আজ্ঞে, দুটোই। ঝরনার আনুরূপ্য হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যেটা সব মানুষকেই অল্পবিস্তর করতে হয়। রোগ শোক বিপদ বিঘ্ন এমন অনেক আছে, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে ঠকতে হয়; সেখানে বুদ্ধিমানই হোক আর বোকাই হোক, বীরই হোক আর কাপুরুষই হোক, সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ যুক্তি—পরাজয় স্বীকার ও যথাসম্ভব মানিয়ে নেওয়া, স্রোতের সঙ্গে ভাসা। যেমন একটা খরস্রোতা নদী পার হতে গেলে—

মনীষী—থাক, উপমা দিয়ে বিষয়টাকে আরও ঘোরালো ক'রে তুলো না, সোজা ভাষায় বল।

আমি—আচ্ছা। তা হ'লে দু রকমকেই আমি বলছি আনুরূপ্য। ঝরনার আনুরূপ্য না থাকলে প্রাণীর প্রাণ বাঁচে না, দেহীর দেহক্ষয় হয়, জ্ঞানীর জ্ঞান হয় অস্বাভাবিক, ভিত্তিহীন। কিন্তু দ্বিতীয় রকমের আনুরূপ্য অনেক শিক্ষা অনেক সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। প্রথম রকমের আনুরূপ্য শেখানো যায় না, ও একটা জীবতত্ত্বের আদিম নিয়ম, দ্বিতীয়টার দ্বারাই মানুষ নিজেকে বিস্তৃত করে, উন্নত করে। প্রথমটা জেলিমাছের দশা, দ্বিতীয়টা—

মনীষী। মহাপুরুষের দশা। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তুমি, এই রকম দশা—যাকে তুমি বলছ আনুরূপ্য, কিন্তু আমি যাকে বলব সারূপ্য—তাই চাও। তা হ'লে স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিচ্ছলে তার কি হবে?

আমি। আজ্ঞে, স্বাতন্ত্র্যও তো চাই।

মনীষী। (রুষ্টস্বরে) স্বাতন্ত্র্যও চাও, সারূপ্যও চাও! দানা-বাঁধা মিছরিও চাও, অথচ সেই মিছরিকে জলে-গোলা মিছরির জল হিসেবেও চাও! মতি স্থির ক'রে তারপর প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কইতে এস, বুঝলে?

আমি। (ভয়ে ভয়ে) আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?

মনীষী। তুমিও তো ভারতীয়। কিন্তু 'যোগ' কথাটার মানে কখনও ভেবে দেখেছ কি? বাইরের সঙ্গে অন্তরের যোগ, অনাত্মীয়ের সঙ্গে আত্মার যোগ। তুমি এত ঘটা ক'রে যা বলতে চাইছ, তা ভারতীয় মনীষীরা বহুকাল আগে থেকেই জেনেছেন, অভ্যাস করেছেন, এবং প্রচার করেছেন। তাঁরাই বলেছেন যে, নিজেকে বিস্তার ক'রে, স্বার্থের মধ্যে থেকে পরমার্থে বেরিয়ে এসে তবেই নিজেকে লাভ করা যায়; তাঁরাই দেখিয়েছেন, কোথায় কেমন ক'রে ওই সারূপ্য ও স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় করা যায়, কেমন ক'রে আমি 'আমি'ই থাকি, অথচ সেই আমিই আবার সোঽহম্, অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সাম্য ও সারূপ্য—

আমি। (মরিয়া হয়ে) কিন্তু ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি লোক সকলেই তো আর মনীষী নয়। তা আশা করাও উচিত নয়। তাদের সঙ্কীর্ণ জগতে তারা কেমন ক'রে বাঁচবে, সেই হ'ল প্রশ্ন। তাদের জন্যে যোগের, সারূপ্যের একটা শিশু-সুলভ সংস্করণ দরকার নয় কি? তারই নাম আমি দিচ্ছি আনুরূপ্য। ইংরেজীতে যাকে বলে—

মনীষী। ইংরেজীতে কি বলে, আমি শুনতে চাই না। দেখতে পাচ্ছি, তাদের স্বাতন্ত্র্য আর তাদের আনুরূপ্যের ধারণা ধার ক'রে তুমি চালাবার চেষ্টা করছ। [এইখানে আমার মুখটা হাসিহাসি হয়ে উঠল, মনীষী পর্যন্ত আমার 'আনুরূপ্য' কথাটা ব্যবহার করছেন; ওটা তা হ'লে চলল!] ওদের স্বাতন্ত্র্য মানে কি জান, নিজেকে

চাবি দিয়ে রাখা, অহঙ্কারের উঁচু বাঁধ তুলে দিয়ে প্রীতি, সহানুভূতির স্রোতটাকে আটকে ফেলা। [আমি (স্বগত)—এবার কিন্তু ইনি নিজেই উপমা ব্যবহার করছেন।] মনের একটা দিকে একটু ছিদ্র ওরা খুলে রেখেছে, বুদ্ধির দিক। বাদ বাকি সব দিক বন্ধ। আর ওদের আমুরূপ্য মানে অভিনয়, ভণ্ডামি, নিজেকে ও অপরকে প্রতারণা; মোট কথা, যাতেই কাজ উদ্ধার হয়, তা সে যত নীচ উপায়ই হোক না কেন, তাই করতে না বাধা। তুমি যে আমুরূপ্যের কথা বলতে চাইছ, সে হচ্ছে মনকে অবস্থা হিসেবে নতুন ক'রে গড়া, কিন্তু এদের আমুরূপ্য খুবই সহজ, কেন না গড়বার কিছুই নেই, মনটাকে বাদই দিয়ে দিয়েছে। (হঠাৎ গম্ভীরভাবে) এখন যাও, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। এক মাস ধ'রে যা বললুম ভাবো, তারপর যদি আর কোনও প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

কাঠগড়া থেকে আমি নেমে যাবার পর রায় লিখলেন, "এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এর বুদ্ধি বাছুরের নতুন-ওঠা শিঙের মত; সব কিছুকেই গুঁতোতে চায়, কিন্তু জোর নেই, হাড় শক্ত হয় নি।"

৩

বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে আমরা ভারতীয়েরা এক কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীতে পরিণত হয়েছি। আমাদের কিছুটা পুরনো ধরন, কিছুটা অনুকরণ। আমরা কখনও বা জেলিমাছের মত মেরুদণ্ডহীন, নিজেকে ভেস্তে দিয়ে, গুলিয়ে দিয়ে, ঘটনার বা পরিবর্ত্তনের দৌরাত্ম্য থেকে আত্মরক্ষা করি। দেখুন এই কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণের দিকে চেয়ে; ছাইমাখা সন্ন্যাসী দেখলেই তারা ঢিপ্ ক'রে গড় করে, পরমুহূর্ত্তে যায় আবগারীর দোকানে নেশার জিনিস সঞ্চয় করতে, ঝগড়া হচ্ছে দেখলে অজান্তে মালকোঁচা বাঁধে, আবার পুলিস দেখলেই ঘরে ঢুকে খিল দেয়, সারাজীবন বাড়ির লোকের সঙ্গে অতি তুচ্ছ ব্যাপারে ইতর ঝগড়া করতে করতে যেই কেউ ম'রে যায় অমনই বুক চাপড়ে গলা-ফাটা চীৎকারে পাড়ার লোককে সারারাত জাগিয়ে রাখে।

আবার কখনও বা আমরা হতে চাই স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, ভাবতে চাই যে, আমাদের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যার বলে আমরা সাধারণের চেয়ে উঁচু। কিন্তু চেয়ে দেখুন আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকদের দিকে। স্বাতন্ত্র্যের নামে তারা শুধু নিজের মধ্যে, নিজেকে চাবি দিয়ে রেখেছে। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা বুদ্ধির ভেতর-মহলে কতকগুলো গলিঘুঁজির পথ খুলে দেয়, বাইরে ভেতরের মানুষটিকে টেনে আনে না। আমাদের রাজনীতি, ব্যবসায়, বৃত্তি—প্রত্যেকটি দীক্ষা দেয় এক এক রকমের অস্ত্রসাধনার। অপর মানুষকে হটিয়ে হারিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার এই

সাধনা ; এই সাধনার ইংরেজী নাম struggle for existence, এর মন্ত্র হ'ল—survival of the fittest. অবাক হয়ে ভাবি. এই আদর্শই যখন মানুষ মেনে নিচ্ছে. তখন সেইটে স্পষ্ট ক'রে বলতে ভয় পাচ্ছে কেন, কেন স্কুলে কলেজে 'রেষারেষি' শিল্প-হিসাবে শেখানো হচ্ছে না (ভোটের সময় তা হ'লে কত সুবিধে হয় !), কেন নবযুগের দ্রোণাচার্য্য কুমারদের শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে মারণ, উচাটন, প্রবঞ্চন প্রভৃতি সূক্ষ্ম মানস-অস্ত্র শিক্ষা দেবার ভার নিচ্ছেন না !

আমাদের শিক্ষিতদের ভয়, কখন তাদের মান নষ্ট হয়, কিংবা, কে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় ! কাজেই গাম্ভীর্য্যের উচ্চ চূড়ায় তারা আসীন। সেই তাদের স্বাতন্ত্র্য। আবার তাদের মধ্যে যারা 'হৃদয়' নামক বালাইটিকে বাদ দিতে শিখেছে, যারা অবলীলাক্রমে যখন তখন উচ্চ হাসে, অপরিচিত লোকের পিঠে হঠাৎ বন্ধুত্বের থাপ্পড় মারে, চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না, মেসে হোক, ট্রেনে হোক, পরের জিনিসকে আপনার ব'লে ভেবে নিতে শেখে, জোর ক'রে নেমন্তন্ন নেয়, অনিচ্ছুক গৃহস্থের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এবং অবশেষে তাকে একটি ইন্‌সিওরেন্সের পলিসি গছায়, তারা হ'ল আমাদের দেশের আত্মকৃপ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা অনেক সময়ে সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় না দেখতে পেয়ে অবশেষে হতভাগ্য বেকার যুবকদেরই দোষী করতে আরম্ভ করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো খুব উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান, কেউ কেউ হয়তো চাকরি দেওয়ার মালিকদের চেয়েও সর্ব্বাংশে অনেক বেশি গুণশালী, কিন্তু তবু তাদের গঞ্জনা শুনতে হয়—তোমাদের adaptability নেই। যাঁরা এই উপদেশ দেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান, বৃত্তিমধুচক্রের এক-একটা বড় খোপ তাঁরা অধিকার ক'রে ব'সে আছেন। এই adaptability বলতে তাঁরা কি বোঝেন, তা তাঁদের নিজেদের কাছেই স্পষ্ট নয়। কিসের সঙ্গে কি মানিয়ে নিতে হবে ? হয়তো কেউ উত্তর দেবেন, কেন, ঘটনার সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে। কিন্তু সেই মানানোটা আসলে কি ? ঠিক কি করতে হবে ?

উপদেষ্টারা এর উত্তর দিতে পারবেন না, বা দিতে লজ্জাবোধ করবেন। কিন্তু তাঁদের মনের ভাবটা এই, তুমি কি করবে তার আমি কি জানি ? মানুষের কর্ত্তব্য সফল হওয়া, তা সে যে উপায়েই হোক। সফল না হতে পারলেই বলব, তার আত্মকৃপ্য নেই।

সাফল্যের এই যে একটি সেরা উপায় আছে, এরই নাম ছলে বলে কৌশলে। এই উপায় আত্মকৃপ্য নয়, আত্মকৃপ্যের ব্যঙ্গানুকৃতি। এর জন্যে কোন গুণের দরকার নেই, কোন শিক্ষার দরকার নেই, শুধু দরকার নিজেকে কমিয়ে খাটো ক'রে আনা। সত্যিকার কৃতিত্বের তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে গুণী ; কিন্তু সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার

আরও অনেক ছিদ্রপথ আছে, যেমন ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে গ্যালারির তলা দিয়েও লোক ঢোকে। সেই ছিদ্রপথে পুরো মানুষটা গলে না, যদি না কিছু মনুষ্যত্ব বার ক'রে তাকে চুপসে নেওয়া হয়। এইভাবে অনেক মানুষ, অনেক জাতি চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে ওঠে; তাদের প্রধান গৌরব যে, তাদের আর কোথাও বাধছে না, না বিবেকে, না হৃদয়ে; তার ফলে মুখচোরাদের, দুর্ব্বলদের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে ক্রমেই স্ফীত হয়ে ওঠে তাদের সাফল্য; তখন তাদের ধর্ম রাজনীতির দাসত্ব করে, তাদের বিজ্ঞান যুদ্ধের মজুরি খাটে, আর তাদের সাহিত্য অবলম্বন করে গণিকাবৃত্তি।

পৃথিবীর মানচিত্র আজ আর স্থির থাকতে চাইছে না, চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে। সকল জাতিদের দুর্ব্বলতর ধরা প'ড়ে গিয়েছে। এমন কি সবচেয়ে সুবিধাবাদী জাতিরাও আজ টের পেয়েছে, জাতীয় চরিত্র গঠন না করলে আর টিকে থাকা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন্ আদর্শের অনুরূপ ক'রে গড়া হবে জাতীয় চরিত্র? যুদ্ধের আদর্শ, না শান্তির আদর্শ? সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানের আদর্শ, না ধ্বংসশীল? বন্ধুত্বের আদর্শ, না জাত্যভিমানের? পরস্পরকে বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত ক'রে বড় হবার আদর্শ, না পরস্পরকে সাহায্য ও সেবা ক'রে সমান সুখী হবার আদর্শ?

ভারতবর্ষকে আজ এই সঙ্কল্প করতে হবে—

বিদেশীর শক্তি, রুচি, শিক্ষার কাছে আর আমরা কাদার পিণ্ডের মত হয়ে থাকব না। আমাদের জাতীয় চরিত্র আমাদের নিজেদের গঠন করতে হবে।

তাই ব'লে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে, ঘটনার স্রোত থেকে পালিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যের কারাগারে নিজেকে বন্দী ক'রে রাখব না।

ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর জাতীয় জীবনেই হোক, নূতনের জন্যে দোর খোলা রাখব। কিন্তু রীতিমত পরীক্ষা না ক'রে কোন নূতনকেই শুধু নতুন ব'লেই ঘরে স্থান দেব না।

বাঞ্ছিত নতুনের সঙ্গে যে আনুরূপ্য, সে শুধু পুরনো চরিত্রের ওপর জোড়াতালি দিয়ে মেরামতের কাজ নয়, সে হ'ল নতুন ব্যক্তিত্বের মধ্যে পুনর্জন্ম। অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ, অনেক ভাবনা, অনেক বিরোধের মধ্যে দিয়ে সেই পুনর্জন্মে পৌঁছতে হয়; তবু আমরা আলস্য করব না, দ্বিধা করব না, দৃঢ়পদে এগিয়ে যাব আমাদের পরিণতির দিকে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

সংবাদ-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কড়ি ও কোমলে'র "তনু" কবিতাটির শেষ পংক্তি "ত্রয়োদশ বসন্তের একগাছি মালা"র ত্রয়োদশকে যথাক্রমে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ করিয়া যে ভাবে যুগের সহিত তাল রাখিতে চাহিয়াছিলেন, প্রতি বর্ষের শেষে নিরুপায় আমরাও ঠিক তাহাই করিয়া চলিয়াছি। গত বৎসর পঞ্চদশী ষোড়শী হইয়াছিল, এবারে ষোড়শী 'শনিবারের চিঠি' সপ্তদশী হইল। এই ক্রমিক আঙ্কিক পরিবর্তন ছাড়া প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সাধ আমাদের থাকিলেও নানা কারণে তাহা সাধ্য নয়। যুদ্ধের ওজুহাতে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদের মত পরাধীনতার ওজুহাতে আমাদের সমাজে শিল্পে সাহিত্যে ও শিক্ষায় মারাত্মক গতানুগতিকতা ও নিষ্ক্রিয়তা অচল অটল আসন লইয়া আছে। মারাত্মক বলিলাম এই কারণে যে, এখন পর্যন্ত আমাদের প্রভুদের দৃষ্টান্ত ও আদর্শ মারিয়াই এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের কারবার চলিতেছে। নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছার বলে আমাদের কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। আমরা কি লিখিব, কি বলিব—কতখানি লিখিব, কতখানি বলিব, প্রভুরাই তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতেছেন। যে দৈনিক সংবাদপত্র দেশের জনমত গঠন করে, তাহাদের পূর্বাপর ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ঝড়ের মুখে কুটার মত লোভ বা ভয়ের মুখে ইহাদের ধর্ম ও জাতীয়তা মুহুর্মুহু শূন্যে বিলীন হইতেছে; যে অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধকল্পে ইহাদের জন্ম, শক্তিমানদের চক্রান্তে ইহারা তাহারই সমর্থক হইয়া দাঁড়াইয়া দেশের দুর্দশা-বৃদ্ধির কারণ হইতেছে। ফলে ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনা জড়তাগ্রস্ত হইয়া আমাদের সকলকেই প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে আমাদের স্বাধীনতা-অপহারী রাজশক্তিরই সহায়ক করিয়া তুলিতেছে। দেশের মসীজীবীরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে আমাদের মূল লক্ষ্যটাই দূরে চলিয়া যাইতেছে, নানা অনাবশ্যক আনুষঙ্গিক ব্যাপার লইয়া আমরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া কৌশলী কর্তাদের আত্মপ্রসাদের কারণ ঘটাইতেছি।

* * *

সপ্তদশ বর্ষের প্রাক্কালে এই অস্বস্তিকর চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলাম, হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, কর্মীর অভাবে ছাপাখানা অচল হইতে বসিয়াছে। কলিকাতার বেলেঘাটা-নারিকেলডাঙা প্রভৃতি যে অঞ্চলে আমাদের যন্ত্রচালকদের বাস, কঠিন ম্যালেরিয়া-রোগে সে অঞ্চল বিধ্বস্ত হইতেছে, বহু বাড়িতে মুখে জল দিবার উপযুক্ত কোনও সুস্থ লোক নাই। উত্তর-বিহারে কলেরা এবং সারা বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার নিদারুণ প্রকোপের সংবাদ আমাদের কাছে সংবাদপত্রগত তথ্য মাত্র ছিল, সহসা অনুভব হইল, তাহা ভয়াবহ সত্যের আকার লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। রাষ্ট্রিক যে অব্যবস্থার ফলে গত বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া বাংলা দেশকে শ্মশান করিয়া গিয়াছে, এ বৎসর তাহার জের মহামারীর মধ্য দিয়া সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, অনাহার ও অর্ধাহারজনিত দৈহিক দুর্বলতা

মহামারীতে পরিবর্তিত হইয়া বাঙালী জাতটাকে মুমূর্ষু ও পঙ্গু করিয়া ছাড়িতেছে। মাঠে ধান কাটিবার, নদীতে মাছ ধরিবার লোক নাই—অন্যান্য যে সকল জাতি বা সম্প্রদায় সমাজকে নানাভাবে সেবা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে, ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সংখ্যা তো হ্রাস হইয়া আসিয়াছেই। ব্যাপকভাবে প্রতিষেধক বণ্টন করিয়া একমাত্র গবর্মেণ্টই এই ক্ষয় নিবারণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাহা না করিয়া অতিরিক্ত লাভের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে অন্যত্র নিয়োগ করিয়া সমাজে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরও কঠিন এবং অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন। এরূপ অবস্থার সহিত আমরা আমাদের উপকরণ ও শক্তি লইয়া যথাযথ লড়িতে পারিতেছি না বলিয়া 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। পূজাবকাশের পর বিলম্বিত প্রীতিসম্ভাষণ আমাদের অক্ষমতাবশতই কটু হইবার উপক্রম হইয়াছে—আমরা করজোড়ে মার্জনা চাহিতেছি।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর বাংলা দেশে যে তুমুল আলোড়ন হইয়াছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইংরেজের সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত হইবার যে আগ্রহ সর্বত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে স্থায়ী সুফল ফলিয়াছিল এই কারণে যে, বাংলা দেশের চিন্তাশীল স্রষ্টা সাহিত্যিক ও কবি-সমাজের চিত্তও পরাধীনতার বেদনায় গ্লানিবোধ করিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই নিগূঢ় ও নিবিড় বেদনাকে তাঁহারা রূপ দিয়াছিলেন তাঁহাদের কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে। তখনকার কর্মীরা আশ্বস্ত ও ভরসাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিরলস কর্মের পশ্চাতে দেশের শ্রেষ্ঠ ভাব ও চিন্তার সমর্থন ছিল জানিয়া। সে যুগের ভাবুক এবং কর্মী উভয় সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কয়েকটা সাময়িক বিপ্লবাত্মক উচ্ছ্বাসেই বাঙালীর নবজাগরণ পর্যবসিত হয় নাই। ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে স্থাপত্যে-শিল্পে মিলে-কলে সর্বত্রই সেই আন্দোলন একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে। শুধু সাহিত্যিকদের সমর্থন ছিল বলিয়াই সেদিনের বিপ্লব কেবলমাত্র সমতলস্পর্শীই হয় নাই, সমগ্র জাতির জীবনের গহনগভীরেও তাহা শিকড় বিস্তার করিয়াছিল।

"আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ সমাগতপ্রায়। মাঝখানে বৃহত্তর পটভূমিকায় যে কয়েকটি বৃহত্তর আন্দোলন হইয়া গেল, তাহাতে বাঙালীর চিত্ত বিত্ত ও রক্তপাত পরিমাণে কিছু কম হয় নাই, বাঙালী কর্মী ও যুবকদের সর্ববিধ ত্যাগস্বীকার ও কৃচ্ছ্রসাধন সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়াছে, অথচ নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সমগ্র বাঙালী-জাতির জীবনচেতনায় এই সকল আন্দোলন সার্থক আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। অনুসন্ধান করিলে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই লক্ষিত হইবে যে, কবি সাহিত্যিক ও শিল্পী-সম্প্রদায় তাঁহাদের সৃষ্টি ও রচনায়

মাঝখানের এই ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনাকে মহিমান্বিত করেন নাই। যে কারণেই হউক, তাঁহারা সন্দেহ করিয়াছেন, দূরে দূরে থাকিয়াছেন, পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন অথবা সহানুভূতির অভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সত্য বটে, তাঁহাদের মন সেদিনও পর্যন্ত ১৯০৫ সালের বিপ্লব-যজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে, অতীতকে বড় করিয়া দেখিয়া বর্তমানের সত্যকার মহিমাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ শুধু তাঁহাদের অতীত-প্রীতিই নয়, নূতন যজ্ঞের হোতারাও সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় সুবৃহৎ গৌরবে তাঁহাদিগকে আত্মীয়তায় উদ্বুদ্ধ না করিয়া অনাদরে তুচ্ছ করিয়াছেন। তাই এ যুগের কবিরাও কাব্যে অসহযোগ আন্দোলনের মহিমাকীর্তন না করিয়া সেই পুরাতন বিপ্লবীদেরই বন্দনা গাহিয়াছেন—

যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি বিক্ষুব্ধ ধূলায়,
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায়া জননীর করিল তর্পণ—
মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জ্জন ;
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহুলক্ষ ভাষাহীন আশাহীন জনে,
ঘর ছাড়ি পথে পথে নিরাশ্বাস নিরুদ্বেগে ফিরি দীর্ঘ দিন
কলঙ্ক বরিল কেহ, কেহ মৃত্যু—মহোল্লাসে প্রেম-আলিঙ্গনে ;
জীবনের সর্ব আশা স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে করিল বিলীন ;
ক্লেদ-পঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোক-বার্তাবহ,
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার,
ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদেরে স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ,
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার !

তাদের বুদ্ধিরে ল'য়ে শুনিয়াছি পণ্ডিতেরা করে আলোচনা,
কেহ কহে মূর্খ তারা, দম্ভসার, চলেছিল ভুল পথ ধরি,
জীবনের রাজপথে চলিতে অক্ষম তারা, কৈল আনাগোনা -
অলক্ষ্য অরণ্যপথে অন্ধকারে ত্রস্তপদে দিবা-বিভাবরী—
মানব-কল্যাণ লাগি গূঢ়গুহাশায়ী হয়ে অলক্ষিত লোকে
অমৃত-সন্ধানী তারা চিরমৃত্যু-আশঙ্কায় যাপিল জীবন—
মানি না তাদের কথা, আমি জানি অনির্বাণ প্রাণের আলোকে
উদ্ভাসিত ভাল যার, মৃত্যুভীত কাপুরুষ নহে সেই জন।
লক্ষ লক্ষ অক্ষমের অপমানে আপনার অপমান মানি
সুকঠোর দৃঢ় হস্তে যে খুঁজিল প্রতিদিন তার প্রতীকার—

কাপুরুষ-অপবাদ নহে তার, ক্ষুদ্র নহে, ইহা সত্য জানি,
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার!

হয়তো করেছে ভুল, হয়তো বা অকস্মাৎ বিনা প্রয়োজনে
করেছে মৃত্যুর পূজা, সুনির্মম, চাহে নাই প্রিয়জন পানে—
জননীর আঁখিজল শুকাইল ঝরি ঝরি বিনিদ্র নয়নে,
প্রিয়ার পাণ্ডুর ওষ্ঠ আজো কাঁপে রহি রহি রূঢ় প্রত্যাখ্যানে।
সুকোমল গৃহশয্যা ডাক দিল আজো তবু রয়েছে অম্লান,
মহামৃত্যু-সাধনায় মিটিয়াছে সন্ন্যাসীর অতৃপ্ত পিয়াস,
স্তব্ধ হ'ল আঁখিতারা, যা খুঁজেছে বুঝি তার মিলেছে সন্ধান ;
মহাকাল ঊর্ধ্বে থাকি নেয় বলি, তবু যেন করে উপহাস।
আমরা কাঁপিয়া উঠি অকস্মাৎ বিলম্বিত আরাম-শয্যায়,
আকাশে খসিল তারা, লাভ-ক্ষতি কে গনিবে ধূলির ধরায়?
তাদেরে দিও না গালি, হে শঙ্কিত, ঢাকিবারে আপন লজ্জায়,
মৃত্যু বরিয়াছে যারা মৃত্যুভয়ে, তাহাদেরে কর নমস্কার।

* * *

কিন্তু সমগ্র ভারতের পরাধীনতা-মুক্তির জন্ম যে মহত্তর সাধনা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের মাটিতেই আরব্ধ হইয়াছিল, এবং যে মুক্তির আহ্বানে হাজার হাজার বাঙালী-যুবকের চিত্ত সাড়া দিয়াছিল, তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া বাংলা সাহিত্য আজও পর্যন্ত ধন্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্ম যে সাময়িক আন্দোলন ঘটিয়াছিল তাহার ফলেই বাংলা সাহিত্য স্থায়ীভাবে পুষ্ট হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে-কবিতায় প্রবন্ধে-গল্পে-উপন্যাসে, প্রভাতকুমারের গল্পে, রজনীকান্ত সেনের গানে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাংবাদিকতায়, বিপিনচন্দ্র পালের বজ্রনির্ঘোষে, সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাংলার ব্রতকথায়। সেদিনের শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করও সেই বহ্নি-বিপ্লবের স্মরণেই 'পথের দাবী', 'ধাত্রী দেবতা' রচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার-অধ্যায়'ও সেই বিপ্লবেরই ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র। সেই বিপ্লবে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল তাঁহাদের স্মৃতি-কথাও কিছু কম চিত্তাকর্ষক হয় নাই, বৈদেশিক ভাষায় অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথের সাধনার কথা নাই বলিলাম। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের যে মুক্তিযজ্ঞ সারা ভারতের মাটিতেই গত দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহার পশ্চাতে আরও দীর্ঘ পঞ্চত্রিংশ বৎসরের গৌরবময় ইতিহাস রহিয়াছে, সেই যজ্ঞে বহু বাঙালীর যৌবন ও জীবন, দেহ ও প্রাণ আহুতি দেওয়া সত্ত্বেও বাংলার

সাহিত্যক্ষেত্রে এই মহাযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সামান্য অঙ্কুরোদ্গম কেন হয় নাই, তাহার জবাবদিহি কি আজ শুধু বাঙালী সাহিত্যিকেরাই করিবে?

* *

কারণ যাহাই হউক, দুর্ঘটনা যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে। বাঙালী সাধক ও কবিদের এই পরস্পর-অপরিচয়ের ফাটল দিয়া অবাঞ্ছিত বৈদেশিক বহু ভাববাদ বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়া বাংলা দেশের তরুণ মনকে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত করিয়া আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে যে পিছাইয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পথে রামমোহন, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ মহাভারতের মুক্তিসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, সেই পথেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া আমাদের জাতীয় চেতনার পরিধি তথাকথিত উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণী এবং শিক্ষিত-সমাজ হইতে অশিক্ষিত-সমাজের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কাজ যে নিষ্ফল ও বাতিল হইয়া গিয়াছে, এমন কথা আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরাও বলিবেন না। তথাপি বহু ক্ষেত্রে এই কংগ্রেসকে ছোট করিবার, বর্জ্জন করিবার প্রয়াসের অন্ত দেখি না। যে ডালে মানুষ উপবেশন করিয়া থাকে, সেই ডাল কাটিবার মত বাতুলও তাহাদের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে সজ্ঞানে আনিবার জন্য যে শাসন দরকার, সুস্থ মানুষেরা তাহার প্রয়োগে ইতস্তত করিলে সকলের সমূহ অমঙ্গল। সেই অমঙ্গল নিবারণের সময় আসিয়াছে। এই ব্যাপারে বাঙালী সাহিত্যিকদেরও বিপুল কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সত্যকার কর্ম্মীদের উৎসাহিত করিবার, সুস্থ করিবার, স্বস্থ করিবার সাময়িক দায়িত্ব তো তাঁহাদের আছেই, ভবিষ্যৎ-কর্ম্মীদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির মারফৎ পথনির্দ্দেশ তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে। যে যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে, এক-আধ পুরুষেই তাহা শেষ হইবার নহে, মন্ত্রবলে আমাদের কাম্য স্বাধীনতা-ফলও আমরা অকস্মাৎ হাতে পাইব না; মৃত্যুর মধ্যে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে, অনাহারের মধ্যে, পীড়ন-অত্যাচারের মধ্যে, কারাগার-নির্বাসনের মধ্যে যুগে যুগে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভের অধিকার আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। কর্মীরা সংহত অথবা বিক্ষিপ্তভাবে তাঁহাদের কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের যাত্রাপথের সঙ্গীত যে সকল শিল্পী কবি ও সাহিত্যিক রচনা করিবেন, তাঁহাদিগকেও স্ব স্ব কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। ডাক দিয়া শ্মশান-বন্ধু সংগ্রহ করার কাজও কাজ।

আমাদের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনেকে দাবি করিতেছেন, বাংলা সাহিত্যে নূতনের অভ্যাগম হইয়াছে—যে নূতন পুরাতনকে নিষ্প্রভ করিতে বসিয়াছে। এই নূতন সাহিত্য নাকি বিশিষ্ট মতবাদের সাহিত্য। কিন্তু নবজন্মের বেদনা-বিক্ষোভ এই কালের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। নূতনের প্রকাশ আমরা যতটুকু দেখিতেছি, তাহাতে নাক-মুখ-চোখ-কানের কোনও বালাই নাই—স্থূল মাংসপিণ্ডের ইঙ্গিত-বিক্ষেপকে অক্ষমের

আর্তনাদ অথবা সক্ষমের ইয়ার্কি বলিয়াই ভ্রম হইয়াছে। এই দুইয়েরই বিরুদ্ধে আমরা নালিশ জানাইয়াছি। পাষাণ-প্রাচীরবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে যদি সত্য সত্যই নূতনের জন্ম হইয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার বেদনা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতাম। যদুবংশীয় অপোগণ্ডদের বেদনা-বিরহিত মুষল প্রসবে ধ্বংসই সূচিত হইয়াছিল। যদি সত্যকার কিছু সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষ করিতাম, তাহা হইলে এই নূতন মতবাদকেও আমরা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতাম, কারণ আমরা সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রেষ্ঠতম মনীষীর মুখ হইতেই শুনিয়াছি—"The development of art is the highest test of the vitality and significance of each movement." আধখানা চাঁদ ও সিকিখানা কাস্তে দেখিয়া বিগলিত হইবার মত আদেখলেপনা আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই, বঞ্চিতের লাল রবিবারকে ধনিকের লাল শনিবারেরই রকমফের বলিয়া বোধ হইয়াছে, নীপারের বাঁকে আমরা ভিন্নতর শৃঙ্খলেরই আভাস দেখিয়াছি, জবানবন্দী নূতনের জবানবন্দী নয়, নবান্নে পুরাতন অন্নই পরিবেশিত হইতেছে মাত্র।

* * *

হইবে না কেন? সত্যকার শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টি এত সহজ ব্যাপার নয়, এখানে অশিক্ষিত মজুর-প্রধানদের মাতব্বরি কোন কালেই স্বীকৃত হইবে না, এ রাজ্যে অবকাশ ও প্রাচুর্যের চিরদিন প্রয়োজন থাকিবে, মজুরদের সাইরেন-শাসিত কর্মব্যস্ততা ইহার পরিপোষক নয়। ইউ. এস. এস. আর.-এর স্রষ্টা একজন বলিতেছেন—

Culture feeds on the sap of economics, and a material surplus is necessary, so that culture may grow, develop and become subtle. Our bourgeoisie laid its hand on literature, and did this very quickly at the time when it was growing rich. The proletariat will be able to prepare the formation of a new, that is, a Socialist culture and literature, not by the laboratory method on the basis of our present-day poverty, want and illiteracy, but by large social, economic and cultural means. Art needs comfort, even abundance. Furnaces have to be hotter, wheels have to move faster, looms have to turn quickly, schools have to work better.

* * *

ঈদ এবং দুর্গাপূজা উভয় বাজারেরই শিকারী একদল নব্যপন্থীর সাহিত্য-সভায় নাকি একজন সাহিত্যিক এখনও ঈশ্বর মানেন বলিয়া নস্যাৎ হইয়া গিয়াছেন। শোনা কথা। সত্য হইলে বেচারা রবীন্দ্রনাথ তো ইহাদের সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের বেদ-কোরান যাঁহারা বানাইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কথা যদিচ বলেন নাই, তবুও স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

If nature, love or friendship had no connection with the social spirit of an epoch, lyric poetry would long ago have ceased to exist.

যাক, ইহারা ঈশ্বর না মানিলেও যে পূরাদস্তুর মাণিকপীরের উপাসনা করিতেছেন, তাহাতেই আমরা খুশি আছি।

বর্ত্তমান সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৫১) 'কবিতা'য় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৪ অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অমিয়-বাবু সম্ভবত তখন "টিনে" (in his teens) ছিলেন—অবশ্য আজও তিনি টিনেই আছেন! রবীন্দ্রনাথ এই অকাল-বিশ্ববখাটে বালককে তখনই লিখিয়াছিলেন—

"মনকে হৃদয়কে নিজের মধ্যে সংহরণ করে রেখো না, তাকে বিকীর্ণ করে দাও—তুমি যে আপনার ভারে আপনি পীড়িত সেই ভারটা কেটে যাক।"

আজ আমরা সকলেই জানি ভক্ত শিষ্য এই অনবধানতাপ্রদত্ত গুরু-উপদেশের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন; মনকে হৃদয়কে নিজের মধ্যে সংহরণ করিয়া অমিয়বাবু কখনই রাখেন নাই, শুধু বিকীর্ণ করা নয়, চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গম্য অগম্য সকল স্থানেই ছড়াইয়া দিয়াছেন। আপনার ভারে আপনি পীড়িতও কখনও থাকেন নাই তিনি, সুকৌশলে অপরের স্কন্ধে ভার কাটাইয়া আসিয়াছেন। ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথ শেষ দিন পর্যন্ত "জীতা রহো বাচ্চা" বলিয়া মনে মনে শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন।

* * *

কিন্তু আমাদের আসল বক্তব্য ইহা নয়। আজ আমরা এতদিন পরে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি (ভাগ্যে চিঠিটি প্রকাশিত হইয়াছে!) যে, অমিয়বাবু সেই শ্রেণীর হনুমান-ভক্ত যাহারা ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে, বিশল্যকরণী চাহিলে গন্ধমাদন আনিয়া হাজির করিয়া দেন। বেচারা রবীন্দ্রনাথ মন বলিতে সাদাসিধা মনই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু অমিয়বাবু তাহার অর্থটা অবচেতন মন পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া যত গোল বাধাইতেছেন। তিনি কিছুদিন হইতে যে ভাবে অবিরত তাঁহার অবচেতন মনকে সর্বত্র বিকীর্ণ করিয়া চলিয়াছেন, আমাদের তো ভয়ই হইতেছে। এই সেদিনও ১৩৫১-র 'বৈশাখী'তে তাঁহার "রাঙা আগুন" শীর্ষক অবচেতন মন আমাদের যাবতীয় বোধশক্তিকে খাক করিয়া দিয়াছে। আমাদের পাঠকদেরও নিষ্কৃতি দিব না, বুঝুন তাঁহারা—

"বাসনার ফুল জ্বলে দাউ দাউ
রক্তিম দাহে মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে—
সে-আগুনে সারা সূর্যের শিখা ছায়া ক'রে দেয়;
পাণ্ডুর সংসার।
এনেছ এ কী এ ভস্মের আয়ু,
ছাই করবার জ্বালা;
ও মশাল নিয়ে দূরে যাও তুমি,
মারীর পথিক, সন্ধ্যা রক্তপথে।
তবু শোনো, তবু শোনো,
চেয়ে দেখো ঐ পথের দুধারে শান্ত আকাশে অন্তমনা

রাঙা গোলাপের স্নিগ্ধ আগুন কেন্দ্রিক স্থির ;
আজো ফুটে আছে প্রথম প্রেমের ব্যথা।
পুষ্পিত ওর লাল উচ্ছ্বাসে
জানো কি তোমারি ভোরের কামনা তৃষ্ণাহরা।
আমার টেবিলে মাটির পাত্র
হাতে চিত্রিত,
সবুজ পাতার মধ্যে উঠেছে দুটো রাঙা জবা ;
তারি দিকে চোখ পড়ে।
লিখি আর নানা ভাবনায়
সুন্দর তার তীব্র শোণিমা ছড়ায় প্রান্তে প্রান্তে।
বাসনার ফুল বনে বনে দেখ ফোটে নির্দাহ,
সৌরসকালবেলার আলোক ঢেলে দেয় আজো শেষ সায়াহ্নে।"

* * * *

ব্যাপারটা আমাদের এক ডাক্তার সাহিত্যিক বন্ধুর কর্ণগোচরে আনাতে তিনি চটিয়া হারমোনিয়াম-জাতীয় কি একটা ব্যবস্থা দিলেন, আমরা তাঁহাকে বেশি ঘাঁটাইতে সাহস করিলাম না। তিনি নাকি ওই ১৩২৫এর দিকেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন!

—

পূজা-সংখ্যা 'দীপালী'তে "মিনতি" কবিতায় কবি শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"এই রজনীতে দেয়া আর নেয়া অবসান :
তমুতটে তমু হারাক আপন সীমানা।
ঘিরে থাক মোরে বেদনাবিধুর তব গান
তোমার আমার এক হয়ে যেতে কী মানা।"

লেনাদেনা যখন চুকিয়া গিয়াছে, তখন কাহারও মানা থাকিবার কথা নয় ; তথাপি আমরা সাক্ষী থাকিতে প্রস্তুত নই। সীমানার ব্যাপারে অনেক হাঙ্গামাতেই পড়িয়াছি কিনা!

—

স্থানাভাবে পুস্তক-পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিবেকানন্দের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। যদিও সকল উক্তির মূলে এক কথাই আছে, তথাপি সেই একটি কথা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমি আরও কয়েকটি নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম।—

It is better not to believe than not to have felt.

* *

Unity is the test of truth. Love is truth and hatred is false, because hatred makes for multiplicity.

* * *

Man has never lost his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free, and you will be!

* * *

The East worships simplicity and herein lies one of the main reasons why vulgarity is impossible to any Eastern people.

* *

As soon as you say, you are a little mortal being, you are hypnotising yourself into something vile and weak and wretched.

* * *

Religion is neither word nor doctrine. It is to be and become, not to hear and accept. It is the whole soul changed into that which it believes.

* * *

Be like an arrow that darts from the bow. Be like the hammer that falls on the anvil. The arrow does not murmur if it misses the target. The hammer does not fret if it falls in the wrong place. The sword does not lament if it breaks in the hands of the weilder. Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside.

৬

"Man has never lost his empire. The soul has never been bound"—ইহাই সেই বৈদান্তিক আত্ম-তত্ত্ব; তথাপি ইহা যে কেবল তত্ত্বমাত্র নয়—জগৎ ও জীবনের সহিত অসঙ্গতা রক্ষা করিয়া, যোগাসনে বসিয়া সেই তত্ত্বকে আত্মগত করাই যে পরমপুরুষার্থ নয়, বিবেকানন্দ তাহাই প্রচার করিয়াছেন; সেই তত্ত্বের বিদ্যুৎকে ধরিয়া মনুষ্যজীবন-রূপ শক্তিযন্ত্রে তাহাকে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছেন। শু

ব্যাপারে বিশ্বাস—আত্ম-বিশ্বাসই—সর্ব্বশক্তির মূল; জগৎ হইতে এ ধরনের বিশ্বাস প্রায় লোপ পাইয়াছে; অথচ এই বিশ্বাস যে কত বড় শক্তি তাহা আমাদের এযুগের কবিও একবার ভাব-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

—'যখনি জাগিবে তুমি'—এই জাগাটাই যে সব! ইহার জন্য চাই বিশ্বাস, তাই কবিও সেই বিশ্বাসকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন—

এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

বিবেকানন্দ এই সত্যকেই একেবারে বাস্তব জীবনের সাধনমন্ত্ররূপে, তাঁহার নিজেরই চরিত্র ও জীবনের দ্বারা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভবিষ্যৎ-বাণী অতিশয় মূল্যবান বলিয়া মঃ রোলাঁ উদ্ধৃত করিয়াছেন—আমিও ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি—তাহাও এখানে স্মরণীয়,—

His strong faith in himself will be an instrument to reestablish in discouraged souls the confidence and faith they have lost.

বিবেকানন্দও ইহাকেই উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, religion বা ধর্ম্মসাধনা বলিতে তিনি ইহাই বুঝিতেন,—"It is the whole soul changed into what it believes"। মনুষ্য-সাধারণ একই কালে একসঙ্গে এই পথে উঠিতে পারে না—এ পর্য্যন্ত কোন লোকশিক্ষক বা জগৎ-গুরু তেমন আশা করেন নাই। কিন্তু একজন পুরুষের মধ্যেও যদি সেই সত্য দিব্যদীপ্তিমান্ হইয়া উঠে তবে আরও দশজন সেই জ্যোতির সান্নিধ্যে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিবে; এবং—"The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves"। ইহাই ছিল বিবেকানন্দের ভরসা ও বিশ্বাস। যে আপনাকে এতখানি বিশ্বাস করে সে মানুষকে বিশ্বাস না করিয়া পারে না; তেমনই, এত বড় আত্মবিশ্বাসীকে দেখিয়া মানুষও আপনাকে বিশ্বাস করিতে শেখে। বিবেকানন্দের বাণীর পশ্চাতে ছিল তাঁহার সেই শক্তি-ঘন পুরুষ-সত্তা—dynamic personality; সে যেন জড়ত্বকে প্রবলভাবে আঘাত করিবার এক মূর্ত্তিমান ঘনীভূত চৈতন্য! নহিলে এ বাণীর কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকিত না। ঠিক এই প্রসঙ্গে সাময়িক-পত্রে উদ্ধৃত, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের একটি মন্তব্য চোখে পড়িল, তাহা এই,—

The emergence of spirit from the bondage of nature is the desideratum in life's movement. But this emergence is a slow process; the advent of a

great soul by its spiritual influence can hasten the emergence, but a too swift process becomes fruitful in producing confusion and chaos.

—পড়িয়া মনে হয়, সরকার মহাশয় তত্ত্বহিসাবে যাহাকে স্বীকার করেন, তথ্য হিসাবে সে বিষয়ে তাঁহার কিছু সন্দেহ আছে। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, আমাদেরও হয়, তাই এত কথা লিখিতে হইতেছে। দার্শনিকের অপরোক্ষ-দর্শন নাই, তাই বিশ্বাসও নাই,—চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুজাল সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেই তিনি নিপুণ; 'মায়া'র বিচিত্র বসনখানির মূল্য যাচাই করিয়াই তিনি কৃতার্থ বোধ করেন, তাহাকে কিনিয়া পরিবার বা টানিয়া ছিঁড়িবার—জীবন-রহস্য-সাগরে অবগাহন ও সন্তরণ-শেষে তাহার তলে পৌঁছিবার—শক্তিও তাঁহার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। কিন্তু এইরূপ দার্শনিক চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন আছে,—জীবনের অকূল অগাধ বারিরাশিতে ঝাঁপ দিয়া তাহারই তরঙ্গচ্ছন্দের সহিত নিজের প্রাণস্পন্দন মিলাইয়া সত্যের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা না থাকিলেও, চিন্তার সাহায্যে তাহার যে একটা পরোক্ষ পরিচয় আমরা তাঁহার নিকটে পাইয়া থাকি—আমাদের মত মানুষের তাহাই একমাত্র সম্বল। তাই সরকার মহাশয়ের উক্তির একাংশ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট; বাকিটা সত্য কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। আমার মনে হয়, সরকার মহাশয়ের ঐ আশঙ্কার মূলে কোনরূপ ভূত-দর্শন বা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আছে; তাহা বিবেকানন্দের সেই 'spiritual influence'-এর সদ্য ফলাফল-ঘটিত কি না জানি না; আমি নিজে এতখানি ভয় পাইবার মত ভূত-দর্শন করি নাই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা আছে; আধুনিক যুগের সহিত যুক্ত করিলেও, আমি বিবেকানন্দকে আসন্ন ও অনাগত বৃহত্তর কালের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছি।

বিবেকানন্দ 'চরিত্র'কেই মানব-ধর্ম্ম-সাধনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, 'মানুষ-গড়া'-(man-making)-ই ছিল তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। এই 'মানুষে'র সবচেয়ে বড় লক্ষণ—'manliness' বা পৌরুষ। অসীম আত্ম-প্রত্যয়, অদম্য কর্ম্মশক্তি এবং তাহার সহিত 'ত্যাগ' বা পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন—ইহাই বিবেকানন্দের ধর্ম্মশাস্ত্র। তত্ত্ব হিসাবে ইহা হিন্দুর চিন্তায় নূতন নয়, পুরাতনই বটে; কিন্তু সাধনমন্ত্র হিসাবে ইহা যে কত নূতন, তাহা আশা করি, এত কথার পর আর বুঝাইতে হইবে না। বিবেকানন্দ যখন বলেন—"Fight always, fight and fight on, though always in defeat—that's the ideal", তখনি বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ইহাও সেই গীতার বাণী; তথাপি ইহার ভাষা ও ভাব দুই-ই যে নূতন, তাহাতে সন্দেহ কি? গীতায় আছে ভগবানে আত্মসমর্পণ—এখানে শক্তিও আমার শক্তি, কর্ত্তৃত্বও আমার। আবার বিবেকানন্দ যখন বলেন—

Worship Death! All else is vain. That is the last lesson...Yet this is

not the coward's love of death, not the love of the weak or the suicide. It is the welcome of the strong man who has sounded everything to its depths, and *knows* there is no other alternative.

—তখনও তিনি চরম শক্তির আশ্বাসই দিতেছেন—অশক্তির নিরাশ্বাস নয়; ঐ চরম শূন্যতার মধ্যেই আত্মা যেন পূর্ণতায় টলমল করিতে থাকে! নিজের চরিত্রে ও জীবনে তিনি আত্মার এই যোদ্ধৃ-মনোভাব সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এ মনোভাব যে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়—বিবেকানন্দ 'চরিত্র' বলিতে যাহা বুঝিতেন, ইহা যে তাহারই লক্ষণ, তাহার প্রমাণ এক সৈনিক-কবির নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলিতে মিলিবে; এমন আশ্চর্য্য ভাবসাদৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই—

> We have built a house that is not for Time's throwing,
> We have gained a peace unshaken by pain for ever.
> War knows no power. Safe shall be my going,
> Secretly armed against all death's endeavour;
> Safe though all safety's lost, safe where men fall;
> And if these poor limbs die, safest of all.

ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের এই বীর-মনোভাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া শেষে বলিয়াছেন—"Both victory and defeat would come and go. He was their witness"; আবার সেই গীতা! বিবেকানন্দের সেই উক্তিটিও এখানে স্মরণীয়—"Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside"; উপরি উদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলির ভাবার্থ একই।

এইজন্য বিবেকানন্দের একমাত্র সাধন ছিল, 'Individuality',—মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বশক্তির উদ্বোধন। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ ব্যক্তির আত্মাভিমান নয়, পূর্ব্বে সে আলোচনা করিয়াছি। এই যে আত্মোপলব্ধি বা স্বাতন্ত্র্য-মহিমার দিব্যানুভূতি—যাহাদের ইহা হইয়াছে, তাহারাই ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তি-স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়াছে। কিন্তু সেই অসীম আত্মস্ফূর্ত্তির এমনই গুণ যে, সে অবস্থায় আত্মা স্ববশেই বিশ্ব-যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া থাকে। বিবেকানন্দ আত্মার সেই পূর্ণতাপ্রাপ্তিকেই তাহার প্রকৃত 'individuality' বা স্বরূপ-মহিমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তবু সেই এক প্রশ্নের উত্তর চাই—আত্মার এইরূপ জাগরণ কি সাধারণভাবে আদৌ সম্ভব? বিবেকানন্দ তাহাই বিশ্বাস করিতেন, কেন করিতেন তাহাও বলিয়াছি,—সে বিশ্বাস তাঁহার নিজের আত্ম-বিশ্বাসের বিশ্বাস, কেবল জ্ঞান-বিচারের বিশ্বাস নয়। একজন মানুষের পক্ষেও যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে সকলের পক্ষেও অন্তত অসম্ভব নয়। পদার্থমাত্রেই যে অগ্নি বা বৈদ্যুত প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাকে প্রকট করিবার উপায় চাই। ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে, সেই প্রেরণা সঞ্চার করা সাধ্য ও সম্ভব, আত্মার

অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। ব্যক্তির জীবনে বা জাতির জীবনে যাহা দৈবাৎ নৈমিত্তিকভাবে ঘটিয়া থাকে তাহাকে নিত্য করিয়া তুলিবার পন্থাও আছে—বিবেকানন্দ সেই পন্থার প্রদর্শক। ব্যক্তির পক্ষে এমন জাগরণ যে সম্ভব তাহা আমরা দেখিয়াছি; কলিকাতার রাজপথে ড্রেনের গহ্বরে নরুর কুণ্ডুর সেই আত্ম-বিসর্জ্জনের ঘটনা এখনও ভুলি নাই; একজন অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মার সেই দিব্যপ্রকাশ নিবিড় অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে, জাতিগতভাবে, তাহারই আর এক প্রকাশ আর এক রূপে দেখিলাম; সেই অতি-প্রবুদ্ধ আত্মাই ষ্টালিনগ্রাডের গগনস্পর্শী জ্যোতিঃশিখায় সারা ইউরোপ আলোকিত করিয়াছে; সেই শক্তি, সেই বীর্য্যও কম আধ্যাত্মিক নয়,—অনাত্মবাদী নাস্তিকেরা তাহার যে অর্থই করুক; সে দৃশ্য দেখিলে বিবেকানন্দও আনন্দে আত্মহারা হইতেন। অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসীর এই বাণী, শুধুই জীবনের ঘটনায় নয়—সাহিত্যিক কবি-সাধকের ধ্যানেও ধরা দিয়াছে—সে প্রমাণও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি চিন্তা-বিষ-জর্জ্জর ম্যাথু আর্নল্ড ইহাকেই আত্মার একমাত্র মুক্তিপন্থা বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া একজন মনীষী সমালোচক বলিতেছেন—

To be oneself, to possess one's own soul,—this, Arnold knew, was the necessity; if this could be achieved, belief could be achieved and an end of perturbation.

"Resolve to be thyself; and know that he
Who finds himself loses his misery."

রুশ সাহিত্যিক চেহভের এই কথাগুলিও বিবেকানন্দের সেই বাণীমন্ত্রের অনুরূপ—

I believe I see salvation in individual personalities scattered here and there all over Russia—whether they belong to the intelligentsia or to the peasants.

ইহার পরেই বলিতেছেন—

This feeling of personal freedom is the mark of the true and completed individuality. Such individuals are the pioneers of humanity, and on them the future of true civilisation does indeed depend.

এ যেন বিবেকানন্দের ভাষায় বিবেকানন্দেরই বাণী! রুশীয় মনীষী যাহাকে তথ্যরূপে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ভারতীয় দৃষ্টিতে তাহার গভীরতর তত্ত্বও উদ্ঘাটিত হইয়াছে; চেহভ যাহা অনুমান করিয়াছেন, বিবেকানন্দ মন্ত্রদ্রষ্টার মত তাহাকে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার হইয়াছে বা হইবে, সে প্রশ্ন এখন মুলতুবি থাকাই উচিত; বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর, এই পঞ্চাশ বৎসরে, জগৎময় মানুষের ব্যাধি যে আকার ধারণ করিয়াছে—যে আগুন তাহার মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিয়াছে, এবং যাহার ফলে মনুষ্যত্বের চেতনাই একণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, সেই আগুন প্রশমিত হইবার পূর্ব্বে কোন সত্যই স্থিতিলাভ করিবে না; অতএব এখন সকল প্রশ্নই বৃথা।

৭

কিন্তু বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবযুগের সহিত বিবেকানন্দের বাণী নিঃসম্পর্কিত নয়। সে যুগের ভাবধারার যে গতি ও প্রবৃত্তির আলোচনা এ যাবৎ করিয়া আসিতেছি, তাহা বিবেকানন্দে আসিয়াই এরূপ শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে; তাঁহার বাণী সেই যুগকে যতই অতিক্রম করুক, ধারা সেই একই—কেবল কূল ছাপাইয়াছে মাত্র। সে যুগের সমস্যা ছিল মুখ্যত বাংলার, এবং গৌণত ভারতের; বাঙালীর প্রতিভাই সেই যুগকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া, জীবনের একটা নূতন অর্থ—একটা নূতন পথ ও পাথেয়-সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সমস্যা কি তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহার সমাধানে কল্পনা, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় বঙ্কিমের প্রতিভাকে সৃষ্টি-সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছিল, এবং তাহাতে সেই যুগ যে তাহার সকল প্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি সুসম্পূর্ণ মূর্ত্তি লইয়া বাঙালীর চিত্তে, তথা সাহিত্যে, প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জাতি-হিসাবে বাঙালীর যে নব-জাগরণ সে যুগের সাধনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ ফল তাহার নিদর্শন—বঙ্কিম-সাহিত্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলেই বিবেকানন্দের সহিত সে যুগের সম্পর্ক কতটুকু ও কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দুইটি বিষয়ে উভয়ের মিল খুব স্পষ্ট,—প্রথম, প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্য সংস্কৃতির সমন্বয় বা যোগস্থাপন; দ্বিতীয়, স্বজাতি-সমাজের চৈতন্য-সম্পাদন। প্রথমটির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রয়াস তাহাতে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি—ভারতীয় জ্ঞানগরিমা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার মূলে ছিল—ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব; তিনি ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহাকে যাচাই করিয়া। এজন্য, তিনি যে নবমানব-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার আধ্যাত্মিকতাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, তিনি পারমার্থিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকটাই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন—যুগের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে মানিয়া লইয়াছিলেন; যুগ ও জাতির সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি ছিল বাস্তব। হাতের কাছেই যে উপাদান আছে তাহা দ্বারা প্রয়োজন-অনুযায়ী একটা কিছু গড়িয়া লইতে হইবে, কবি ও মনীষী বঙ্কিম ইহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অথচ বঙ্কিম যে কতবড় আদর্শবাদী ছিলেন তাহাও আমরা জানি; সেই আদর্শকেই বাস্তবের অধীন করিবার যে শক্তি, তাহাই বঙ্কিমের সৃষ্টি-শক্তি; এই সৃষ্টিশক্তি তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনায়—কবিকর্ম্মে যেমন, জ্ঞান-গবেষণার কর্ম্মেও তেমনই—পরিস্ফুট হইয়া আছে। উপকরণ যত সামান্য হউক—আদর্শ যতই দুরধিগম্য হউক—বাস্তবে ও কল্পনায় যতই বিরোধ থাকুক, তথাপি তাহারই সাহায্যে একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না। তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরোধ-মীমাংসায় তিনি আশ্চর্য্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন; একের গৌরব-উদ্ধারেও অপরের মূল্যও স্বীকার

করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের মনোভাব কিছু স্বতন্ত্র; তিনি য়ুরোপীয় জাতি-সকলের সাধনার বৈশিষ্ট্য ও মূল্য স্বীকার করিলেও, ভারতের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন, এবং উভয়কে পৃথক রাখিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনিও অবজ্ঞা করেন নাই এবং বঙ্কিমের মতই তাহার অনুশীলন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন —বুদ্ধিকে জাগ্রত এবং জ্ঞানকে সপ্রতিভ রাখিবার জন্য তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত তত্ত্বকে ভারতীয় সাধনার অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি 'এভল্যুশন'-বাদ মানিতেন না—বঙ্কিম প্রায় পুরাপুরি মানিতেন। তিনি আত্ম-তত্ত্বকেই সকল তত্ত্বের উপরে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া, যে 'progress' বা 'প্রগতি'র সংস্কার য়ুরোপীয় চিন্তায় বদ্ধমূল, তাহাতেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না; একবার ভগিনী নিবেদিতার একটি অভিযোগের উত্তরে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"That's because you cannot overcome the idea of progress, but things do not grow better. They remain as they are, and *we* grow better by the changes we make in them."—ইহা সত্যই বড় ভয়ানক কথা!

এ সম্বন্ধে আমি খাঁটি হিন্দু মনোভাবের আর একটু পরিচয় এখানে দিব—পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা আরও ভয়ানক। মনুষ্যসমাজের উন্নতি-সাধন নয়—হিত-সাধনই হিন্দু চিন্তার অনুমোদিত। ওই উন্নতির একটা মাপকাঠি অনুসারে, জাতি বা ব্যক্তিসকলের উচ্চ-নীচ-ভেদ হিন্দুর তত্ত্ব-জ্ঞানের বিরোধী। নব-প্রকাশিত একখানি অভিনব ও উপাদেয় বাংলা পুস্তক হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিব—প্রত্যেক সত্যপিপাসু ও আত্মজিজ্ঞাসু শিক্ষিত বাঙালীকে আমি এই পুস্তক পাঠ করিতে বলি—বর্ত্তমান যুগে এই ধরনের পুস্তক 'টনিকে'র মতই স্বাস্থ্যকর। পুস্তকখানির নাম—'তন্দ্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ', গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তকের এক স্থানে এক অঘোরী তান্ত্রিকের মুখে যে কথাগুলি বাহির হইয়াছে, আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে—আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐ উন্নতিবাদ ভারতীয় সাধনার একটা মূলতত্ত্বের কত বিরোধী। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাহা হইলে, তিনি, কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে জ্ঞানমার্গী উদাসীন হইয়া শ্মশানে বা গিরিগুহায় বাস করিতেন।

> "তোদের কেবল উন্নতি আর উন্নতি; উন্নতি কি সকলের এক ভাবেই হয়? এর মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাঁরা এখানে কোন উন্নতি অবনতির উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি, কেবল কর্ম্মক্ষয় করতে এসেছে। আত্মার ক্ষুধা যার যেমন তার সেই রকম ভোগ আর কর্ম্ম এখানে চলবে তো?…লোকচক্ষে—অন্ততঃ তোদের মত লেখাপড়া জানা বাবুলোকদের চক্ষে, হয়ত তা খারাপ ঠেকবে, কিন্তু তাদের হিসেবে তারা ঠিক আছে।…

একটা কথা মনে রাখবি, কখনো ভুলিস নি;—কারও উন্নতি বা অধঃপতন নিয়ে বিচার করতে বসিস্ নি, আর প্রচারও করিস নি কখনো,—তাতে তোর ক্ষতি হবে, নিজের কিছুই সুবিধা হবে না। এখানে যা কিছু দেখবি বা শুনবি তার থেকে একটা মনগড়া সহজ সিদ্ধান্ত করে নিয়ে কারো কাছে কিছু বলিস নি, ঠকে যাবি। যত জীব দেখছিস—যারা জীবনের ধারা পেয়ে গেছে—তাদের সকলের মধ্যেই একটা করে পৃথিবী আছে। জ্ঞানী মহৎ ব'লে তুই যাদের কর্ম্মের কতকটা দেখেছিস তাদেরও যে রকম—অজ্ঞান, হীনবুদ্ধি, মূর্খ, কুক্রিয়াসক্ত ব'লে যাদের দেখছিস, তাদেরও সেই রকম—সকলকারই একটা একটা আলাদা পথ আছে, যার মধ্যে দিয়ে সে খেলা করছে—আপনাকে প্রকাশ করছে।" (পৃঃ ২২২)

অতএব মূল তত্ত্বের দিক দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোন সত্যকার রফা হইতে পারে না, ইহা বিবেকানন্দ বুঝিতেন। তথাপি য়ুরোপের বিশিষ্ট সাধনাকে শ্রদ্ধা করিতেও কোন বাধা ছিল না; প্রত্যেকের পথ পৃথক হওয়াই তো স্বাভাবিক; যাহার যে পথ সে সেই পথেই অগ্রসর হউক—শেষে সেই এক তীর্থেই পৌঁছিবে। তথাপি বিবেকানন্দের এ অভিমান ছিল যে, সে তীর্থ ভারতেই আছে, শেষে সকলকে সেখানেই পৌঁছিতে হইবে। এরূপ অভিমান বঙ্কিমেরও ছিল; কিন্তু তিনি উপস্থিত একটা রফা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি বিবেকানন্দের মত এত বড় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না,—কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে পারেন নাই ব'লয়া একটু পাটোয়ারী বুদ্ধি রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের উপরে বহুকাল ধরিয়া যে আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তাহা কাটিয়া দূর করিবার একমাত্র অস্ত্র—য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান; তাহা ছাড়া, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে মতি-গতি হইয়াছে তাহাকেও যথাসম্ভব অনুকূল রাখাই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের কোন দ্বিধা-সংশয় ছিল না; ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

To his mind Hinduism was not to remain a stationary system, but to prove herself capable of embracing and welcoming the whole modern development...Above all, she was the holder of a definite vision, the preacher of a definite mission among nations.

—অর্থাৎ, এমন কোন নূতন তত্ত্ব বা মতবাদ নাই যাহার সহিত হিন্দু-চিন্তার রফা করিতে হয়; তাহা এমনই সর্ব্বাশ্রয়ী যে, কিছুরই সহিত তাহার বিরোধ হইতে পারে না, তাহার মত করিয়া সে সকলকে হজম করিয়া লইবে; এবং তাহার যে নিজস্ব সত্য-সম্পদ—যে বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টি আছে—তাহাই জগৎকে দান করিবে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সহিত বঙ্কিমের মত-ভেদ ছিল না বটে, কিন্তু চিন্তাপদ্ধতি ও সাধন-রীতিতে বিশ্বাস-ঘটিত তারতম্য ছিল।

দ্বিতীয় বিষয়—স্বজাতির উদ্ধার-সাধন। এখানেও উভয়ের বাসনা এক হইলেও, আদর্শ এক ছিল না। এই উদ্ধার-সাধন বিবেকানন্দের নিকটে কোন পৃথক সমস্যার মত ছিল না; তাহার জন্যও তিনি সেই একমন্ত্র—আত্মার মুক্তি-মন্ত্র ছাড়া, আর কোন উপায় চিন্তা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বাজাত্য-সাধনাকেই জাতির মুক্তিলাভের অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়া—ভারতবর্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন—সেই জাতীয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শ তদপেক্ষা উন্নত ও উদারতর, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি, বিবেকানন্দের সেই আধ্যাত্মিক শক্তিসাধনা এবং এই সাধারণ মানব-ধর্ম্ম সাধনার একত্র বিচার করিয়া মঃ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

This message of energy (বিবেকানন্দের) had a double meaning; a national and a universal. Although for the great monk of the Advaita, it was the universal meaning that predominated, it was the other that revived the sinews of India. (ইহা আমরাও জানি; অন্তত বাংলা দেশে—জাতীয়-জাগরণের এই আদি অরুণোদয়ের দেশে—বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী বিবেকানন্দের মন্ত্রে অধিকতর শক্তি লাভ করিয়াছিল)। There was ground for fearing that its high spirituality would be twisted to the profit of a purely animal pride in race or nation, with all its stupid ferocities.

কিন্তু তার পরেই বলিতেছেন—

But how else was it possible to bring about within the disorganised Indian masses a sense of human unity, without first making them feel such unity within the bounds of their own nation?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ইহাই ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্'-গানের উদ্দিষ্ট দেবতা যে ভারতভূমি নয়—বঙ্গভূমি, ইহাতেও তাঁহার বাস্তব-দৃষ্টি, মানব-চরিত্র ও ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে! প্রেমের প্রথম উদ্দীপন, বাস্তবের ক্ষেত্রে, অতিশয় নিকট বস্তুতেই হইয়া থাকে; স্ব-সমাজ ও স্বজাতি আগে, বৃহত্তর সমাজ পরে, এ তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ভাল-রূপই জানিতেন। বিবেকানন্দের প্রেম কত বড় ও গভীর ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার মূলে ছিল ভারতীয় সাধনার প্রতিই ঐকান্তিক অনুরাগ, তাই ভারতীয় জনগণের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া তিনি সমগ্র ভারতের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। অতএব এই দুই জনের ব্রত যে দুইরূপ—তাহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক; কারণ, একজন ছিলেন সন্ন্যাসী, আর একজন সমাজধর্ম্মী গৃহস্থ। এই দুই ধর্ম্মই সত্য—এক অপরের পরিপূরক মাত্র। এ বিষয়ে সে-যুগের এক মনস্বী বাঙালী-লেখকের উক্তি বড়ই যথার্থ, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব—বিবেকানন্দের ভারতপ্রীতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি এই দুই-ই যে সমান সত্য ও সমান আবশ্যক, এই উক্তি যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে।—

"তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, undefined and indefinite units, অর্থাৎ, নির্দ্দেশশূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষ্টি লইয়া কখনও কোন সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একত্তা সম্ভবপর নহে। আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়-জন দ্রাবিড় হইবে না—দ্রাবিড়ের আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুন্ন রাখিয়া সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও; পরে গোটা ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি,—সন্ন্যাসীর সেই কথাটা! তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী ও যতি-সজ্জনে ভাবিবে; প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের মত মান্য করি।"

এ চিন্তা ঐ ভাবনা এ যুগে একেবারে 'out of date' হইয়াছে—বাঙালীরও চিন্তাশক্তি আর নাই; তাহার কারণ, সত্যকার বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষাও আর নাই; নহিলে কংগ্রেসপন্থী বাঙালী ক্রমেই এত দুর্ব্বল ও মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িবে কেন?

৮

আরও কয়েকটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিবেকানন্দের তুলনা করা যাইতে পারে। দুই জনেই 'পলিটিক্স্' বা রাষ্ট্রনীতি-চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন, আজিকার দিনে ইহা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। একজনের মতে উহা ধর্ম্মই নহে, আর একজন উহাকে পরধর্ম্ম বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোনরূপ মন্তব্য করা শোভা পায় না; কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল আমরা ক্রমে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' বলিয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহা যে এখনও আমাদের ধাতুগত হয় নাই, বরং তাহার ফলে আমাদের শক্তি অপেক্ষা অশক্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপাত-দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝি—মহাপুরুষের দিব্য-দৃষ্টিতে তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ আছে। কেবল ইহাই লক্ষণীয় যে, এ বিষয়ে এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারার ঐক্য আছে। তারপর, এ যুগের যাহা প্রধান প্রবৃত্তি—যাহা এই যুগেরই নবধর্ম্ম—সেই Humanity বা মানব-পূজা বা মানবাত্মার মহত্ত্ব-বোধ এই উভয়কেই সমান অনুপ্রাণিত করিয়াছে; বঙ্কিমে যাহার প্রথম পূর্ণ ও সজ্ঞান উপলব্ধি, বিবেকানন্দে তাহা উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে। "We Indians are MAN-worshippers. Our God is man"—বিবেকানন্দের এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়,—বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' এই 'মানব-ভগবৎ'-বাদের একটি সুনিপুণ ভাষ্য মাত্র। কেবল একটা বিষয়ে দুইয়ের দৃষ্টিতে প্রভেদ

আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে, মানুষের প্রকৃতিসুলভ যে মনুষ্যত্ব—তাহার সেই দেহ-মন-প্রাণের ধর্ম্মকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং সেই জন্ত পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভকে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা বা সর্ব্ববৃত্তির অনুশীলনসাপেক্ষ করা হইয়াছে। এইরূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম ব্যতিরেকেও, তথাকথিত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবেও, অন্ত উপায়ে মানুষের আত্মা যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব তাহার যেন প্রতিবাদী। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের মত, আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় (বিবেকানন্দের 'individuality') বিশ্বাস করিতেন না; ছোট-বড় সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক শক্তি-বীজ-নিহিত আছে, তাহার স্ফুরণ যে সর্ব্বাবস্থাতেই সম্ভব—সামাজিক অবস্থা বা মানসিক উৎকর্ষের উপরে তাহা নির্ভর করে না; চরিত্র-বলই যে চিত্তশুদ্ধির নিদান, এবং তাহা অশিক্ষিতের মধ্যেও সুলভ,—বঙ্কিমচন্দ্রের Doctrine of Culture তাহা গ্রাহ্য করে নাই। এজন্ত তিনি একরূপ Intellectual aristocracy-র সমর্থন করিয়াছেন। বিবেকানন্দও কম aristocrat নহেন, কিন্তু তাঁহার aristocracy—আত্মার aristocracy, তাই তাহা ডেমোক্রেসিরও চূড়ান্ত।

উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র যদি সে যুগের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে বিবেকানন্দ সেই যুগকে অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র—তাহার সেই ধারাকে তটবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বিবেকানন্দও সেই যুগেরই সন্তান, তাঁহার ধাতুপ্রকৃতিতেও সেই যুগের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাঁহার বালক-বয়সের সেই বিদ্রোহী মনোভাব সেই যুগেরই লক্ষণ। কেবল, তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রে যে অসাধারণ পৌরুষ সুপ্ত ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের যাদু-স্পর্শে তাহা এমনই স্ফুরিত হইয়াছিল যে, তিনি অনায়াসে যুগকে অতিক্রম করিয়া, বৃহত্তর দেশে ও কালে আপনাকে প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন। সেকালে ইহা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না—বিবেকানন্দের পক্ষেও নয়; কারণ, ইহা ঐতিহাসিক কালধর্ম্মে—বা স্বভাবের নিয়মে ঘটে নাই। তথাপি, ইহাও সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ উভয়েই বাঙালী—উভয়ের প্রতিভা বাঙালী-প্রতিভা; উভয়ে একই যুগের একই জল-মাটির মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই জল-মাটির বটে (বাঙালী না হইলে এমন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের রস-রসিকতা সম্ভব হইত না), কিন্তু তিনি সকল যুগের। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ-চেতনা এই যুগাতীতের স্পর্শ লাভ করে নাই—বিবেকানন্দের করিয়াছিল। তাই উভয়ের মধ্যে বাঙালীর ধাতুগত সেই শাক্ত-সংস্কার জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও, একজনের সংস্কার খাঁটি, আর একজনের তেমন খাঁটি নয়—মিশ্র। বিবেকানন্দ বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে গুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গে—লীলায় নয়—সংগ্রামে অবতীর্ণ করিয়া, বন্ধন-ছেদনের আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্তই বন্ধনকে স্বীকার করিয়া—আত্মার

কর্ত্তৃত্ব-শক্তির (dynamic energy) জয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, খাঁটি শাক্তের মত, প্রকৃতির উপাসনা করিয়া তাহারই পথে,' পশ্বাচার হইতে দিব্যাচারে আরোহণ করাকেই সহজ ও সাধ্য মনে করিয়াছিলেন। একজনের সাধন-পীঠ—আত্মা, আর একজনের—দেহ; একজন মৃতকেও জাগাইবার জন্য ডাক দেন—"Lazarus Come forth !", আর একজন মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার জন্য তাহার দেহে বৈদ্যকশাস্ত্র অনুসারে তাপ সঞ্চারের চেষ্টা করেন; একজনের মতে—"The soul is the cause of the body", আর] একজনের মতে—The body is the cause of the manifestation of the force we call the soul"; যদিও ঐ 'soul' উভয়ের নিকটেই সমান সত্তা। তথাপি উভয়েই শাক্ত; বিবেকানন্দ তাঁহার ধর্ম্মকে 'dynamic religion' বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই dynamism-কে তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের ভিত্তি করিয়াছেন; প্রভেদ এই যে, একজন প্রকৃতিপন্থী হইলেও যুক্তিবাদী, অতিশয় নিয়মতান্ত্রিক, তাই 'morality'র উপরে উঠিতে পারেন নাই; আর একজন অধ্যাত্মবাদী, তাই সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণু; তাঁহার ধর্ম্মে, আত্মা আত্মা ছাড়া আর কিছুরই বশীভূত নয়; morality প্রভৃতি 'custom' মাত্র—'character'ই সব। কিন্তু কেহই বিনাযুদ্ধে জয়লাভের কথা বলেন নাই; পথ-চলার 'আনন্দ' নয়—পথ-চলার দারুণ বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-বিভীষিকাকে অপসারিত করিবার যে শক্তি তাহার সাধনাকেই একমাত্র সত্য-সাধনা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এই তত্ত্বের রস-রূপ ট্র্যাজেডির আকারে প্রকটিত করিয়াছেন। বিবেকানন্দও 'মায়া'কে নস্যাৎ করিতে পারেন নাই, বরং সেই মোহিনী তাঁহার বাঙালী-প্রাণকে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিয়াছিল, নতুবা, তিনি এত বড় প্রেমিক হইতে পারিতেন না। মঃ রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দের নূতনতর মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিবার ছলে লিখিয়াছেন—

Nothing in the world is to be denied, for, Maya, illusion, has its own reality. We are caught in the network of phenomena. Perhaps it would be a higher and a more radical wisdom to cut the net, like Buddha, by total negation, and to say : "They do not exist." But in the light of the poignant joys and tragic sorrows, without which life would be poor indeed, it is more human, more precious to say : They exist. They are a snare.

—বাঙালী কবি ও বাঙালী সন্ন্যাসী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই; "They exist. They are a snare"—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিও এই আর্ত্ত-ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতএব, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য

তাহা মাত্রাগত; বিবেকানন্দ বঙ্কিম-যুগের প্রবৃত্তিকে বিপরীতগামী করেন নাই, তাহার সেই ধারাকেই সহসা এক গভীরতর খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

*

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বিবেকানন্দের কথা প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবল একটি কথা এখনও বাকি আছে। বিবেকানন্দের বাণীই যে পরবর্ত্তী মন্বন্তরের কোলাহলে ভারতের নিজস্ব সাধনাকে কিছু পরিমাণে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে সে বিষয়ে কিছু না বলিলেও চলিত; কিন্তু এই জাতি এতই সত্য-ভীরু ও পাপ-দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন সাধনার ক্ষেত্রেও গুরুশিষ্যের সম্পর্ক স্বীকার করে না। বাঙালী ডুবিয়াছে, তাই বঙ্কিমচন্দ্রও ডুবিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষ তো জাগিয়া উঠিতেছে; সেই জাগরণের অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী এখনও কার্য্যকরী হইয়া আছে। তথাপি বিবেকানন্দের প্রতিও সেই মনোভাবের কারণ কি? মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণ-উদ্বোধন-নীতির মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণীই যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবে কে? মহাত্মা গান্ধী যে কখনও বিবেকানন্দের নাম করেন নাই এমন নহে; তথাপি একজন বিদেশীকেও দুঃখ করিয়া বলিতে হইয়াছে—

It is regrettable that the name the example and the words of Vivekananda have not been invoked, as often as I could have wished, in the innumerable writings of Gandhi and his disciples.

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই,—বিবেকানন্দ যে বাঙালী! কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস হইতে বাঙালীর কীর্ত্তি মুছিয়া ফেলিবার এত আগ্রহ যাহাদের তাহারা সত্যাগ্রহী হইতে পারে, কিন্তু সত্যবাদী হয় কেমন করিয়া? আমার এই কথাগুলি অনেক বাঙালীরও ভাল লাগিবে না, তাহা জানি, কারণ, এ ধরনের কথা রাজনৈতিক-বুদ্ধিসঙ্গত নয়; সত্যকে গোপন করা, এবং মিথ্যাকে সহ্য করা—অকপট না হওয়াই রাজনৈতিক ধর্ম; এই জন্যই কি বিবেকানন্দ রাজনীতিকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন? কারণ, ইংরেজের মত ও-পাপ হজম করিয়া চরিত্র বজায় রাখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমি গান্ধীভক্ত ভারতীয়দের কথাই বলিতেছি, মহাত্মা গান্ধীর কথা বলিতেছি না। কথা উঠিতে পারে, ইদানীং বাংলাদেশেই বা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দের নাম কয় জন করিয়া থাকে? কথাটা সত্য, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র; বাংলার নবযুগের সেই ধারাই যে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—কাহার দ্বারা ও কেমন করিয়া তাহা হইয়াছে, এই আলোচনার পরিশিষ্টে তাহাই বলিব।

একদিকের কথা বলিলাম, আর একদিকে, অর্থাৎ সাধনার অপর ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় একই, বরং আরও বিচিত্র—কারণ, সেখানে এই বিস্মৃতি অ-বাঙালীর নয়, বাঙালীর। বিবেকানন্দের কর্ম্ম-মন্ত্র যেমন মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র হইয়াছে, তেমনই, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এ যুগের এক মহা শক্তিমান সাধকের সাধনার সহায় হইয়াছে,

—শ্রীঅরবিন্দ যে সেই সাধন-মন্ত্রেরই উত্তর-সাধক, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; তাঁহার নিজেরই রচনাবলীতে ইহার স্পষ্ট আভাস আছে। কিন্তু পরে, একটি সম্প্রদায়ের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সেই সাধন-ধারার পারম্পর্য্য আর স্বীকৃত হয় না, বরং ক্রমেই একটা বিরোধের ভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারের 'Eastern Lights' নামক উপাদেয় গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্ময় ও কৌতুক বোধ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের নব-দর্শনের নবত্ব ও মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহার একটিও শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের তত্ত্ব-দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। আমি এখানে সেই তত্ত্বের দার্শনিক গহনে প্রবেশ করিব না, কেবল নমুনাস্বরূপ একটি প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করিব। শ্রীঅরবিন্দের নব-দর্শন সম্বন্ধীয় সেই তত্ত্বটি সরকার মহাশয় এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"Energy and matter are the bi-polar expression of the divine Sakti"; যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-মূর্ত্তির ভিতরে দৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটে এ তত্ত্ব নূতন নহে। তাহা ছাড়া, Arthur Avalon-এর সহিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের তন্ত্র-সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই তত্ত্বের সন্ধান অনেকেই পাইয়া থাকিবেন। এমন কথা বলিলেও হয়তো অযথার্থ হইত না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যাহা বীজ বা অঙ্কুররূপে বিদ্যমান, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার প্রতিভাবলে তাহাকেই পূর্ণবিকশিত করিয়া, অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে তাহাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু বলিব না, কেবল উক্ত প্রবন্ধ হইতে আরও দুই-একটি এমন উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহা শ্রীঅরবিন্দ অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা বিবেকানন্দ সম্বন্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য। যথা—

"Shiva and Kali, Brahman and Sakti are one, and not two who are separable. Force inherent in existence may be at rest or in motion."

এ উক্তি যদি কোন অর্থে নূতন হয়, তবে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের। নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দুইটিও বিবেকানন্দের; প্রথমটির আলোচনা আমি ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে করিয়াছি— বিবেকানন্দ-প্রচারিত 'Individuality'র ব্যাখ্যায়, এবং আরও পূর্ব্বে, 'আত্মা'র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধিকার-বোধ এবং 'ব্যক্তি'র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাভিমানের পার্থক্য-বিচারে; ইহা যে বিবেকানন্দেরই বাণী, তাঁহার বক্তৃতাগুলির মধ্যে তাহার অজস্র প্রমাণ মিলিবে।—

"But the finer insight of Aurobinda has been able to distinguish will from desires, and to discern the cosmic and the transcendent movement of will from egoistic tendencies."

* * *

"Aurobinda is equally alive to the play of the divine life in creatian and destruction. 'God is there not in the still small voice, but in the fire and the winds'."

এ তত্ত্ব ভারতবর্ষে আদৌ নূতন নহে, বিবেকানন্দের প্রায় আরও পুরাতন। আরও আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, এই প্রবন্ধে, James, Bergson, Plato, Schopenhauer, বুদ্ধ, চৈতন্য, তন্ত্র, সাংখ্য, বেদান্ত—কিছুই বাদ যায় নাই, বাদ গিয়াছেন কেবল বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ!—যেন তাঁহাদের বাণীর মৌলিকতা বিচারযোগ্যই নয়। 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'—কিন্তু ইহা কি সত্যই মতিভ্রম? সত্যের উপরে ব্যক্তিকে স্থান দিলে ব্যক্তিরও যেমন মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনই, যুগের স্বরূপ ও তাহার ধারাটি ধরিবার পক্ষে বড়ই বিঘ্ন ঘটে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আখেরী

১৩৫০ সালের চৈত্রের শেষ, ইংরিজী ১৯৪৪এর এপ্রিল। পার্কের নিঃশেষে-পাতা-ঝ'রে-যাওয়া কৃষ্ণচূড়াগাছে ফুলের কুঁড়ির স্তবকগুলো পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে; মাথার দিকে লালচে আভা গাঢ় হয়ে এসেছে; কাঠমল্লিকা ফুটেছে অজস্র, আরও অনেক ফুল ফুটেছে; বসন্ত চ'লে গিয়েছে, গরম পড়েছে, ভোরের বাতাস স্নিগ্ধ, কিন্তু তার মধ্যে আর সে দখনে হাওয়ার মিষ্টতা নাই।

ভোরবেলা। ঝাড়ু পড়ছে রাস্তায়। জল দেওয়ার শ্রমিকেরা এসে হাঁকছে।—ফুটপাথে এখনও লোক শুয়ে আছে।

বাগবাজার-শ্যামবাজারের মোড়ে একটা ছোট চায়ের দোকান। পাশে একটা বিড়ির দোকান ত্রিশঙ্কুর মত অর্থাৎ কাঠের কুলুঙ্গীর উপর। বিড়িওয়ালা হুসেন, চায়ের দোকানের অমূল্য এখনও ঘুমুচ্ছে। ভোরের বাতাস এখনও ঠাণ্ডা, তাতে এখনও পেট্রোল-মোবিলের ধোঁয়া মেশে নি; বাস ছাড়তে শুরু করে নি। মিলিটারী লরী সবে চলতে আরম্ভ হয়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে এক দল লরী; হরেক রকম মাল এবং মানুষ অর্থাৎ সেপাই বোঝাই নিয়ে চলেছে, লালচে ধুলোয় একাকার হয়ে গিয়েছে।

চায়ের দোকানটার এ পাশে একটা মিষ্টির দোকান। এ দোকানটা এর মধ্যে চালু হয়েছে। উনোনে আঁচ গনগন করছে, কড়াইয়ে ঘি তেতে উঠেছে, মোটাসোটা কারিকরটি জিলিপি ছাড়ছে, একজন একটা ছোট ঝুড়িতে বাসী—মানে, অচল বাসী কচুরি মিষ্টি গুঁড়ো ক'রে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে কাক-ভোজনের জন্য; ট্রামের তার থেকে রাস্তার উপর নেমে এসেছে কাকের ঝাঁক। গোটা দশেক ভিখিরীর ছেলেও তাদের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওদিক থেকে আসছে যুদ্ধের কারখানায় শ্রমিকবাহী লরী। তারই মধ্যে আছে খাস-অ্যামেরিকানবাহী বাস। বিশ ত্রিশ হাত লম্বা রেলের কার্ট সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ির মত চেহারা, মাথায় পাঁচটা লাল আলো, পিছনে তিনটে, তার মধ্যে মাথার দুটো সর্ব্বদাই জলছে, নীচেরটা জ্ব'লে উঠছে গাড়িটা থামলেই, আবার চললেই

নিবে যাচ্ছে। ওদিকের ফুটপাথে চলেছে গঙ্গাস্নানের যাত্রী। পুণ্যকামী মেয়েরা, স্বাস্থ্যকামী বাবুরা, গাজনে সন্ন্যাসব্রতধারী মেয়েপুরুষ। শ্বারিক ঘোষের দোকানের পাশে পঞ্চাশের কঙ্কালের দল ফেলে-দেওয়া দইয়ের খুরি, এঁটো পাতা কুড়িয়ে চাটতে বসেছে। ক'জন রুগ্ন পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে ধুঁকছে। ঝুড়িতে বোঝাই তরকারি নিয়ে দেহাতি হাটুরেরা চলেছে বাজারে। খবরের কাগজওয়ালারা সাইকেল হাঁকিয়ে ছুটছে।

হঠাৎ যে লোকটা কাক-ভাজনের জন্ম কচুরিগুঁড়ো ছড়াচ্ছিল, সে চীৎকার ক'রে উঠল, অ্যাই! জিলিপি ভাজছিল যে সে বলে উঠল, শালা!

একটা কাককে চাপা দিয়েছে একখানা লরী। যাক, ছোঁড়া তিনটে বেঁচেছে। যে জিলিপি ছাড়ছিল সে বললে, আর থাক। ছিটুস নি আর। তারপর আবার বললে, গুপের জন্তে রেখেছিস তো? সে বেটা এখনও এল না যে?

ওই যে! 'ওই যে অমূল্যকে খোঁচা মারছে।

হুঁ। বন থেকে বেরুল টিয়ে লাল গামছা মাথায় দিয়ে। বেটা আনারস রাত্রে থাকে কোথা বল্ দেখি! এই! এই গুপে!

দশ বারো বছরের বাচ্চা একটা। সতেজ আগাছার মত ছেলে। কাক চাপা পড়েছে দেখে নাচতে আরম্ভ করেছে। লে—খা—খা! খাঁয়ে যা কচুরি। কা! কা! কা!

জিলিপি-ভাজিয়ে কারিকর ধমক দিলে, মারব গিয়ে থাপ্পড়। কাক মরেছে তাতে নাচন কিসের?

চায়ের দোকানের অমূল্য উঠেছে. সে বললে, দেখ না। ভারী পাজী!

গুপে হি-হি ক'রে হাসছে। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল গুপের, সে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলে চেপ্টে-যাওয়া কাকটাকে। এঃ হে-হে রে। নির্দ্দম, একেবারে ছাতু ক'রে দিয়েছে। শালারা!

মাথার উপরে কাকের দল কলরব ক'রে উড়ছে। গুপের হাতে মরা কাকটাকে দেখে তারা তাকেই আক্রমণের লক্ষ্য করেছে। গুপে কিন্তু 'শালারা' ব'লে তাদের গাল দেয় নি। দিচ্ছিল লরীর ড্রাইভারকে।

কাকের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল। গুপে কাকটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এল চায়ের দোকানে। দোকানে তখন চায়ের খদ্দের এসে গিয়েছে জন চারেক। দুজন হাফপ্যাণ্টের সঙ্গে কলার দেওয়া গেঞ্জি পরেছে, পায়ে কাবলী স্যাণ্ডেল, ওরা সব যুদ্ধের কারখানায় কাজ করে; একজন বাস-ড্রাইভার শিখ; একজন সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক।

(১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সপ্তর্ষি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ইন্দুর সুন্দর মুখখানাও অজ্ঞাতসারে যেন পাষাণের মত কঠোর হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হতে লাগল, তা আর যাই হোক আনন্দ নয়। নিজের ব্যর্থ ব্যথিত জীবনের অনতিক্রম্য অভিশাপ বহন ক'রে সংসারের সমস্ত আনন্দ-উৎসব থেকে সে নিজেকে যথাসাধ্য দূরেই সরিয়ে রেখেছে, তার কারণ পাছে তার দুর্ভাগ্যের উত্তাপে আর কারও সৌভাগ্যের ফুল শুকিয়ে যায়, তা ঠিক নয়। নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই নিজেকে অবলুপ্ত ক'রে দিতে চায় সে। যে মহাকালের নিদারুণ বিধানে তার সমাজ-জীবনের আশা-আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা একবার নয় দু-দুবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সে মহাকালকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু পরাজয়-গ্লানি-লাঞ্ছিত এই ভাগ্য নিয়ে কুন্ঠিত দৃষ্টি তুলে সেই সমাজ-জীবনে আর সে ফিরে যেতে চায় না। যেখানে গৌরবের আসন দাবি করেছিল, সেখানে সসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে কিছুতেই। বড় বউদিদি কেন তাকে যেতে লিখেছেন, তিনি কি তাকে চেনেন না? তাকে এমন অপদস্থ করবার মানে কি?

হংস-শুভ্র আড়চোখে একবার কন্যার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন। হাঁটুর আন্দোলন আরও বেড়ে গেল। কিছু বললেন না। গড়গড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ রইল না খানিকক্ষণ। ইন্দু চিঠিখানা প'ড়ে সযত্নে সেখানা খামের মধ্যে পুরে তেপায়ার ওপরে রেখে চ'লে যাচ্ছিল, এমন সময় হংস-শুভ্র কথা কইলেন।

বড়বউ নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শশাঙ্কটাকে নানা রকম হুজুকে ক্রমাগত। এদিকে ঋণে তো জেরবার হয়ে পড়েছে শুনছি।

ঋণ শোধ হয়ে গেছে বোধ হয়। নতুন একটা মিল কিনেছেন, শুনলাম সেদিন তারাপদর কাছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বললে ইন্দু-শুভ্রা। মিল কেনার কথা হংস-শুভ্রও শুনেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর মনে একটা জ্বালাও ছিল। অতর্কিতে উত্তপ্ত কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

হ্যাঁ, কিনেছে—বড়বউয়ের নামে।

ইন্দু চুপ ক'রে রইল। তারপর অতিশয় নিরীহভাবে প্রশ্ন করলে, আপনার কি কি কাপড় গুছিয়ে দেব? যাবেন তো, বড়বউদি অত ক'রে অনুরোধ করেছেন যখন?

খানিকক্ষণ গড়গড়া টেনে অগ্নিবর্ষী চক্ষুর দৃষ্টি ইন্দুর মুখের ওপর স্থাপন ক'রে বললেন, যাব কেন?

ইন্দু নতমুখে নতদৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্দুর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থেকে হংস-শুভ্রের দৃষ্টির জ্বালা স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল—সবেদন স্নিগ্ধতায়। এই তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান—কনিষ্ঠ এবং প্রিয়তম। এর ওপরই বিধাতার যত আক্রোশ! আই. এ. পাস ক'রে নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছিল মহীতোষকে, ছ মাসের মধ্যে বিধবা হ'ল। বছর দুই পরে আবার বিয়ে দিলেন—বীরেনও বাঁচল না। ওর জন্যে আলাদা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন, আলাদা সম্পত্তি ক'রে দিয়েছেন। যথেচ্ছাচার জীবন যাপন করবার কোন সুযোগের অভাব নেই। এ যুগে সবাই ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, ওই বা দেবে না কেন—তিনি নিজেও তো কম কিছু করেন নি? পর পর কয়েকটা মুখ মানস-পটে ফুটে উঠল—জোহরা, স্বর্ণ, মিস এলিসন, মিসেস ঘোষ, মোক্ষদা, আরও কয়েকটা— কেউ তো একালে আত্ম-সম্বরণ ক'রে ব'সে নেই, পারুক না পারুক দু হাতে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বিস্তার করেছে সবাই। কুন্দর মুখখানা আবার মনে পড়ল—ইন্দুই বা কৃচ্ছ্রসাধন করবে কেন, এর মধ্যেই সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে যাবে কেন ওর? একটা ছেলে পর্য্যন্ত হ'ল না! কলকাতায় নিজের বাড়িতে গিয়ে বেশ জমজমাট হয়ে থাকুক না, কিন্তু না, তা থাকবে না ও, থান প'রে শুধু হাতে আমার চোখের সামনে হবিষ্যি ক'রে যাবে দিনের পর দিন। মাথার সিঁদুরটা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে। বাসন্তীর নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করবে ঠিক। হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি আবার প্রখর হয়ে উঠল।

আমি যাব কেন? আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক একটা ফরম্যুলা মাত্র, একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার শুধু। আমি প্রাগৈতিহাসিক। শ্বেতপাথরের বাসন দিয়ে আমার যুগের সঙ্গে এ যুগের সেতু বাঁধবার চেষ্টা দুশ্চেষ্টা তোমাদের।

তবু আপনাকে যেতেই হবে শেষ পর্য্যন্ত।

তুমি যদি জোর ক'রে নিয়ে যাও, তা হ'লে যেতেই হবে।

কন্যার মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে মৃদু হাসলেন হংস-শুভ্র। যে

প্যাচটা কষেছেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়া ইন্দুর পক্ষেও অসম্ভব হবে ভেবে বেশ একটু পুলকিতই হলেন তিনি। ইন্দু তবু চেষ্টা করতে ছাড়লে না।

আমি ভাবছি—

তুমি কি ভাবছ, তা জানি। তুমি ভাবছ, বুড়োটা ওই হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মরুক, আমি দিব্যি এখানে নিরিবিলিতে থাকি। তোমরা সবাই স্বার্থপর।

ক্ষণকাল নীরব থেকে ইন্দু বললে, বেশ, যাব তা হ'লে।

ব'লেই চ'লে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্র ডাকলেন।

আজ সোম আসবে একটু পরেই। মনে আছে তো?

কাকামণির ঘরটাই ঠিক করতে যাচ্ছি।

পালংশাক আনতে দেওয়া হয়েছে?

তারাপদকে স্থক্তোর সব জিনিসই আনতে দিয়েছি, কিন্তু এখনও তার পাত্তা নেই। তুমি ওকে বড্ড আশকারা দাও বাবা।

এ আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হবার স্থযোগ পেল না, কারণ দ্বারপ্রান্তে ভট্টাচার্য্য মশাই দেখা দিলেন। এইবার মহাভারত-পাঠ শুরু হবে।

ইন্দু-শুভ্রা কাকামণির ঘর ঠিক করতে গেল।

থ

কাকামণির ঘর ঠিক ক'রে ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দু নিজের ঘরে এসে ঢুকল। তার সমস্ত মন জুড়ে কি যে একটা হচ্ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। ঠিক রাগ নয়, ঠিক বিরক্তিও নয়, কি যেন একটা কি! মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। দু-দুবার বিধবা হয়েছে ব'লে যে গ্লানি হওয়া স্বাভাবিক, সে গ্লানি একা ঘরে তার হয় না, সে গ্লানি সামাজিক। দুবার বিধবা হয়ে সমাজের কাছে সে যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, উপর্য্যুপরি দুবার ট্রেন মিস করলে আর পাঁচজনের কাছে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। মহীতোষ কিংবা বীরেনের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র মমত্ববোধ নেই—এ কথা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু সে মমত্ববোধটা তার সমস্ত সত্তাকে সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে থাকে না। দুটি যুবক তার জীবনে অতি অল্পদিনের জন্য এসেই চ'লে গেছে—এদের মধ্যে কেউ একজন বেঁচে থাকলে হয়তো তার জীবন ফলে-ফুলে স্থশোভিত হয়ে উঠত, এই সব স্মৃতি-সম্ভাবনা নিয়ে সারা-জীবন হা-হুতাশ ক'রে কাটিয়ে

দেওয়ার মত নির্জ্জীব মন তার নয়। তার পরনে থান, মাথায় সিঁদুর নেই, অঙ্গ নিরাভরণ, এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন ক'রে কম্বলে শুয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সে পালন করছে বটে, কিন্তু অন্তর তার নিরাসক্ত নয়, বৈরাগ্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে সে, মুক্তি তার কাম্য বটে, কিন্তু 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' সে মুক্তি। কিন্তু কোথায় সে সহস্র বন্ধন, যা তাকে মহানন্দময় মুক্তির সন্ধান দেবে? স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর যে বন্ধন, কোন এক বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যে যে সব সামাজিক বন্ধনে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাঁধা পড়ে, তা কি সব সময়ে আনন্দময়? তা তো নয়। বাড়ির কার সঙ্গেই বা তার মনের সুর মেলে? যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাদের সঙ্গেই বা মিলত কি না কে জানে! মহীতোষের প্রেমে প'ড়েই তাঁকে বিয়ে করেছিল সে, মনে হয়েছিল যে, মনের সুর মিলেছে, কিন্তু দু দিনেই ভুল ভেঙেছিল। যে মহীতোষকে সঙ্গী ক'রে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে এক আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে আশা করেছিল, সেই মহীতোষ যখন বিয়ের পর খাকি হাফপ্যান্ট প'রে পুলিসে চাকরি নেবার জন্যে স্থানে-অস্থানে সেলাম ক'রে বেড়াতে লাগল, তখন তার স্বপ্ন-কাব্যে প্রথম ছন্দ-পতন ঘটল। পুলিসমাত্রেই যে খারাপ তা নয়, খাকি হাফপ্যান্ট অনেক ভদ্রলোকেও পরে, তবু যে কেন বেসুরো বাজল তা ঠিক জানা নেই তার, কিন্তু বেজেছিল। হয়তো আবার সুর জমত এসব সত্ত্বেও, হয়তো জমত না, কিন্তু মহীতোষ বাঁচল না। তারপর এল বীরেন। বীরেনকে সে আগে চিনত না। বাবা সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিয়েতে মত দিয়েছিল মাত্র। অন্য কোন কারণে নয়, বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত— এই সুস্থ মতবাদকে সমর্থন করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। অপরে যা করতে ভয় পায় সে যে তা অকুতোভয়ে করতে পারে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। আবার বিয়ে করবার দিকে বিশেষ একটা লোলুপতা তার ছিল না। যৌন-সম্ভোগ-লালসা তার জীবনকে কোনদিনই নিয়ন্ত্রিত করে নি, অযৌন জীবন যাপন করলে যে নারী-জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবেই এই হাস্যকর উক্তিকে সে কোনদিনই যুক্তিযুক্ত মনে করে না, সে বিয়ে করেছিল বিধবা-বিবাহের প্রতি সমাজের অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ। বিধবা-বিবাহ সমাজে সুপ্রচলিত থাকলে হয়তো সে বিয়ে করত না।...বীরেনও বাঁচল না। দু-দুটো বন্ধন খুলে গেল। কিন্তু তাই ব'লে সে কি দাদা-বউদিদিদের সংসারে

ঢুকে সকলের অনুকম্পা-ভাজন হয়ে তাদের ছেলে-মেয়ে মানুষ ক'রে নারীজন্ম সার্থক করবে? যাদের সঙ্গে এতটুকু মতের মিল নেই, সারা-জীবন তাদের কথায় সায় দিয়ে দিয়ে গৃহলক্ষ্মী সেজে ব'সে থাকবে? পৃথিবীতে আর কাজ নেই? আর মানুষ নেই? আছে বইকি। অজস্র মানুষ আছে, সহস্র সহস্র মানুষ আছে, যাদের সে দেখে নি অথচ ভালবাসে, যাদের আদর্শকে সে শ্রদ্ধা করে, যাদের মনের সুরের সঙ্গে তার মনের সুর ঠিক ঠিক মিলে যায়, তারাই তার আত্মীয়। তাদের জন্যেই বাঁচতে হবে, তাদের জন্যেই বৈধব্যের এই ছদ্মবেশ। তাদের জন্যেই দরকার হ'লে বিলাসিনীর ভূমিকাতেও সে অবতীর্ণ হবে তার পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে, কিন্তু এখনও তার প্রয়োজন হয় নি, প্রয়োজন হ'লে সে সব করবে, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেবে, কিন্তু এখন নয়। এখন তাকে দমদমের বাড়িতেই থাকতে হবে কিছুকাল।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। যে কথাটা এতক্ষণ অস্পষ্টভাবে তার মনকে আকুল ক'রে তুলছিল, সহসা সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথা নয়, বর্ণনা। মেদিনীপুরের একটা বর্ণনা। বর্ণনাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ বর্ণনার পেছনে যে ছবি প্রচ্ছন্ন আছে, তা ভয়ঙ্কর। সকালে যখন কাগজ পড়ছিল, সেই ছবিটা মুহূর্ত্তের জন্য ফুটে উঠেছিল তার মানস-পটে⋯তবু শঙ্করের ছেলের অন্নপ্রাশনে উৎসব করতে হবে, বউদিদির বাবা ঝুড়ি ঝুড়ি উপহার পাঠিয়েছেন—লজেন্‌জ, বিস্কুট, মেওয়া⋯হীরক জেলে—কম্‌রেড হীরক⋯হীরককে সে বুঝতে পারে না⋯নিজের দেশের চেয়ে রাশিয়া তার কাছে বড় হ'ল! বুঝতে পারে না ঠিক, কিন্তু হীরককেই সে এখনও শ্রদ্ধা করে বাড়ির মধ্যে। রজতকেও করত, কিন্তু রজত বিয়ে করেছে, আর কোন আশা নেই তার কাছে, সেতারের তারগুলো এবার ঢিলে হয়ে যাবে ক্রমশ, দীপক রাগিণী আর আলাপ করা চলবে না তাতে। নন-ভায়োলেণ্ট নন্-কো-অপারেটার ছোটদার কথা মনে প'ড়েই হঠাৎ অনঙ্গকে মনে পড়ল তার। অনঙ্গের অঙ্গ নাকি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে রোজ জেলে চাবুকের চোটে⋯ অনঙ্গ জেলের আইন মেনে চলবে না কিছুতে⋯এ কি ছেলেমানুষি তার, বার বার মার খাবে, তবু মানবে না! হঠাৎ মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল ইন্দু, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা টেনে অনঙ্গের ফোটোখানা বার ক'রে নির্নিমেষে চেয়ে রইল সেটার দিকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, শার্লমেন, তৈমুর, চেঙ্গিস, নাদির শা বেঁচে থাকবে;

ক্লাইবও থাকবে, কিন্তু অনঙ্গ থাকবে না, এই কচি কিশোর অনঙ্গ মহাকালের আবর্ত্তে কোথায় তলিয়ে যাবে, কেউ তাকে মনে রাখিবে না—যাদের জন্যে সে প্রাণ দিচ্ছে, তারাও না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে—জল নয়—বিদ্যুৎ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হতে লাগল যেন।

গ

বাইরের ঘরে তখনও মহাভারত-পাঠ চলছিল।

স্বর্গ থেকে পতনোন্মুখ যযাতিকে সম্বোধন ক'রে তাঁর মর্ত্ত্যবাসী দৌহিত্র অষ্টক প্রশ্ন করছিলেন, "উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে?" যযাতি উত্তর দিচ্ছিলেন, "যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রয়-বিবর্জ্জিত এবং কামাচার-পরাঙ্মুখ তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহিক সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র···"

এমন সময় সোম-শুভ্র এসে পৌঁছলেন।

সোম-শুভ্রের বয়স ছিয়াত্তরের কাছাকাছি হ'লেও তিনি মোটেই অসমর্থ হয়ে পড়েন নি। এখনও বেশ খাড়া আছেন। মুখে প্রাজ্ঞতার ছাপ পড়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যও ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে, দেখলে ভয় করে না, সম্ভ্রম হয়। মাথাটি যেন বড় একটি কদমফুল, ছোট-ক'রে-ছাঁটা ধপধপে সাদা চুলে ভরতি। এতটুকু টাক পড়ে নি। গোঁফ-দাড়ি কামানো নিটোল মুখে কোথাও জরার চিহ্ন নেই। চোখের দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। পরনে থান, সাদা লংক্লথের 'চায়না' কোট, পায়েও ধপধপে ক্যাম্বিসের ফিতাহীন জুতো। জুতোটির বিশেষত্ব আছে, ফরমাশ দিয়ে তৈরি করানো। সোম-শুভ্রকে দেখলেই মনে হয়, শুভ্রতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ রকম সচেতন। মলিনতার সামান্যতম গ্লানিও যেন তিনি নিজের ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না। আপাদমস্তক সব ধপধপ করছে।

ঘরে ঢুকেই সোম-শুভ্র হেঁট হয়ে দাদার পদধূলি নিলেন। ভট্টাচার্য্য মশাইকে নমস্কার করলেন।

তুমি এসে পড়লে? নটা বেজে গেল নাকি?

পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে সোম-শুভ্র বললেন, নটা কুড়ি।

স্টেশনে কাউকে পাঠাতে পারি নি, নেপালী চাকরটা পালিয়েছে—

তারাপদ স্টেশনে ছিল।

ও, ছিল বুঝি! তাই বাজার থেকে ফিরতে এত দেরি তার।

সঙ্গে সঙ্গেই তারাপদ কাঁধে সোম-শুভ্রের বিছানার বাণ্ডিল ও হাতে বাজারের থলি নিয়ে ঢুকল। হংস-শুভ্রের কথার জবাবস্বরূপই বোধ হয় বললে, একা আর ক দিক সামলাই, বল। এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখে ভেতরের দিকে চ'লে গেল হনহন ক'রে।

তারাপদ ও হংস-শুভ্র সমবয়সী। শুধু তাই নয়, সহপাঠীও। সেকালে শিব-শুভ্রের বাড়িতে ছোটখাট একটা পাঠশালা ছিল। শিব-শুভ্রের বাড়িতে খেয়ে এবং শিব-শুভ্রের নিকট বেতন নিয়ে একজন পণ্ডিত, শুধু হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রকেই নয়, পাড়ার সব ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতেন। কাউকে কোন খরচ দিতে হ'ত না। সেই পাঠশালায় তারাপদ হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রের সঙ্গে কিছু দিন পড়েছিল। সদগোপের ছেলে তারাপদর পড়া অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হয় নি, কিন্তু এই সুবাদে সে হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে 'তুমি' এবং পরিবারের বাকি সকলকে অসঙ্কোচে 'তুই' বলে। তখন থেকেই সে একাধারে হংস-শুভ্রের বন্ধু এবং ভৃত্য, পার্শ্বচর এবং অনুচর। হংস-শুভ্র তার সমস্ত খরচ বহন করেন, সমস্ত আবদার সহ্য করেন। তারাপদও কম সহ্য করে নি—তার স্ত্রী মোক্ষদার সঙ্গে হংস-শুভ্রের যে সম্পর্ক ঘটেছিল, তাও সে সহ্য করেছিল, কিছু বলে নি। হংস-শুভ্র অবশ্য আর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তারাপদর বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আজীবন তার পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন ক'রে এসেছেন, তবুও এতটা কে সহ্য করতে পারত? হংস-শুভ্রের এই ধরনের অত্যাচার, শুধু একটা নয়, তারাপদ অনেক সহ্য করেছে। সেই ছেলেবেলাতেই যখন পাঠশালায় পড়ত, একটা সুন্দর পেন্সিল কুড়িয়ে পেয়েছিল। হংসকেই দিতে হ'ল সেটা শেষ পর্য্যন্ত। না নিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। তার বদলে পাঁচটা নতুন পেন্সিল কিনে দিলে অবশ্য, কিন্তু চ্যাপ্টা গোছের ওই পেন্সিলটা সে নিলে। কলকাতার বাজারে ওরকম পেন্সিল তখন পাওয়া যেত না, কোন সায়েবসুবোর পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছিল বোধ হয়। তারাপদ জানে, হংসের স্বভাবই ওই রকম, যখন যেটা ধরে সহজে ছাড়ে না, একেবার চূড়ান্ত ক'রে তবে ছাড়ে। এখন ধর্ম্ম নিয়ে পড়েছে। র‍্যাংকিনের বাড়ির স্যুট ছাড়া যে এককালে আর কোন কিছু পরত না, সে এখন নামাবলী আর পাটের কাপড় প'রে ব'সে আছে।

হয়তো কোন্‌দিন কমণ্ডলু নিয়ে ছাই মেখে বলবে, চললাম সংসার ছেড়ে। কিছুই বিচিত্র নয়। তারাপদর ধারণা, ঝোঁক চেপে গেলে হংস না করতে পারে এমন জিনিস নেই।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে সোম-শুভ্র ভেতরে চ'লে গেলেন।

মহাভারত পাঠ-আবার শুরু হ'ল।

"রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? এবং আপনি কোথা হইতে—"

আগামী রবিবার দিনটা কেমন দেখুন তো, এই পাঁজি নিন।

মহাভারতের সম্ভবপর্ব্ব থেকে হঠাৎ গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় নীত হওয়াতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মানসিক অবস্থাটাও অনেকটা যযাতির মত হ'ল। তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

আজ্ঞে, কি বলছেন?

আগামী রবিবার দিনটা শুভদিন কি না দেখুন, সেদিন অন্নপ্রাশন দেওয়া চলতে পারে কি না!

মিনিট পাঁচেক দেখে ভট্টাচার্য্য অভিমত প্রকাশ করলেন, না, অত্যন্ত অশুভ দিন আগামী রবিবার।

হংস-শুভ্রের চোখ দুটো জ'লে উঠল। কিন্তু তিনি চুপ ক'রে রইলেন। ভট্টাচার্য্য আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে পঞ্জিকাটি সন্তর্পণে মুড়ে রেখে পুনরায় যযাতির-উপাখ্যান আরম্ভ করতে যাবেন, এমন সময় হংস-শুভ্র বললেন, আজ আর থাক।

আচ্ছা।

ভট্টাচার্য্য ধীরে ধীরে উঠে গেলেন।

অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের মত স্থির হয়ে ব'সে রইলেন হংস-শুভ্র।

ক্ষণকাল পরেই একটা সাদা প্লেট ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে তারাপদ প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, পণ্ডিত মশাই চ'লে যাচ্ছেন, ডাক তো। ভট্টাচার্য্য আবার ফিরে এলেন।

অন্নপ্রাশনের একটা ভাল দিন দেখে দিন তো পণ্ডিত মশাই।

ভট্টাচার্য্য আবার পঞ্জিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারাপদ প্লেটটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সে হংস-শুভ্রের দিকে যে দৃষ্টিটা

নিক্ষেপ ক'রে গেল, তার অর্থ—আবার কি নিয়ে মাতলে তুমি? ছেলেটার অন্নপ্রাশনে বাগড়া লাগাচ্ছ নাকি?

খানিকক্ষণ পাতা উলটে ভট্টাচার্য্য বললেন, এর পরের বৃহস্পতিটা খুব ভাল দিন।

এর পরই হংস-শুভ্র যে প্রশ্নটি করলেন, তার জন্যে ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনি যজ্ঞ করতে পারবেন?

আজ্ঞে?

আমার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠান রীতিমত হিন্দু পদ্ধতিতে করতে চাই। তাতে যজ্ঞ হোম ঠিক বৈদিক নিয়ম অনুসারে করতে হবে। আপনি কি অধ্বর্য্যু কিংবা অন্য কোন ঋত্বিকের কাজ করতে পারবেন?

ইতিপূর্ব্বে কখনও করি নি। তবে সাধারণভাবে বৃদ্ধি-টৃদ্ধি—

না, সাধারণভাবে হবে না। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে করতে হবে। ভট্টাচার্য্য হংস-শুভ্রকে চিনতেন। চুপ ক'রে রইলেন।

কাশীতে খবর পাঠাতে হবে দেখছি। জিনিসপত্র যা যা লাগবে, তার একটা ফর্দ্দ কোথা পাই—

আজ্ঞে, তা আমি ক'রে দিতে পারব, বই আছে আমার কাছে।

বইটা আনুন তা হ'লে।

ব'লেই তিনি উঠে অন্দরের দিকে চ'লে গেলেন।

যাচ্ছিলেন সোম-শুভ্রের কাছে। যেতে যেতে হঠাৎ ছবি-ঘরের কপাটটা তাঁর চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

তারাপদ!

তারাপদ এল।

এ ঘরটা খোল।

প্রকাণ্ড চাবির গোছাটা এনে তালাটা খুলে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল তারাপদ, হংস-শুভ্র বললেন, পণ্ডিত মশাই একটা ফর্দ্দ দেবেন, সেটা তুমি টুকে নাও গিয়ে।

কিসের ফর্দ্দ?

যজ্ঞের।

হংস-শুভ্র ঘরের ভেতর ঢুকে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলেন। বন্ধ দ্বারের দিকে চেয়ে তারাপদ সবিস্ময়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চ'লে গেল।

ছবি-ঘরে অনেক দিন ঢোকেন নি হংস-শুভ্র। একটা ঘরকে 'ছবি-ঘর' নাম দিয়ে সেটাকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দান তিনিই করেছিলেন একদিন, বহুকাল পূর্ব্বে। মৃত পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনদের ছবিই শুধু নয়, অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অনেক জিনিসও উত্তর দিকের এই ঘরখানিতে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন তিনি। তারাপদকে বলেছিলেন, দুবেলা যেন ধূপধূনা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় ঘরটা। তারাপদ অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন ক'রে যাচ্ছে, তিনি নিজেই বহুদিন ঘরটাতে ঢোকেন নি। হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের মহাসমুদ্রে অবগাহন ক'রে তাঁর মনে কিছুকাল থেকে এই প্রতীতি জন্মেছিল যে, যারা আত্মার অমরতায় আস্থাবান, মায়া-পাশ ছিন্ন ক'রে অখণ্ড অব্যক্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও জীবের গত্যন্তর নেই ব'লে যাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবকেই জন্মজন্মান্তরের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়ে অবশেষে সেই একই মহাসত্তায় মিশতে হবে এই যারা সত্য ব'লে মনে করে, তাদের পক্ষে এই নশ্বর জীবনের দু-চারটে স্মৃতির টুকরোকে আঁকড়ে থাকার অর্থ—সেই বিরাট প্রবাহকে অস্বীকার করা, যার খরস্রোতে, তারা জানে যে, পর্ব্বত সমুদ্রে এবং সমুদ্র মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আজকের পর্ব্বতের প্রতিকৃতি নিয়ে কি হবে? ওটা তো ওর আসল রূপ নয়। নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল পরমাণুপুঞ্জের একটা বিশেষ মুহূর্ত্তের ছবি রেখে লাভ কি? নিত্য-চলমান বিশ্বজগতের পটভূমিকায় কল্পনানেত্রে দেখলে ওর স্বরূপ হয়তো দেখা যেতে পারে এবং তাই হয়তো সত্য দর্শন। বহুকাল তিনি ঢোকেন নি ঘরটাতে। আজ কিন্তু ওই বড় তালাটা চোখে পড়াতে তাঁর দার্শনিক মন হঠাৎ যেন ক্রীড়াপ্রবণ হয়ে উঠল। দর্শনের বিজ্ঞ অধ্যাপক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে খেলার মাঠে নেমে যেন হুড়োহুড়ি ক'রে খেলতে উৎসুক হলেন।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে শিব-শুভ্রের বিরাট অয়েল-পেণ্টিং ছবিখানা। হঠাৎ দেখলে রামমোহন রায় ব'লে ভুল হয়। সেই চোগা চাপকান শামলা। হংস-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যদিও ছবি ছবিই, তবু হংস-শুভ্রের মত দার্শনিকও মনে মনে কোন একটা

প্রত্যাদেশের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন যেন ক্ষণকাল। বাচনিক কোন প্রত্যাদেশ এল না বটে, কিন্তু অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল মনে। তাঁর আর সোম-শুভ্রের উপনয়নের ছবি। ভট্টপল্লী থেকে গৌরীকান্ত শিরোমণি এসেছিলেন, কাশী থেকে এসেছিলেন পণ্ডিত গোপীনারায়ণ। তা ছাড়া পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রী আরও অনেকে ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনিতে বিরাট মণ্ডপটা গমগম করছিল, এখনও তাঁর মনে আছে। বিরাট উৎসব হয়েছিল। সাত দিন সাত রকম। প্রথম দিন হিন্দু মতে—ব্রাহ্মণভোজন, যাত্রা, ভাগবত-পাঠ। দ্বিতীয় দিন মুসলমানী মতে—পোলাও-কাবাব-কোপ্তার খানা, বাইনাচ, মুশয়রা। তৃতীয় দিন সাহেবদের জন্য সাহেবী হোটেলে সাহেবী ফ্যাশানে ডিনার, ড্রিঙ্ক, ডান্স। চতুর্থ দিনে কাঙালী-ভোজন—লুচি, ভাত, ডাল, পোলাও, তরিতরকারি, মিষ্টান্ন—সব রকম, যে যত খেতে এবং নিয়ে যেতে পারে, অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্ত্তন হয়েছিল। পঞ্চম দিন কেবল মেয়েদের খাওয়ানো হয়েছিল, সেও ভূরি-ভোজন। পুরুষদের কোন সম্পর্কই ছিল না তার সঙ্গে। মেয়ে রাঁধুনী, মেয়ে পরিবেশনকারিণী, মেয়ে কীর্ত্তনিয়া, এমন কি মেয়ে-যাত্রা পর্য্যন্ত এসেছিল। ষষ্ঠ দিন কবির লড়াই, কবিদের সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল সেদিন। সপ্তম দিন হয়েছিল পালোয়ানদের কুস্তি, ওস্তাদদের গান, আর তাঁদের প্রত্যেকের ফরমাশ অনুযায়ী খাওয়ার ব্যবস্থা। কেউ খেলেন বাদামের হালুয়া, কেউ মহিষের কাঁচা দুধ, কেউ স্বপাক আলোচাল গাওয়া-ঘি, কেউ সিদ্ধির সন্দেশ, কেউ মধু আর ফলাহার করলেন কেবল, কেউ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে নিলেন নিজের হাতে।···হঠাৎ চাবুকটা নজরে পড়ল হংস-শুভ্রের। চামড়ার ওই হাণ্টারটা দিয়ে সিতাংশুকে খুব মেরেছিলেন তিনি একদিন অবাধ্যতার জন্য। হংস-শুভ্র ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ছবির ভিড়ের মধ্যে সিতাংশুর ছবিখানা খুঁজতে লাগলেন। ওই যে, হাসিমুখে চেয়ে আছে। ব্যারিস্টারের গাউনে কি সুন্দর মানাত ওকে! হিমাংশু সুধাংশুর ছবিও পাশাপাশি টাঙানো রয়েছে, কিন্তু সিতাংশুর দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তিনি। ছেলেটা দুষ্ট ছিল ব'লেই বোধ হয় বেশি ভালবাসতেন তাকে। যা ধরত, তা করত। তাঁর মতের বিরুদ্ধেই ব্যারিস্টারি পড়েছিল, কিছুতেই আই. সি. এস. পরীক্ষাটা দিলে না। কিছুতেই সামলানো যেত না, একটা ঝড় যেন। ঝড় থেমে গেছে। হংস-শুভ্র এগিয়ে গিয়ে আর একটা অয়েল-পেন্টিংয়ের সামনে দাঁড়ালেন। দূরসম্পর্কের পিসীমা ভুবনমোহিনী

দেবী। রক্তের দিক দিয়ে সম্পর্কটা দূর বটে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে এই ভুবনমোহিনী একদিন হংস-শুভ্রের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বহু-বিবাহের যুগে বহুপত্নীবান যে কুলীনের গলায় মালা দিয়ে ভুবনমোহিনী সীমন্তে সিঁদুর পরবার অধিকার পেয়েছিলেন, তাঁর গৃহেই সেই ন বছর বয়স থেকেই বহু সপত্নী সমভিব্যাহারে তিনি এমন নিখুঁত রকম সুন্দর অনাড়ম্বর আত্মমর্য্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন ক'রে গেছেন যে, সে কথা ভাবলে হংস-শুভ্রের শির এখনও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে হংস-শুভ্রের বাড়িতে আসতেন তিনি। প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। হংস-শুভ্র অবাক হয়ে যেতেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অনবদ্য রূপরাশি দেখে, প্রস্ফুটিত শতদল যেন। বেশি দিন বাঁচেন নি, ভরা-যৌবনেই মারা গেছেন। ইংরেজী-কেতায়-মানুষ হংস-শুভ্র তাঁর একগোছা চুল স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কেটে রাখতে চেয়েছিলেন, ভুবনমোহিনী দেন নি। ভাগ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে একটা ফোটো তুলে রেখেছিলেন, তাই এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। অনেক খরচ ক'রে সেই ফোটো থেকে এই ছবিখানা করিয়ে রেখেছেন তিনি। হংস-শুভ্র যখনই এ ছবিখানার কাছে এসেছেন মনে মনে প্রণাম করেছেন, আজও করলেন। হংস-শুভ্র এগিয়ে গেলেন। ছবির পর ছবি···কত ছবি! দামী গ্লাস-কেসে একখানা শাল রাখা ছিল, কাঞ্চনমালার শাল। সেখানার সম্মুখে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ। পাশেই কুন্দর গয়নার বাক্সটা রয়েছে, যাবার সময় কুন্দ গায়ের সমস্ত গহনা খুলে রেখে গিয়েছিল। তারপরই ভায়রাভাই রুদ্রবিলাস। এককালে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল লোকটার সঙ্গে, চমৎকার শেক্স্‌পিয়র আবৃত্তি করত। কবে ম'রে গেছে। শেক্স্‌পিয়রের নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের আরও কতকগুলো প্রিয় নাম মনে প'ড়ে গেল—মিল্টন, বেকন, লক, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, গিবন, রলিন্স···স্বপ্নের মত মনে হ'ল, বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত। এদের কারও সঙ্গেই আর জীবন্ত সম্পর্ক নেই, সমস্তই স্মৃতি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

প্রথম অঙ্ক

ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো : ড্রয়িং-রুম

ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, পুলিস-সুপার, সিভিল, সার্জন, হেডমাষ্টার, দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা প্রভৃতি

ম্যাজিস্ট্রেট। একটা দুঃসংবাদ দেবার জন্যে আজ আপনাদের এখানে ডেকেছি। শিগগিরই একজন ইন্সপেক্টর আসছে।

জজ। ইন্সপেক্টর?

দাতব্য-কর্ত্তা। ইন্সপেক্টর?

ম্যাজিস্ট্রেট। হ্যাঁ, একজন গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর—কলকাতা থেকে, ছদ্মবেশে, সিক্রেট অর্ডার নিয়ে।

জজ। কি দুঃসংবাদ!

দাতব্য-কর্ত্তা। দুঃসংবাদ ব'লে দুঃসংবাদ। এমনিতেই আমাদের বিপদ-আপদের যেন অভাব আছে? তার ওপরে আবার—

হেডমাস্টার। তার ওপরে আবার 'সিক্রেট-অর্ডার'! কি সর্ব্বনাশ!

ম্যাজিস্ট্রেট। একটা যে কিছু বিপদ আসছে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কাল সারারাত আমি ইঁদুরের স্বপ্ন দেখেছি—প্রকাণ্ড দুটো কালো ইঁদুর, আমার কাছে এসে গাঁ শুঁকে চ'লে গেল। তখনই মনে হ'ল, একটা বিপদ আসছে। আর ভোরবেলা উঠেই এই সংবাদ।…যাক, চিঠিখানা আপনাদের প'ড়ে শুনিয়ে দিই। আমার বন্ধু বীরনগরের রায় সাহেবকে তো আপনি জানেন [দাতব্য-কর্ত্তার প্রতি]। রায় সাহেব লিখছেন, 'প্রিয় রায় বাহাদুর' [চিঠিখানার বিশেষ বিশেষ অংশ পড়িতে লাগিলেন] কোথায় গেল—এই যে, "অন্যান্য সংবাদের মধ্যে একটা বিশেষ খবর-এই যে, এই বিভাগ—তার মধ্যে আবার আমাদের জেলা পরিদর্শনের জন্য একজন ইন্সপেক্টর ছদ্মবেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তিনি ইন্সপেক্টর বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না, সাধারণ লোক হিসাবে চলাচল করিতেছেন। এই খবর একান্ত বিশ্বাসজনক সূত্রে প্রাপ্ত। আমি তো জানি যে, সাধারণ মানুষ-সুলভ দুর্ব্বলতা আপনার আছে, কারণ কোন বিচক্ষণ মানুষই সুযোগ আসিলে ছাড়িয়া দেয় না।" [একটু থামিয়া, কাসিয়া] এখানে তো সকলেই আমরা বন্ধু, কাজেই…[পুনরায় পড়িতে লাগিলেন] "আমি পূর্ব্বাহ্ণেই

আপনাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি যে, যে কোন মুহূর্ত্তে এই ইন্সপেক্টর আপনাদের মধ্যে গিয়া পৌছিতে পারেন, যদি তিনি ইতিমধ্যেই ছদ্মবেশে গিয়া না পৌছিয়া থাকেন। হয়তো তিনি এখনই আপনাদের মধ্যে বসবাস করিতেছেন, আপনারা জানিতেও পারিতেছেন না। গতকল্য আমি"... যাক, এবার তাঁর পারিবারিক সংবাদ আরম্ভ হ'ল, "গতকল্য আমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি রতনবাবু আসিয়া পৌছিয়াছেন। রতনবাবু আরও মোটা হইয়াছেন এবং অবসর পাইলেই বসিয়া বসিয়া বাঁশী বাজান।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। যাকগে। তা হ'লে ব্যাপার হ'ল এই—

জজ। দুঃসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এমন হ'ল? নিশ্চয় কোন জরুরি কারণ আছে।

হেডমাস্টার। সত্যি রায় বাহাদুর, কেন এমন ঘটল? ইন্সপেক্টর কেন আসতে যাবে? আপনার কি মনে হয়?

ম্যাজিস্ট্রেট। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] কেন আর কি? ভবিতব্য! ভবিতব্য! এতদিন অন্যান্য জেলায় গিয়েছে, এবার আমাদের পালা।

জজ। অত সহজ নয় রায় বাহাদুর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খুব জরুরি আর গোপনীয় কারণ আছে। ব্যাপারটা রাজনৈতিক। [নীচু স্বরে] শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে, তাই খবর নেবার জন্যে ইন্সপেক্টর বেরিয়েছে, কোথাও কোন বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা আছে কি না!

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি এমন বিচক্ষণ লোক, আর এসব কথা বলছেন! বিশ্বাসঘাতকতা এই দিনাজসাহী শহরে! তবু যদি বা সীমান্তের ধারে কাছে হ'ত! এক মাস হাঁটলেও সীমান্তে গিয়ে পৌছনো যায় না এমন শহর এই দিনাজসাহী।

জজ। আমার মনে হয়, আপনি ভুল করছেন। রাজধানীতে যারা থাকে, তাদের বুদ্ধিই অন্য রকম। ক্ষতির কারণ না থাকলেও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেওয়া সেই বুদ্ধির একটা লক্ষণ।

ম্যাজিস্ট্রেট। কারণ যাই হোক, আগে থেকে আপনাদের সতর্ক ক'রে দিলাম। আমার ডিপার্টমেণ্ট আমি ইতিমধ্যে গুছিয়ে নেব। আপনাদেরও তাই করা উচিত। [দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তার প্রতি] রসময়বাবু, ইন্সপেক্টর যে আপনার দাতব্য-হাসপাতাল দেখতে যাবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। রুগীগুলোকে যেন ভিখিরীর মত না দেখায়। হঠাৎ

ওদের ভিখিরী ব'লেই মনে হয়। বিছানাগুলো একটু ফিটফাট যেন থাকে।

াতব্য-কর্ত্তা। এ আর এমন বেশি কি! বিছানাগুলো একটু পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। হ্যাঁ, বিছানাগুলো দেখলে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা ব'লে মনে হয়।

আর এক কাজ করতে হবে প্রত্যেকখানা তক্তাপোশের পাশে, প্রত্যেক রুগীর মাথার কাছে ইংরিজীতে উচ্চাঙ্গের একটা নীতিবাক্য লিখে রাখা উচিত; প্রত্যেক রুগীর পায়ের কাছে একখানা কাগজে রুগীর নাম, রোগের নাম, বয়স, কতদিন ভুগছে, সব লেখা থাকা দরকার।

সত্যি, আপনার রুগীরা এমন কড়া তামাক খায় যে, কাছে গেলেই হাঁচি পায়। আর রুগীর সংখ্যা কম হ'লেই ভাল ছিল, নতুবা ইন্সপেক্টর মনে করতে পারেন যে, স্বাস্থ্য-বিভাগ যথেষ্ট মনোযোগী নয়, কিংবা সিভিল-সার্জন কিছু জানেন না।

দাতব্য-কর্ত্তা। চিকিৎসার বিষয়ে যদি বলেন, তবে আমি আর সিভিল-সার্জন অনেক দিন হ'ল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়াই চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য, সেইজন্যে দামী ওষুধ আমরা ব্যবহার করি না। আমার রুগীরা গরিব লোক, যদি মরে নিতান্ত সাদাসিধেভাবে মরবে। আর যদি বেঁচেই ওঠে, তাও সাদাসিধেভাবেই উঠবে। বাঁচা মরা যেমনই হোক, সিভিল-সার্জনের পক্ষে ওদের চিকিৎসা করাই সম্ভব নয়, কারণ ডাক্তার পিলাই এক অক্ষরও বাংলা বুঝতে পারেন না।

সিভিল-সার্জন। [অস্পষ্ট নাসিকা-গর্জ্জন দ্বারা আপত্তি প্রকাশ করিল।]

ম্যাজিস্ট্রেট। [জজের প্রতি] মিঃ সিন্‌হা, আপনিও একটু দৃষ্টি রাখবেন আদালত-বাড়িটার দিকে। এজলাস ঘরের মধ্যেই আপনার চাপরাসীরা মুরগী পালতে শুরু করেছে। ওঃ; সেদিন দেখি, একপাল হাঁস মুরগী সে কি ডাক শুরু করেছে! উকিলবাবুদের সওয়ালের সঙ্গে হাঁসের ডাক মিলে সে কি জটিল ঐক্যতান! অবশ্য পক্ষীপালন খুব উপকারী, বিশেষ এই দুর্দ্দিনে। কিন্তু একেবারে প্রকাশ্য আদালতে ব্যাপারটা বোধ করি বাঞ্ছনীয় নয়। আমি অনেকবার আপনাকে মনে করিয়ে দেব ভেবেছি, কিন্তু কাজের চাপে কিছুতেই মনে রাখতে পারি নি।

জজ। আজকেই আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি, সব যেন আমার বাবুর্চ্চিখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আসুন না আজ রাত্রে ডিনারে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আরও একটা কথা। আদালত-ঘরের দেয়ালে ঘুঁটে দিয়ে দিয়ে বসন্তের রুগীর গায়ের মত হয়ে গিয়েছে। আর রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা শুকোতে দেখা যায়। আর সেরেস্তার আলমারির গায়ে একখানা শঙ্কর মাছের চাবুক ঝুলতে দেখেছি। এতে ক'রে প্রমাণ করে, শিকারে আপনার খুব শখ। কিন্তু কয়েক দিনের জন্যে ওটা সরিয়ে নেওয়া দরকার। তারপরে ইন্সপেক্টর চ'লে গেলে আবার ওটা স্বস্থানে রাখা যেতে পারে।

আর আপনার পেশকার। তার কথা আর কি বলব। তার গায়ে এমন বিকট গন্ধ, যেন এখনই তাড়িখানা থেকে বেরিয়ে এল। আপনাকে অনেকবার মনে করিয়ে দেব ভেবেছি, কিন্তু আমি এমনই ব্যস্ত থাকি যে, আদৌ সময় পেয়ে উঠি না। অবশ্য লোকটা যদি বলে যে, ওটাই তার স্বাভাবিক গন্ধ, তা হ'লে আপত্তি করা চলে না। কিন্তু খুব ক'ষে পেঁয়াজ-রসুন খাইয়ে ওটা চাপা দেওয়া যায় না? আচ্ছা, ডাক্তার পিলাই, আপনি একটু ওষুধ দিয়ে ওটা চেপে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারেন না?

সিভিল-সার্জন। [নাসিকা-তর্জ্জনে কি যেন জানাইল।]

জজ। না না, ও গন্ধ দূর করবার উপায় নেই। লোকটা বলে যে, ওর নার্স শৈশবে ওকে মদের মধ্যে একবার ফেলে দিয়েছিল, সেই থেকে তাড়ির গন্ধ ওর স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। যাই হোক, একবার তবু মনে করিয়ে দিলাম। কিন্তু যে ভাবে আদালতে বিচার হয়, আমার বন্ধু চিঠিতে যাকে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বলেছেন, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। আর বলবার আছেই বা কি? দুর্ব্বলতা-মুক্ত মানুষ আর কোথায়? এ তো বিধাতার বিধান।

জজ। দুর্ব্বলতা কাকে বলছেন রায় বাহাদুর? সব দুর্ব্বলতা কি সমান? আমি প্রকাশ্যে ব'লে থাকি যে, আমি ঘুষ নিয়ে থাকি। কিন্তু কি? টাকাকড়ি নয়—বিলিতী কুকুরের বাচ্চা। ওকে ঘুষ বলা চলে না।

ম্যাজিস্ট্রেট। বিলিতী কুকুরের বাচ্চাই হোক আর যাই হোক, ওকে ঘুষ ছাড়া আর কি বলে?

জজ। না রায় বাহাদুর, এ কথা ঠিক হ'ল না। ধরুন, একজন যদি স্ত্রীর জন্যে পাঁচশো টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ি নেয়, কিংবা—

ম্যাজিস্ট্রেট। স্বীকার করলাম, ঘুষ হিসাবে আপনি শুধু বিলিতী কুকুরের বাচ্চাই নেন, কিন্তু তাতেই বা কি? আসল কথা, আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না, কোনদিন পূজা-অর্চনা করেন না। ভগবানে আমার অটল বিশ্বাস। তিন বেলা সন্ধ্যাহ্নিক না ক'রে আমি জলগ্রহণ করি নে।

জজ। দেখুন, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ যদি তুললেন তবে স্পষ্ট বলি, আমি শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, এসব বিষয়ে আমি কারও সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। কোন কোন বিষয়ে অতি-চিন্তা চিন্তাহীনতার চেয়ে নিন্দনীয়। কিন্তু সে যাই হোক, জজের আদালতে যে ইন্সপেক্টর যাবেন, তা মনে হয় না—ও জায়গা একেবারে বিধাতার খাস জমিদারির অধীন। এ বিষয়ে আপনার সৌভাগ্য ঈর্ষ্যার যোগ্য।

কিন্তু হেডমাস্টার মশায়, আপনি সাবধান হবেন—বিশেষ ক'রে আপনার শিক্ষকদের সম্বন্ধে। অবশ্য তাঁরা সবাই শিক্ষিত লোক। ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপে ধাপে আরোহণ ক'রে জ্ঞানের চিলেকোঠায় গিয়ে ওঁরা পৌঁছেছেন, কিন্তু ওঁদের অনেকের বড় বিচিত্র রকমের অভ্যাস আছে, বোধ করি, জ্ঞানের থেকে সেসব অবিভাজ্য। যেমন ধরুন না কেন, সেই যে মোটা চেহারার ভদ্রলোকটি, নামটা কিছুতেই মনে থাকে না, চেয়ারে গিয়ে বসলেই এমন বিকট মুখভঙ্গী করে [মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইলেন] আর ক্রমাগত দাড়িতে হাত বুলাতে থাকে; যতক্ষণ সে ছেলেদের প্রতি মুখভঙ্গী করে কিছু আসে যায় না, হয়তো অধ্যাপনার ওটা একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, আমার পক্ষে নিশ্চিত ক'রে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে করুন তো, ওই রকমটি যদি কোন দর্শকের প্রতি করে, তবে কি বিপদ ঘটবে! ইন্সপেক্টর ভাবতে পারেন, ওতে তাঁকে ব্যঙ্গ করা হ'ল। তখন ওই ঘটনা কত দূর গড়াবে বলুন তো?

হেডমাস্টার। আমি কি করব বলুন? আমি বারংবার তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি। সেদিন মহামান্যা লাটপত্নী ইস্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। আর কি বলব! এমন মুখভঙ্গী ক'রে উঠলেন, না না, তেমনটি আপনি কখনও দেখেন নি। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য খুব সাধু। কিন্তু এজন্য এডিকং-এর কাছে আমাকে কথা শুনতে হ'ল।

ম্যাজিস্টেট। আর আপনার ইতিহাসের শিক্ষকের বিষয়ে একটা কথা বলতে

চাই। লোকটি খুব পণ্ডিত সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্লাসে এমন অত্যুৎসাহে বক্তৃতা করেন যে, প্রায় আত্মবিস্মৃত অবস্থা। একবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। যতক্ষণ অ্যাসিরিয়ান আর ব্যাবিলোনিয়ানদের বিষয়ে বলছিলেন আত্মসম্বিৎ একেবারে হারান নি, কিন্তু যখন আলেক্‌সাণ্ডার দি গ্রেটে এসে পৌছলেন, অবস্থা চরমে গিয়ে পৌছল। মনে হ'ল, ঘরে যেন আগুন লেগেছে, সত্যি তাই মনে হ'ল। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে প'ড়ে মেঝের ওপরে দড়াম ক'রে একখানা চেয়ার ফেললেন। আলেক্‌সাণ্ডার দি গ্রেট অবশ্য মস্ত বীর ছিলেন, কিন্তু সেজন্য চেয়ার ভাঙা কেন? ওগুলো যে গভর্মেণ্টের সম্পত্তি।

হেডমাস্টার। ঠিক বলেছেন, লোকটা অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমি অনেক বার তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি। কিন্তু তিনি কি বলেন জানেন, 'আপনি যাই বলুন, জ্ঞানবিস্তারের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।'

ম্যাজিস্ট্রেট। বিধাতার কি লীলা! বুদ্ধিমান লোকেরা হয় মাতাল, নয় এমন বিচিত্র মুখভঙ্গী করে যে, ভয় পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়।

হেডমাস্টার। কি আর বলব! আমার শত্রুও যেন শিক্ষাবিভাগে কাজ করতে না আসে। এখানে সকলকেই ভয় ক'রে চলতে হয়; কে যে কর্ত্তা নয় তা বুঝতে পারি না, প্রত্যেকেই এসে দুটো উপদেশ দিয়ে যায়; প্রত্যেকেই প্রমাণ করতে বসে যে, আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান; যত দেউলে ব্যবসায়ী, পশারহীন উকিল, আকাট বৈজ্ঞানিক, বড় সাহেবের জামাইয়ের জামাই—আমাদের কর্ত্তা। আর বেতনের কথা সে আর কি বলব! নিজের স্ত্রীর কাছে উল্লেখ করতেও লজ্জা বোধ হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিছুতেই কিছু যায় আসে না, কিন্তু বেশটা যে ছদ্ম, বুঝতে পারবার আগেই ব'লে উঠবে—এই যে সোনার চাঁদেরা, তোমরা সব এখানে! দেখলাম তোমাদের সব কীর্ত্তি। জজ কে? জগদ্ধাত্রী সিংহ? গ্রেপ্তার। দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা কে? রসময় কটক? গ্রেপ্তার। এ যে অসহ্য অবস্থা!

(পোষ্টমাষ্টারের প্রবেশ)

পোস্টমাস্টার। কি ব্যাপার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব? ইন্সপেক্টর আবার কে আসছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন, আপনি কি শোনেন নি কিছু ?

পোস্টমাস্টার। আমি বলরামবাবুর কাছে এইমাত্র শুনলাম। তিনি ডাকঘরে গিয়েছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার কি মনে হয় ? কেন ইন্সপেক্টর আসছে ?

পোস্টমাস্টার। কেন আবার ? শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে।

জজ। দেখুন। আমিও ঠিক এই কথাই বলেছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনারা কিছুই বুঝতে পারেন নি।...তারপরে নিরাপদবাবু, পোস্ট-অফিসের সব খবর ভাল তো ? ইন্সপেক্টর ডাকঘর পরিদর্শন করতে নিশ্চয় একবার যাবেন।

পোস্টমাস্টার। আমি সর্ব্বদা ঘর সামলিয়ে চলি। আপনার খবর সব মঙ্গল তো ?

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি ? আমি ভয় পাব কেন ? কেবল একটু, মানে ব্যবসায়ীরা আর শহরের লোক আমাকে জ্বালাতন ক'রে মারলে। আমি নাকি তাদের সর্ব্বনাশ করছি ! হ্যাঁ, কখনও যে অল্পস্বল্প না নিয়ে থাকি এমন নয়, কিন্তু ভগবান জানেন, তার উদ্দেশ্য সাধু। দেখুন মুস্তফী মশায় [পোস্টমাস্টারকে একান্তে লইয়া গিয়া নীচু স্বরে] এক কাজ করতে পারেন না, তাতে আমাদের সকলেরই উপকার হবে, এই, মানে—কিনা ডাকঘরে যত চিঠি আসে আর যায়, সবগুলো খুলে একবার দেখতে পারেন না ? আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে কি না ? না থাকে তো কোন বালাই নেই, আবার বন্ধ ক'রে দিলেই চলবে। না হয় খোলাই থাকবে। নিশ্চয় কোন অভিযোগ যাচ্ছে, নইলে ইন্সপেক্টর আসতে যাবে কেন ?

পোস্টমাস্টার। এসব বুদ্ধি আর আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না। রোজ ভোরবেলা উঠে ওই তো আমার প্রথম কাজ। চা খেতে খেতে হাঁক দিই—শশী পিওন, আমায় খবরের কাগজ। শশী এক তাড়া খামের চিঠি এনে দেয়। বলব কি মশায়, এক-একখানা চিঠি এমন সুন্দর ! যেমন বর্ণনা, তেমনই ভাষা, আর শিক্ষণীয় বিষয়ও তেমনই থাকে। কোথায় লাগে আপনাদের আনন্দবাজার, যুগান্তর !

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, তার মধ্যে কি কলকাতা থেকে ইন্সপেক্টর আসবার কথা দেখেন নি ?

পোস্টমাস্টার। কই, না।...কিন্তু যাই বলেন, এক-একখানা চিঠি এমন

আবেগের সঙ্গে লিখিত! দুঃখ হয় যে, এমন সব চিঠি আপনারা পড়তে পান না। একজন কর্নেল তাঁর এক বন্ধুকে লিখছে—'প্রিয় বন্ধু, আমরা এখন নন্দনকাননে বাস করছি; চারদিকে অগণিত তরুণী; নিশান উড়ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, পানাহারের অপরিমিত আয়োজন।' আমি রেখে দিয়েছি—দেখবেন নাকি? সে কি জ্বালাময়ী ভাষা!

ম্যাজিস্ট্রেট। আর এক সময়ে হবে, এখন ভাল লাগছে না। নিরাপদবাবু, যদি কখনও আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আপনার হাতে এসে পড়ে, আপনি রেখে দেবেন।

পোস্টমাস্টার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

জজ। ডাকবাবু, এই রকম করতে করতে একদিন আপনি বিপদে প'ড়ে যাবেন।

পোস্টমাস্টার। আমি পড়ব বিপদে!

ম্যাজিস্ট্রেট। কথখনও নয়। চিঠিগুলোর তো আর প্রকাশ্য ব্যবহার হচ্ছে না; গোপনীয় বস্তু গোপনেই রাখছেন। এতে আবার বিপদ কি?

জজ। কখন্ কোন্ বিপদ ঘটে, তার নিশ্চয় কি? সে যাক্‌গে, রায় বাহাদুর, আপনাকে আমি একটা বিলিতী কুকুরের বাচ্চা উপহার দেবার জন্তে এনেছিলাম। কোতনগরের দুই জমিদারে মামলা বেধে উঠেছে। দুই শরিকের কাছ থেকেই বিলিতী কুকুরের বাচ্চা উপহার নিচ্ছি, তারই একটা—

ম্যাজিস্ট্রেট। প'ড়ে মরুক আপনার বিলিতী কুকুরের বাচ্চা। আমি কিছুতেই সেই ছদ্মবেশী ইন্সপেক্টরের কথা ভুলতে পারছি না। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে, কখন্ বা দরজা খুলে যাবে—আর এসে ঢুকবেন সেই—

(দরজা খুলিয়া গেল আর ঘনরামবাবু ও বলরামবাবু উর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ করিল)

বলরামবাবু। অদ্ভুত সংবাদ!

ঘনরামবাবু। আশ্চর্য্য ঘটনা!

সকলে। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

ঘনরামবাবু। অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! আমরা কানাইবাবুর হোটেলে গিয়েছিলাম—

বলরামবাবু। [বাধা দিয়া] ঘনরামবাবু আর আমি হোটেলে গিয়েছিলাম—

নরামবাবু। [বাধা দিয়া] আমাকে বলিতে দাও বলরামবাবু। আমি বলব।

লরামবাবু। না না, আমাকে বলতে দাও, আমাকে বলতে দাও। তুমি ভাষা খুঁজে পাবে না।

নরামবাবু। তুমি বলতে গিয়ে সব মাটি ক'রে ফেলবে। এমন ঘটনা সব তোমার দোষে মাটি হয়ে গেল দেখছি।

লরামবাবু। দেখ না, আমি কেমন ক'রে বর্ণনা করি? তুমি কেবল একটু চুপ কর তো। আহা, বাধা দিও না আমাকে। আপনারা দয়া ক'রে ঘনরামবাবুকে থামতে বলুন তো।

্যাজিস্ট্রেট। যে হয় আপনারা একজন বলুন। বসুন তো, এই নিন চেয়ার। আমাদের নাভিশ্বাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

(ঘনরাম ও বলরাম বসিল; সকলে তাহাদের ঘিরিয়া বসিল)

কলে। এইবার বলুন, ব্যাপার কি?

লরামবাবু। আমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করব। আপনাদের এখান থেকে বেরিয়ে—আপনারা তখন তো চিঠি প'ড়ে কাঁপতে শুরু ক'রে দিয়েছেন—আমি ছুটে চললাম। আমার সব মনে আছে—আমাকে বাধা দিয়ো না ঘনরাম। আমি প্রথমে গেলাম কমলবাবুর বাড়িতে, সেখানে তাঁকে না পেয়ে গেলাম রোহিণীবাবুর বাড়িতে, তাঁকেও পেলাম না। তখন আপনার কাছে গেলাম পোস্টমাস্টারবাবু, গিয়ে আপনাকে খবরটা দিয়ে যেমনই বেরিয়েছি, অমনই দেখা হ'ল ঘনরামের সঙ্গে—

নরাম। [বাধা দিয়া] ঠিক কুন্দনলালের পানের দোকানের সমানে—

লরাম। [তাহাকে থামাইয়া দিয়া] কুন্দনলালের পানের দোকানের সামনে। আমি তাকে দেখেই বললাম, ঘনরাম, রায় বাহাদুর যে গোপন খবর পেয়েছেন, তা শুনেছ কি? আপনার বাড়ির চাকর ফণিবাবুর বাড়িতে যেন কি কাজে যাচ্ছিল, তার কাছে ঘনরাম সে খবর শুনতে পেয়েছে—

নরাম। [বাধা দিয়া] ফণিবাবুর বাড়ি যাচ্ছিল তালমিছরি আনতে।

লরাম। [তাহাকে বাধা দিয়া] তালমিছরি আনতেই বটে। তখন আমরা দুজনে পরেশবাবুর বাড়ির দিকে চললাম।...ঘনরাম, এ রকম

ক'রে বাধা দিলে—আপনারা দয়া ক'রে ওকে একটু থামান না।··· এ তোমার ভারি অন্যায়। পরেশবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময়ে ঘনরাম বললে—চল না হে, একবার কানাইবাবুর হোটেলে যাওয়া যাক। সকাল থেকে কিছু খাই নি। ভোরবেলা দেখলাম কানাইবাবু পাঁঠার মাংস কিনে নিয়ে গেলেন। খান দুই ক'রে চপ হ'লে মন্দ কি? আমি বললাম—চল না, মন্দ কি! যেমনই আমরা হোটেলে ঢুকেছি, অমনই দেখলাম একজন যুবক—

ঘনরাম। [বাধা দিয়া] সুপুরুষ, কিন্তু গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, কোট-প্যাণ্টলুন নয়।

বলরাম। সুপুরুষ, সুদর্শন যুবক গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, ঘরের মধ্যে এই ভাবে হাঁটছেন। [দেখাইল] মুখে সে কি বুদ্ধির ছাপ! হাবভাব চেহারায় মনে হয়, যেন গভর্মেণ্টের অদৃশ্য ছাপ-মোহর মারা। আর মাথাটা দেখলেই মনে হয়, বুদ্ধিতে ঠাসা। দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। তখখুনি বুঝতে পারলাম লোকটি যে-সে নয়। ঘনরামকে বললাম—ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারছ? ঘনরাম আগেই সন্দেহ করেছিল। সে কানাইবাবুকে জিজ্ঞেস করলে—লোকটি কে হে? কানাইবাবুর আবার মাস খানেক হ'ল একটি ছেলে হয়েছে। বেশ ছেলেটি। দেখেই বুঝলাম, ছেলেটা বাপের ব্যবসা রেখে চলতে পারবে। ঘনরাম জিজ্ঞেস করলে—লোকটা কে হে? কানাইবাবু বললে—ওই লোকটা?—আচ্ছা, ঘনরাম, এ রকম ক'রে বাধা দিলে···আপনারা ওকে একটু থামতে বলুন না।···তুমি নিজেও বলতে পারবে না, আমাকেও বলতে দেবে না। পারবে না কেন? ফোকলা দাঁতের গর্ত দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায়, বলবে কি ক'রে? কানাইবাবু বললে—ভদ্রলোক একজন অফিসার, কলকাতা থেকে আসছেন, নাম মিঃ আনন্দমোহন রায়, যাচ্ছেন শিলিগুড়ি। লোকটির আচারব্যবহার অদ্ভুত। আজ প্রায় পনরো দিন ধ'রে এখানে আছেন; এক পয়সাও এ পর্য্যন্ত দেন নি, সবই ধারে চালাচ্ছেন। এই না শুনেই আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল, আমি বললাম—বটে!

ঘনরাম। না, বলরাম, আমি বলেছিলাম—বটে!

বলরাম। হ্যাঁ, তুমি প্রথম বলেছিলে, তারপরে আমি বলেছিলাম। তখন আমরা দুজনে মিলে ব'লে উঠলাম—বটে! লোকটা যদি শিলিগুড়িই

যাবে, তবে এখানে থাকবার কারণ কি? এই লোকটাই তবে নিশ্চয় সেই অফিসার!

ম্যাজিস্ট্রেট। কে? কোন্ অফিসার?

বলরাম। যে অফিসারের আসবার সংবাদ আপনারা পেয়েছেন, সেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! কি বলছেন আপনারা? এ কখনই হতে পারে না।

ঘনরাম। নিশ্চয়ই এ সেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর। লোকটা টাকাও দেয় না, আবার হোটেল ছেড়ে চ'লেও যায় না! আর তার যাবার কথা শিলিগুড়ি! এ যদি গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর না হয় তো কি বলেছি!

বলরাম। এ নিশ্চয় সেই লোক! সব দিকে তার দৃষ্টি। ঘনরাম আর আমি চপ খাচ্ছিলাম, আর লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল। যেন চোখ দিয়ে চপ দুখানা সে কেড়ে নেবে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মাথা ঘুরে উঠল।

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান, রক্ষা কর। কত নম্বর ঘরে আছে?

ঘনরাম। পাঁচ নম্বর ঘর; ঠিক সিঁড়ির নীচেই।

বলরাম। এক বছর আগে দুজন অফিসার যে ঘরটায় ঘুষোঘুষি করেছিল, ঠিক সেই ঘরটাতে।

ম্যাজিস্ট্রেট। কতদিন ধ'রে আছে?

ঘনরাম? পনরো দিনের ওপর।

ম্যাজিস্ট্রেট। পনরো দিনের ওপরে? ভগবান, রক্ষা কর। এই পনরো দিনের মধ্যেই যে কসাই-বুড়ীকে বেত মারা হয়েছে; কয়েদীদের রেশন দেওয়া হয় নি। রাস্তাঘাটে একদিনও ঝাড়ু পড়ে নি। আবর্জ্জনা! দুর্গন্ধ! হায় হায়, সব গেল। [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

দাতব্য-কর্ত্তা। রায় বাহাদুর, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? চলুন, আমরা সবাই মিলে কানাইবাবুর হোটেলে যাই।

জজ। না না, আগে ব্যবসায়ীদের পাঠিয়ে দেওয়া যাক। আগে যাওয়া কিছু নয়, কারণ শাস্ত্রেই আছে—'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্।'

ম্যাজিস্ট্রেট। আমাকে কর্ত্তব্য স্থির করতে দিন। এর আগেও আমার এ

রকম বিপদ এসেছে, আবার তা কেটেও গিয়েছে। এবারেও দয়াময় অন্যান্য বারের মত বিপদুদ্ধার ক'রে দেবেন। [বলরামকে] বলরামবাবু, লোকটি তো যুবক?

বলরাম। যুবক বইকি! খুব বেশি হয় তো তেইশ-চব্বিশ।

ম্যাজিস্ট্রেট। মন্দর ভাল। অল্প বয়সের ছোকরাকে খুশি করা সহজ। বুড়ো শয়তানের মনে যে কি আছে, তা ভগবানও বুঝতে হার মানেন। আপনারা সব যান, নিজের নিজের আফিসগুলো গুছিয়ে নিন গিয়ে। আমি ছোট রায় সাহেবের সঙ্গে [বলরামকে লক্ষ্য করিয়া] শহরটা ঘুরে দেখে আসি, সব ঠিক আছে কি না। চন্দন সিং!

চন্দন সিং। হুজুর!

ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম দাও। না না, তোমাকে দরকার আছে। তুমি কাউকে বল, পুলিস সাহেবকে যেন এখনই একবার আসতে বলে। আর তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস।

চন্দন সিংএর দ্রুত প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তা। জজ সাহেব, চলুন, শিগগির যাওয়া যাক। না জানি কি বিপদ ঘটবে!

জজ। আপনার আবার বিপদ কি? রুগীগুলোর বিছানাপত্তর একটু ফিটফাট ক'রে রাখবেন, তা হ'লেই চলবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। বিছানাপত্তর! কি যে বলছেন! সমস্ত বাড়িটায় এমন দুর্গন্ধ যে, নাকে কাপড় না দিয়ে ঢোকা যায় না।

জজ। আমি দিব্যি নিশ্চিন্ত আছি। আজ পনরো বছর এখানে জজিয়তি করছি, এই পনরো বছরে সেরেস্তা এমনই দুরস্ত ক'রে রেখে দিয়েছি—

দাতব্য-কর্ত্তা। যদি কোন নথি দেখতে চায়?

জজ। দেখতে চাইলেই হ'ল! খুঁজেই পাবে না। আরও পনরো বছর লাগবে নথি খুঁজে বের করতে। তা স্বয়ং বেদব্যাসের অসাধ্য।

(জজ, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাষ্টার, পোষ্টমাষ্টারের প্রস্থান ; চন্দন সিংএর প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার গাড়ি তৈরি?

চন্দন সিং। হাঁ হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, চল ; না, দাঁড়াও। আর সকলে কোথায়? পুরন্দর সিং? পুরন্দর সিংকে আনতে ব'লে দিলাম।

চন্দন সিং। পুরন্দর সিং, পুলিস-ফাঁড়িতে। কিন্তু হুজুর, তাকে দিয়ে কাজ হবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন?

চন্দন সিং। হুজুর, সে দারু পিয়ে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে আছে। দু বালতি জল তার মাথায় ঢালা হয়েছে, তবু হুঁশ হয় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! ভগবান, রক্ষা কর। তুমি শিগগির ফাঁড়িতে যাও। না না, আগে ঘরের মধ্যে থেকে আমার নতুন টুপিটা নিয়ে এস। বলরামবাবু, চলুন, যাওয়া যাক।

ঘনরাম। চলুন, আমিও যাচ্ছি, রায় বাহাদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, এত লোক গেলে সবাই সন্দেহ করবে, আর গাড়িতেও জায়গা নেই।

ঘনরাম। কিছু ভাববেন না, জায়গা এক রকম ক'রে হয়ে যাবে। না হয় গাড়ির পেছন পেছন ছুটে যাব। মোট কথা, ওখানে কি রকম কি হয় দেখতেই হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [চন্দন সিংকে] শিগগির যাও। পাহারাওয়ালারা কোথায়? পাহারাওয়ালারা প্রত্যেকে একখানা ক'রে রাস্তা নিয়ে ঝাঁটাগুলো সব সাফ ক'রে ফেলুক, মানে ঝাঁটা নিয়ে, পথগুলো সব সাফ করতে শুরু ক'রে ফেলুক। বিশেষ ক'রে কানাইবাবুর হোটেলের দিকটা। আর চন্দন সিং, দেখ, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আমার চোখ সব দিকে আছে। যা সয় সয়, তাই নিও। তুমি জমাদার, কিন্তু ঘুষ নেবার বেলায় যেন দারোগা। অতটা ভাল নয়। শিগগির যাও।

(পুলিস সাহেবের প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। এই যে পুলিস সাহেব, অন্তর্দ্ধান করেছিলেন কোথায়? এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

পুলিস সুপার। কি ব্যাপার সার্?

ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতা থেকে সেই অফিসার এসে পৌছেছেন। এদিকের কি ব্যবস্থা করেছেন?

পুলিস সুপার। আপনার হুকুমমাফিক পঞ্চুলাল পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পথ ঝাড়ু দিতে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। ডুলবাজ খাঁ কোথায়?

পুলিস সুপার। সে গিয়েছে আগুন নেবাবার বালতিগুলো নিয়ে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর পুরন্দর সিং মদ খেয়ে প'ড়ে আছে ?

পুলিস সুপার। হ্যাঁ সার্।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন এমন হয় ?

পুলিস সুপার। ভগবান জানেন। নতুন পাড়ায় দাঙ্গার খবর পেয়ে তাকে পাঠাই, যখন তাকে ফিরিয়ে আনা হ'ল, একদম বেহুঁশ।

ম্যাজিস্ট্রেট। এক কাজ করুন। পঞ্চুলাল খুব লম্বা-চওড়া আছে, ওকে একটা নতুন পোশাক পরিয়ে চৌমাথার ওপরে দাঁড় করিয়ে দিন। চমৎকার দেখাবে। হ্যাঁ, দেখুন, বাজারের মধ্যেকার ওই পুরনো পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ওখানে গোটা কয়েক ঝাঁটা-বাধা বাঁশ খাড়া ক'রে দিন, মনে হবে, যেন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। চারদিকে যত ভাঙাচোরা দেখা যাবে, শহরের অথরিটিদের তত বেশি অ্যাকটিভ মনে হবে। বুঝলেন ? কিন্তু সর্ব্বনাশ, ওই পাঁচিলটা ভাঙলেই যে এদিক থেকে আবার আবর্জ্জনার গাদা দেখা যাবে! ও গাদা সরানো তো একদিনের কর্ম্ম নয়। সত্যি, শহরটাতে কি দুর্গন্ধ! আর লোকেরই বা কি অভ্যাস! শহরের মধ্যে কোথাও একটুখানি 'পার্ক' করা হয়েছে কি সবাই সেখানে আবর্জ্জনা ফেলতে আরম্ভ করে। একটা মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে কি দেখতে দেখতে তার গলা অবধি আবর্জ্জনায় ডুবে যায়। আমরা সকলে আস্ত থাকতে এত আবর্জ্জনাই বা পায় কোথায় ?

আর দেখুন, অফিসার যদি কোন পুলিসকে জিজ্ঞেস করে, সে খুশি কি না ? অমনই যেন বলে, খুব খুশি হুজুর। কেউ যদি সত্যিই খুশি না থাকে, তবে পরে তাকে খুশি ক'রে দেব।

(টুপি ভাবিয়া টুপির বাক্সটি তুলিয়া লইল)

এখন ভগবানের ইচ্ছেয় সব ভালয় ভালয় চুকে গেলে হয়। দোহাই মা কালী, জোড়া পাঁঠা দেব। তারপরে বেটা দোকানদারদের কাছ থেকে দশ জোড়া পাঁঠার দাম আদায় ক'রে নেব। একবার অফিসার চ'লে যাক, তারপর দেখা যাবে। চলুন বলরামবাবু।

(টুপির বদলে টুপির বাক্সটি মাথায় পরিবার চেষ্টা)

পুলিস সুপার। ওটা টুপির বাক্স, টুপি নয়।

ম্যাজিস্টেট। [বাক্স ফেলিয়া দিয়া] টুপি নয় তো নয়, গোল্লায় যাক।

দেখুন, অফিসার যদি জিজ্ঞাসা করেন, নতুন হাসপাতাল কেন গড়া হয় নি, পাঁচ বছর আগে টাকা দেওয়া হয়েছে, বলবেন যে, গড়া হয়েছিল, হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে। আমি সেই রকম রিপোর্ট পাঠিয়েছি। কেউ যেন ব'লে না ফেলে যে, বাড়িটা তৈরিই হয় নি। হ্যাঁ, আর দেখুন, ডুলবাজ খাঁকে বলবেন [ঘুষি দেখাইয়া] ওটা যেন বেশি না চালায়। যত লোক ফাঁড়ি থেকে বেরোয়, সকলের মুখে কালশিরে। অফিসারের চোখে না পড়লে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। চলুন ঘনরামবাবু। [ফিরিয়া আসিয়া] আর দেখুন, কন্‌স্টেব্‌লরা যেন পোশাক প'রে তবে বেরোয়। কারও খালি পা, কারও পায়ে পট্টি নেই! ভগবান, কি যে তোমার মনে আছে, কে জানে!

সকলের প্রস্থান

(ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী বনমালার প্রবেশ, সঙ্গে তাহার কন্যা কমলা)

বনমালা। কোথায় গেল সব? মাগো, আর তো পারি নে। কেউ নেই এখানে! [কমলার প্রতি] তোমার জন্যেই এই বিপদটা হ'ল। যত বলি তাড়াতাড়ি এস, ওরা সব গেল। না, 'মা, ব্রোচটা লাগিয়ে নিই, মুখে একটুখানি পাউডার—'! নাও, এখন সব গেল।

কমলা। আমার কোন দোষ নেই মা। দিদির জন্যেই তো দেরি হ'ল।

বনমালা। একবার দেখব সেই মা-মরা ডাইনি ছুঁড়ীকে। পাউডার, স্নো, পমেটম। যেন তার বর এসেছে। ওই তো দাঁড়কাকের মত চেহারা। [জানালায় উঁকি দিয়া] ওগো, শুনছ? কোথায় চললে তুমি? এসেছে নাকি? গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর? গোঁফ আছে তো? কত বড় গোঁফ?

ম্যাজিস্ট্রেটের স্বর। শিগগিরই ফিরে আসছি। তোমরা থাক।

বনমালা। শিগগির ফিরে আসছি ব'লে আমাকে ভোলানো চলবে না। বলা নেই, কওয়া নেই, অমনই চলল! গোঁফ আছে কি না ব'লে গেলেও তো হ'ত! এসব তোমার দোষ। মা, এক মিনিট সবুর কর পিনটা গুঁজে নিই!

কমলা। আমি বলতে যাব কেন? দিদি তো বললে।

(রমলার প্রবেশ)

রমলা। এসেছে নাকি?

বনমালা। হ্যাঁ, তোমার বর এসেছে। হয়েছে তোমার পিন-গোঁজা আর

স্নো-মাখা? পোস্টমাস্টারকে দেখলেই তোমার সাজ করবার কথা মনে পড়ে যায়! তোমাকে দেখলে যে সে মুখ ভেঙচায় তা কি চোখে পড়ে! তবু হ'ত যদি কমলা!—আর ওদিকে উনি হটহট ক'রে চলে গেলেন! গোঁফ আছে কি না ব'লে গেলেও কতকটা হ'ত।

কমলা। দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই সব জানতে পারা যাবে মা।

বনমালা। চমৎকার! কি বুদ্ধি! দু-এক ঘণ্টা! তবু ভাল যে, বল নি দু-এক মাসের মধ্যে। [জানালায় উঁকি মারিয়া] ঝিটা গেল কোথায়? ওই যে! ও মিছরি, মিছরি, শহরে কেউ এসেছে খবর পেয়েছিস? পাস নি? তা জানবি কি ক'রে? কেবল ছোঁড়াগুলোর পেছনে পেছনে ঘোরা, কাজের কথা জানবার কি আর সময় আছে? যা না, ওদের পেছনে পেছনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছুটে যা। সব জেনে আসতে হবে কিন্তু। দরজার ফাঁক দিয়ে সব শুনবি। কি রকম দেখতে? চোখের রং কটা, না কালো? আর সবচেয়ে লক্ষ্য করিস, গোঁফ আছে কি না। ছোট ছোট, দৌড়ে যা, লক্ষ্মী!

(চীৎকার করিতে লাগিল)*

ক্রমশ

প্র. না. বি.

বলিদান

আমি যেন ভাই হই শেষ-বলিদান,
আমারই রক্তে ব্যথিতা ধরার হউক মুক্তিস্নান।
শৃঙ্খল-বাঁধা পীড়িত মানুষ ক্ষমাহীন দিনে রাতে,
নিরুপায় যারা জাগে ভাই যত অপমান নিয়ে মাথে,
দুঃখ-রাতের বর্ষা-ধারায় যার আঁখিজল মেশে,
আমি নেব ভাই হেসে,
তাহাদের যত চিন্তার বোঝা আমার স্কন্ধে তুলি
সকল দুঃখ, সকল যাতনা ভুলি ;—
আমার আত্মদান,
পীড়িত ব্যথিত মানবাত্মার ক্ষোভের করুক ত্রাণ।

* বিখ্যাত রুশ-লেখক Gogol-এর উক্ত নামধেয় নাটকের অনুবাদ।

জেনেছি; জেনেছি, মৃত্যুরে ভয় নাই—
মৃত্যু-তিমিরে জীবনের আলো লুকায়ে রয়েছে ভাই।
তাই তো দিনের শেষে,
অরুণ তপন ডোবে আঁধারের দেশে,
সঞ্চয় করে বিত্ত সেথায় সুদীর্ঘ শর্বরী,
শেষে নবরূপ ধরি—
সোনার কিরণে পূর্ব গগন প্রভাতে দেয় সে ভরি।
একটি জীবন-সমাধি রচিয়া জানি,
বাঁচায়ে রাখিব নানা জীবনের বহু পরাণের বাণী ;—
দুর্য্যোগ যদি ঘিরে ধরে কভু, তুমি থেকো ভাই ধীর,
আমি আছি, দিব বাড়ায়ে আমার অখ্যাতনামা শির ॥
যদি কেহ মোর তরে
প্রথম প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া ধরে,
যদি কেউ ভাই মালা গেঁথে রাখে আমার মিলন-আশে,
ভুল ক'রে কেউ যদি মোরে ভালবাসে ;
আমার মরণে নয়ন তাহার যদি ভ'রে ওঠে জলে ;
হৃদয়ের বনতলে,
পাতায় পাতায় বিচ্ছেদ-গান মর্মরি যায় চ'লে ;—
—সে কালো-আঁখিরে ব'লো ভাই শুধু ব'লো,
এ বিদায়ে শুধু আরো মহীয়ান মিলন-সূচনা হ'ল।
সেথায় বাতাস আরো মন্থর শস্তের সৌরভে,
প্রাণ-জয়-গৌরবে,
সেখানে আমি তো একটি হৃদয়ে নই,
শত-হৃদয়ের ছায়ায় ছায়ায় আমি বহু হয়ে রই।
আজি বসন্ত রাত্রে প্রিয়ার চুম্বন যদি বৃথা,
অন্তরে জ্বলে ব্যর্থ-প্রেমের চিতা,—
যদি কাঁদে শুকতারা,
আমার সহসা-বিদায়ে তাহার নামে অশ্রুর ধারা,—
ব'ল তারে ভাই, আমি হই নাই মিছে,
অজানা-দেশের পাখীর কণ্ঠ মোর গানে মুখরিছে ;
রুদ্ধ জীবন-স্রোতের আমি যে খুলে দিয়ে যাই বাঁধ,
আগত-প্রাতের ভৈরবী গাই—আমি রাত-জাগা চাঁদ ॥

শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার

হিন্দী সাহিত্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা একটু সন্ধান রাখেন, তাঁরা এ কথা স্বীকার করবেন যে, বর্ত্তমান যুগে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য একমাত্র বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষা অধিক উন্নত ও প্রগতিশীল। বাংলা-সাহিত্যকে এইজন্যে শ্রেষ্ঠতর আসন দিলাম যে, আমার মতে, এ পর্য্যন্ত হিন্দী-সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-মহারথী অবতীর্ণ হন নি। কিন্তু তাই ব'লে ভবিষ্যতে যে অবতীর্ণ হতে পারেন না, তা বলা যায় না, কারণ সমগ্র ভারতব্যাপী বিশাল ক্ষেত্রে যে কোনদিন তা সম্ভবপর হতে পারে।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ও বিস্তার এত দ্রুত ও এমন আকস্মিক যে, তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিকতম যুগ পর্য্যন্ত এর আলোচনা করা সম্ভব হবে না এবং তা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলব।

হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হয়েছে ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই সময় থেকেই গদ্যযুগ আরম্ভ হয়, তাহার আগে পদ্য-রচনারই যুগ ছিল। যদিও রাজা লক্ষ্মণ সিংহের সময় থেকেই হিন্দী গদ্যের ভবিষ্যৎ রূপরেখার একটি আভাস পাওয়া যায়, তবুও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকেই বর্ত্তমান গদ্যযুগের প্রবর্ত্তক ব'লে ধরতে হবে। কারণ তাঁর পূর্ব্বে ব্রজভাষার কবিতার যুগই চ'লে আসছিল। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এক দিকে যেমন গদ্যের ভাষাকে মার্জ্জিত করতে থাকেন, অপর দিকে তেমনই হিন্দী সাহিত্যকে নতুন পথও দেখিয়ে দেন। তাঁর এই ভাষা-সংস্কারের প্রভাবে হিন্দী সাহিত্যে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশী থেকে জগন্নাথ-পুরীর পথে বাংলা দেশে উপস্থিত হন, সেই সময় বাংলা ভাষায় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক-উপন্যাসাদি দেখে হিন্দী সাহিত্যে তার অভাব অনুভব করেন। এর তিন বছর পরেই তিনি বিদ্যাসুন্দর নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদে তিনি হিন্দী ভাষার একটি সুন্দর ও নূতন রূপের আভাস দেন। এই বছরেই তিনি কবিবচনসুধা ও চন্দ্রিকা নামে দুখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সেই সূত্রে একদল নূতন কবি ও লেখক সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। হিন্দী গদ্যসাহিত্যের এই আরম্ভকালে সেই সময় যে কজন অল্প-সংখ্যক সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, তাঁরা সকলেই সজীব ও মৌলিক ভাবাপন্ন। হরিশ্চন্দ্রের জীবনকালেই লেখক ও কবিদের একটি প্রবল দল গঠিত হয়ে ওঠে, এবং তাঁরা সকলে মিলে হিন্দী সাহিত্যের এই নতুন অভিযানে যাত্রা করেন।

এর পরই আধুনিক পদ্ধতিতে নাটক-উপন্যাসাদি রচনা আরম্ভ হয়। স্বয়ং ভারতেন্দু কতকগুলি নাটক-নাটিকা রচনা করেন ও লালা শ্রীনিবাস দাস পরীক্ষাগুরু নামক উপন্যাস রচনা করেন। তারপর, বঙ্গবিজেতা, দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, ইন্দিরা প্রভৃতি উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়।

এই রকমে ভারতেন্দুর সময় থেকেই হিন্দীর সাহিত্য-নির্ম্মাণকার্য্য চলতে থাকে, কিন্তু তখন প্রচার ও প্রসারে অনেক বাধা ছিল ব'লে তার স্রোত তেমন দ্রুত গতি লাভ করতে পারে নি। আদালতে তখন হিন্দীর কোন স্থান ছিল না এবং সাধারণ কাজেও লোকে হিন্দী লিখতে লজ্জাবোধ করত। ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ নিজের মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখাতেন এবং যাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করতেন, তাঁদের উপহাস করতেন। তখন বিদ্যালয়ে হিন্দীর নামগন্ধ মাত্রও ছিল না; এমন কি পাঠশালাকে মদরসা বলা হ'ত। কাজেই তখন হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য খুব বেশি প্রসার-লাভ করে নি।

এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ ক'রে, হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা প্রাচীন অজ্ঞাত কবিদের লেখা সংগ্রহ ক'রে, তাঁদের জীবনী সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। হিন্দী-শব্দসাগর নামক সুবৃহৎ অভিধান প্রকাশ করেন। এইরূপ নানা উপায়ে এই সভা হিন্দী ভাষার সেবা ক'রে হিন্দী সাহিত্যকে লোকচক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এর পরে হিন্দী সাহিত্যের উত্থানের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার 'প্রবাসী' পত্রিকা তখন এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। ওই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরণায় ইণ্ডিয়ান প্রেসের সত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ আচার্য্য পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের সম্পাদনায় সরস্বতী নামক হিন্দী মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এই বাঙালী-পরিচালিত ইণ্ডিয়ান প্রেসের নিকট হিন্দী সাহিত্য চিরকাল ঋণী থাকবে।

এই সময় হিন্দী ব্যাকরণের ব্যতিক্রম ও ভাষার অস্থিরতা নিয়ে অনেক বাদপ্রতিবাদ চলতে থাকে এবং পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীই তার নিষ্পত্তি ক'রে দেন। দ্বিবেদীজী সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ন্যায় নানা বইয়ের সমালোচনা ক'রে নানা দোষত্রুটি দেখান। এই সময় থেকেই হিন্দীতে উচ্চ সাহিত্যের সৃষ্টি হতে থাকে। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে পুরাণকথা, কাব্য, সিদ্ধান্ত, নীতি, শিক্ষা বিষয়ক নানা গ্রন্থের সুন্দর ও সহজ রূপান্তর হিন্দীতে করেন। বর্ত্তমান হিন্দী গদ্য-নির্মাণ-কার্য্যে তাঁর চমৎকার হাত ছিল এবং আজও তার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এক কথায়, তিনি হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য এমন কাজ নেই যা করেন নি।

তারপর অনুবাদ-যুগ আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রায় সমস্ত নাটক, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী' 'চোখের বালি', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক কাব্য উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশী বিদেশী নানা ভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিন্দীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই রকমে হিন্দী সাহিত্য উন্নতি লাভ করে।

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী সাহিত্যের অতি-আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রেমচাঁদের উদয় হয়। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে লোকচরিত্র, গ্রাম্যচিত্র, সমাজচিত্র এমন ভাবে ফুটে ওঠে যে, পাঠকের মন সহসা জেগে উঠল আর সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করল। এক কথায়, বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের যে স্থান, তাই তিনি লাভ করলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর শেষ দান 'গোদান' উপন্যাস পাঠককে উপহার দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা এখন খুবই আশাপ্রদ ও প্রগতিশীল। চারদিক থেকে উৎসাহ দানেরও কোন ক্রটি নেই। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন প্রতি বৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থনির্ম্মাণের জন্য বারো শো টাকার মঙ্গলাপ্রসাদ-পুরস্কার দিয়ে আসছেন। ওরছার মহারাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের জন্য দু হাজার টাকার পুরস্কার দিচ্ছেন। মহিলা লেখিকাদের জন্য পাঁচ শো টাকার সেকসেরিয়া-পুরস্কারও দেওয়া হচ্ছে। এ রকম পুরস্কারের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়ছে। ফলে, প্রতি বৎসর বহু বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য গ'ড়ে উঠছে। সুতরাং, হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা যেমন আশাপ্রদ ও প্রগতিশীল, ভবিষ্যৎও তেমনই উজ্জ্বল।

সর্ব্বশেষে, যে কথাটি বলার লোভ আমি সামলাতে পারছি না তা এই যে, বাংলা সাহিত্যে বাইরের মধ্যে কেবল বিদেশী সাহিত্যেরই প্রভাব পড়েছে, কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে বিদেশী ছাড়াও, বাংলা, গুজরাতী, উর্দ্দু, মারাঠী, তেলেগু প্রভৃতি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার সাহিত্য থেকে আবশ্যক ও সারযুক্ত কিছু-না-কিছু নিয়ে আপনাকে স্বাস্থ্যবান ও বলবান ক'রে নিতে সমর্থ হয়েছে। বাংলা সাহিত্য যেন ভাদ্র মাসের ভরা গাঙ, হিমালয় থেকে নেমে সমান বেগে গভীর হয়ে চলেছে, আর, হিন্দী সাহিত্য যেন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাকে আপনার দিকে টেনে এনে নিজেকে সমুদ্র করবার স্বপ্ন দেখছে।

শ্রীধন্যকুমার জৈন

মৃত্যু

হে অব্যক্ত, ব্যক্তে তুমি ধরিতে চাহিছ অবিরাম,
চলে ধরাধরি খেলা, মৃত্যু মাত্র তার পরিণাম।

আখেরী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অমূল্য বললে, খবরদার! মরা কাক ছুঁয়ে এলি, কিছু নাড়বি না তুই। বেরো বলছি, বেরো।

ওপারের ময়রার দোকানের কারিকর বললে, জাত গেল তোর। গঙ্গাচান ক'রে আয় গিয়ে।

ভদ্রলোক খদ্দেরটি হেসে বললে, কলে হাত ধুয়ে ফেল্ ভাল ক'রে।

দোকানের সামনেই জলের কল, গুপে সেইখানে কলের হাতলটা টিপে ধ'রে চান করতে ব'সে গেল। স্নান ক'রে ভিজে গায়ে ভিজে কাপড়েই এসে অমূল্যকে বললে, লে। হ'ল তো ইবার?

অমূল্য বললে, এই এই! কাপড় নিংড়ে ফেল্। এই এই!

গুপের সেদিকে গ্রাহ্য নাই, সে বললে, দে, দোকানীদের চা দিয়ে আসি। দেরি হয়ে যেছে।

ভদ্রলোকটি বললে, মুছে ফেল্ রে গা-হাত, অসুখ করবে।

উঁহু! ব'লেই সে অমূল্যকে ধমক দিয়ে বললে, দে না দোকানীদের চা।

অমূল্য একখানা ট্রের উপর চারটে কাপে চা ঢালছিল, দুধ চিনি মিশিয়ে দেবার জন্ম চামচে দিয়ে নেড়ে, ট্রেটা হাতে দিয়ে বললে, তুমি মর বাচ তাতে কিছু যায় আসে না, দোকানে যে কাদা হয়ে গেল কাপড়ের জলে।

মুছে দিব। গুপে চায়ের ট্রে হাতে চ'লে গেল ময়রার দোকানে।

ওই ব'য়ে দেওয়ার জন্ম সে দোকানীর কাছে কাক-ভোজনের অচল বাসী খাবারের একটা ভাগ পায়। চায়ের ট্রেটা নামিয়ে দিয়ে গুপে বললে, দাও।

হুঁ, দেব! বেটা শয়তান কোথাকার, নিজে তো ঘিয়ের খাবার খাস না, কাকে দিবি তাই বল্? নইলে দেব না।

সি একজনা আছে—দিব একজনাকে।

কাকে?

দিব। সি একজনা বটে।

অমূল্য হাঁকলে, কাজলামি করিস নি ওখানে। খদ্দের আসছে। গুপে!

বাসী খাবারের ঠোঙা হাতে ক'রে গুপে এক ছুটে এসে দোকানে ঢুকল, এক কোণে রেখে দিলে ঠোঙাটা।

অমূল্য সেই ভদ্রলোকটিকে বলছিল, উ মরবে! আজ্ঞে না। কিছু হবে নি ওর। গেল সালের ঝড়ে ওর মা মরেছে দেওয়াল চাপা। দুর্ভিক্ষে বাপ মরেছে। নিজে—

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললে, মা বাপ নাই ওর?

উত্তর দিলে গুপে, ভদ্রলোকের পাশের লোকটির সামনে চায়ের কাপ কেকের ডিশ নামিয়ে দিয়ে বার দু-তিন ক্ষিপ্রভাবে ঘাড় নেড়ে দিলে।

কোথায় বাড়ি তোর ?

উচ্ছিষ্ট কাপ-ডিশগুলো গুছিয়ে তুলছিল গুপে, বললে, হুই, সেই মেদিনীপুর জিলা। সেই বহুলিয়া গাঁ আছে !

বহুলিয়া ?

হুঁ। দেবপাল পোষ্টাপিস বটে।

হুঁ। ঝড়ে তোর মা মারা গেছে ?

কাপ-ডিশগুলো নিয়ে ততক্ষণে গুপে জলের ট্যাপের নীচে রেখে কল খুলে ধুতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। হাতের কাপের বিরাম দেয় না। কাজ করে আর কথা বলে। এবার কিন্তু তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সবিস্ময়ে সে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কি বলছেন ?

বললে অমূল্য, ঝড়ে তোদের ঘর উড়ে—

উঁহু। ঝড় নয়, হাওয়াতে বটে।

হো-হো ক'রে হেসে উঠল খদ্দেরের দল। গুপে সবিস্ময়ে শুধু একবার তাকিয়ে দেখলে, বুঝবার চেষ্টা করলে, হাসির কারণটা কোথায়। তারপর কাপ-ডিশের গোছা নিয়ে এসে নামিয়ে দিলে অমূল্যর টেবিলের উপর। বললে, হাসিস না ক্যাকক্যাক ক'রে। কাজ কর্। ব'লেই সে ন্যাতা নিয়ে ভিজে মেঝেটা মুছে ফেলে, হাত ধুয়ে ফেলে, বইতে আরম্ভ করলে চা-ভর্ত্তি কাপগুলো, যেগুলো ইতিমধ্যে অমূল্য তৈরি ক'রে ফেলেছিল।

ভদ্রলোকটির বোধ হয় কৌতূহল হয়েছিল, এবং ভদ্রলোক হয় বেকার, নয় পয়সা আছে, সে আবার টেনে নিলে নতুন এক কাপ চা। খপ ক'রে গুপের হাতখানা ধ'রে বললে, হাওয়াতে তোদের ঘর উয়ে গেল, তোর মা চাপা পড়ল, তুই বাঁচলি কি ক'রে ?

অত্যন্ত সহজভাবে গুপে বললে, কেনে, হাওয়াতে চালটো উড়ে গেল, উঠানে একটো গাছ ছিল, সিটাতে ঠেকা খায়ে পড়ল মাটিতে, আমি ছুটে গিয়ে ঢুকলম সিটার ভিতরে, আমার পাছু পাছু বাবা এল, মা আসবার মুখে ঘরের ভাল ভেঙে পড়ল।

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সে এঁটো কাপ গুছতে আরম্ভ করলে। অমূল্য বললে, জল আন্। গুপে !

গুপে ছুটল বালতি নিয়ে। কলের নীচে বালতি পেতে কল টিপে ধ'রে তাকিয়ে দেখছিল সামনের পানের দোকানের আয়নাটার দিকে। হাসছিল আপনার মনে। মধ্যে মধ্যে খালি হাতখানা বুলোচ্ছিল আপনার মুখে কতকগুলো বসন্তের ক্ষতচিহ্নের উপর।

জলের বালতিটা নামিয়ে নিয়েই সে আবার এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। পকেট থেকে একটা ভাঙা চিরুনি বার ক'রে অত্যন্ত দ্রুত টেরি কেটে নিল।

অমূল্য হাঁকছে ভিতর থেকে, গুপে! এই গুপে!

হুঁ, যাচ্ছি।

গেলি কোথায়?

যাচ্ছি।

তোমার পেটে লাথি মারব আমি। দত্তশীলের দোকানে চা দিতে হবে না?

গুপে ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল ফুটপাথের উপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গিয়ে দাঁড়াল অমূল্যর কাছে।

দত্তশীলের দোকান কয়েকখানা দোকানের পরেই। গুপে বেরুচ্ছিল সেখান থেকে। সেই ভদ্রলোক তাকে বললে, দাঁড়া।

উঁহু, কাজ আছে। অমূল্য শালা বকবে।

তোর বাবা দুর্ভিক্ষে ম'রে গেছে?

উঁহু। আকালে মরেছে বাবা। চাল ছিল নি, কিছুই খেতে মিলত নি। যা পেত বাবা আমাকে খাওয়াত, নিজে খেত নি। তাথেই ম'রে গেল।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেল। একটু অবিশ্বাসও হ'ল। ছেলেটা কথাগুলো বলছে যেন উপকথা বলছে; "আমার কথাটি ফুরুলো নটে গাছটি মুড়লো।"

গুপেই বললে, একদিন রাখালকাকার বাড়ি গিয়েছিলম খাবার তরে। অ্যানেকক্ষণ পরে খেতে দিলে। ফিরে এসে দেখলম, বাবা ম'রে প'ড়ে আছে। রা কাড়ে না, কাঠের পারা শক্ত হয়ে গিয়েছে।

তারপর?

তারপরে? তারপরে চ'লে এলম কলকাতাকে।

কার সঙ্গে এলি?

কত লোক এল। তাদের সঙ্গে এলম। আঠারো কোশ হাঁটলম। পা দুটো এই ফুলে গেল। জর হ'ল, গুটি বেরুলো। সেই একটো গাঁয়ে প'ড়ে থাকলম। তারপর আবার হাঁটলম। শেষে রেলগাড়িতে চড়লম। চ'লে এলম কলকাতা।

ছুটে চ'লে যাচ্ছিল গুপে। ভদ্রলোক ডাকলে, শোন্ শোন্। এই নে দু আনা পয়সা নে।

গুপীনাথ মহা খুশি। পয়সা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বললে, কি বলছেন বলেন?

কে আছে দেশে তোর

একটু ভেবে গুপে বললে, ভাঙা ঘরটো আছে, দুটো গাছ আছে উঠানে, তিন বিঘা জমি আছে।

আপনার লোক কে আছে ?

সি রাখালকাকা আছে। তা সি কাকা বটে, আপনার নোক লয়।

গুপে! গুপে! ওরে শূয়ার! সয়তান কোথাকার! গুপে কিন্তু চঞ্চল হ'ল না, হেসে বললে, অমূল্যা হাঁকাড়ছে, আমি যাই।

ভদ্রলোকটি চেয়ে দেখলে, অমূল্য দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকছে। গুপী যেতেই সে তার মাথায় বসিয়ে দিলে একটা চাঁটি। গুপে চীৎকার ক'রে উঠল, মারিস না, হাতের কাপ-ডিশ প'ড়ে যাবে, ভেঙে যাবে।

চায়ের দোকান সরগরম হয়ে উঠেছে গল্প-গুজবে—খবরের কাগজ যুদ্ধ, ইংল্যাণ্ড, অ্যামেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীনতা, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী, দুর্ভিক্ষ মড়ক।

গুপে কাজ ক'রে যায়। কাজ করার ক্ষমতা ওর অদ্ভুত। যে কাজগুলো বাকি পড়েছিল, সেগুলো ক্ষিপ্র হাতে নিপুণতার সঙ্গে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সেরে ফেললে। ওদিকে মড়ক থেকে বোমা এসেছে আসরে। একজন উত্তেজিত হয়ে বললে, এর চেয়ে বোমায় মৃত্যু ভাল। একবারে একমুহূর্তে মরে মানুষ।

গুপী এগিয়ে এসে লম্বা টেবিলের ধারে দাঁড়ায়, ঘাড় নাড়ে, না—না—না।

সকলে অবাক হয়ে যায়। ছোঁড়াটা বলে কি ? গুপে বলে, আমি দেখেছি আজ্ঞা। উ রে বাবা রে!

দেখেছিস ?

গুপীর চোখ বড় হয়ে উঠে, সে আকাশের দিকে চায়, বলে, সেই দিনে, খিদিরপুরে, হুই জাহাজ-ঘাটায়, উঃ বাবা রে! ছেত্তরে গেল মানুষগুলান, এমন কুটিকুটি ক'রে মাছ কুটে না মানুষ। কি আওয়াজ! উ রে বাবা রে! আগুন, ধুঁয়া, বাবা রে!

তুই ছিলি সেখানে ?

হাঁ, দেশ থেকে এসে হোথা গিয়েছলম। কাজ করতম। বারো আনা পেতম দিন। বাবা রে! মড়ার গাঁদি লেগে গেল! নরিতে ক'রে নিয়ে গেল। বাবা রে! পালিয়ে এলম। ছুটু ছুটু হুই সাদা ঝকঝকে, পাখীর-মতন ঝাঁক বেঁধে এল, বাবা রে!

লোকে অবাক হয়ে যায়। অমূল্য বলে, তুই মরলি না কেন ?

গুপী হাসতে আরম্ভ করে। বলে, ভেঁপু বাজতেই আমি পালায়েছিলম। খালের ভিতরে লুকালম, হেঁই গুটিসুটি মেরে চুপ ক'রে পড়েছিলম। তারপরে, আমি যেন হেথা আর উই—উইখানে পড়ল বোমা। বাস্, দাঁতি লেগে গেল আমার। তা বাদে উঠলম যখন, তখন এই মড়া ওই মড়া—হাত পা, কুটিকুটি, রক্ত, আগুন, ধুঁয়া।

সমস্ত ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে যায়। গুপী বলে, চৌপর দিন আমি কেঁদেছিলম, খেতে লেরেছিলম তিন দিন, ঘুমুতে নারতম। গুপী এর পর উদাস হয়ে যায়। চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

জলদি এক কাপ চা। ঘরে ঢুকল একজন শিখ বাস-কণ্ডাক্টার।

চমক ভাঙল অমূল্যর। সে উনান থেকে তুলে নিলে গরম জলের কেৎলি। শিখটি ব'লে উঠল, আরে গোপীয়া! তুম হিঁয়া আ গেয়া?

গুপী তার মুখের দিকে চেয়ে হাসলে, বললে, পাঁইজী! রাম-রাম রাম-রাম পাঁইজী! হিঁয়া কাম করতা হামি আজকাল।

বাসমে আওর কাম করবি না? শিখ বসল।

অমূল্য অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, বাসেও কাজ করেছিস নাকি?

গোপী হাসে। তাড়াতাড়ি সম্ভ্রম ক'রে চায়ের কাপ নিয়ে শিখের সামনে নামিয়ে দিয়ে অমূল্যকে বলে, হাঁ। শ্যামবাজার, কালিঘাট, মৌলালী, গোলতালাও, এসপ্ল্যানেড, আলিপুর, খিদিরপুর—তিন নম্বর—তিন নম্বর।

ভাগলি কেঁও রে তু? অ্যাঁ?

জ্বর হ'ল যি! তুমরা যি বললে, হাসপাতালে যা! পথের ধারে আমি শুয়েছিলম, আমাকে নিয়ে গেল নরিতে তুলে, কাঙালীদের হাসপাতালে।

কাঙালীদের হাসপাতালে! ডেষ্টিচুটদের মেডিকেল রিলিফ সেণ্টারে!

গুপী কথার সবটা বুঝতে পারে না। নিজের কথাই সে বুঝিয়ে বলে, সে পুলিসে নরিতে ক'রে ধ'রে নিয়ে যেছে। সেই কাঙালীদের হাসপাতালে! সেই সেথাকে।

হুঁ, হুঁ। তাতেও মর নাই তুমি? কথাটা শুনে সকলে মুচকে হাসে।

গুপী গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, না। চার দিন বাদে সেথা থেকে পালায়ে এলম। সনঝের সময়ে, চুপিচুপি। হঠাৎ সে থেমে যায়। কাজে মনোযোগী হয়ে উঠে।

শিখটি উঠে যাবার সময় গুপীকে ডেকে একটা আনি দিয়ে যায়। শিখের বদান্যতার ছোঁয়াচে আর দুজনে দেয় দুটো ডবল পয়সা। একজনে দিলে একটা সিকি।

দুপুরবেলা। চৈত্রের সূর্য্য প্রখর হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ নরম হয়েছে, ভারী মোটরের চাকার টায়ারের দাগ বসছে। মধ্যে মধ্যে দমকা গরম হাওয়ায় কালো ধুলো উড়ছে। তার উপর ক্রুড অয়েলের ধোঁয়ায় দুপুরের রোদ কালচে হয়ে যাচ্ছে। পথ জনবিরল। বড় রাস্তায় বাস ট্রাম একটু দেরিতে দেরিতে চলছে। শুধু মিলিটারি লরির বিরাম নাই।

চায়ের দোকানের সামনে বিড়িওয়ালা পরম কৌতুকে হাসছে। মিষ্টির দোকানের কারিকর খুব বাহবা দিচ্ছে। কয়েকটা ভিখারী ছেলে ব্যগ্র কৌতূহলে অবাক হয়ে চেয়ে

দেখছে। অমূল্য এবং গুপীতে যুদ্ধ বেধেছে। অমূল্যর দাবি, গুপী যা বকশিশ পেয়েছে তার ভাগ নেবে। গুপী দেবে না। এ ঝগড়ার সূত্র অনেক দিন থেকেই হয়ে আসছে। কিন্তু এতদিন গুপীর পাওনা লোভনীয় হয়ে উঠে নাই। চার পয়সা, দু-আনা বড় জোর দশটা পয়সার বেশি সে পেত না। আজ কিন্তু তার পাওনা আট আনা ছাড়িয়ে গিয়েছে। অমূল্য বলে, দোকানে আমরা দুজনেই কাজ করি। যা বকশিশ হবে, তার ভাগ দিতে হবে। দোকানে কাজ করিস ব'লেই দিয়েছে। দোকানের খদ্দেরে দিয়েছে।

গুপী কিন্তু দেবে না। সে বলে, তু যি পনের টাকা মাইনা পাস, আমি যি মোটে পাঁচটি টাকা পাছি। তুর মাইনার ভাগ আমাকে দে। তবে দিব। দোকানের খদ্দেরে তুকে দিলে না কেনে? আমাকে দিলে কেনে?

কথা-কাটাকাটি থেকে মারামারি। গুপী বেরিয়ে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু অমূল্য দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে উনানে বাতাস দেওয়া পাখাখানা। গুপী ধরেছে উনান-খোঁচানো লোহার শিকটা। কিন্তু অসুবিধে হয়েছে, শিকটাও ছোট, তার হাতখানাও ছোট।

লম্বা হাতে অপেক্ষাকৃত লম্বা পাখার ডাঁটটা দিয়ে অমূল্য পটাপট মার চালাচ্ছে। গুপী সরছে, কখনও গুঁড়ি হচ্ছে। কখনও চেষ্টা করছে শিকটা দিয়ে অমূল্যর হাতে আঘাত করতে। যুদ্ধ চলছে নিঃশব্দে।

ওপারের মিষ্টির দোকানের কারিকর মহা উৎসাহে বাহবা দিচ্ছে। তার ভুঁড়িটা নাচছে। বহুৎ আচ্ছা, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ ভাই!

অমূল্য এগিয়ে এসে পড়েছে। এইবার ধরবে। আর উপায় নাই। কারিকর হেঁকে উঠল, ধর্ বেটাকে, ধর্। হি-হি-হি-হি!

গুপে কিন্তু অদ্ভুত। ধাঁ ক'রে সে ব'সে প'ড়ে ঢুকে গেল মালিকের বসবার চেয়ারটার তলায়। মাথাটা আটকাল কাঠের বসবার জায়গায়, চারিপাশে চারটে পায়া তার চারিদিকে রক্ষাবেষ্টনী হয়ে গেল। অমূল্যর আঘাতগুলো কাঠের পায়ায় ব্যাহত হয়ে যেতে লাগল। গুপী হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে দিতে এগুতে আরম্ভ করলে।

রাস্তায় হাসির হল্লা উঠে গেল—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ রে ভাই!

গুপী ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল অমূল্যকে। না পিছিয়ে অমূল্যর উপায় ছিল না। সংকীর্ণ ঘর, তারই মধ্যে আবার লম্বা বেঞ্চ এবং চেয়ারে ঘরখানাকে সংকীর্ণতর ক'রে তুলেছে। আশেপাশে সরবার জো নাই।

ফুটপাথে এসেই চেয়ার মাথায় দিয়েই ছুটল গুপী; কিছুদূর গিয়ে ব'সে পড়ল। চেয়ারের তলা থেকে বেরিয়েই বললে, নিয়ে যা তোর চেয়ার। সে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল

মিষ্টির দোকানের ধারে। দোকানের উনানে দেবার জন্যে কয়েকখানা ইট থাকে, তাই একটা তুলে নিয়ে বললে, আয় ইবার। আয়।

সে একবার কোমরে হাত দিয়ে দেখে নিলে গামছায় বাঁধা বাসী কচুরি-মিষ্টির গুঁড়োগুলো ঠিক বাঁধা আছে কি না, তারপর বড় রাস্তাটার এপাশ ওপাশ চকিতে দেখে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ছুটল। ব'লে গেল, করব নি আর কাজ। আর আসব নি আমি।

রাত্রি দশটা।

চায়ের দোকান বন্ধ হয়েছে। মিষ্টির দোকান বন্ধ হচ্ছে। বিড়িওয়ালার কাঠের কুলঙ্গি তালা বন্ধ। অমূল্য আর বিড়িওয়ালা চলেছে সিগারেট টানতে টানতে। গঙ্গামুখে চ'লে গেছে যে রাস্তাটা সেই রাস্তায় চলেছিল তারা। সমস্ত দিনের পর তারা চলেছে বিকৃত আনন্দের সন্ধানে। ব্ল্যাক আউটের পথ অন্ধকার।

অমূল্য হঠাৎ বললে, এই! দাঁড়া!

কি?

গুপে। ওই দেখ্। অন্ধকারের মধ্যে কালো শিলুয়েট ছবির মত ছোট একটা ছেলে কলের মুখ থেকে একটা কলসীতে জল ভ'রে নিচ্ছে। রাত্রি দশটায় জল আসে কলে। বিড়িওয়ালাও চিনলে, হ্যাঁ, গোপীই বটে।

চল্, দেখি ও কোথা যায়।

রাস্তা পার হয়ে একটা খোলা জায়গা। কর্পোরেশনের জিনিসপত্র থাকে। এখন স্লিটট্রেঞ্চ আর পাকা খিলেন শেল্টারে ভর্তি। গোপী চলেছে।

এই গুপে! চমকে উঠল গোপী। কে? অমূল্যা?

বিড়িওয়ালা বললে, কি করছিস ইখানে?

অমূল্য বললে, এইবার কি হয়?

গোপী বললে, দাঁড়া, দাঁড়া। অমূল্যা ভাই, দাঁড়া। সে ঢুকে গেল একটা খিলেন করা শেল্টারের মধ্যে। পিছন পিছন ঢুকল অমূল্য আর বিড়িওয়ালা। ছোট একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। স্বল্প আলোর মধ্যে তারা দেখলে, গোপী কলসী থেকে জল নিয়ে কাকে দিচ্ছে, কিছু করছে। তারা এগিয়ে গেল।

বিড়িওয়ালা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, পিছনে হাত দিয়ে অমূল্যর অগ্রগতি রোধ করলে। অবাক হয়ে গেল তারা। আশ্চর্য্য সুন্দর-সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে! পরনের কাপড় রক্তাক্ত, কোলের কাছে রক্তমাখা একটি সদ্যজাত শিশু। মেয়েটি নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে আছে। গোপী তার মুখে জল দিচ্ছে।

গোপী বললে, অমূল্যা, কি করব?

ও কে?

উ বুবি বটে। খোকা হইছে বুবির। কি করব ?

বুবি ? বুবি কে ?

হুঁ। বুবি, বুবি বটে উঁ।

কে রে তোর ?

কে আবার হবে! আমি সেই কাঙালীদের হাসপাতালে ছিলম, সেথা ছিল বুবি। কালা বটে, শুনতে পায় না, কথা বলতে লারে। উয়াকে লিয়ে হাসপাতালের নোকে যা তা বুলত। উ কাঁদথ। তাথেই উয়াকে লিয়ে সাঁঝবেলাতে পালায়ে এলম। এই-ঠেনে উকে নিয়ে থাকি।

ওরা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চায় বিচিত্র দৃষ্টিতে।

গোপী ব'লে যায়, বুবি বড় ভাল রে, ভারী ভাল। ভারী মায়া লাগে। তাথেই তুকে পয়সার ভাগ দিই না। উর লেগেই আনি আমি কচুরি মিষ্টি কেক। বুঝলি ? বুবিকে লিয়ে খোকাকে লিয়ে ঘরকে যাব। ঘর করব। তিন বিঘা জমি আছে। চাষ করব। বড় হব। বিয়া করব। সে থামলে। তারপর প্রশ্ন করলে, আমি এখুন কি করব অমূল্যা ?

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল ওদের দুজনের মুখের উপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সে চট ক'রে চ'লে গেল শেল্টারের মধ্যে। অমূল্য বিড়িওয়ালা দুজনে এবার ফিসফিস ক'রে কথা বলে। হঠাৎ চমকে উঠে গোপীর রূঢ় কণ্ঠস্বরে।

খুন ক'রে ফেলাব।

চকিত হয়ে দুজনে চেয়ে দেখে, দৃঢ় দৃপ্ত ভঙ্গীতে গোপী দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা লম্বা শক্ত লাঠি। গোপী বললে, লাঠির মাথায় খোঁচা লাগানো আছে, বিঁধে ফেলাব যদি এগুবি তো, হাঁ।

অন্ধকারের মধ্যে ভয়াল মনে হচ্ছে গোপীকে। ওরা দুজনে কয়েক পা পিছু হ'টে এল।

গোপী হেসে বললে, তুদের মত অনেক দেখলম আমি। পালা। পালা।

বিড়িওয়ালা অমূল্যকে বললে, আয়। কাল দেখব। আজ সব নোংরা হয়ে আছে। আয়।

* * *

পরের দিন সন্ধ্যের পর নয়, দুপুরবেলাতেই অমূল্য এল। সে আর দেরি সইতে পারলে না। কোমরে একটা ছুরি নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু শেল্টার শূন্য। কেউ নেই। গোপী তার বুবিকে নিয়ে খোকাকে নিয়ে অন্যত্র চ'লে গেছে।

অমূল্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই তার মনে পড়ল, আজ সংক্রান্তি, কাল নতুন খাতা। মালিককে হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দিতে হবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

সাহিত্যিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলাম। লোটাস-ইটার্স অথবা মিউজিক-মেকার্স বলিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া পরিত্রাণ পাইবার উপায় অন্তত বর্তমান যুগে আর নাই। দেহতত্ত্ব কিংবা ভাটিয়ালি গান লিখিয়া জনসাধারণের মন ভুলাইবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি; মহুয়া-মলুয়ার প্রেমের কাহিনীতেও আর সাধারণ মানুষের তৃপ্তি নাই। মুটে-মজুর-কামার-ছুতারের কবি বলিয়া নিজেদের উচ্চকণ্ঠে জাহির করিয়া তবে আসর জমাইতে হইতেছে, শ্রেণীসংগ্রামের ঠেলায় পড়িয়া কবি-গাল্পিকেরা গলদঘর্ম হইতেছেন, কলের বাঁশি শ্যামের পুরাতন আড়-বাঁশিটিকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আমাদের মনের সুখ হরণ করিয়াছে। মোটের উপর, আমরা মহা মুশকিলেই পড়িয়াছি। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ইতিহাস পূর্বাপর অনুধাবন করিয়া দেখিতেছি, প্রত্যেক কবির জীবনেই এই চিরদুঃস্থ মানুষের কল্যাণ করিবার, তাহাদের সুখদুঃখের কথা লিখিবার, নিদ্রিতকে জাগাইবার, পরাধীনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার সদিচ্ছা একবার না একবার জাগিয়া থাকে; তারপর, হয় তাঁহারা কর্মী বনিয়া কর্মের সাগরে গা ভাসাইয়া কাব্যের নিশ্চিন্ত তটভূমির আশ্রয় ছাড়িয়া যান, নয় পুনরায় মনকে কাব্যের আফিমে বুঁদ করিয়া দিয়া স্বপ্নের ঘোরে পদ্মের পাপড়ি চিবাইতে থাকেন। মহাকালের দরবারে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁহারাই টিঁকিয়া যান। যাঁহারা সময়ের বা কালের মহিমা স্মরণ করিয়া সেই খণ্ডকালকেই জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, বৃহত্তর কালের ঢেউ আসিয়া তাঁহাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, খণ্ডকালের মত তাঁহাদের সাময়িক হৃদয়-বেদনাও হারাইয়া যায়! কাল এবং কালাতীতের দ্বন্দ্বের এই ট্র্যাজেডি সাহিত্যিকদের জীবনেই ঘটিয়া থাকে। শিল্পীমনের ঐকান্তিক নির্লিপ্ততা ও নির্মমতা যাঁহাদিগকে ক্ষুদ্রকালে সমসাময়িকদের নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে লইয়া যাইতে পারে তাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা বিরাট, কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দুর্ভাগ্য তাঁহাদিগকে বারংবার কাল এবং কালাতীতের মধ্যে দোল খাইতে খাইতে হয়রান হইয়া যাইতে হয় এবং অধিকাংশেই হারিয়া বিলুপ্ত হইয়া যান। রবীন্দ্রনাথের মত বৃহত্তমের মনেও যখন সংশয় জাগিয়া থাকে, তাঁহাকে বলিতে হয়—

বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে?

বলিতে হয়—

' এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়!

তখন অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু তাঁহার জীবনে ইহা ক্ষণিক সংশয় মাত্র। তিনি শেষ পর্যন্ত—

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।

শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপূর,
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
জানে না আপনা জানে না ধরণী
সংসারকোলাহল।

—সেই অনাদিধ্বনির অনুসরণে সংসার-কোলাহলের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন বলিয়া কালকেও অতিক্রম করেন—যদিও বর্তমানকালের শ্রেণী ও সমাজ সচেতন সমালোচক তাহা স্বীকার করেন না, অতীতের অন্ধকার গর্ভেই তাঁহাকে জোর করিয়া কবর দিয়া বর্তমান কালকে কালাতীতের উপরে জয়যুক্ত করেন। কিন্তু সকলেই রবীন্দ্রনাথ নন। সমসাময়িককালের ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত সাহিত্যিকের সংখ্যাই বেশি। তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহাদের কর্তব্য কি?

* * *

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারি সংস্কারের স্বপক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টারের পিটারলু ফিল্ডস-এ যে সভা হয়, অশ্বারোহী সৈন্যদলের আক্রমণে তাহা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই সংঘর্ষে ছয়জনের মৃত্যু ঘটে, বহু আহত হয়। ইংলণ্ডের কবি শেলী তখন ইটালী-প্রবাসে ছিলেন। সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে মিসেস শেলীর ভাষায়, "it roused in him, violent emotions of indignation and compassion." বহু যদি দৃঢ়চিত্ত হয় এবং তাহাদের চিত্ত যদি এক সুরে বাঁধা হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রভূত শক্তিশালী অস্ত্রকে বশে আনিতে পারে, পরবর্তী কয়েকদিনের ঘটনায় এই মহাসত্য অন্তরে অনুভব করিয়া কবি তাঁহার লাঞ্ছিত দেশবাসীকে প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ শিখাইতে মনস্থ করেন। সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত এই অনুভূতির ফলে কবির "দি মাস্ক অব অ্যানার্কি" নামক চিরন্তন কবিতাটি জন্মলাভ করে। শেলী এই কবিতায় যে পদ্ধতির কথা বলেন, তাহা আসলে অহিংস অসহযোগ। কবিতাটি এই—

Stand ye, calm and resolute,
Like a forest, close and mute,
With folded arms and looks that are
Weapons of unvanquished war....

তোমরা দাঁড়াও শান্ত ও দৃঢ় মনে
অরণ্যসম নিবিড়, বাক্যহীন,
বুকে বাঁধি বাহু, স্থির দিঠি আঁখিকোণে—
অজেয় জনের অস্ত্র যা চিরদিন।

And if then the tyrants dare,
Let them ride among you there,
Slash and stab, and maim and hew—
What they like, that let them do.

অত্যাচারীরা পারে যদি, তারো পরে
তোমাদের মাঝে ছুটাইয়া দেয় ঘোড়া,
অসি-কষাঘাতে হত বা পঙ্গু করে—
যা খুশি ওদের, যা পারে করুক ওরা।

With folded arms and steady eyes,
And little fear, and less surprise,
Look upon them as they slay
Till their rage has passed away,

বদ্ধ বাহুতে, অপলক দুটি চোখে
থাকিবে না ভয়, জাগিবে না বিস্ময়,
দেখ—যারা রয় নরহত্যার ঝোঁকে,
যাবৎ তাদের ক্রোধ না শান্ত হয়।

Then they will return with shame
To the place from which they came
And the blood thus shed will speak
In hot blushes on their cheek.…

লজ্জা মানিয়া সেথা ওরা ফিরে যাবে
যেথা হতে হেথা এসেছিল এককালে,
আজিকার এই নিঠুর রক্তস্রাবে
লজ্জার আভা ফুটিবে ওদের গালে।

And that slaughter to the Nation
Shall steam up like inspiration,
Eloquent, oracular,
A volcano heard afar.

জেনো নিশ্চয় এই হত্যার ফলে
এ মহাজাতির হবে নবজাগরণ;
মুখর হইবে মূকেরাই দলে দলে
অগ্নিগিরির শোনা যাবে গরজন।

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number—
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you—
Ye are many—they are few.

ঘুম ভেঙে জেগে ওঠ সিংহের মত
কাতারে কাতারে জেগে ওঠ শত শত—
ঘুমের মাঝারে শিকলের ঝন্‌ঝনা
বেড়িয়াছে দেহ, যেন শিশিরের কণা
ঝেড়ে ফেলে দাও, ধর মুক্তির ব্রত;
তোমরা যে বহু—ওরা শুধু কয়জনা।"

ক্ষুদ্রকে দেখিয়া কবি তাঁহার মানসলোকে যে বৃহৎকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ঠিক শতবর্ষ পরে আমাদের কালে সেই বৃহতের মহনীয় রূপ আমরা আমাদেরই এই দেশে চক্ষুগোচর করিলাম; কিন্তু আমাদের লেখনীতে তেমন কাব্য জাগিল কই? নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে নিরস্ত্র মানুষের নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অবারিতবক্ষ মানুষের জয়যাত্রার বিপুল মহিমা আমাদের রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিল না বলিয়াই কি আমরা সকলেই বিমুখ হইলাম? এই দুর্যোগের দিনে ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে তেত্রিশকোটি

মানুষকে শক্তিহীন করিবার জন্ত ক্ষীণপ্রাণ খর্বকায় একটি মানুষের কণ্ঠে যে মাভৈঃ বাণী উচ্চারিত হইল, সমসাময়িক কবির কাব্যে তাহা চিরন্তন মহিমা লাভ করিল কই? দীর্ঘ শতাব্দীপাদ ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের বুকে অহিংস অসহযোগের যে শান্ত-ভীষণ মধুর-ভয়াল প্রকাশ আমরা দেখিলাম, আমাদের শিল্পস্রষ্টা ও কবিরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেশবাসীর কাছে তাহার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিচয় রাখিয়া গেলেন কি?

* * *

রাম নামধেয় ব্যক্তিটি বাস্তবজগতে কখনও বর্তমান ছিলেন কি না, অথবা থাকিলেও তাঁহার যথার্থ জীবন-ইতিহাস কি ছিল আজ আমাদের তাহা জানিবার আবশ্যক নাই, কবি বাল্মীকি যে রামকে ভাবীকালের দরবারে উপহার দিয়া গিয়াছেন তিনিই সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে আজ চিত্ত ও নয়নাভিরাম হইয়া আছেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়তো আসলে একটা পারিবারিক দাঙ্গা মাত্র ছিল, কিন্তু মহাভারতের কবি সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় এই যুদ্ধকে স্থাপন করিয়া এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের ধর্মকর্মের আশা-আকাঙ্ক্ষার নীতি-আদর্শের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, সারা পৃথিবীতে তাহা আজিও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে। অর্থাৎ সমসাময়িক ঘটনা বা জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কবিরা চিরন্তন কাব্যের সৃষ্টি করিতে পারেন, যদি তাঁহাদের মনের তন্ত্রীতে আঘাত লাগে, যদি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, যদি তাঁহাদের শিল্পকর্মের সঙ্গে ধর্মবুদ্ধি সংযুক্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ বৎসর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের আশেপাশে এবং আমাদের জীবনে মহাকাব্যের বিষয়ের অপ্রতুলতা ঘটে নাই, কিন্তু আমাদের কবিপ্রাণ নানা পীড়নে, আঘাতে এবং ভাববিপর্যয়ে মুহ্যমান ছিল বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ বর্তমানকে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ করিয়া তুলিতে পারিলাম না। বীর এবং কবির, রাম এবং বাল্মীকির যথাযথ সংযোগ ঘটিল না।

* * *

কবি গ্যেটে তাঁহার *Faust* কাব্যে আদর্শ মানব বা Ideal Man হিসাবে ফাউষ্টকে খাড়া করিয়াছেন। পার্থিব ক্ষমতা ও গৌরবের, জাগতিক সৌন্দর্য ও আনন্দোপভোগের চরম করিয়া কালের দুর্নিবার গতিমুখে ছুটিতে ছুটিতে ফাউষ্টের মনে সহসা বৈরাগ্যোদয় হইল। সে অনুভব করিল, সব মিথ্যা, সব ঝুট্ হ্যায়। নিরুৎসাহ হইবার পাত্র সে নয়। শেষ পর্যন্ত বিকাররহিত আনন্দের কথা অবিরত ধ্যান করিতে করিতে একটা সন্ধান তাহার মিলিল—দৈবাদিষ্ট একটা পরিকল্পনা।

> Let that high joy be mine for evermore
> To shut the lordly ocean from the shore,
> The watery waste to limit and to bar
> And to push it back upon itself afar!
> From step to step I settled how to fight it:
> Such is my wish.

কারণ,

The Deed is everything, the Glory naught.

কি তাহার আয়োজন?

Collect a crowd of men with vigour
Spur by indulgence, praise or rigour.

তাহার কাম্য কি?

To many millions let me furnish soil
Though not secure, yet free to active toil ;...
And such a throng I fain would see,
Stand on free soil among a people free.

শতাধিক বর্ষ পরে কবি গ্যেটের মানসিক পরিকল্পনাকেই আমরা মূর্ত্ত হইতে দেখিলাম আমাদেরই এই নির্যাতিত নিপীড়িত জাতির মধ্যে। মহিমান্বিত সাগরকে যিনি তট হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন, কর্ম্মকেই যিনি প্রাধান্য দিলেন, যশকে নয়, জনতাকে যিনি আকৃষ্ট করিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাধীন মৃত্তিকার আশ্রয় দিবার জন্য বারংবার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলেন। এদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা আদর্শের বাস্তব রূপান্তর দেখিয়াও লেখনীমুখে বৃহৎ কিছু সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করিলেন না।

* * *

ভাবিতে ভাবিতে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ গোপালদার সশব্দ অভ্যাগমে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। গোপালদা হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, এবারকার সমস্যাটা কি ভায়া? গোলআলুর গোলামি, না নবান্নের স্বাবা?

গোপালদার হাসিটা সাময়িকভাবে বিশ্রী লাগিল, তবু শান্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, বর্ত্তমান অবস্থায় সাহিত্যিকদের কর্তব্য কি, সে কথাই ভাবছিলাম।

গোপালদা চিন্তা মাত্র না করিয়া বলিলেন; আত্মরক্ষা, যেন তেন প্রকারেণ। বিজ্ঞাপন লিখে হোক, গান লিখে হোক, সিনেমা-সংলাপ লিখে হোক, জনযুদ্ধের প্রশস্তি গেয়েই হোক বাঁচতে হবে তাদের, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সত্য ও আদর্শ নিষ্ঠা দেখাবার সময় ঢের পাওয়া যাবে, মহাকাব্যের ক্ষণ কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না, তার আগে মহামৃত্যুটা তো রোধ করতে হবে।

বলিলাম, সেই মহামৃত্যুর কথাই তো আমি ভাবছি। দশদিন উঞ্ছবৃত্তি ক'রে আত্মার বিনিময়ে কোনও রকমে দেহ ধারণ করলে তো সেই মহামৃত্যুকে রোধ করা যাবে না। সাহিত্যিক বাঁচবে তার সাহিত্যের মধ্যে। কোন্ আদর্শে—

গোপালদা বাধা দিয়া বলিলেন, আত্মা আদর্শ প্রভৃতি ওসব বড় বড় কথা ব'লো না ভায়া। আমাদের জন্যে ভগবান সহজ সরল পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। যুগধর্ম্ম পালন কর, বাস্, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কি আপনার ভগবানের নির্দিষ্ট সেই যুগধর্ম্ম?

গোপালদা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। আসনপিঁড়ি হইয়া পূর্ব্বেই বসিয়াছিলেন

ঘন ঘন দুলিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখে সহসা সেই দূরপ্রসারী মোহময় দৃষ্টি ঘনীভূত হইতে লাগিল, আমিও মোহাবিষ্ট ও বিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিলাম। গোপালদা বলিলেন, রঘুর দশম সর্গের দ্বাবিংশ শ্লোক মনে আছে তোমার?—

চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগা।
চতুর্বর্ণময়ো লোকস্ত্বত্তঃ সর্বংচতুর্মুখাৎ।

অর্থাৎ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গপ্রদ জ্ঞান, সত্য-ত্রেতাদি চতুর্যুগ-পরিমিত কাল এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণময় এই সকল লোক চতুর্মুখ স্বরূপ আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যুগভেদে এই চতুর্বর্গের এক একটি বর্গ স্বয়ং ভগবান নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। ধর্মনিষ্ঠদের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, অর্থনিষ্ঠদের কাল শেষ হয়ে এল ব'লে, এখন কামনিষ্ঠরা মাথা চাড়া দিচ্ছেন। ইংলণ্ড আমেরিকা ভারতবর্ষ প্রভৃতি সকল দেশেই অর্থনিষ্ঠগণ তাই শঙ্কিত হয়ে নানা সংঘবদ্ধ এবং কৌশলময় উপায়ে বিপুল অর্থের সহায়তায় আত্মরক্ষা করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কামনিষ্ঠদের কাল সমাগত।

বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিলাম, কামনিষ্ঠ?

হ্যাঁ, কামনিষ্ঠ, এ আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। স্বদেশী বস্তুকেই তোমরা বিদেশের ধার করা জিনিস ভেবে আনন্দ পেতে অভ্যস্ত। সেই আনন্দই পাচ্ছ। অর্থনিষ্ঠরা চঞ্চল হ'লেও স্বভাবদোষে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছে, কর্মনিষ্ঠ কামনিষ্ঠেরা কাম চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজের লোক তাঁরা। এযুগে তাঁদের কাম জয়যুক্ত হবেই। যদি বাঁচতে চাও, সাহিত্যিক হিসেবেই হোক আর মানুষ হিসেবেই হোক, যুগধর্ম পালন কর, কামনিষ্ঠ হও।

দমিয়া গেলাম। গোপালদাকে আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না। তবু ছোট্ট একটি প্রশ্ন ছাড়িলাম, তা হ'লে মোক্ষ?

গোপালদা দ্বিধাহীন তৎপরতার সহিত জবাব দিলেন, কামের রাজত্ব সমাপ্ত হ'লেই মোক্ষ তো সুনিশ্চিত। তবে মোক্ষনিষ্ঠদের দিন আসতে দেরি আছে। তৃতীয় বর্গের কথাই এখন কায়মনে চিন্তা কর ভায়া, মোক্ষ পাবেই। আজ তবে আসি।

গোপালদার চতুর্বর্গ শুনিয়া সাহিত্যিকদের কর্তব্যচিন্তা আমার রগে উঠিয়াছিল। গোপালদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে আর বাধা দিলাম না। একটু একলা থাকার প্রয়োজন অনুভব করিলাম।

—

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁহার 'দময়ন্তী' কাব্যের প্রথম কবিতায় "রে কন্যা আমার" বলিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়া থাকিলেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন, তবে "বদ্বীপ" বুঝিতে কিছু ভূগোল-জ্ঞান আবশ্যক বটে। কবি বলিতেছেন—

শোন্ তোরে বলি :
যে-ত্রিবলী
তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম
আজো তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।
যে মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবি
খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-স্থলে
সর্বস্ব তিমির তলে অলজ্জ বদ্বীপ,
অমনি থমকে কাল।

কথাটা কন্যাকে বলিবার মত বটে! না থমকিয়া কালের উন্মত্ত হইয়া উঠাই উচিত ছিল।

—

অতি-আধুনিক কবিদের যে জুয়াচুরির কথাটা আমরা বরাবরই প্রচার করিয়া আসিতেছি, দেখিতেছি তাহা একান্ত বাঙালী কবিদের নিজস্ব নয়। এই জুয়াচুরির বান পৃথিবীর সর্বত্র ডাকিতেছে। 'কবিতা'-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কাব্যবুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অমিতাভ সেন একবার কয়েকটি আজগুবি শব্দ ও বাক্যের সমষ্টিকে কবিতা হিসাবে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাগুলি পাঠে সম্পাদক মহাশয় ভাবগদ্গদ হইয়া কয়েকটিকে অচিরাৎ পত্রস্থ করিয়াছিলেন। এ সংবাদ আমাদের পাঠকেরা জানেন। অষ্ট্রেলিয়ায় সংঘটিত অনুরূপ একটি ঘটনা সংবাদপত্র হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল। বাংলা দেশের আধুনিক কবিকুল ইহাতে পুলকিত হইবেন।

ANGRY PENGUINS

Australians were chuckling last week over a literary hoax as fantastic as a duck-billed platypus. Editor Max Harris, of Adelaide's long-haired little review, *Angry Penguins*, had introduced the work of a new poet named Ern Malley with a 30-page rhapsody explaining, with deadly and Dadaistic earnestness, why Malley was "one of the two giants of contemporary Australian poetry."

Then Australian Army Lieut. James MacAuley (who fought in New Guinea) and Corporal Harold Stewart revealed that they were "Ern Malley." Forced to kill an afternoon's leave, they created Poet Malley by leafing through *The Oxford Dictionary of Quotations* and other inspirational works, and lifting whatever hit their fancy. Samples of Malley masterpieces :

There have been interpolations, false syndromes
Like a rivet through the hand
*Such deliberate suppressions of crisis as Footscray.**
There is a moment when the pelvis
Explodes like a grenade . . .
I have spit the infinitive,
Beyond is anything.

Hoaxers MacAuley and Stewart confessed that they culled the first three lines of *Culture as Exhibit* from a U. S. report on mosquito breeding grounds :

Swamps, marshes, borrowpits and other
Areas of stagnant water serve
As breeding grounds.

But Lieut, MacAuley and Corporal Stewart were out to kill more than an afternoon, As Ern Malley they wrote : "For some years we

have observed with distaste the gradual decay of meaning and craftsmanship in poetry. Harris and other *Angry Penguins* writers represent the Australian outcrop of a literary fashion prominent in England and America, a distinctive feature of which seemed to us to render its devotees insensible of its absurdity. . . . ."

Buzzed Surrealist Editor Harris : "If fifty million monkeys with fifty million typewriters tapped for fifty million years, one of them would produce a Shakespeare sonnet. I hope MacAuley and Stewart have not produced such a phenomenon. It is not their claims of exposure but time [that] tells the story. Time will explain that a myth is sometimes greater than its creators."—*Time*, July 17, 1944.

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

সব মেয়েই যে সমান ভ্রমণ-বিশারদ প্রবোধ সান্যাল তাঁহার একটি উপন্যাসে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন—

"মেয়েরা একাকার হ'লে সকলের দামই সমান—সকলে একই পদার্থ। ...

ওই দেখো নৃত্যশিল্পী মলিনা যেন মিশে গেছে তিনকড়ি দাসীর সঙ্গে—ওটা বস্তির মেয়ে। আর ওই যে বসে রয়েছে রূপোর ঝুমকো দুলিয়ে, ও মেয়েটি হোলো ডক্টর মিসেস বনলতা মিত্রের বোনঝি—পারুল বোস। সম্প্রতি উনি হাত বদলে বেড়াচ্ছেন। তার পাশে নূরনগরের ছোট তরফের বউ—মেয়েটি বছর দুই আগে প্রেমোন্মাদিনী হয়ে এসে জানবাজারে ফ্লাট ভাড়া নেয়। ওর বাঁদিকে—ওই যে গেলাস ধ'রে আছে—ও-মেয়েটি কে জানো? রায় বাহাদুর অঘোর চৌধুরীর নাৎনী—নতুন এসে ঢুকেছে সিনেমায়—চেয়ে দেখো, কারো সঙ্গে কারো পার্থক্য নেই—একই সাজসজ্জার পারিপাট্য, একই দেহভঙ্গিমা, একই ফ্যাসনের পুতুল,—এবং দেখতেই পাচ্ছ, ইতরভদ্রের উদ্দেশ্যটাও একই।"...

"নতুন কয়েকজন এসে আসরে বসলো, এবং এই ফাঁকে আরও জুড়ি দুই তিন স্ত্রী-পুরুষ গেলাসগুলো হাতে নিয়েই তাদের বিশ্রামকক্ষের দিকে গা ঢাকা দিল। তাদের এই পলায়নের কারণ কারো কাছে, এমন কি সুধাংশুর কাছেও অস্পষ্ট রইল না।"

ইহা কি প্রবোধবাবুর দ্বিতীয় মহাপ্রস্থানের পথের রচনা? সঙ্গে কি আত্মীয়া-বান্ধবী কেহই ছিলেন না?

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি

১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ঃ পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ

১

বাংলার নবযুগের যে পরিচয় দিয়াছি তাহাতে বুঝা যাইবে যে, ওই যুগ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই একরূপ সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা তাহার ধারাকে এ কাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া আজিকার এই প্লাবনকেও সেই এক গতিবেগের পরিণাম বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণাও এক অর্থে সত্য হইতে পারে, কারণ, কালের স্রোত অবিচ্ছেদেই বহিয়া থাকে, বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সম্পর্ক থাকেই। কিন্তু সেই সাধারণ কালধর্ম্মকে স্বীকার করিলেও, কালের এক একটা অংশ এমন বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, স্বতন্ত্র যুগ-বিভাগও আবশ্যক হইয়া পড়ে। বাংলার আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী তেমনই একটা বিশিষ্ট যুগ, সে যুগে সমাজ, ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতির সমস্যাই এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সেই সমস্যাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছিল একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কটের যুগ—সেই সঙ্কটে জাতির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—শ্রেষ্ঠ প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর সে সমস্যাই যেন লোপ পাইল, বাঙালীর সকল বুদ্ধি—হৃদয়বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল; সে এক নিষ্ফল সাধনার সিদ্ধিলাভের আশায় মাতিয়া উঠিল। সে যেন একটা আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত:! তার পর হইতেই তাহার জীবনের মূল পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। কেন এমন হইল, এই ঘটনার মূলে কোন্ জটিলতর কারণজাল প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার বিচার এ যুগের ঐতিহাসিক করিবেন, এখানে সে প্রয়োজন নাই। বাংলার নবযুগ বলিতে আমি কালের যে ধারাকে একটি সুস্পষ্ট গতি ও পরিণতির আকারে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহার প্রধান প্রেরণা ও প্রবৃত্তি ছিল—বিধর্ম্মের সহিত স্বধর্ম্মের, মানবতার সহিত জাতীয়তার সমন্বয়-সাধন। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বিবেকানন্দও সেই বিরোধকে একটা বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গীভূত করিয়া তাহার সমাধান-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাস্তবের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনকে স্বীকার করিয়া তাহার উপরে জয়ী হইবার যে প্রয়াস, সেই সংগ্রামকে জীবন-ধর্ম্মরূপে বরণ করাই ছিল উভয়ের আদর্শ, এজন্য চিত্তশুদ্ধি ও পৌরুষের সাধনাকেই তাঁহারা আর সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফল কিছু ফলিতেও আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল, সেই সাধনা অতিশয় বিষময় হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দ

তাহাতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি-মন্ত্র যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষেত্র ছিল সমাজ; বঙ্কিমচন্দ্রের 'চিত্তশুদ্ধি' এবং বিবেকানন্দের 'পৌরুষ' এই দুইয়েরই সাধনা সমাজ-জীবনে হইতে পারিবে এবং তাহাই আবশ্যক, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন; তাহার কারণ, উভয়েই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, জাতির এই অধঃপতিত অবস্থায় প্রথমেই বাহিরের সহিত বিরোধ নয়, শক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বেই শত্রুজয়ের অভিযান নয়,—ভিতরে আত্মস্থ হওয়া—মানুষ হওয়াই মুখ্য, আর সকলই গৌণ। দুইটি কারণে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না, প্রথমটি—বাঙালীর জাতিগত ব্যাধি, তাহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা; দ্বিতীয়—নবযুগের সেই বাণীমন্ত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা, এবং সেই পথে দৃঢ়ভাবে চালিত করিবার মত শক্তিমান নায়কের অভাব।

প্রথমটির কথাই আগে বলিব। চরিত্রই মানুষের জীবনের নিয়ামক বা নিয়তি, জাতিরও তাহাই। বাঙালী জাতির চারিত্রিক দৃঢ়তা অপেক্ষা ভাবাবেগ বিহ্বলতাই অধিক; তাহার মেরুদণ্ড বড়ই দুর্ব্বল—মস্তিষ্কের ভাবগ্রাহিতা যেমন ক্ষিপ্র, হৃদয়ও তেমনই সদ্য-স্ফীতিপ্রবণ; তাই দীর্ঘকাল একাসনে কোন মন্ত্রের সাধনা তাহার পক্ষে বড়ই দুষ্কর। যাহার চরিত্র দুর্ব্বল তাহার আত্মপ্রত্যয় দ্বিধাযুক্ত হয়, অতএব এমন জাতি অবস্থার দাস হইতে বাধ্য। এইরূপ চরিত্রের কারণে বাঙালীর ইতিহাসও বিচিত্র বটে; ধর্ম্ম ও ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে সে অতিশয় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া, বৈষয়িক জগতে, সে কোন বড় কীর্ত্তির অধিকারী হয় নাই; নিজ বাস-পল্লীর ক্ষুদ্র সমাজ-জীবনে কর্ম্মকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া, ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত সাধনার সহায় করিয়া, এবং ভোগ-সুখকে যতদূর সম্ভব পরিমিত করিয়া, সে পারিবারিক জীবনকেই সুন্দর ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

তথাপি গত শতাব্দীতে এই জাতিই তাহার সেই দুর্ব্বল চরিত্রে একটা প্রবল ধাক্কা পাইয়া যেন নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার কারণ, তাহার সেই- মেধা ও প্রতিভার বলে সে জগতের যুগান্তর-সমস্যাকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল, এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভাব-চিন্তার সংঘর্ষে আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। সেই প্রথম তাহার নিজের প্রতি নিজের দৃষ্টি পড়িয়াছিল; সেই দৃষ্টির ফলে, সে আর একবার—সেই ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন—আত্ম-সংশোধনে ও আত্মরক্ষণে যত্নবান হইয়াছিল। এবার শুধুই বর্জ্জন নয়—গ্রহণও আবশ্যক; প্রাণপণে কেবল আত্মরক্ষাই নয়—পরকেও জয় করিতে হইবে, তাই কেবল শাস্ত্রশাসন নয়—চরিত্র-গঠনই হইল মুখ্য; কারণ, পথ্যাপথ্য-বিচার নয়—সর্ব্বপথ্য হজম করিবার শক্তিই তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। এই চিন্তা, এই ভাব, এই সংকল্প যখন তাহার জীবনে একটু মূলবদ্ধ হইতেছে ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দিক হইতে প্রবল ঝড় বহিতে শুরু করিল—ভাব-প্রবণ বাঙালী

আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই ঝড়ের মুখে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এই ঝড়কে বশীভূত করিবার জন্য যে বুদ্ধি ও যে শক্তির প্রয়োজন তাহা গণবুদ্ধি ও গণশক্তি—সে শিক্ষা ও সে সংস্কারই ভিন্ন, আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক আদর্শই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাই নবযুগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বেই, সহসা সাধনার এই ক্ষেত্র-পরিবর্ত্তনে একটা আদর্শ বিপর্য্যয় ঘটিল; বাঙালী আবার ভাসিয়া গেল; তারপর এখনও পর্য্যন্ত সে পায়ের নীচে মাটির সন্ধান পায় নাই। যে শক্তি-সাধনা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত ছিল তাহা এইরূপ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ও সুদুর্গম কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইল; পূর্ণশক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বেই, সেই স্বল্পসঞ্চিত শক্তির উন্মাদনায় বাঙালী যুবক, আত্মজয় নয়—আত্মনাশের আতশবাজিতে রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে চাহিল। বাঙালীর চরিত্রগুণে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাণী সংহতিসাধক না হইয়া বিস্ফোরক হইয়া উঠিল। ইহাতেই বাংলার নবযুগের অবসান হইয়াছে। বাংলার যুব-জীবনে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহার কারণ, খাঁটি স্বাজাত্যচেতনার পরিবর্ত্তে, বিলাতী nationalism তাহাকে রিপুর মত গ্রাস করিয়াছিল; সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে আত্মস্থ হইবার—স্বজাতিকে চিনিবার ও তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ় করিবার পূর্ব্বেই, সে একটা সেন্টিমেণ্ট মাত্র সম্বল করিয়া পলিটিক্‌সের পথে দেশোদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছিল। এই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্রমে সে আদর্শভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, এবং নৈরাশ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পরধর্ম্ম (অ-বাঙালী বা অ-ভারতীয়) আশ্রয় করিতেও তাহার বাধে না। এখন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নেতৃত্ব করা দূরে থাক—নিজ সমাজে নেতৃত্ব করিবার জন্য সে পরের শরণাপন্ন হয়।

অতএব, বাহিরের দিক দিয়া বাঙালীর এই দুরবস্থার কারণ যেমনই হউক, বা যতই জটিল হউক, তাহার চরিত্রই যে তাহার শত্রু, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই চরিত্রই গত যুগের সেই নবজাগরণের ফলে নূতন ছাঁচে পুনর্গঠিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্যশিক্ষা ও যুগপ্রভাবের সহিত বাঙালীর জাতিগত সংস্কৃতি ও প্রতিভার মিলনে, জীবনের এক নূতন আদর্শ—এক অভিনব মানব-ধর্ম্ম—বাঙালীর সুপ্তিভঙ্গ করিয়াছিল, সে সাড়া তাহার আত্মায় জাগিয়াছিল, নতুবা জ্ঞানে, কর্ম্মে, কল্পনায় ও ভাবুকতায় এমন প্রতিভার বিকাশ হইত না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বাঙালী সেই নবযুগকে এত সহজে বরণ করিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ, জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহার মনোভাব ভারতীয় প্রকৃতি হইতে একটু স্বতন্ত্র, তাহার আধ্যাত্মিক সংস্কারও সন্ন্যাসের বিরোধী,—বৈষ্ণবই হউক, আর শাক্তই হউক, সে ভোগবাদী, রূপরসরসিক—তান্ত্রিক। তাই

জীবনকে আরও শক্ত করিয়া ধরিবার জন্য—পাশ্চাত্যের প্রকৃতিবাদকেও যেমন, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকেও তেমনই, তাহার সেই স্বভাব-ধর্ম্মের বা স্বধর্ম্মের দ্বারা শোধন করিয়া, সে এক নূতন শক্তিমন্ত্রের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত, তাহার চরিত্রে যে বস্তুর বিশেষ অভাব—সেই পৌরুষ ও কর্ম্মবীর্য্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সাধনা প্রধান পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাই সে যুগের শেষ শিক্ষা, এই মন্ত্রে দীক্ষালাভই যে সেই যুগ-সমস্যার শেষ সমাধান, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহাও জানি; এই জীবনবাদ, ও শক্তিসাধনার এই আদর্শ যে অতঃপর ভাসিয়া গেল কি কারণে, তাহা বলিয়াছি। বাঙালীর দুর্ব্বল ধাতুতে ওই শক্তিমন্ত্র সহ্য হইল না। কিন্তু ইহার পর তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কার—ব্যক্তি ও সমাজের সেই পুরাতন বন্ধনও আর টিঁকিল না। সে যে আর টিঁকিবে না—একটা ভূকম্প যে আসন্ন, সেই আশঙ্কা করিয়াই, গতযুগের শেষভাগে, জাতিহিসাবে বাঁচিবার জন্য এত চেষ্টা হইয়াছিল, সেই চেষ্টাই উপস্থিত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, সেই ভাবধারাও রুদ্ধ হইয়াছে।

২

তথাপি ওই যুগের শেষভাগে, বিবেকানন্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আর এক মহা-প্রতিভার উদয় হইয়াছিল; পরবর্ত্তীকালে এই প্রতিভা বাঙালীর ভাব-জীবনে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—আমি বঙ্গভারতী ও ভারত-ভারতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথের উদয় ও অভ্যুদয়ের কাল উনবিংশ শতাব্দীর কিয়দংশ অধিকার করিলেও, তাঁহার প্রকৃত উদয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই হইয়াছিল, এবং তাঁহার সাধনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ওই শতাব্দীর বয়োবৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই সাধনাও ক্রমে যে মুখে অগ্রসর হইয়াছে তাহা এতই স্বতন্ত্র, এমন কি বিপরীত যে, তাঁহাকে নবযুগের সেই ধারার সহিত যুক্ত করিলে, সেই যুগ ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়কে বুঝিবার পক্ষে বাধা হইবারই সম্ভাবনা। এজন্য, আমি যাহাকে বাংলার নবযুগের সাধনা বলিয়াছি, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে পৃথক রাখাই কর্ত্তব্য মনে করি। তৎসত্ত্বেও, রবীন্দ্র-প্রতিভার এইরূপ বিকাশের মূলে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীরই একটা গভীর ও প্রচ্ছন্ন প্রেরণা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে—প্রধান ধারার বহির্ভূত হইলেও, তাহা সে যুগের সহিত একেবারে নিঃসম্পর্কিত নয়। অতএব আমার এই আলোচনার পরিশিষ্ট হিসাবে, আমি প্রথমে সেই সম্পর্কের, এবং পরে সেই প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের কথাই বলিব।

বাংলার নবযুগের বঙ্কিম-পূর্ব্ব ভাগের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি সেই কালের একটি প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি—সেই প্রবৃত্তির নাম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহা। যে মানব-মহত্ত্ববোধ এই যুগের নব প্রবৃত্তির আদি লক্ষণ, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহাও তাহারই অন্তর্গত। সমাজের সহিত ব্যক্তির নূতন করিয়া বোঝাপড়া, শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে

বিচার বুদ্ধির জাগরণ, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে স্বকীয় আদর্শ ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তিতা—এ সকলই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের লক্ষণ। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-চেতনা ততখানি অন্তর্মুখ ছিল না, তিনি তৎকালীন সমাজকে সহ্য না করিলেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই; তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্যবোধে এইরূপ পৌরুষেরই দৃপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রামমোহনের বাণী ও তাঁহার কার্য্যকলাপ তাঁহার সেই আদর্শ স্থাপনের পক্ষে কার্য্যকরী হয় নাই; তাঁহার সেই আন্দোলন কেবল এক দিকেই নবযুগের সেই প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করিয়াছিল—সর্ব্ব বিষয়ে Reason বা বিচার-বুদ্ধির একাধিপত্য, এবং তজ্জনিত ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা। হৃদয়বৃত্তির উপরে বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রাধান্যের ফলে, সমগ্রভাবে সমাজ বা জাতির কল্যাণ-কামনা মুখ্য না হইয়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র সাধনাই শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিতেছিল; যে তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য, যে দূরদৃষ্টি ও প্রেম ব্যতিরেকে, এক অতি-প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী, অথচ অধুনা-মৃতবৎ অতিকায় সমাজ-দেহের উত্তোলন ও উজ্জীবন অসম্ভব, ব্যক্তির এই স্বাতন্ত্র্য-কামনা তাহার আদৌ অনুকূল নয়। এইরূপ মনোভাব সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও মধ্য স্তরে সংক্রামিত হইবার পক্ষে একটা বড় সহায় হইয়াছিল—সেকালের ইংরেজী শিক্ষা; সেই শিক্ষার অন্তর্গত Humanity বা মনুষ্যত্বের মহিমাবোধ এবং তাহারই সমর্থনে ইতিহাস-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য ও তৎ-প্রসূত যুক্তিবাদ, সেকালের অতি দুর্ব্বল হিন্দু-সংস্কারকে প্রবলভাবে আঘাত করিবারই কথা। রামমোহনের প্রতিভায় এই ভাব আপনা হইতেই স্ফুরিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না, তাই বোধ হয়, তাঁহার দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু পরে যাঁহারা রামমোহন হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি ঠিক রামমোহনের অনুগামী ছিল না; তখন সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ভিতরে ভিতরে জাতীয়-চেতনার মূল ক্ষয় করিতেছিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই, ইংরেজী শিক্ষার সারতত্ত্ব হজম হইয়া আসিলে পর, বাঙালীর মানস-দেহে সেই শিক্ষা বিষ-চিকিৎসার মতই সুফলপ্রদ হইল, তাহারই কারণে, সমাজ-চেতনারও অধিক—জাতীয় আত্ম-চেতনার সঞ্চার হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহার মস্তিষ্কের যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই চেতনা হৃৎপিণ্ডে পৌছিল, প্রাণে সাড়া জাগিল—প্রেম আসিয়া জ্ঞানের হাত ধরিল, বাঙালী নবযুগকে তাহার জীবনে বরণ করিয়া লইল। আমি ইহারই কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার উদয় ও সেই প্রতিভার উন্মেষের সহিত এই যুগের যে সম্পর্ক তাহা ওই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ঘটিত, অতএব, এই তত্ত্বটিকে ধরিয়া আর একটু ভিতরে যাইতে হইবে। সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই অন্ততঃ কতক পরিমাণে দেশ-কালের নিয়ম-

বহির্ভূত—কখন্ কোথায় যে তাহার আবির্ভাব হইবে পঞ্জিকার সাহায্যে তাহা গণনা করা যায় না; তাহার উপর, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই স্ব-তন্ত্র যে, অনেক সময়ে মনে হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের, তথা বাঙালী-জীবনের কোন সাক্ষাৎ-সম্পর্ক নাই—কেবল ইহাই সত্য যে, ওই জ্যোতিষ্কের উদয় আর কোথাও না হইয়া আমাদের এই নিম্নভূমির অতি-নিকট দিগ্‌বলয়ে হইয়াছিল; তাহার কোন কারণ না থাকিলেও, বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয় নিয়মে তাহার বারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ নামক যে প্রতিভা সূর্য্য আপন জ্যোতির্লীলা আপনারই স্বভাবে প্রকটিত করিয়া আপনিই অস্ত গিয়াছে, তাহার আলোকে আমাদের অন্ধকার গৃহকোণ আলোকিত হইয়াছে কি না, তাহার কিরণ-প্রাচুর্য্যে আমাদের ক্ষেত্রতলের শস্যরাশি পাকিয়াছে কি না, অথবা তাহার উত্তাপে আমাদের শীত-জড়িমা ঘুচিয়াছে কি না—এমন প্রশ্ন যেন নিতান্তই অবান্তর; যদি তাহা হইয়া থাকে, ভালই; যদি না হইয়া থাকে, সে অনুযোগ করা মূঢ়তা মাত্র। কিন্তু এ কথা পরে, এখন যাহা বলিতেছিলাম। এই যে প্রতিভা, ইহা যতই স্বয়ম্পূর্ণ বা দেশকাল-নিরপেক্ষ হউক, ইহারও একটা জন্মস্থান বা উদ্ভব-ক্ষেত্র আছে—সেই ক্ষেত্রই ইহার বিকাশের পক্ষে বাধা না হইয়া বড়ই অনুকূল হইয়াছিল। এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র ও সাধন-জীবনের প্রভাবে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই যুগের যে সম্পর্ক—রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জ্জীবনের সম্পর্ক গৌণভাবে তাহাই; অন্তর্জ্জীবন বলিলাম এই জন্য যে, কবিশিল্পী হিসাবে সেই যুগের সহিত তাঁহার যে সাহিত্যিক সম্পর্ক তাহা অন্যরূপ; সে সম্পর্কের কথা, এ প্রসঙ্গে যতটুকু আবশ্যক, পরে বলিব।

দেবেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে রামমোহনের শিষ্য হইলেও তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতিশয় বিলক্ষণ; ওই যুগের যে আধ্যাত্মিক সঙ্কটের কথা বলিয়াছি, সেই সঙ্কট দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই সর্ব্বপ্রথম গুরুতর হইয়া উঠে। রামমোহনের নিকটে তিনি একটা মন্ত্রের নির্দ্দেশ মাত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সংশয় আরও গভীর হইয়াছিল। তিনি, রামমোহনের মত, ধর্ম্মবিষয়ে কেবল জ্ঞানপন্থী ছিলেন না—ভাবপন্থীও ছিলেন, তাই বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতকে যুক্তিসিদ্ধ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া, এবং সেমিটিক ঈশবাদকেই তাহার দ্বারা উন্নত ও মার্জ্জিত করিয়া, কেবল 'পৌত্তলিকতা'র উচ্ছেদসাধনেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; তিনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদকেই নিজের আধ্যাত্মিক পিপাসার অনুরূপ একটি ভাব-সাধনার বস্তু করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন যে ধর্ম্মমতের স্থাপনা করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে একটি বিশিষ্ট সাধনা যুক্ত করিয়াছিলেন; কেবল 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্' নয়—তিনি ব্রহ্মের রস-রূপকেও জীবনে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধর্ম্মমন্ত্র তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত সাধনার সহিত এমনই

জড়িত ছিল, তাঁহার সেই আদর্শের মধ্যে এমন একটা বন্ধন ছিল যে, মুক্তিপিপাসু নব্য সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিতে পারে নাই; রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সংস্কারপন্থীরা সেরূপ না বুঝিয়া তাঁহার সেই যুক্তি-ধর্ম্মের শাণিত অস্ত্রখানিকেই সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদনের উপযোগী বলিয়া সাগ্রহে বরণ করিয়াছিল।

নব্যপন্থী হইলেও দেবেন্দ্রনাথ যে বন্ধন মানিতেন, তাহা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাধনার আধ্যাত্মিক সংস্কার; তিনি আধুনিক জীবনেই সেই সনাতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যুগ-প্রকৃতির সহিত তিনি যেটুকু রফা করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাহা প্রকৃত রফা নয়—আসলে তাহার সেই আক্রমণকে নিবারণ করিয়া, সেই বিদ্রোহকেই ভিন্ন পথে ফিরাইয়া, একটা অতীত যুগ ও অতীত সমাজের ভাবস্বপ্নময় আদর্শকে সত্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অতিশয় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন—বংশগত সংস্কারেও তিনি ছিলেন পুরা অ্যারিষ্টোক্র্যাট (aristocrat)। তাহার উপর, তাঁহার চরিত্রেই এমন একটি উন্নত আদর্শনিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিল যে, তিনি সহজেই ভারতীয় সাধনার সেই অন্তর্মুখ ও আত্মতান্ত্রিক আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এ যেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের এক খণ্ড সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ নবযুগের সেই সমস্যাসঙ্কুল ভাববন্যার তরঙ্গাভিঘাত রোধ করিয়া, একটি সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে স্বকল্পিত সাধনমঞ্চ রচনা করিয়াছিলেন; সেই সাধনমঞ্চ যেমন বিবিক্ত, তেমনই তাঁহারই স্বহস্তরোপিত পুষ্পপাদপে সুশোভিত ছিল। বাহিরের হিন্দুসমাজের সহিত যে ব্যবধান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহাও সম্ভবতঃ এইরূপ মনোভাবের সহায়ক হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানের বিদ্রোহকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই—কিন্তু সমাজ-জীবনের মিথ্যা অপেক্ষা ব্যক্তি-জীবনের মিথ্যাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, এজন্য নিজ জীবনের সত্যোপলব্ধিকে সমাজের পক্ষেও সমান উপযোগী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সংস্কারকের গোঁড়ামি বা প্রচারকসুলভ অন্ধতা ছিল না—তাঁহার চরিত্রগত আভিজাত্য সে বিষয়ে একটি সুন্দর সংযম রক্ষা করিয়াছিল।

এই যে চরিত্র এবং এই যে বিশিষ্ট সাধনা ইহা যে সেই যুগের ভাবধারারই একটি তরঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই—ভাবের কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই আন্দোলনের গতি ও পরিণতি ওই শতাব্দীর শেষে কিরূপ হইয়াছিল সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; কেবল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও সাধনায় তাহার যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহাই বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে, কারণ, রবীন্দ্রনাথের মানস-জীবন-গঠনে তাহার প্রভাব অতি গভীর। দেবেন্দ্র-নাথের ধর্ম্মজীবনে উপনিষদের বাণী যেভাবে পুষ্পিত ও বিকশিত হইয়াছিল তেমন

আর সে যুগে কোথাও দেখা যায় না। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন একজন স্রষ্টা-কবি। তিনি তাঁহার নিজ জীবনের ভাষায় যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার ছন্দ ও সুর রবীন্দ্রনাথের বাণী-মন্ত্রে বীজরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে অর্থে স্বকীয় বা নিজস্ব, সেই অর্থে এই পৈতৃক মন্ত্র-বীজ তাঁহার নিজস্ব নয়, এমন বলা যাইতে পারে; তথাপি, ইহারই প্রভাব তাঁহার কবিমানসকে প্রথম হইতেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; তাঁহার কবিপ্রতিভা ও কবিজীবন একটি বিশিষ্ট ভাব-তন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। কথাটা একটু বেশি সূক্ষ্ম হইয়া পড়িতেছে—বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবকাশও নাই, তথাপি, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিতে যে উদার রসপিপাসা ও সর্ব্বতোমুখী কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এমন সন্দেহ হয় যে, সেই স্বাধীন স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভা যদি এত বড় একটা প্রভাব ও অন্যান্য বেষ্টনী-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিত, যদি সেই একান্ত আত্মমুখী সাধনা তাঁহার পিতার মূর্ত্তিতে শরীরী হইয়া তাঁহার মানসে দৃঢ়-মুদ্রিত না হইত, তাহা হইলে হয়তো রবীন্দ্রনাথই অতিশয় শক্তিমান তান্ত্রিক সাধকরূপে বাংলার সেই নবযুগের Renaissanceকে চরম ও পরম পূর্ণতা দান করিতে পারিতেন। এইরূপ ভাবনা যে সূক্ষ্ম-বিচার-সঙ্গত নয় তাহাও বুঝি; কারণ এরূপ মহতী প্রতিভা আপনার নিয়মেই আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে, বাহিরের সকল প্রভাবকে সে আত্মসাৎ করিয়া লয়, তাহাকে কেহ আত্মসাৎ করিতে পারে না। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কোনরূপ বাধা পাওয়া দূরে থাক, তাঁহার পিতার ওই প্রভাবে একটা বিশেষ রঙে রঞ্জিত ও দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই—তাঁহার সেই Idealism ও আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা ওই সনাতন ভারতীয় আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যক্তির আত্মসাধনাই ইহাতে প্রবল; এইরূপ ভাব-সাধনার সহিত অত্যুৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা যুক্ত হইলে যাহা হয়—রবীন্দ্রনাথের সাধনায় তাহাই হইয়াছে। এক দিকে সেই এক ভাব-মন্ত্রের বন্ধন, এবং অপর দিকে কাব্যরস-সাধনার মুক্তি, এই উভয়ের লুকাচুরি—'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র সেই লীলা, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কবিমানসকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাহার মূলে আছে সেই খাঁটি ভারতীয় মনোভাব, তাহারই বশে রবীন্দ্রনাথ, এত কাল পরেও বাস্তবজীবনের সকল বিরূপতা ও আধুনিক যুগের বিষম কোলাহলের উপরে এক স্বাধীন আত্মার স্বকল্পিত ভাবজগৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিমানস ও সেই কাব্যজগতের বিস্তারিত পরিচয় এখানে অনাবশ্যক; তাহা যে সেই যুগের ভাবধারা হইতে স্বতন্ত্র—শুধুই সে যুগ কেন, কোন যুগেরই অধীন বা অনুগামী নয়, ইহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কি কারণে এত গভীর ও গূঢ় তাহা বলিয়াছি, সেই একই কারণে তিনি সেই যুগের প্রতিনিধি হইতে পারেন নাই। এই প্রতিভাই, বাংলার

ও ভারতের—কেবল পৌরাণিক ছাড়া, আর সকল যুগের—সকল ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার রসকল্পনাকে পুষ্ট করিয়াছে ; অতএব; এক হিসাবে ইহা যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি-কাননের যেন একটি কবি-মধুকর,—তেমনই কোন এক বিশেষ যুগের প্রতিনিধি নহে। এই অবাধ ভাবরসরসিকতার সহিত দুর্জ্জয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জ্জীবন ও বহির্জ্জীবনের দ্বন্দ্বও অতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সকল আসক্তির মধ্যেই তিনি নিরাসক্ত ; জনতার শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেও সারা পথ তিনি আত্মমনস্ক, তাঁহার জীবনে কর্ম্মানুষ্ঠানের যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায় তাহাতেও বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা আত্মগত ভাবসত্যের প্রয়োজনই অধিক। যে পথ তাঁহাকে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া লয় তাহা আমাদের এই পথ নয় ;—তাঁহার সেই পথ ও ঘর একই, তাহার কারণ, সে পথে—যাত্রারম্ভ ও যাত্রাশেষ, এই দুইয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই—তাহাতে গন্তব্যের ভাবনা নাই, পথ চলাতেই আনন্দ, তাই পথবাসে ও গৃহবাসে প্রভেদ নাই। এইরূপ দেশকালহীন মানস-ভ্রমণ কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব, যে রবীন্দ্রনাথের মত একটি আত্মস্থির ভাবদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, যে নিজেরই মধ্যে সমস্ত জগৎকে গ্রাস করিয়া তাহাকে আপন রসকল্পনার অধীন করিয়াছে—গতি ও স্থিতির যুগ্ম-তালকে বিশ্বরাগিণীর সঙ্গীত-সুষমার সমীভূত করিতে পারিয়াছে। তখন কোথায় যুগ ! কোথায় বা তাহার সমস্যা। উনবিংশ শতাব্দীতে যাহার উদয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকালে যাহার অস্তগমন—সেই অন্বর্থনামা কবির রবিমণ্ডলে বসিয়া প্রাচীন ঋষিবংশবন্দিত সাবিত্রী-দেবতা সেই এক সুরের উদ্বোধন করিতেছে—সেই—'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্' !

অতএব, যে নূতন মানবধর্ম্ম—Humanityর যে বাস্তব আদর্শ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় সাধন, এই ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভাব-মুক্তির সাধনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সাধনা অতিশয় শক্তিমান ব্যক্তিপুরুষের সাধনাই বটে ; কিন্তু সকল ভাবতান্ত্রিক আদর্শকে নিষ্ফল করিয়া মানুষের যে ইতিহাস-জাত নিয়তি আজ শত শতাব্দীর শেষে তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাকে এড়াইয়া চলিবার উপায় আর নাই ; এবার ব্যক্তি-জীবনকে মানব-জীবনে লয় করিতে হইবে ; সেই মানবও ব্যক্তি-মানবের একটা ভাব-বিগ্রহ নয়, রক্তমাংসেরই এক বিরাট শরীরী বিগ্রহ। মানবাত্মার যাহা পরম পদ তাহাও স্বীয় ভাবসাধনার লভ্য নয় ; জীবনের উপলবন্ধুর পথ, দুর্গম গিরিসঙ্কট ও তপ্ত মরুসৈকত অতিবাহন করিয়া, দুর্ব্বলতম যাত্রীর হাত ধরিয়া, সেই পরম তীর্থে পৌঁছিতে হইবে। অতএব ওই ভাবমার্গের সাধনা এ যুগের পক্ষে ব্যর্থ হইবারই কথা—যদিও আর এক ক্ষেত্রে আর এক রূপে তাহা সার্থক হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে আশ্রয় করিয়া সেই ভাব-বীজ কালজয়ী কাব্যকুসুমে বিকশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—নবযুগের সমস্যা-সমাধানের সহিত সে

কীর্ত্তির সাক্ষাৎ-সম্পর্ক যে অল্প, এ কথা বিস্মৃত হইলে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিই অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে যুগ, জাতি ও দেশের বাস্তব আঘাত হইতেও নিষ্কৃতি পান নাই; সেই আঘাতে তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত নানা রূপে সাড়া দিয়াছে—সেই সাড়াও তাঁহার সেই আত্ম-সচেতন মনের সহিত নিজেরই বোঝাপড়া। সাময়িক ভাবাবেগে তিনি নিজের কবিধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া বিড়ম্বনা ভোগও করিয়াছেন—রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবির অন্তর্জ্জীবনের পাশে পাশে সেই বহির্জ্জীবনের কাহিনীও রেখাপাত করিয়াছে। সেই সকল রেখাবলী হইতে পৃথক করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়া লওয়া দুরূহ নয়, বরং, বাংলার নবযুগের ভাবধারার যে পরিচয় আমি দিয়াছি তাহার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সেই কবিমূর্ত্তিকে স্থাপন করিলে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই সে যুগের সাহিত্যিক আদর্শকেও অস্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্য এমনই যে, যতদিন বাংলার ভাবচিন্তায় সে যুগের প্রভাব মন্দীভূত হয় নাই, ততদিন তাঁহাকে কেহ চিনিতেও পারে নাই; তখন তাঁহার ভাবও যেমন—ভাষা ও ছন্দও তেমনই, সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া মনে হইত; প্রায় মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াও এই রবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র আপনার কিরণজাল প্রকাশিত করিতে পারেন নাই! তারপর, যখন কিছুদিনের জন্য (তাঁহার কবিমানসের একটি আকস্মিক ও অভিনব বিকাশে) তিনি জাতীয়তার চারণ-কবিরূপে পথে বাহির হইলেন—এবং গানে গানে জনতার কণ্ঠ ভরিয়া দিলেন; যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মত, বিবেকানন্দেরই প্রায় সমধর্ম্মী, আর এক মহাপ্রাণ মহামনস্বী বীর সন্ন্যাসীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এক দিকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, এবং অপর দিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে, তাঁহারই স্মৃতি-মণ্ডিত 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতায়, জাতির চরিত্রগঠনে ও জাতীয় আদর্শের উদ্ধারসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন, তখনই বাংলার নবযুগের শেষ প্রতিনিধিরূপে তিনি আপন অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দান করিলেন। তাহার পরের ইতিহাস অন্যরূপ; রবীন্দ্র-জীবনের এই অধ্যায়ই বাংলার নবযুগের শেষ অধ্যায়। ইহার পর দেশ ও জাতির ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধনাও ভিন্নমুখী হইয়াছে, অথবা আরও নিশ্চিতরূপে আপন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এই যুগের রচনাবলীর সহিত পরবর্ত্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এই পরবর্ত্তীকালের যে কবিকীর্ত্তি তাহার বিচার-বিশ্লেষণ এ আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাহাতে নবযুগের সেই সাধনার ধারা যে খণ্ডিত হইয়াছে আমি অতঃপর তাহারই কিছু

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মাধুকরী

১

কল্পনা-গগনে
ভ্রমি আনমনে ;
তরুছায়ে চমকিল তোমার অঞ্চল,
ঝঙ্কারিল বুঝি তব নূপুর চঞ্চল !
বুঝি তুমি হেরিয়া আমারে
পুষ্পিত মালঞ্চ-বক্ষে গভীর আঁধারে
উৎসুক আনন্দে লুকাইলে—
সহসা অন্তরে শুখাইলে
স্ফুটমান আশার মঞ্জরী,
মন্দানিলে মোর 'পরে ঝরি
পড়িল শিশিরকণা শীর্ণধারে
বেদনার অশ্রু সম। আমি যে তোমারে
হারাইনু বাঁধিয়াও নয়নের আলিঙ্গনে,
লভিয়াও স্পর্শ তব নূপুরনিক্কণে !
হে মানসী প্রণয়নী প্রিয়া,
দূর হতে দর্শনের ছবিটুকু নিয়া
কাটিবে কি দীর্ঘ শুষ্ক দিন ?
হতাশার দগ্ধ বক্ষে লীন
হ'ল হায় ক্ষণিকের ক্ষীণস্রোতা আশা
বিফল হইল ভালবাসা !
না না, তুমি যাও নাই ; ঐ দূরে
বাজিল কঙ্কণ তব নব সুরে ;
সুবর্ণখচিত বস্ত্রাঞ্চল
হইল যে আবার চঞ্চল
মেঘবক্ষে ক্ষণপ্রভা সম ;
হে প্রেয়সী মম,
ঘনপত্র যূথিকার ঈষৎ আড়ালে
ঐ যে দাঁড়ালে
ছলনার হাসি হেসে,
গন্ধরাজ বিলম্বিত কেশে
ডা'কছ ইঙ্গিতে,
বিক্ষুব্ধ শোণিতস্রোত মোর ধমনীতে।

২

মুহূর্তের তরে
আমার অন্তরে
জ্ব'লে ওঠে সতেজে আবেগে
তীব্র তালে বজ্রবহ্নি সম ওঠে জেগে ;
সমুদ্র পীড়ন করে ঝড় যেন তেজে
শিরায় শিরায় যায় বেজে
শব্দহীন ঘোর কলরোল ;
দ্রুত হতে দ্রুততর মৃদঙ্গের বোল
কে যেন বাজায় বুকে অদৃশ্য আঙুলে ;
উঠে ফুলে ফুলে
শিরা-উপশিরা
চুনি পান্না মরকত হীরা
ঝ'রে পড়ে অবিরল আমার উপরে,
বিস্ফোরিত অগ্নিকণা ব'য়ে যায় অনন্ত নির্ঝরে।
বুঝি তার শেষ নাই, চিরস্থায়ী এক সে নিমেষে
বহুরূপা বিদ্যুৎ না'চয়া যায় লক্ষবর্ণ বেশে ;
কোটি কুসুমের গন্ধ ভ'রে ওঠে প্রাণে,
শিহরিত অন্তরাত্মা অপূর্ব্ব আঘ্রাণে,
আনন্দের কারাগারে বন্দি আমি
আনন্দ-সায়রে নামি ;
স্বপ্নক্লান্ত জাগি সখী নিঝুম হয়েছে
তোমার পরশে।

৩

একটি রজনী সখী, তারই মাঝে
জীবনের আরম্ভ ও শেষ।
একটি রজনী বঁধু, জ্যোৎস্নামাখা
রজনীগন্ধার গন্ধে পুলকিত,
দক্ষিণ সাগরপথে সঞ্চারিত
সুস্নিগ্ধ পবনে সুশীতল।
আজিকার এ নিশীথে উঠেছে চন্দ্রমা
মেঘ ভেসে আসিয়াছে বায়ুভরে
মন্থর গতিতে ক্রমে ধীরে
চ'লে গেছে আকাশের পথে।
তোমার মানসপটে
কত চিত্র বর্ণে বর্ণে উঠেছে ফুটিয়া ;
নয়ন হয়েছে সিক্ত অশ্রুজলে,
কভু দৃপ্ত হেরিয়াছি বিদ্যুৎবহ্নিতে,
হাস্যরসে কভু তরঙ্গিত ;
অথবা কখন অবসাদে
নিদ্রাক্রান্ত ধূমাচ্ছন্ন দীপশিখাসম।
আমি হেরিয়াছি তব রূপ
মায়ামুগ্ধ চোখে,
চমকিয়া উঠিয়াছি অকারণে,
লভিয়াছি পরশে তোমার
শেষ রসবিন্দু জীবনের।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

তাল এবং মিছিল

সেদিন এক বিবাহের নিমন্ত্রিত আসরে একটি ভদ্রলোক বলিতেছিলেন, তাঁহার ভয়ানক বদ অভ্যাস, উচিত কথাটি স্পষ্ট ভাষায় শুনাইয়া দেওয়া। এ বিষয়ে তিনি কাহাকেও পরোয়া করেন না, তা তিনি যত উচ্চপদস্থ লোকই হন না কেন। এই তো সেদিন কালেক্টার সাহেবকে ধরিয়াই দুই কথা অাচ্ছা করিয়া শুনাইয়া দিয়া আসিলেন। বললাম, সাহেব, আমাদের দেশের আসল খবর তো আর কিছু রাখ না। দু দিনের জন্য আসিয়া ফপরদালালি করিয়া চলিয়া যাও। এদিকে—

একটি দুষ্টবুদ্ধি যুবক প্রশ্ন করিয়া বসিল, ফপরদালালির ইংরেজীটা কি বলিয়াছিলেন? স্পষ্টবক্তার নিতান্ত মন্দ ভাগ্য। সভাসুদ্ধ লোক একযোগে এমন তুমুল হাস্য করিয়া উঠিল যে, স্পষ্টবক্তার সমস্ত কথা বেমালুম অস্পষ্ট হইয়া গেল।

যুবকটি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। সে সভাসুদ্ধ সমস্ত লোককে এক বিষম বিপত্তি হইতে বাঁচাইয়া দিল। বিপত্তি বইকি। যাঁহারা নিজেদের গুনপনা সম্বন্ধে বড় বেশি স্পষ্ট আলাপ করেন, তাঁহারা সভ্য-সমাজের আতঙ্ক। দেখা হইলে গা ছমছম করে। তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তি ধরাধামে রাখিয়া যাইতেছেন, সেগুলি দৈবক্রমে অপরের অজ্ঞাত। তাই যেখানে সেখানে, সুবিধা পাইলেই, জাঁক করিয়া শুনাইতে হয়, নহিলে লোকে

জানিবে কি করিয়া? অথচ লোকে যে জানে না, তাহার কারণই হইল, কীর্ত্তিটা একেবারে কাল্পনিক না হইলেও বলিবার মত কিছু নয়। বহ্বাস্ফোট-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই ওই এক ধরন, যাহা করেন, তাঁহা একেবারে ফলাও করিয়া জাহির করা চাই, যেন এ কর্ম্মটি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম।

জাহির করিবার ধরনটি সাধারণত দুই রকমের দেখা যায়। কেহ কেহ তিলকে তাল করিয়া জাহির করেন, আর কেহ কেহ আসল ব্যাপারটিকে না বাড়াইয়া এমন আড়ম্বর ও সমারোহ সহযোগে উহা ঘোষণা করেন যে, হঠাৎ ভ্রম হয়, সামান্য ব্যাপারটি বুঝি আসলে অসামান্য। প্রথমটি হইল অতিরঞ্জনের কৌশল। ইহার সুবিধা এই যে, বলিবার সময়ে ঢাক-ঢোল বাজাইবার দরকার হয় না। তিলটি তো প্রথমেই তালে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এখন উহা শুধু সকলের নাকের সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলেই হইল। সুতরাং মুখমণ্ডলে পরম ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততার অভিব্যক্তি ফলাইয়া তালটিকে কেবল বর্ণনা করিয়া গেলেই কার্য্যশেষ। ভাবখানা, ইহা লইয়া আর হৈ-চৈ করিব কি? আপনাদের কাছে অবশ্য খুবই অসাধারণ কীর্ত্তি বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আমার নিকট ইহা জলভাত। দ্বিতীয় প্রণালীটি বিবাহের মিছিলের মত। একটা রীতিমত তাণ্ডব সম্মুখে লইয়া জরিমখমল-পরিহিত নাতিসুশ্রী বালকটি দশাশ্বচালিত স্যন্দনে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। কেবল বরটিকে হয়তো দেখিলে নাক সিঁটকাইতেন। কিন্তু সমারোহে হকচকাইয়া গিয়া উহার আসল রূপটি দৃষ্টি এড়াইয়া গেল।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই জাতীয় বিপাকেই আমাকে পড়িতে হইয়াছে। অতিরঞ্জনের কৌশলী রঞ্জনবাবুর কথাই প্রথমে বলি। তিনি ঘরে ঢুকিবামাত্র ঘ্রাণেই যেন টের পাই, আলোয়ানের ভিতর একটি অতি পরিপক্ক তাল ঢাকিয়া ঢুকিয়া আনিয়াছেন। তাল সামলাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। প্রথমটায় এটা সেটা নানারকম ছোটখাট বিষয়ের আলোচনা চলিতে থাকে। উহা গ্রাউণ্ড প্রিপারেশন। অর্থাৎ, আলাপটা উচ্চগ্রামে না চড়াইয়া নীচু পর্দ্দায় বাঁধিয়া রাখিবার আয়োজন। ইহার সার্থকতা অনভিজ্ঞের নিকট প্রথমে ধরা পড়ে না। আমারও প্রথম প্রথম পড়ে নাই। উদ্দেশ্যটা পরে বুঝিয়াছি। আসল কথাটি পাড়িবার সময় আলাপের সুরটা যদি পূর্ব্বাপর একই রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সুরের সহিত 'তাল'এর বৈষম্যটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; এবং তালটা যেন হঠাৎ গাছ হইতে কাটিয়া গিয়া ধুম করিয়া পিঠের উপর পড়ে। চুটকি গান গাহিতে গাহিতে সুরটিকে রাখিয়া গানটি বদলাইয়া ভগবদ্গীতার শ্লোক যোজনা করিলে যাহা হয় আর কি। আপনি মনে মনে একেবারে লাফাইয়া উঠেন। ওই মানসিক উল্লম্ফনটাই রঞ্জনবাবুর এবং তাঁহার গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। রঞ্জনবাবুর ব্যবসা ডাক্তারি। পসারও মন্দ নয়। সেদিন নানা কথার ফাঁকে হঠাৎ বলিলেন, সাহেবগুলির

ইংরিজী বোঝা যায় না কেন, বলুন তো? আমি বলিলাম, কোন্ সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা করতে গিয়েছিলেন?

না, দেখা নয়। টেলিফোনে কথা হচ্ছিল।

কার সঙ্গে?

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে।

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে? কেন?

রঞ্জনবাবুর সুর অতি সহজ ও স্বাভাবিক। বলিলেন, না, বিশেষ কিছু নয়। আমার বাড়ির সামনে একটা ট্র্যাফিক পুলিশের বন্দোবস্তের জন্যে। যা রুগীর ভিড় হয়।

তাস্টিকে আলোয়ানের বাহিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াই পর-মুহূর্ত্তে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ইহাই নিয়ম। ভাবখানা হইল, এমন একটা কি কথা বলিলাম, যাহার জন্ত আমার কিংবা আপনার থমকাইয়া থাকিতে হইবে!

দূরের জিনিস যেমন ছোট এবং নিকটের জিনিস যেমন বড় দেখায়, ইহাদের চোখেও তেমনই অন্যের গুণগুলি ছোট লাগে এবং নিজেরগুলি বৃহৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়। নিজের তিলটি তাল বলিয়া মনে হয়, অপরের তালটিকে তিল বলিয়া বোধ হয়। মনশ্চক্ষুর এ রোগের চিকিৎসা নাই। উহাতে চশমা পরানো চলে না। ফলে রোগ বাড়িয়াই চলে।

রঞ্জনবাবুর জুড়ি হইলেন নবনীবাবু। ইনি এম. এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)। মস্ত পণ্ডিত। ইস্কুল হইতে ইউনিভার্সিটি পর্য্যন্ত বরাবর প্রথম হইয়া আসিয়াছেন। কৃতী অধ্যাপক, বক্তৃতায় পারদর্শী, যুক্তিতর্কে অদ্বিতীয়। যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহা দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। কিন্তু হইলে কি হইবে? ওই মনশ্চক্ষুর ব্যারামে একেবারে সব মাটি! একদিন তাস খেলিতে খেলিতে বলিয়া বসিলেন, জহরলাল নেহরু নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করিয়াছেন। আমরা স্তম্ভিত। বলিলাম, কেন?

আমার পুস্তকের একখানি কপি তাঁহাকে উপহার দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম। অথচ এ যাবৎ পাঠাইতেই পারিলাম না।—বলিয়াই নির্লিপ্তভাবে খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

কোন কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত ইহার সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল। উহাই অতিরঞ্জিত হইয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, এমন কি মান-অভিমানের সম্ভাবনায়, পরিণত হইয়াছে।

এখন মিছিলওয়ালাদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাদের কৌশল হইল সমারোহ। পথের ধারে বাজিকরদের খেলা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। সম্মুখে একটি কড়ি কিংবা কাষ্ঠপুত্তলী রাখিয়া খুব করিয়া ডুগডুগি বাজাইতে থাকে। লোকের

ভিড় জমিয়া যায়। সমারোহ দেখিয়া লোকে মনে করে, উহা সামান্য কড়ি কিংবা পুতুল নহে, আর কিছু। হয়তো এখনই নড়িয়া উঠিবে। আমাদের মিছিলওয়ালারাও ওই বাজিকরদের ন্যায় তাঁহাদের ক্ষুদ্র কীর্তিখানি সম্মুখে রাখিয়া উহাকে জাঁকাইয়া তুলিবার জন্য খুব খানিকটা হাত-পা ছুঁড়িতে থাকেন। তাঁহারা নিজেদের কীর্তিতে নিজেরাই মুগ্ধ, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, উহা পাঁচজনকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া শোনাইবার মত। বিবাহ-বাড়ির যে স্পষ্টবক্তাটির কথা বলিতেছিলাম, তিনি এই দলের। কালেক্টার সাহেবকে তিনি যাহা "শুনাইয়া" দিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সাধারণ কথা। বিদেশী লোক দুই দিন থাকিয়া এ দেশের কিছুই বুঝিতে পারে না, এই মাত্র। কিন্তু একে সাহেব, তাহার উপর একটা গোটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাহারও উপর এমনই এক প্রসঙ্গ যাহা চাকুরির দরবারও নয়, খেতাবের প্রার্থনাও নয়। সুতরাং এ এক মহা কীর্তি। ইঁহাদের বাড়াইয়া বলিবার দরকার হয় না। কোন দিন তাহা বলেনও না? সত্য সত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহাই যে এক রাজসূয় কীর্তি।

মাত্রাজ্ঞানের ত্রুটিটি লক্ষ্য করিতেছেন নিশ্চয়ই। ইহার কারণ আর কিছু নয়, কারণ হইল নিজেদের ক্ষুদ্রতা। যে প্রশ্রয় এবং বাহবা আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাহাদুরি দেখিয়া দিয়া থাকি, ইঁহারা নিজেরাই নিজেদের বাহবা দেন। সাবাস বটে! এত বড় সাহসের কথাটা তুমি কি করিয়া সাহেবকে বলিয়া আসিলে?—স্বগতোক্তিটা যেন কানে স্পষ্ট শোনা যায়।

আপনাকে যদি ঘণ্টাখানেক কাটাইতেই হয়, তাহা হইলে আপনি ইঁহাদের কোন্ দলে ভিড়িবেন? আমি বিনা দ্বিধায় মিছিলওয়ালাদের দলে ভিড়িব। দুই দলই অসহ্য। কিন্তু তবু যেটুকু তারতম্য আছে, তাহা বোধ করি ইঁহাদেরই অনুকূলে। ইঁহারা মানসিকভাবে অপর পক্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ এবং ভদ্র। নিজেদের তথাকথিত গৌরব লইয়া যে জগঝম্পটা বাজান, তাহা কুরুচিপূর্ণ ও মাত্রাবিরুদ্ধ হইলেও অপরের প্রতি তাহা অসম্মানজনক নহে। অনেকে ঘটা করিয়া পুত্রকন্যার জন্মোৎসব করেন। অপত্যলাভ এমন সাধারণ ব্যাপার যে ঘটা দেখিয়া অসহ্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। এ সমারোহ তাঁহাদের নিজেদের আনন্দের জন্য। অপরের দারিদ্র্য কিংবা অপুত্রক অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়া নয়।

রঞ্জন-নবনী সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। অন্যের প্রতি তাঁহাদের অনতিগোপন মনোভাবটি অসম্মানজনক। তাঁহারা মনে মনে অপরের মাথার উপর সর্ব্বক্ষণ পা তুলিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। কৃপা করিয়া কিংবা দায়ে ঠেকিয়া আজ আপনার সহিত আড্ডা দিতেছেন বটে, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যদি কাল প্রসন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার

"পেচকপক্ষীর পাখায় ভর করিয়া উন্নতির কোন্ অভ্রভেদী শিখরে তিনি উড়িয়া গিয়া বসিবেন, তাহা কি আপনি জানেন না? আগামী কল্যের এই সম্ভাবনায় তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ এত মশগুল যে, দুই দণ্ড বসিয়াই হাঁপ ধরিয়া উঠে।

সুবাস

প্রেম

তুমি নেই, তাই অন্ধকারের শূন্য ঘরের মধ্যে
একা একা প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ঝড় এল কালবোশেখী
ঘোলাটে মেঘের উদ্দামগতি এলোমেলো হাওয়া বইছে,
তোমার হাতের সূচীশিল্পের সবুজ পর্দ্দা উড়ছে!
তুমি নেই, তাই মন উদাসীন
স্মরণের বীণা বাজে রিমঝিম্
বিজন ঘরের স্তিমিত আলোয় প্রদীপের বুক পুড়ছে!

তুমি নেই, তাই প্রতীক্ষাময়ী চঞ্চল ঝ'ড়ো রাত্রে
আচমকা শুনি পায়ের শব্দ। অস্ফুট ভাষা শুনছি
বহিরাকাশের প্রান্তরে কত উদ্দাম ঘোড়া ছুটছে
মেঘলাবরণ চোখে বিদ্যুৎ হ্রেষায় বজ্র হাঁকছে!
অস্ত গিয়াছে মিলনের চাঁদ
মেঘে মেঘে তাই গভীর বিষাদ
আবছা আঁধারে হৃদয়ের দীপে শিখায়িত প্রেম কাঁপছে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পলিসি

পলিসি ধরেছ ভালো গো দাদারা, পলিসি ধরেছ ভালো,
এ গাঢ় তিমিরে যত দীপ জ্বলে, তোমরাই তাহা জ্বালো।
পরিকল্পনা তোমাদেরি জানি যেখানে যা ঘটে কাজ,
তোমাদেরি ওই কোনারক সাঁচী, তোমাদেরি ওই তাজ।
যারা করে কাম, তাহাদেরই নাম লেখা তোমাদের দলে,
যাহা করণীয় ক'রে ব'সে আছ, তাহারি নকল চলে।
পলিসি ধরেছ ভালো গো দাদারা, পলিসি ধরেছ ভালো,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতে পারিলে লাল হবে ঘোর-কালো।

সপ্তর্ষি

২

সোম-শুভ্র

ক

টেবিলের ওপর সাদা একখানি চাদর পাতা। তার ওপর কয়েকটা সাদা প্লেট। এক ধারে একখানি খবরের কাগজ বিছানো। সোম-শুভ্র একটি চকচকে কাঁচি দিয়ে পালংশাক কাটছিলেন। যে পাতাটি পোকায় খেয়েছে অথবা যেখানে সামান্যতম মলিনতার সংস্রব আছে ব'লে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, তা তৎক্ষণাৎ কেটে বাদ দিয়ে খবরের কাগজে জমা করছেন। তিনি যা খাবেন, তা নিখুঁত রকম নির্ম্মল হওয়া চাই এবং সে বিষয়ে তাঁর মন এত বেশি রকম সজাগ যে, তিনি নিজের হাতেই সব করেন। পাশেই চাল এবং ডাল রয়েছে। ইন্দু সব বেছে দিয়েছে একবার, তবু তিনি আর একবার নিজে দেখে দেবেন। কয়েকটি আলু, আধখানা বাঁধাকপি, গোটা দুই বিলিতী বেগুন হাতে ক'রে ইন্দু ঢুকল। সোম-শুভ্র প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তার দিকে হাসি-মুখে চাইলেন।

গরম জলে ধুয়ে নিয়ে এলে? আচ্ছা, রাখ ওই প্লেট দুটোতে। আমার আর কিছু লাগবে না।

আপনার কুকারটা ঠিক ক'রে দিই?

সব আমি ক'রে নেব এখন, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ইন্দু কোন উত্তর না দিয়ে আলু কপি আর বিলিতী বেগুনগুলো প্লেটে সাজিয়ে রাখতে লাগল। সোম-শুভ্র ক্ষণকাল ইন্দুর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে থেকে যেন তার আবদার রক্ষা করছেন, এই ভাবে বললেন, আচ্ছা, বেশ, তুমিই কর আজ সব। কুকারের বাটিগুলো গরম জলে ধুয়ে নাও একবার তা হ'লে। আমার বেতের বাক্সটাতে জল মাপবার ছোট মগটা আছে। ঠিক এক মগ জল লাগবে ঝরঝরে ভাত হতে। ডালে এক মগের কম দিলেও চলবে, পাতলা ডাল পছন্দ নয় আমার। হাসলেন একটু। ইন্দুর মুখেও সামান্য একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল। সে কুকারটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সোম-শুভ্র পালংশাক কাটা শেষ ক'রে চাল বাছতে লাগলেন।

যৌবনকালে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ব'লেই নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন ব'লে বাধ্য হয়ে স্বাবলম্বী হতে হয়েছে তাঁকে। সেকালে, ব্রাহ্মরা

গোঁড়া হিন্দুদের কাছে প্রায় অস্পৃশ্যই ছিলেন। পরিচয় জানতে পারলে হিন্দু রাঁধুনী পর্য্যন্ত থাকতে চাইত না। সোম-শুভ্র কখনও কারও কাছে নিজের পরিচয় গোপন করেন নি। ব্রাহ্মদের কাছে গিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বেধেছিল; অপরিচ্ছন্ন চাকরের হাতে খেতে তাঁর চিরকালই অপ্রবৃত্তি, সুতরাং স্বপাক আহারেই অভ্যস্ত হতে হয়েছে তাঁকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন কিন্তু এমন হয়েছে যে, অপরে রেঁধে দিলে তৃপ্তিই হয় না। সুরেশ্বরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক পরে হয়েছিল; ইকমিক কুকারও অনেক পরের কথা। সে যুগে সনাতন প্রথাতেই পিতলের বোক্‌নাতে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেতেন তিনি। নিজে হাতে রেঁধে খেতে হ'ত ব'লে তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা প্রায় নেই বললেই হয়,—তরি-তরকারি যা খান, তা হয় কাঁচা, না হয় সিদ্ধ। শরীরের জন্যে আর যা দরকার, তা পূরণ করেন দুধ দিয়ে। চাষবাস নিয়েই ছিলেন, সুতরাং গরুর অভাব হয় নি কখনও। তারপর অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে—বিহার-অঞ্চলে নিজের আস্তানাই গ'ড়ে উঠেছে একটা—বন্ধুবান্ধবেরও অভাব হয় নি পরে—সুরেশ্বরদের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতাই হয়েছিল—ইচ্ছে করলে অন্যভাবেও তিনি আহারের ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু স্বপাক ত্যাগ করেন নি তিনি। যে স্বাধীন মনোভাব তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল, সেই স্বাধীন মনোভাব তিনি বরাবর বজায় রেখেছেন। কখনও কোনও কারণে কারও অধীনতা স্বীকার করেন নি। বাল্যকালে হংস-শুভ্রের সঙ্গে বিলাসের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত আদর্শের জন্য অশেষ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে তাঁকে জীবনে। সে আদর্শ স্বাধীনতারই আদর্শ। বিদেশী রাজা আমাদের দেশ দখল করেছে ব'লে প্রাণ-মনও তাদের পায়ে সঁপে দিতে হবে, এই হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের হিড়িকে সবাই যখন সাহেবদের নকল করতে ব্যস্ত, তখন তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধা হয়েছিল সেই মহৎপুরুষটির প্রতি, যিনি সে যুগে মিশনারিদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, হিব্রু আর গ্রীক অধ্যয়ন ক'রে প্রচলিত বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, শাস্ত্র ঘেঁটে হিন্দুধর্ম্মের কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করেছিলেন, পৌত্তলিকতাই যে হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ কথা নয়, তা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে

পেয়েছিলেন। রামমোহনের মনীষাই নয়, তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর আত্মসম্মান-বোধ বেশি মুগ্ধ করেছিল সোম-শুভ্রকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কম মুগ্ধ করে নি। সে যুগে সকলেই যখন বিলাসের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন ওই ধনীর দুলালের সত্য-অনুসন্ধিৎসা, বিষয়ে বীতরাগ, পাশ্চাত্য সভ্যতার মারক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস সত্যিই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। মহর্ষি নিজেই যে স্বাধীনচিত্ত ছিলেন তা নয়, অপরের স্বাধীনতার ওপর তিনি জোর ক'রে কখনও হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। তাই তাঁর প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যখন মতবিরোধ হ'ল, তখন নিজের মতে নিজের পথেই চলতে দিলেন তিনি তাঁকে। নিজেরও আদর্শ পরিবর্ত্তন করলেন না, তাঁকেও পরিবর্ত্তন করবার জন্যে জবরদস্তি করলেন না। তাঁর সহধর্ম্মিণীকেও তিনি পৌত্তলিকতা থেকে জোর ক'রে বিরত করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর এই স্বাধীনতা-নিষ্ঠা যদিও সোম-শুভ্রের মনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল, তবু তিনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজে ঢোকবার চেষ্টা করেন নি, তার কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, স্বাদেশিকতার ছদ্মবেশে সে সমাজে যে সনাতনী মনোবৃত্তি তখনও ওতপ্রোত হয়ে ছিল, তা ঠিক সংস্কারমুক্ত মনোবৃত্তি নয়। উপবীতধারী ব্যক্তি-মাত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। কেশব সেনের অতি-প্রগতিশীল আন্দোলনেও তাঁর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয় নি, তা যেন বড্ড বেশি পাশ্চাত্য-ঘেঁষা ছিল। যদিও তিনিও মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন, তাঁর 'সুলভ সমাচার' যদিও স্বদেশী ভাবই উদ্দীপ্ত করত তখন সকলকার মনে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি যেন যীশুখ্রীষ্টেরই ভক্ত হয়ে পড়লেন। যীশুখ্রীষ্টের ওপর কারও বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু দেশে তখন 'স্বদেশী' ভাব জেগেছে—বেদান্ত উপনিষদ ছেড়ে বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনবার প্রবৃত্তি ক'মে আসছিল শিক্ষিত যুবকদের। দেশী কুসংস্কার এবং পাশ্চাত্য-বিহ্বলতা—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর। তাই হংস-শুভ্র যখন মেতেছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্যের দলে, সোম-শুভ্র তখন দীক্ষা নিচ্ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে দীক্ষা নিচ্ছিলেন ব'লে যে, মহর্ষির দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তা মোটেই নয়। নবগোপাল মিত্রের এবং রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধ তখন কোন্ যুবকের প্রাণে সাড়া না জাগাত! নবগোপাল মিত্রের নামই ছিল 'ন্যাশনাল' মিত্তির।

তাঁর কাগজের নাম ছিল 'ন্যাশন্যল পেপার'। তাঁর হিন্দুমেলায়, শঙ্কর ঘোষের লেনে তাঁর কুস্তির আখড়ায় সে যুগে কে না গেছে! সেই কুস্তির আখড়ায় সোম-শুভ্রও লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, তরোয়াল-খেলা শিখেছিলেন একদিন। লর্ড লিটন আসবার পর অবশ্য থেমে গেল সেসব। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতেও সাগ্রহে যেতেন তিনি। যেতেন না কেবল 'পলিটিকাল' সভায়। সেকালের বক্তৃতা-মুখর পলিটিকাল আন্দোলনে তাঁর প্রাণ ঠিক সাড়া দিত না। তাঁর মনে হ'ত, সাহেবী পোশাক প'রে বিলিতী মদ খেয়ে সভায় সভায় সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের লম্বা বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি, যদি কার্য্যত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের মর্য্যাদা আমরা না দিতে পারি? আমাদের নিজেদেরই সমাজে যখন জাতিভেদের অসাম্য, স্ত্রীলোকদের পরদা সরিয়ে দেবার সাহস নেই, কুসংস্কারের পঙ্কে সমস্ত দেশ যখন পঙ্কিল, ভ্রাতৃবিরোধই যখন সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনা, তখন সেখানে নিজেরা সেসব দূর করবার চেষ্টা না ক'রে বক্তৃতা করলেই কি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে? স্বায়ত্ত-শাসন তিনিও কাম্য মনে করতেন, কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি কাম্য মনে করতেন স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা অর্জ্জন করাকে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি, তাই এ কথাটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি যে, জনসাধারণ কর্ত্তৃক জনসাধারণের হিতের জন্য যে শাসনবিধি আমরা চাইছি, তা কখনও স্থায়ী হবে না, জনসাধারণ যদি তার উপযুক্ত না হয়। নিজের চিত্ত স্বাধীন না হ'লে সত্যিকার স্বাধীনতা কে দিতে পারে? সমাজের পায়ে অসংখ্য কুসংস্কারের শৃঙ্খল আমরা নিজেরাই পরিয়ে রেখেছি, অথচ তার অগ্রগতির জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি বিদেশী বড়লাটকে। এই হাস্যকর ব্যাপারে তাঁর মন কখনও সাড়া দেয় নি। তাই তিনি কংগ্রেস-সভায় বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা করবার চেষ্টা না ক'রে সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে। প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তাঁর পৌরুষ যেন কৃতার্থ হয়েছিল। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্যে তিনি ব্রাহ্ম হন নি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সে যুগে বিদ্রোহের প্রতীক ছিল ব'লেই তিনি সে ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বিদ্রোহী ছিলেন। কোন গণ্ডির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তিনি যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি, তার প্রমাণ, ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে

সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেন নি। সে সমাজেরও নানা কুসংস্কার নানা গোঁড়ামি তাঁর মনকে পীড়িত করত। শেষকালে সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মদের 'হামবড়া' ভাব। মুখে যদিও সকলে বিনয়ের অবতার ছিলেন, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্ত্তায় তাঁরা এমন ভাব প্রকাশ করতেন অব্রাহ্ম হিন্দুদের সম্পর্কে যে, সোম-শুভ্রের লজ্জা করত। কারও সঙ্গে খাপ খায় নি ব'লেই তিনি পালিয়েছিলেন বাংলা দেশ ছেড়ে বেহারের দেহাতে; এবং সেখানেই স্কুল ক'রে হাসপাতাল ক'রে নিজের আদর্শ জীবন যাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন এতকাল। এক সময়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, বেহার অঞ্চলে অনেকখানি জমি কিনে নির্য্যাতিত ব্রাহ্মদের জন্যে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবেন, অনেকেই তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্যে নির্য্যাতিত হতেন। অনেককে সাহায্য করতেন তিনি। ভেবে-চিন্তে উপনিবেশ স্থাপন করবার বাসনা ত্যাগ করেছিলেন তিনি শেষকালে। ভেবে দেখলেন, এতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হওয়া সম্ভব। বহু-সম্প্রদায়-বিভক্ত এই দেশে আর একটা সম্প্রদায় বাড়ালে বিরোধের আর একটা বীজ বপন করা হবে মাত্র। এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা প্রত্যঙ্গ— ওটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পৃথক করবার চেষ্টা করা অনুচিত। ওর যেটুকু ধর্ম্ম সেটুকু সনাতন হিন্দুশাস্ত্র থেকেই নেওয়া, আর ওর যেটুকু ঢং সেটুকু বিদেশী জিনিস। উপনিবেশ স্থাপন করলে অনিবার্য্যভাবে সেই ঢংটুকুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। নিছক ধর্ম্মচর্চ্চার জন্যে আলাদা উপনিবেশ স্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-সংস্কার করতে গেলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবার চেষ্টা করাই ভাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পর হয়ে যেতে হয়, তাতে লাভ হয় না,— লোকসান হয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। ধর্ম্মের জন্যে আদর্শের জন্যে কষ্টস্বীকার না করলে ঠিক যেন মূল্য দেওয়া হয় না তার। সুতরাং উৎসাহী ব্রাহ্ম-হিতৈষী হিসাবে ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁর খুব খাতির ছিল না। বন্ধু সুরেশ্বর ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলেন না তিনি। বেহারের যে অংশে তিনি জমি কিনেছিলেন, তা নেহাতই দেহাত—রেল-স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে—মেশবার মত বাঙালীও কাছে-পিঠে ছিল না বড় একটা। বেহারী জনমজুর, বেহারী চাকর-গোমস্তা, স্কুল, হাসপাতাল আর চাষবাস নিয়েই থাকতেন তিনি। বই প'ড়ে

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশের সঙ্গে যোগ ছিল বাংলা সাহিত্যের মারফত। বাংলা ভাষার প্রত্যেক লেখককে তিনি চিনতেন। সাহিত্য ছাড়া তাঁরা আর একটি শখ ছিল, তা বাগানের—শুধু ফলের নয়, ফুলেরও। প্রকৃতির কোলেই কেটেছে সারাটা জীবন। তাই কোন বিষয়ের কোন গোঁড়ামিই তাঁর মনকে আবিল ক'রে তোলে নি। তিনি মনের শুভ্রতা সত্যিই বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবাহ করেন নি, কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসেন নি, মিথ্যা কথা বলেন নি, হীন কাজ করেন নি কখনও কোনও রকম। তাঁর মনের আর একটা অবলম্বন ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। কলেজ-জীবনে আর্টের চেয়ে বিজ্ঞানের প্রতিই বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর, বিশেষ ক'রে উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি। উদ্ভিদ-জীবনের গহন রহস্যে নানা তত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন। যশোলিপ্সা থাকলে তাঁর ওই সব অপূর্ব্ব, অদ্ভুত এবং অনেক সময় আজগুবি গবেষণা ছাপিয়ে তিনি নাম করতে পারতেন, কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সত্যকে সন্ধান করবার যে আনন্দ, সেই আনন্দেই মশগুল থাকতেন, সেসব লিপিবদ্ধ ক'রে কাজে লাগাবার খেয়াল কখনও হয় নি। এমনও হয়েছে যে, তাঁর কল্পনা, তাঁর গবেষণা অনেক পরে অন্য বৈজ্ঞানিকের যশের কারণ হয়েছে, কিন্তু সেজন্য কখনও ক্ষুব্ধ হন নি তিনি, আনন্দিতই হয়েছেন। গাছেরও যে অনুভূতি আছে—এ কথা জগদীশচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে তাঁর মাথায় এসেছিল। জগদীশচন্দ্র, ঠিক তাঁর সহপাঠী না হ'লেও, সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যখন উদ্ভিদের অনুভূতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন সোম-শুভ্র নিজের কল্পনাকে একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় মূর্ত্ত দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। গাছের অনুভূতিই নয়, গাছ বিষয়ে নানা উদ্ভট কল্পনা আছে তাঁর। তাঁর ধারণা, পশুপক্ষীরাই শুধু যে মানুষের অনুরাগ-বিরাগ বুঝতে পারে তা নয়, গাছেরাও পারে। গাছকে ভালবাসলে সে হৃষ্ট হয়, ঘৃণা করলে ক্লিষ্ট হয়। বায়লজিস্টরা গাছকে জীব-জগতের নিম্নতম স্তরে স্থান দিয়েছেন গাছের পূর্ণ পরিচয় এখনও ঠিকমত পান নি ব'লে। ঘোড়ার শরীরে ডিপ্থিরিয়া এবং টেটানাস ঢুকিয়ে যখন প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্সিন তৈরি করা সম্ভব হ'ল, তখন সোম-শুভ্রের মনে হ'ল, গাছের শরীরেও যদি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে গাছও হয়তো প্রতিষেধক

কোনও ঔষধ প্রস্তুত করতে পারে। যে গাছ জীব-জগতের এত আহার এবং ঔষধ যোগাচ্ছে, তার পক্ষে এও অসম্ভব না হতে পারে। এই সব নিয়ে তাঁর কল্পনা-বিলাসের অন্ত নেই। এই সম্পর্কেই বিশেষ ক'রে তিনি এবার কলকাতায় এসেছেন।

হংস-শুভ্র এসে প্রবেশ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন সোম-শুভ্র।

ব'স ব'স। একটা কথা জানতে এলাম। শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনের খবর পেয়েছ তুমি?

হ্যাঁ, দু তরফ থেকেই পেয়েছি। শঙ্খর শ্বশুরবাড়ি থেকেও নিমন্ত্রণ করেছেন আমাকে। আগামী রবিবারে তো?

রবিবারে হবে না। ছুটির দিন দেখে অন্নপ্রাশন হয় না, শুভদিন দেখে হয়। পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ভাল দিন আছে, সেই দিনই ঠিক করছি। তুমি থাকতে পারবে তো? প্রায় দিন দশেক পেছিয়ে গেল।

পারব।

তা হ'লে তো ভালই হ'ল, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা হচ্ছিল। মৃগাঙ্ককেও চিঠি লিখে দিই তা হ'লে, তার এখন বম্বে যাওয়ার দরকার নেই। কংগ্রেসের একটা মীটিঙে ও না গেলে দেশোদ্ধার আটকে থাকবে না। সবাই দেশোদ্ধার করতেই মত্ত—নিজেকে উদ্ধার করা যে আগে দরকার, তা কেউ বুঝবে না।

হীরক এবং রজতের মুখ তাঁর মনে পড়ল। তাঁর এই পৌত্র দুটির জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাঁর। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে আজকাল ভাবাই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। হীরক জেলে; রজতের পেছনে নাকি এখনও পুলিস ঘুরছে, এত খরচ করা সত্ত্বেও। রজতের সম্বন্ধে একটা যা ভরসার কথা, ছোকরা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছে। মেয়েটাও নেহাত তুচ্ছ করবার মত নয়, কালো চোখের চাউনিতে আলো আছে। কাজলের ঢলঢলে মুখখানা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছু বলেন নি তিনি, কিন্তু এক নজর দেখেই এই নাত-বউটিকে ভারী পছন্দ হয়েছিল তাঁর। রজত কি একে ফেলে পালাতে পারবে? কিন্তু রজত সব পারে। একটুও মুখবিকৃতি না ক'রে কুইনিন-মিক্‌শ্চার খেয়ে বাজি জিতেছিল একদিন ছেলেবেলায়। ট্রেন ফেল ক'রে তুমুল বৃষ্টিতে হেঁটে এসেছিল কেবল কথা রাখবার জন্যে।

সব পারে। আজকালকার এই ডাকাত ছেলেগুলোর অসাধ্য কিছু নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মনে হ'ল, এর আগে এ দেশে এ রকম ছেলে ছিল কি? ক্ষুদিরাম? কানাইলাল?—বারীনের নামটা মনে পড়তেই মনটা খিঁচড়ে গেল হঠাৎ। না—না...হঠাৎ নজরে পড়ল, সোম-শুভ্র তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

আত্মস্থ হয়ে বললেন, ও, আচ্ছা, তুমি থাকছ তা হ'লে। দেখ, ভাবছি, এই বোধ হয় আমার জীবনের শেষ কাজ, একটু ভাল ক'রেই করব। কাশী থেকে ভাল পুরোহিত আনিয়ে রীতিমত যজ্ঞ ক'রে, বুঝলে—

উৎসাহভরে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন, সোম-শুভ্র চাল বাছছেন—ইতিপূর্ব্বে আরও দু-একবার দেখেছেন, তবু মেজাজটা বিগড়ে গেল নতুন ক'রে। গমনোদ্যত হয়ে বললেন, আচ্ছা, বিকেলে সব কথা হবে এখন।

বিকেলে আমি কলকাতা যাব ভাবছি।

ও, আচ্ছা।

একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সোম-শুভ্র প্রশান্তভাবে চাল বাছতে লাগলেন। মিনিট দুই পরে একটা কাচের কুঁজো হাতে ক'রে তারাপদ প্রবেশ করলে।

এই দেখ, তোমার মনোমত হয়েছে কি না। তিন বার ধুয়েছি।

কুঁজোটা তুলে ধরলে। সোম-শুভ্র ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে দেখলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, এখনও ময়লা ভাসছে। থাক, রেখে দাও তুমি, আমি নেব ঠিক ক'রে এখন।

কোথা ময়লা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু!

আবার বেরিয়ে গেল তারাপদ। একটু পরেই আবার জল-ভরতি কুঁজো নিয়ে ঢুকল।

নাও, দেখ।

সোম-শুভ্র দেখে বললেন, রেখে দাও। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, রেখে দাও না, আমি সব ঠিক ক'রে নেব।

তা তো নেবে। কিন্তু ওদিকে বড় কর্ত্তা যদি টের পায় যে, তুমি নিজে সব ঠিক ক'রে নিচ্ছ, তা হ'লে আর আস্ত রাখবে না আমাদের কাউকে।

তোমাদের বংশে রাগটি তো কারও কম নয়, নেপালী চাকরটাকে এমন খড়ম ছুঁড়ে মারলে সেদিন যে—

তারাপদ !

হংস-শুভ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওই শোন। এখন কলকাতা ছুটতে হবে আমাকে। অন্নপ্রাশনের তারিখ-ফারিখ সব উল্টে দিয়ে ব'সে আছে। যজ্ঞ হবে। বাণীকণ্ঠকে তার করা হয়ে গেছে।

বাণীকণ্ঠ কে ?

এ বাড়ির তোমরা কেউ চেন না তাকে। ওর এক ক্লাসের ইয়ার ছিল আগ্রায়। চমৎকার সারেঙ্গ বাজায়, এই তার গুণ।

তারাপদ !

উচ্চতর গ্রামে হংস-শুভ্রের ডাক শোনা গেল আবার।

আমি যাই। ইন্দু রইল, সে সব ঠিক ক'রে দেবে।

তারাপদ !

তারাপদ চ'লে গেল। কুকারের বাটিগুলি গরম জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে একটা ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ইন্দু প্রবেশ করলে একটু পরে।

চালগুলো ধুয়ে আনি ?

আন, ছাড়বে না যখন।

ইন্দু নিখুঁত নিপুণতা সহকারে বাছা চালগুলি গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোম-শুভ্র ডালে মন দিলেন।

খ

সোম-শুভ্র কলকাতায় এলে পরমানন্দের বাসাতেই ওঠেন। শশাঙ্কের বাসায় উঠতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় তাঁর। বাসন্তী এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে, কিন্তু তবু তিনি ওঠেন নি। শঙ্খ রজত হীরক—এদের কাউকে তিনি চেনেন না। শশাঙ্ককে চেনেন, কিন্তু— এই 'কিন্তু'টা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তিনি। অন্নপ্রাশনের দিনে যেতে হবেই, ভিড়ে গোলমালে কেটে যাবে কোন প্রকারে, এই ভরসা।

পরমানন্দ এবং অনামিকাকে আগে থাকতেই খবর দিয়েছিলেন। খবর না দিয়ে কোথাও যান না তিনি। পরমানন্দ এবং অনামিকা বিকেলে বেরিয়ে

পড়ে সাধারণত। কোন মহদুদ্দেশ্যে নয়, আড্ডা দিতে যায়। পরমানন্দ যায় নবকুমারের বাড়িতে, অনামিকা ইলার। পরমানন্দের চাকরি হয়েছে, নবকুমারের হয় নি। নবকুমার 'অধরা' নামক মাসিক-পত্রিকার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক। অনামিকার বিয়ে হয়েছে, ইলার হয় নি। ইলাও বিনা বেতনে শিক্ষয়িত্রীগিরি করেন সদ্য-স্থাপিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে। পরমানন্দ নবকুমার শুধু যে এক ক্লাসের লোক তা নয়, এক ধাতেরও। দুজনেই নোট-বই মুখস্থ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জ্জন করেছে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণও করেছে, কিন্তু একজনও ঠিক ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির নয়। সুলভ সংস্করণের নানা পুস্তকের দৌলতে দুজনেই—বিশেষ ক'রে নবকুমার—আধুনিক জগতের অনেক সংবাদ রাখে। ফড়ফড় ক'রে অনেক কিছু আউড়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে সাধারণ যে কোন লোককে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ওরা ঠিক 'ব্রাহ্মণ' নয়, এমন কি শিক্ষিতও নয়। ওরা ভারবাহী মাত্র। ওরা নানা বই থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে চতুর্দ্দিকে আস্ফালন ক'রে বেড়ায় নিজেদের জাহির করবার জন্যে এবং সেটাও নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে। শিক্ষাটা মনে প্রবেশ করলে যে সঙ্কোচ, যে দ্বিধা, যে বিনয় আত্মপ্রচারে বাধা সৃষ্টি করে, তা এদের নেই, এবং নেই ব'লেই যেন এরা গর্ব্বিত। অনামিকা ইলারও সেই দশা। লোক-দেখানো শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত হয় নি। মনোজগতের নয়, বস্তুজগতের সুখ-সুবিধা আহরণের জন্যেই ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে সর্ব্বদা নানা ভাবে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে।

তবু সোম-শুভ্র এদের কাছেই আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন। যদিও তিনি পরমানন্দকে মানুষ করেছেন এবং নিজে পছন্দ ক'রেই অনামিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন, তবু এদের যে তিনি ঠিক চেনেন না, তা তিনি নিজেও বুঝতেন। আজকাল কোন ছেলেকে 'মানুষ' করা মানে, তার জন্যে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করা। সে সত্যিই মানুষ হচ্ছে কি না, তা নির্দ্ধারণ করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব। পছন্দ ক'রে বিয়ে দেওয়াটাও অনেকটা ওই-জাতীয় অসম্ভব ব্যাপার। যে মেয়েটিকে পছন্দ করা যায়, সে সত্যিই পছন্দসই কি না, তা এক নজর দেখে বা সামান্য একটু-আধটু খবর নিয়ে বোঝা শক্ত। এসব জানা সত্ত্বেও সোম-শুভ্র এদের কাছেই নিজের

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক করলেন, তার কারণ, যৌবনের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, অসম্ভব এবং আজগুবি কল্পনা পরিহাসের পরিবর্তে স্বপ্ন উদ্রিক্ত করতে পারে কেবল যৌবনের মনেই। যৌবনের প্রতি তাঁর এই আস্থার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, আধুনিক ছেলে-মেয়েদের চপলতা, বিলাসপ্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বেচালকেও তিনি সহ্য করতেন। মনে করতেন, প্রাণের জীবন্ত প্রবাহ স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের তৈরি কৃত্রিম গণ্ডি অতিক্রম ক'রে যায় মাঝে মাঝে। চিরকালই যায়। ও নিয়ে বেশি বিচলিত হয় তারাই, যারা সত্যকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তবে এটাও ঠিক যে, তিনি বেচাল পছন্দ করতেন না, সভ্যসমাজের রীতিনীতি মেনে চলাটাই ভাল লাগত তাঁর, নিজেও মেনে চলতেন। জীবন্ত প্রাণের আবেগকে স্বীকার করতেন ব'লেই তার দুর্দ্দমনীয়তাকেও মানতেন। এই আবেগকে শুধু যে মানতেন তা নয়, এর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর।

জীবনের ছিয়াত্তর বছর যখন পূর্ণ হ'ল, এবং হঠাৎ যখন তাঁর পুরাতন ভৃত্য বকুহ্ সন্ন্যাস-রোগে মারা গেল এক ঘণ্টার মধ্যে, তখন তাঁর মনে হ'ল, জমা-খরচ মিলিয়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ এবার ঠিক ক'রে ফেলা উচিত। যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে। বিবাহ করেন নি, উত্তরাধিকারী কেউ নেই। দশ লক্ষ টাকার যে পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি পেয়েছিলেন, তা থেকে কিছুই তিনি প্রায় খরচ করেন নি। হাজার দশেক টাকা খরচ ক'রে জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সস্তায় যে দুশো বিঘে জমি কিনেছিলেন, তা থেকে শুধু তাঁর ভরণ-পোষণ নয়, অনেক উদ্বৃত্তও হয়েছে। স্কুল এবং হাসপাতাল চালাতে কিছু খরচ হয়েছে অবশ্য, বন্ধুবান্ধবরাও মাঝে মাঝে নিয়েছেন কিছু, শশাঙ্ককে কিছু দিয়েছিলেন একবার, পরমানন্দর জন্যেও কিছু গেছে, কিন্তু তবু এখনও সবসুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর ব্যাঙ্কে জমা আছে। এ টাকাটার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া তাঁর যেসব গবেষণা-মূলক অদ্ভুত কল্পনা আছে, সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা করাও উচিত—সম্ভব হ'লে যন্ত্র-সহযোগে সেসবের যাথার্থ্যও প্রমাণ করতে হবে। এই সম্পর্কেই তাই তিনি পরমানন্দ এবং অনামিকাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তারা যেন তাদের দু-একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনে

বুধবার সন্ধ্যায়, সেই দিন তিনি কলকাতায় পৌঁছবেন এবং তাদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে দু-একটা আলোচনা করবেন। পরমানন্দ অনামিকা তাই সেদিন আড্ডা দিতে না গিয়ে নবকুমার ইলাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল নিজেদের বাড়িতে। নবকুমার কাগজের সম্পাদক, সবজান্তা, সবাইকে ডাক লাগিয়ে কথা বলে। ইলা বি. এস-সি. পড়েছিল, তারও বৈজ্ঞানিক হতে বাধা নেই।

সোম-শুভ্র ঠিক সময়ে এসে পৌঁছলেন এবং পরমানন্দ, অনামিকা, নবকুমার, ইলার সম্মুখে এমন স-সঙ্কোচে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটি পাঠ করলেন যে, যেন তিনি বিশ্ববিখ্যাত কোন বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মুখে কতকগুলি হাস্যকর উদ্ভটতার অবতারণা ক'রে ধৃষ্টতা প্রকাশ করছেন।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

দ্বিতীয় অঙ্ক

কানাইবাবুর হোটেলের ছোট একটি ঘর। ঘরের মধ্যে তক্তাপোশ, টেবিল, আলনায় কোট পাণ্টলুন; ট্রাঙ্ক; টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। মুকুন্দ অর্থাৎ অনঙ্গমোহনের ভৃত্য মনিবের বিছানায় শুইয়া গড়াইতেছে আর নিজের মনে বকিতেছে

মুকুন্দ। ওরে বাবা! খিদের যে এমন তেজ তা আগে টের পাই নি, পেটের মধ্যে যেন রুশ-জার্মানের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।...দু মাস হ'ল কলকাতা ছেড়েছি, বাবু যাবেন বাড়ি—এতদিনে পৃথিবী ঘুরে আসা যায়! কোথায় গেল সব টাকাকড়ি, এখন এই পচা শহরে খিদের জ্বালায় ভুগে মরি। কেন বাপু, নিজের আয় বুঝে ব্যয় করলেই হয়! তা হবে না। নিজে যে মস্ত জমিদার, তা প্রমাণ করা চাই। মাইনের টাকাগুলো কলকাতাতেই শেষ। বুড়ো কর্ত্তা টাকা পাঠালে, তবে বাবু রওনা হলেন। মাঝখানে মাথায় যে কি চাপল, নেমে পড়লেন দিনাজশাহী শহরে। উঃ-হু-হু, পেটের মধ্যে সত্যি রুশ-জার্মানের লড়াই বেধে গিয়েছে। টাকাগুলো বাবুগিরি ক'রে, জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে এখন মুখটি চুন। কিন্তু চাল খাটো হবে না। [তাহার মনিবের বাচন-ভঙ্গীতে] মুকুন্দ,

যাও, হোটেলে গিয়ে সবচেয়ে ভাল ঘরটা রিজার্ভ কর। সবচেয়ে ভাল খানা চাই। যেন কোন নবাব-পুত্তুর আর কি! এদিকে তো কেরানীগিরি ক'রে কলম ক্ষ'য়ে গেল। নাঃ বাপু, কলকাতার চাকরি এবার ছেড়ে দেব, এর চেয়ে পাড়াগাঁয়ে বেশ আরামে থাকা যায়। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই; পছন্দমত একটা বিয়ে ক'রে ফেল, বউটা সব কাজ করবে, আর আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে—বাঃ, কি সুখের জীবন!

কিন্তু যাই বল, টাকা থাকলে কলকাতার মত আরামের জায়গা আর নেই। একখানা ফরসা ধুতি-চাদর হ'লেই সবাই 'বাবু' বলে, 'মশাই' বলে। গাড়োয়ান, রিকৃশওয়ালা সবাই 'আসুন' বলবে। ট্রামে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে চ'লে যাও। তোফা! তোফা! সাহেবী দোকানে ঢুকে পড়, কেনো, নাই কেনো, মেমসাহেবরা এসে বলবে 'সার'! নাঃ, আমাদের বাঙালী দোকানগুলো কিছু নয়।

অনেকক্ষণ পথে চ'লে কষ্ট হ'লে ট্রাম আছে, বাস আছে। না হয় ট্যাক্সি নাও। ভাড়া না থাকে তো তাতেই বা কি! এই ড্রাইভার, ঠারো, হামারা দোস্তকা কোঠি হ্যায়।—ব'লে এক বাড়ির সামনে নেমে পড়, আর পেছনের দরজা দিয়ে স'রে পড়। হাঃ-হাঃ, এইজন্যেই বড়লোকের বাড়ির দুটো দরজা। খাদ্যি-খানাও চমৎকার। কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেলেই বিপদ, এখন যেমন উপস্থিত। বুড়ো কর্ত্তা টাকা পাঠাচ্ছেনই, কিন্তু বুঝে-সুঝে খরচ করলে তো আর লোকে নবাব বলবে না! ট্যাক্সি ছাড়া বাবু চলবেন না, প্রত্যেক দিন সিনেমা দেখা চাই। তার পরদিন বলবেন, মুকুন্দ, দেখ তো কোটটা বেচে কিছু পাওয়া যায় কি না! আড়াইশো টাকার কোটে পঁচিশ টাকাও ওঠে না।…কেন বাপু, এত নবাবি না ক'রে আর দশজনের মত আপিসে গিয়ে খাটলেই হয়!…বুড়ো কর্ত্তা একবার জানতে পারলে জল-বিছুটির ব্যবস্থা করবে। কি মুশকিলেই পড়া গেছে! হোটেলওয়ালা জবাব দিয়েছে, সমস্ত দাম মিটিয়ে না দিলে আর এক পয়সার জিনিসও দেবে না। উঃ, পেটের মধ্যে কি লড়াইটাই না হচ্ছে! এক মুঠো ভাত পেলেও…ইস্, কি খিদেই না পেয়েছে! মনে হচ্ছে, এক গ্রাসে পৃথিবীটা খেয়ে ফেলতে পারি। কে? [দরজায় ধাক্কা] বাবু নিশ্চয়। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল]

(অনঙ্গমোহনের প্রবেশ)

অনঙ্গমোহন। এই নাও। [টুপি ও ছড়ি মুকুন্দর হাতে দিল] আবার তুমি আমার বিছানায় গড়াচ্ছিলে?

মুকুন্দ। তোমার বিছানায় শুতে যাব কেন?

অনঙ্গমোহন। বটে! আবার মিথ্যে কথা! বিছানা এলোমেলো হ'ল কেন?

মুকুন্দ। বিছানায় আমার কি দরকার? আমার পা নেই? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারি।

অনঙ্গমোহন। [পায়চারি করিতে করিতে] যাক, দেখ তো কৌটোয় সিগারেট আছে কি না!

মুকুন্দ। সিগারেট কোথেকে আসবে? চার দিন হ'ল ফুরিয়ে গিয়েছে।

অনঙ্গমোহন। [পায়চারি করিতে করিতে গম্ভীরভাবে] দেখ মুকুন্দ।

মুকুন্দ। আজ্ঞে?

অনঙ্গমোহন। [স্বর আগের চেয়ে কম গম্ভীর] একবার ওখানে যাও তো।

মুকুন্দ। কোথায়?

অনঙ্গমোহন। [স্বর আর গম্ভীর নয়; যেন অনুনয়ে পূর্ণ] নীচে, রান্নাঘরে, ওদের বল, আমাকে খাবার পাঠিয়ে দিক।

মুকুন্দ। আমি তা পারব না।

অনঙ্গমোহন। পারবে না? এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মুকুন্দ। কিছুতেই আর কিছু হবে না। হোটেলওয়ালা বলেছে, আর তোমাকে বিনা পয়সায় কিছু দেবে না।

অনঙ্গমোহন। এতখানি তার সাহস! আর কি করবে শুনি?

মুকুন্দ। সে বলছে, এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সে বলে, তোমার বাবু আজ তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি পয়সা দেয় নি। তোমরা ঠগ। তোমার বাবু জোচ্চোর। সে বলে, এ রকম ঠগ আগেও অনেকবার দেখেছি।

অনঙ্গমোহন। আর তোমার এত আস্পর্দ্ধা, সেই সব কথা আমার কাছে বলছ!

মুকুন্দ। হোটেলওয়ালা বলে, এই রকম লোক আসতে আরম্ভ করলে ছ মাসের মধ্যেই আমাকে লালবাতি জ্বালতে হবে। না, এবার আর

আমি ছাড়ছি না, আমি আজই তাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি, এর পরে যাতে শ্রীঘর যেতে হয় তার ব্যবস্থা করব।

অনঙ্গমোহন। থাক থাক। অনেক হয়েছে। এবার গিয়ে তাকে খানা পাঠিয়ে দিত বল।

মুকুন্দ। তার চেয়ে আমি তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। তাকে দিয়ে আমার কি দরকার? আমার দরকার তার খাবারগুলো।··আচ্ছা, তাকেই ডেকে নিয়ে এস।

মুকুন্দর প্রস্থান

উঃ, কি খিদেই না পেয়েছে! একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, খিদে দমন হয় কি না! চারগুণ আর বেড়ে উঠল। নাঃ, নৈহাটিতে সাত দিন কাটিয়ে কি ভুলই না করেছি! ওখানে জুয়াড়ীদের পাল্লায় না পড়লে আজ অনেক টাকা থাকত। আর এ কি পচা শহর, বাপ্‌স্! কেউ ধারে এক পয়সার জিনিস দিতে চায় না, প্রগতি ব'লে এখানে কিছু নেই দেখছি।

('মেবার পাহাড়', 'যমুনে তুমি কি সেই যমুনে!' প্রভৃতি সুর শিস দিয়া পায়চারি করিতে লাগিল)

(মুকুন্দ ও হোটেলের একজন খানসামার প্রবেশ)

খানসামা। বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি চাই?

অনঙ্গমোহন। আরে, তুমি যে! ভাল আছ তো?

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। তোমাদের হোটেলের খবর কি? সব ঠিক চলছে?

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। লোকজন কেমন আসছে?

খানসামা।—মন্দ নয়।

অনঙ্গমোহন। দেখ, ওরা এখনও আমার খাবার পাঠিয়ে দেয় নি। তুমি চটপট আমার খাবারটা পাঠিয়ে দাও তো। খেয়েই আমাকে একটা জরুরি কাজে বেরুতে হবে।

খানসামা। আমার মনিব বলেছেন, আর আপনাকে খাবার দেবেন না আজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর নালিশ করতে যাওয়ার কথা আছে।

অনঙ্গমোহন। এতে নালিশ করবার কি আছে? তুমিই ভেবে দেখ না, আমার কর্ত্তব্য কি? আমাকে খেতে হবে, না খেয়ে কতদিন থাকব? তাতে যে শরীর শুকিয়ে যাবে। বিষম খিদে পেয়েছে। ভেবো না যে, আমি ঠাট্টা করছি।

খানসামা। মনিব বলেছেন, আগের সব মিটিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত আর আপনাকে কিছু দেবেন না।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো। তুমি তাকে গিয়ে একটু বুঝিয়ে বল না।

খানসামা। এর মধ্যে বুঝিয়ে বলবার আর কি আছে?

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার এখন বিষম খিদে পেয়েছে। পেয়েছে কি না? আচ্ছা, তা হ'লে আমার খাওয়া দরকার। দরকার কি না? এই তো দিব্যি বুঝতে পেরেছ! সত্যি, তোমার কি বুদ্ধি! এইবার তোমার মনিবকে গিয়ে বুঝিয়ে বল। খিদে এক জিনিস, আর টাকা আর এক জিনিস। ছুটোকে মিশিয়ে ফেলতে নিষেধ ক'রো। তাকে বল গিয়ে যে, তার মত চাষা দু-চার দিন না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমার মত ভদ্রলোকের পক্ষে এক বেলাও অনাহারে থাকা অসম্ভব। অন্যায়। বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধ। বুঝেছ? এইবার গিয়ে বুঝিয়ে বল দেখি।

খানসামা। আচ্ছা হুজুর। আমি বলি গিয়ে।

খানসামা ও মুকুন্দর প্রস্থান

অনঙ্গমোহন। যদি সত্যিই সে খাবার না পাঠায়, তবে তো বিপদ! এমন খিদেও জন্মে পায় নি। পদ্মার হাওয়ায় খিদের আগুন দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল। কোট আর ট্রাউজার বাঁধা দিলে কিছু পাওয়া যায় না? না না, বরঞ্চ দু দিন না খেয়ে থাকা ভাল, তবু হার্ম্যানের বাড়ির নতুন স্থুট প'রে বাড়ি পৌঁছনো চাই।

...ইচ্ছে ছিল, মোটরে ক'রে কলকাতা থেকে খু্শালগুড় যাব। বেটা পেট্রলওয়ালা গোল করলে। নাঃ, বাকিতে দেব না। কেন বাপু? বড়লোক কবে নগদ দাম দেয়? মোটরে ক'রে বাড়ি পৌঁছতে পারলে শহরের লোক দেখে অবাক হয়ে যেত। কে আসছে? মিঃ অনঙ্গমোহন রায়, বি. এ., অফিসার অব দি সেক্রেটারিয়েট! মুকুন্দটাকে সামনে

বসিয়ে দিতাম, চকচক করছে চাপরাস আর উর্দ্দি! ওঃ, সে কি চমৎকার হ'ত! সব মাটি ক'রে দিলে বেটা পেট্রলওয়ালা। বাকিতে দেব না! নন্সেন্স! বড়লোকে কবে আবার নগদ কারবার করে! কিন্তু, উঃ, কি খিদেই না পেয়েছে!

(মুকুন্দর প্রবেশ)

কি খাব?

মুকুন্দ। খাবার নিয়ে আসছে।

অনঙ্গমোহন। [দুই চেয়ারে ভর দিয়া বার কয়েক দুলিল]

খাবার! খাবার! খাবার!
নামটি যেন বাবার।
না পেলে প্রাণ সাবাড়!

চমৎকার! চমৎকার! তুই বলছিলি, দেবে না?

(খানসামার থালা বাটি লইয়া প্রবেশ)

খানসামা। মনিব বললেন, এর পরে আর খাবার দেবেন না।

অনঙ্গমোহন। মনিব! মনিব! তোমার মনিবের আমি ভারি ধার ধারি কিনা! কি এনেছ?

খানসামা। ভাত, ডাল আর মাছের ঝোল।

অনঙ্গমোহন। শুধু ডাল আর মাছের ঝোল?

খানসামা। শুধু এই আজ হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। তোমার মনিবকে বল গিয়ে, ওসব ধাপ্পায় আমি ভুলব না। আর যা যা আছে, সব পাঠিয়ে দিতে বল।

খানসামা। আর কিছু হয় নি।

অনঙ্গমোহন। মাংস হয় নি?

খানসামা। না।

অনঙ্গমোহন। ফের মিথ্যে কথা! রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ওঠবার সময়ে দেখলাম, মাংস রাঁধছে। আর দুজন লোককে মাংসের চপ খেতে দেখলাম এখুনি।

খানসামা। আছে, কিন্তু নেই।

অনঙ্গমোহন। তার মানে?

খানসামা। তার মানে ওসব ভদ্রলোকদের জন্তে।

অনঙ্গমোহন। রাস্কেল!

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ। ওরা খাচ্ছে আর আমি পাই না কেন? আমি কি খেতে জানি না?

খানসামা। ওরা দাম দিয়ে খায়।

অনঙ্গমোহন। এসব বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা নিষ্ফল। [খাইতে খাইতে] একে মাছের ঝোল বলে নাকি? ঝাল নেই, নুন নেই, কেবল কতকগুলো জল। যাও, ভাল দেখে ঝোল পাঠিয়ে দাও।

খানসামা। মনিব বলেছেন, পছন্দ না হ'লে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে; আর কিছু সে পাবে না।

অনঙ্গমোহন। [পাছে ফিরাইয়া লইয়া যায়, সেই ভয়ে হাত দিয়া বাটি রক্ষা করিতে করিতে] তুমি রাস্কেল। তোমার মনিব ডবল রাস্কেল। আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার চলবে না ব'লে দিচ্ছি। [খাইতে খাইতে] কি ঝোল! আর কি মাছ! বাপ রে, জ'মে পাথর হয়ে গিয়েছে। এ মাছ নদীর, না পাহাড়ের? নাঃ, এ মাছই নয়।

খানসামা। মাছ নয় তো কি?

অনঙ্গমোহন। তোমার মাথা। চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল। এখন দাঁতগুলো না ভেঙে যায়! আর কিছু আছে?

খানসামা। না।

অনঙ্গমোহন। শূয়ার! গাধা! গরু! চাটনি নেই? দই? এ তো খাওয়ানো নয়, ভদ্রলোকদের পকেটমারা!

(খানসামা ও মুকুন্দ মিলিয়া থালা বাটি লইয়া টেবিল পরিষ্কার করিয়া ফেলিল; উভয়ের প্রস্থান)

নাঃ, পেট ভরল না, কেবল খিদে আরও বেড়ে গেল। পয়সা থাকলে বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নেওয়া যেত।

(মুকুন্দর প্রবেশ)

মুকুন্দ। বাবু, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন। তোমার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

নঙ্গমোহন। সর্ব্বনাশ! হোটেলওয়ালা বেটা নিশ্চয় নালিশ করেছে। জেলে নিয়ে যাবে নাকি? সেখানে যদি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করে··· না না, কখনই জেলে যাওয়া হবে না। এ কদিন এখানে মস্ত অফিসার সেজে বেড়াচ্ছিলাম, আর এখন জেলে···না না, সে কিছুতেই হবে না। লোকটার আস্পর্দ্ধা দেখ না, আমাকে ভাবে কি? আমি চোর জোচ্চোর, না মুটে-মজুর। আমি বলব, আমাকে কি ভাব? এত বড় তোমার সাহস! এত—

(সহসা দরজা খুলিয়া গেল; অনঙ্গমোহন ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও বলরাম প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত দুইজন দুইজনের দিকে ভীতভাবে তাকাইয়া থাকিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভীত ভাব কতক পরিমাণে কাটাইয়া বিনীতভাবে] সুপ্রভাত। আশা করি, আপনার সব মঙ্গল।

অনঙ্গমোহন। সুপ্রভাত, সার্।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমাকে মাপ করুন···

অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। এই শহরের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে আমার কর্ত্তব্য, এই শহরের বিদেশী অতিথিদের মঙ্গলামঙ্গল দেখা।

অনঙ্গমোহন। [প্রথমে ভীতভাবে, কিন্তু শেষে ভয় কাটাইয়া উঠিয়া] কিন্তু আমি কি করব বলুন? আমার দোষ নেই, আমি সব পাওনা মিটিয়ে দিতেই যাচ্ছিলাম—আজই বাড়ি থেকে আমার টাকা আসবার কথা। [ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিল] দোষ ওরই···লোকটা মাছ দেয় যেন পাথরে তৈরি, আর মাংস কেবলই হাড়। জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া মুখে দেবার উপায় নেই। চায়ে আঁশটে গন্ধ। কদিন থেকে বেটা আমায় না খাইয়ে রেখেছে। আমি কেন তাকে···কেন যে—

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভয় পাইয়া] মাপ করুন, কিন্তু সত্যি বলছি, আমার দোষ নয়। এখানকার বাজারে চমৎকার টাটকা মাছ ওঠে। তালাইমারির জেলেরা বড় ভাল লোক, বছরে তারা দুবার বারোয়ারী পূজো করে—একবার কালীপূজো, একবার হরিপূজো। ও বেটা যে এ মাছ কোথা থেকে নিয়ে আসে, জানি না। চলুন, আপনাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। না, আমি অন্য ঘরে যাব না। আমি বুঝতে পেরেছি, অন্য ঘর মানে কি—শ্রীঘর! আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাবার আপনার কি অধিকার? আমাকে রামা-শ্যামা মনে করবেন না। আমি কলকাতার অফিসার। আমি দেখে নেব, নিশ্চয় বলছি, দেখে নেব—

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ভগবান, রক্ষা কর! কি দুর্দ্দান্ত লোক! সব ধ'রে ফেলেছে দেখছি, বেটা দোকানদারেরা সব ফাঁস ক'রে দিয়েছে।

অনঙ্গমোহন। [সজোরে] পল্টন নিয়ে আসলেও আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না। আমি এক্ষুনি মন্ত্রীদের লিখে পাঠাচ্ছি। [টেবিল চাপড়াইয়া] এখন কি করতে চান, বলুন? কি মতলব আপনার?

ম্যাজিস্ট্রেট। [কম্পিতভাবে] দয়া করুন। আমার সর্ব্বনাশ করবেন না। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস করি, আমি ছাপোষা মানুষ, এসব ক'রে আমার সর্ব্বনাশ করবেন না।

অনঙ্গমোহন। না, আমি কিছুতেই যাব না। আপনার স্ত্রীপুত্র আছে তো আমার কি? আপনার স্ত্রীপুত্রের খাতিরে কি আমাকে জেলে যেতে হবে নাকি?

(ঘনরাম দরজায় উঁকি দিয়াই ভয়ে অদৃশ্য হইল)

ধন্যবাদ। আমি অন্য ঘরে যাব না।

ম্যাজিস্ট্রেট। [কম্পমান অবস্থায়] আমার সব দোষ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কি করব বলুন, আমি যে মাইনে পাই, তাতে চা-জলখাবারেরও খরচ ওঠে না, তার ওপরে অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা। ওরা বুঝি লাগিয়েছে, আমি ঘুষ নিয়েছি? ওসব কথায় বিশ্বাস করবেন না। হয়তো কিছু কলা-মূলো, হয়তো এক-আধ থান কাপড়। আর কসাই-বুড়ীকে চাবুক মারার গল্প ক'রে গিয়েছে বুঝি? সব মিথ্যে কথা। আমার শত্রুদের সব কারসাজি, ওদের অসাধ্য কিছু নেই, ওরা গলায় ছুরি দিতে পারে।

অনঙ্গমোহন। আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। কসাই-বুড়ীকে চাবুক মেরেছেন ব'লে আমাকেও যদি মারবেন ভাবেন, তবে ভুল করছেন। আমি তো বলছি, সব পাওনা মিটিয়ে দিতে রাজি আছি, কেবল এখন আমার হাতে টাকা নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ওঃ, শয়তান! কিছুতেই ধরা দিতে চায় না!

আমরা যেন এতই বোকা! আচ্ছা, দেখা যাক, এবারে কি হয়! [প্রকাশ্যে] আপনার যদি টাকার দরকার হয়, সেজন্যে ভাববেন না। আমি আছি। বিদেশী লোকদের সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

অনঙ্গমোহন। দিন কিছু টাকা হাওলাত। দেখুন, এক্ষুনি আমি হোটেলওয়ালাকে মিটিয়ে দিচ্ছি। একশো টাকা হ'লেই চলবে, কিছু কম হ'লেও ক্ষতি নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট। [নোট দিল] এই যে, ঠিক একশো টাকাই আছে। কষ্ট ক'রে আর গোনবার প্রয়োজন নেই। ও ঠিক আছে।

অনঙ্গমোহন। [টাকা লইয়া] বিশেষ বাধিত হলাম। বাড়ি গিয়েই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। অনিবার্য্য কারণে হঠাৎ টানাটানিতে প'ড়ে গিয়েছিলাম। আপনি সত্যিই ভদ্রলোক দেখছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] চার গিলেছে দেখছি, এবারে কাজ সহজ হয়ে আসবে। একশো ব'লে দুশো টাকা গছিয়ে দিয়েছি।

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ!

(মুকুন্দর প্রবেশ)

খানসামাকে ডাক দাও। [ম্যাজিস্ট্রেট ও বলরামের প্রতি] আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ঠিক আছি।

অনঙ্গমোহন। সে কি হয়? বসুন, বসুন। এখন বুঝতে পারছি, আপনি কেমন সরল আর কর্ত্তব্যপরায়ণ। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি...[বলরামের প্রতি] বসুন না।

(ম্যাজিষ্ট্রেট ও বলরাম বসিল। ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া শুনিবার চেষ্টায় নিযুক্ত)

ম্যাজিস্টেট। [স্বগত] একটু সাহস সঞ্চয় করা দরকার। উনি ওঁর ছদ্মবেশ বজায় রাখতে চান। তাই হবে। আমি এমন ব্যবহার করব, যেন চিনতেই পারি নি। [প্রকাশ্যে] ইনি বলরামবাবু, ইনি এই জেলার একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। এখন বলরামবাবু আর আমি দুজনে শহর পরিদর্শন করতে বেরিয়েছিলাম। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট আছে, শহরের কোন খোঁজ-খবরই রাখে না। আমি সে রকম নই। বিদেশী লোক যদি এখানে এসে বিপদে পড়ে, সে তো আমাকেই দেখতে হবে। কর্ত্তব্য

ছাড়া শাস্ত্রেও তো উপদেশ আছে, অপূজিতো অতিথির্যস্য গৃহাৎ যাতি বিনিঃশ্বসন্। ঘুরতে ঘুরতে এই হোটেলে এসে আপনার মত মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

অনঙ্গমোহন। আমিও আপনার পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছি। আপনি হাওলাত না দিলে আমাকে খুব কষ্টেই পড়তে হ'ত।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ও কথা অন্যকে ব'লো চাঁদ। কষ্টেই পড়তে হ'ত! বটে! ওসব চাল আমার কাছে দিও না। [প্রকাশ্যে] যদি কিছু না মনে করেন তো জানতে চাই, কোথায় যাচ্ছেন?

অনঙ্গমোহন। শিলিগুড়ি যাচ্ছি। ওখানেই আমার বাড়ি আর জমিদারি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বটে! শিলিগুড়ি! সোনার চাঁদ এত বড় মিথ্যেটা বলতে মুখে বাধল না! এর সঙ্গে খুব সমঝে চলতে হবে। [প্রকাশ্যে] দেশভ্রমণে যদিচ অসুবিধা আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। আপনি অবিশ্যি আনন্দলাভের জন্যে বেরিয়েছেন?

অনঙ্গমোহন। না, বাবা বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। আমি সার্ভিসে চটপট প্রমোশন পাচ্ছি না ব'লে তিনি আমার ওপর বিরক্ত। এই বুড়োদের ধারণা, কলকাতায় যাওয়ার পরদিনেই রায় বাহাদুর হওয়া যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] শোন কথা একবার! কি রকম গল্প ফেঁদে বসেছেন! আবার বুড়ো বাপকেও টেনে আনছে দেখছি। [প্রকাশ্যে] কতদিন দেশে থাকবেন?

অনঙ্গমোহন। কিছুই বলতে পারি না। বুড়োর যে কাণ্ডজ্ঞান আছে, তা মনে হয় না। কলকাতা ছেড়ে আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব। চাষাভুষোর মধ্যে জীবন কাটাবার জন্যে আমার জন্ম হয় নি। মদ ছাড়াও আমি বাঁচতে পারি, কিন্তু কাল্‌চার না হ'লে বাঁচা অসম্ভব। কাল্‌চার! কাল্‌চার! [কাল্‌চার শব্দ এমন ভাবে উচ্চারণ করিল, যেন দুর্লভ শ্যাম্পেন দুই ঢোক গলাধঃকরণ করিল]

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বুদ্ধি আছে বটে! কেমন মিথ্যের সঙ্গে মিথ্যের মালা গেঁথে চলেছে! ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই। আচ্ছা, দাঁড়াও, এখনই সব ফাঁস ক'রে দিচ্ছি। [প্রকাশ্যে] যা বলেছেন, এসব জায়গায় কি মানুষ থাকে! অবশ্য কর্তব্যের খাতিরে, দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে

থাকতে হয়। দিনে রাত্রে দেশের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু গভর্মেণ্ট কি এসব স্বার্থত্যাগের খোঁজ-খবর রাখে? [ঘরের দিকে তাকাইয়া] ঘরটা স্যাঁতসেঁতে ব'লে মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। যাচ্ছেতাই ঘর। আর ছারপোকা কি? এক-একটা যেন আস্ত ইঁদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি অন্যায়! এমন কাল্‌চার্ড অতিথিকে কতকগুলো নরাধম ছারপোকা কামড়ায়! এই সব হতভাগার জন্মাবার কি প্রয়োজন ছিল? ঘরটা অন্ধকার মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। ঘোর অন্ধকার। হোটেলওয়ালা আমার ঘরে আলো দেওয়া বন্ধ করেছে। কখনও কখনও পড়তে ইচ্ছে করে, আবার একটু-আধটু লেখবার অভ্যাসও আছে। নাঃ, ঘরটা একদম অন্ধকার।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি···কিন্তু—না, সে সাহসও নেই, সে যোগ্যতাও নেই।

অনঙ্গমোহন। ব্যাপার কি? বলুন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, আমি তার যোগ্য নই।

অনঙ্গমোহন। কোন ভয় নেই, খুলে ব'লে ফেলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বাড়ির দোতালায় চমৎকার একটি ঘর আছে। আলো বাতাস, চারদিক খোলামেলা, চমৎকার। ঠিক আপনার যেমনটি দরকার, সেই রকম। কিন্তু না না, আপনাকে যেতে বলবার যোগ্যতা আমার নেই। বেয়াদপি মাপ করবেন। সরলপ্রকৃতির লোক ব'লেই যা মনে এল ব'লে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।

অনঙ্গমোহন। এতে বেয়াদপি কিসের! ওই রকম একটি ঘর পেলে তো আমি বেঁচে যাই। এই নোংরা হোটেলের চেয়ে অনেক ভাল।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি কৃতার্থ হব, আমার স্ত্রী কৃতার্থ হবে, আমার মেয়েরা কৃতার্থতম হবে। ছেলেবেলা থেকে আতিথেয়তাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ব'লে মনে করতে শিক্ষা পেয়েছি। এ খোশামুদি মনে করবেন না। আমার যদি কোন দোষ না থাকে, তবে সে ওই দোষটি।

অনঙ্গমোহন। আমারও ঠিক ওই কথা। আমি নিজেও যেমন সরলপ্রকৃতি, তেমনই সরলপ্রকৃতির লোক ভালবাসি। আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান ছাড়া আপনার কাছে আর কিছু চাই না।

(খানসামা ও মুকুন্দের প্রবেশ। ঘনরাম উঁকি মারিল)

খানসামা। হুজুর, ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

অনঙ্গমোহন। বিল লে আও।

খানসামা। আজ সকালে দিয়ে গিয়েছিলাম। এই নিয়ে দুবার দেওয়া হ'ল।

অনঙ্গমোহন। তোমার বিলের কথা মনে রাখবার আমার সময় নেই। বল, কত হয়েছে ?

খানসামা। প্রথম দিন দুবেলা। তার পরদিন একবেলা, তার পর থেকে সব বাকিতে চলছে।

অনঙ্গমোহন। স্টুপিড! দফাওয়ারি বলবার দরকার নেই। মোটের ওপর কত হয়েছে বল না!

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি ব্যস্ত হবেন না। পরে হবে এখন। [খানসামাকে] যাও এখন, ভাগো। বিলের ব্যবস্থা করা যাবে।

অনঙ্গমোহন। ঠিক বলেছেন। [টাকা পকেটে রাখিয়া দিল]

(খানসামার প্রস্থান। ঘনরাম দরজায় উঁকি মারিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো একবার দেখবেন না ?

অনঙ্গমোহন। দেখবার মত এমন কি আছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট। দাতব্য-বিভাগের বিলি-ব্যবস্থা কি রকম, দেখা তো দরকার।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো, চলুন না।

(ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া মাথা বাহির করিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। তারপরে জেলা-স্কুল পরিদর্শনে যেতে পারেন। সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা কেমন দেখা দরকার।

অনঙ্গমোহন। দরকার বইকি।

ম্যাজিস্ট্রেট। তারপরে থানা এবং জেলখানায় যাওয়া আবশ্যক। আমরা কয়েদীদের কি রকম রাখি, তা জানা প্রয়োজন।

অনঙ্গমোহন। আবার থানা-জেলখানা কেন ? তার চেয়ে দাতব্য-প্রতিষ্ঠানগুলোই দেখব।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার যেমন অভিরুচি। আপনি নিজের গাড়িতে যাবেন, না আমার গাড়ি আনব ?

অনঙ্গমোহন। আপনার সঙ্গেই যাব, গল্পগুজব করতে করতে যাওয়া যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বলরামকে] বলরামবাবু, আমার গাড়িতে আপনার জায়গা হওয়া তো মুশকিল।

বলরাম। কিছু ভাববেন না, আমি ব্যবস্থা ক'রে নেব।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বলরামকে] দুখানা চিঠি নিয়ে এখনই ছুটে যান। একখানা দেবেন আমার স্ত্রীকে। আর একখানা দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের রসময়বাবুকে। [অনঙ্গমোহনের প্রতি] আপনি যদি অনুমতি করেন তো এখানে ব'সে আমার স্ত্রীকে দু ছত্র লিখে পাঠাই যে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার কুটীরে পদধূলি দিতে সম্মত হয়েছেন।

অনঙ্গমোহন। লিখুন না। এই যে দোয়াত। কাগজ! কাগজ কই? যাকগে, এই বিলখানার অপর পিঠে লিখতে পারেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। বেশ তো, চমৎকার হবে। [নিজের মনে লিখিতে ও বলিতে লাগিল] খাওয়ার পরে দেখা যাবে এখন। এক বোতল হুইস্কি আছে। কয়েক পেগ পেটে গেলে দেখা যাবে, বাছাধনের পেটে কি আছে!

(চিঠি বলরামের হাতে দিল। সে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। হঠাৎ দরজা খুলিতেই ঘনরাম ঘরের মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। সে এতক্ষণ দরজায় ঠেস দিয়া সব শুনিতেছিল)

অনঙ্গমোহন। আশা করি, আপনার লাগে নি।

ঘনরাম। না না, এমন কিছু নয়। শুধু নাকটা একটু থেঁতলে গিয়েছে। সিভিল-সার্জনের কাছে গেলে এখুনি সেরে যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [ঘনরামের দিকে রুষ্টভাবে তাকাইয়া অনঙ্গমোহনকে বলিল] না না, এমন কিছু নয়। চলুন, রওনা হওয়া যাক। আপনার চাকর জিনিসপত্তর নিয়ে যাবে। [মুকুন্দকে] ওহে বাপু, আমার বাড়িতে, তার মানে, ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে এস। [অনঙ্গমোহনকে] না না, সে কি হয়! আপনি আগে চলুন। [অনঙ্গমোহনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বাহির হইবার সময়ে ঘনরামের দিকে রুষ্টভাবে তাকাইয়া] ঠিক আপনার মতই কাজ হয়েছে। আর কোথাও কি পড়বার জায়গা পেলেন না!

(সকলের প্রস্থান। নাক ধরিয়া ঘনরামের অনুসরণ)

ক্রমশ—প্র. না. বি

ডিমের সেন্সাস

(ডিম্বের ন্যায় ছন্দও এক রকম নয়)

ব্রহ্মাণ্ডই অণ্ড যখন— অখণ্ড এই বিশ্ব—
ডিম্ব এবং বিম্ব নিয়েই এই চ াচর দৃশ্য,
বসল সভা রাক্ষুসে এক, ছায়ার তলে নিম্বের,
অতি ত্বরিৎ করতে হবে সেন্সাস সব ডিম্বের।
ক্রমে ক্রমে উঠছে বেড়ে সকল ডিমের মূল্য,
মহার্ঘ কি হবে শেষে সেও সোনার তুল্য ?
পাড়ছে নাকো ডিম কি দেশের মুরগী এবং হংস ?
কিংবা তাহা লুকিয়ে রাখে, কিংবা করে ধ্বংস ?
সত্য ব্যাপার বুঝতে হবে, করতে হবে, হোক গো-
বিশ্বজিতের প্রায়ই সমান ডিম্বজিৎ এক যজ্ঞ।

২

যত নিখিল-বঙ্গীয় সব মুরগী এবং হংস,
সকল রকম খেচর ভূচর জলচরের বংশ—
মশা, মাছি, সর্প হতে টিকটিকি আর কুম্ভীর,
বাদ যাবে না সরীসৃপও, ব্যাপারটা খুব গম্ভীর।
খুঁজতে হবে পগার পাহাড়, বন-বাদাড়ের গর্ত্ত
বালুর চর ও ঘুঘুর বাসা, এইটে হবে শর্ত্ত।
তক্তাপোশের তলার বিবর, ছাদের ফাটাল, ভিত্তি
দলে দলে নিপুণভাবে খুঁজতে হবে নিত্যি।
অণুর মত ডিম্ব আছে ঝোপের মাঝে উহু—
মাইক্রস্‌কোপ শক্তিশালী সঙ্গে নেবে বুঝছ।

৩

বোজাবে না গর্ত্ত কেহ, কাটবে না কেউ কাঠ,
দেবে নাকো রৌদ্রে চাটাই মাদুর কিংবা খাট,
সর্প যদি ডিম্ব লুকায় আনবে ডেকে মাল,
বাস্তু-সাপে বাহির ক'রে করবে নাজেহাল,
অণ্ডজেরা বিষম বেকুব বুঝিয়ে দেবে বেশ,
হচ্ছে আদমসুমারি, আর থাকবে নাকো ক্লেশ।

শর কাশ ও বেনার বনে থাকবে যে যথায়
পড়বে সবাই স্মরণীয় আইনের আওতায়।

৪

ধরলে পরে ডিম্ব-সহ কই কি ইলিশ মাছই,
ট্যাংরা, কই, বা মৌরলাদি নেইকো বাছাবাছি,
অবিলম্বে করবে হাজির হোক না যত সের
সম্মুখেতে মাননীয় স্কোয়াড-মাষ্টারের।
তৎপরতার নাইক সীমা চৌদিকে আশ্বাস
সুলভ হবে ডিম্ব, চলে ডিম্বেরি সেন্সাস।
অঙ্কেতে আর কুলায় নাকো দীর্ঘ দু মাস পর
সাঙ্গ হ'ল ঠুকঠুকানি গণকদের সফর।
সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ ক'রে—বিবৃতি এইটাই,
ডিম্ব তেমন সুখাদ্য নয়, ডিম্ব বেশি নাই।
ডিম না পেলে তার বদলে সবাই খাবে ফ্যান,
খোলা না হোক কাটা হ'ল গ্রন্থি গর্ডিয়্যান।
আঙুর-ক্ষেতে হাসল শৃগাল, বার হ'ল গর্দ্দভ,
ডাকল ভেবে কোথায় তাহার আত্মীয়েরা সব।
বংশীতে হায় তবু যে চিড—পায় না তরী কূল
বাহির হ'ল তালিকাটায় একটা বেজায় ভুল।
ঘোড়ার ডিমের সংখ্যা ল'য়ে বাধল বিসম্বাদ
গণনাটাই বাতিল—বাতিল বেবাক সে তায়দাদ।
ডিম্ব থেকে ছুটল ঘোড়া উষ্ট্রপাখীবৎ—
নেংটি ইঁদুর করলে প্রসব প্রকাণ্ড পর্ব্বত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জীবন

অব্যক্তও ধরা দেয় দুটি ক্ষীণ বাহু বিস্তারিয়া,
তাহারে ধরার নামে মোরা উঠি উৎসবে মাতিয়া—
নবশিশু জন্ম নেয়, মোরা খুঁজে মরি তার নাম,
জীবন কিছুই নয়—অব্যক্তের ক্ষণিক বিশ্রাম।

মঞ্জরী রায়

নীলকণ্ঠ কেবিন।

নামকরণটি ঠিকই হইয়াছিল। স্বয়ং নীলকণ্ঠ ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে কেবিনটি নিরাপদ নহে, এবং এ কেবিনে কয়েকদিন আসিয়া যে টিকিয়া থাকিতে পারিবে, সে প্রায় নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে, ভবিষ্যতে অন্য কোথাও সে সহজে ঘায়েল হইবে না।

তবু সিনেমায় বাংলা ছবি দেখিবার যেমন লোকের অভাব হয় না, তেমনই নীলকণ্ঠ কেবিনেও খরিদ্দারের অভাব হয় না। যাঁহারা ফিরিবার সময় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যান, মনে মনে (কখনও বা প্রকাশ্যেই) প্রতিজ্ঞা করেন, আর কখনও এ'দিককার ছায়াও মাড়াইবেন না, তাঁহারাই পরদিন যথাসময়ে আসিয়া হাজির হন। ইহাদের মধ্যে আমি অন্যতম।

ইহার কারণ আছে। নীলকণ্ঠ কেবিনটি এ পাড়ার বনিয়াদী রেস্তরাঁ এবং দীপালী সিনেমার প্রায় মুখামুখি। ইহার ভয়েই বোধ হয় কাছাকাছি অন্য কেহ রেস্তরাঁ খুলিতে ভরসা পায় নাই। পাড়ার লোক পাড়া ছাড়িয়া অন্য পাড়ার রেস্তরাঁয় গিয়া চা খাইয়া আসিবে, বাঙালী আজিও এতটা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস' হইতে পারে নাই। সুতরাং পাড়ার সবেধন নীলমণি নীলকণ্ঠ কেবিন বেশ দাপটের সহিতই টিকিতেছে।

রোজই বিরক্ত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ফিরি যে, কাল আর আসিব না। কিন্তু পরদিন সে কথা নীলকণ্ঠ কেবিনে ঢুকিবার আগে পর্য্যন্ত আর মনে থাকে না। ঢুকিয়াই বলি, ওরে ছোকরা, চা আন্ দেখি। পেয়ালাটা বেশ ক'রে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিস বাপু। ঐ বলা পর্য্যন্তই। পেয়ালাটা বাস্তবিক গরম জল দিয়া ধোয়া হইল কি না সেটা দেখার আর প্রয়োজন মনে করি না। আমার বিবেকের কাছে আমি তো পরিষ্কার রহিলাম, এখন ছোকরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অধৌত পেয়ালাতেই আমাকে চা দেয় তো পরলোকে ইহার জন্য ও-ই জবাবদিহি করিবে। আমার কি তাহাতে?

শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক বছর আগে নাকি এই কেবিনের পানীয় এবং ভোজ্য ভালই ছিল, কিন্তু পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী ব্যবসায়ীরা সাধারণত যাহা করিয়া থাকে, নীলকণ্ঠ কেবিনও ঠিক তাহাই করিয়াছে।

আমি যে রোজ নীলকণ্ঠ কেবিনে আসি তাহার ব্যক্তিগত কারণও আছে। গল্প লেখা আমার পেশা—শুধু পেশা নয়, নেশাও বটে। কিন্তু নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া লেখার পক্ষপাতী আমি নই। এই কেবিনে আমার গল্প লেখার বাস্তব খোরাক প্রচুর মেলে। আমি কিছু বলি না, শুধু এক পাশে চুপচাপ বসিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিবার ভান করি এবং মাঝে মাঝে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিই। সঙ্গে সঙ্গে কান দুইটি খাড়া রাখি এবং চোখ দুইটিও সর্ব্বদা সজাগ থাকে।

আমার একটি দিনের অভিজ্ঞতা মাত্র নমুনাস্বরূপ বলিতেছি। চায়ের কাপে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিতেছি, এমন সময় রুক্ষচুল সুক্ষদেহ এক ভদ্রলোক ধাঁ করিয়া ঢুকিয়াই আমার পাশের চেয়ারে বসিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। তাঁহার পরনে লংক্লথের পায়জামা, গেঞ্জি-পরা গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে চটি এবং মাথায় মাড়োয়ারী টুপি। আমি তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিতেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, বলছি বলছি মশাই, সব বলছি। আগে একটু জিরিয়ে নিতে দিন। কি রকম হাঁফাচ্ছি, দেখছেন না?

আমি কহিলাম, কই, কিছু তো আমি জানতে চাই নি আপনার কাছে।

হাত ঘুরাইয়া ভদ্রলোক কহিলেন, জানতে না চাইলেও চাওয়া আপনার উচিত ছিল। দুনিয়ায় জ্ঞানযোগটাই হচ্ছে সেরা যোগ। আর এ ব্যাপারে ভেদাভেদ রাখতে নেই, সে হচ্ছে মূঢ়তা। যার কাছ থেকে যতটুকু পারেন ততটুকুই জেনে নেবেন। এইজন্তেই তো শাস্ত্রে বলেছে, স্ত্রী-রত্নং দুষ্কুলাদপি। বলিলাম, তা হয়তো বলেছে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কথার কোনও যোগাযোগ নেই। তিনি বলিলেন, দেখুন, দুনিয়ায় কিসের সঙ্গে যে কিসের যোগ, সেটাও বুঝতে পারা সহজ নয়। এই বোয়, দো কাপ চা, দোঠো ডবল মামলেট। না না, আপনাকেও খেতে হবে। কোনও আবদার শুনছি না। চা ও অমলেট খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোকের কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

বন্ধুর মত পরামর্শ দিচ্ছি মশাই, কখখনও কিন্তু প্রেমে-ট্রেমে পড়বেন না। পড়লেই স্রেফ মারা পড়বেন। উঃ, এসব কি আর ভদ্রলোক সইতে পারে? রীতিমত নুইসেন্স। আমার ব্যাপারটাই সংক্ষেপে শুনুন।

মঞ্জরী রায়ের প্রেমে পড়লুম। তাকে না পেলে আমার কত রকমের সর্ব্বনাশ হবে, তার একটা লম্বা ফর্দ্দ তাকে দিলুম। মঞ্জরী হেসে বললে, বেশ তো। আমি ধনী বাপের একমাত্র ছেলে, টাকা আমার কাছে খোলামকুচি। মঞ্জরী আমার টাকায় খুশিমত থিয়েটার বায়স্কোপ দেখতে লাগল, যখন তখন ফারপো, গ্রেট ইষ্টার্ন, চাংওয়া, গ্র্যাণ্ড হোটেল ক'রে বেড়াতে লাগল। মঞ্জরীর বাপেরও পয়সা কম ছিল না, কিন্তু মঞ্জরী বাপের টাকায় হাত দিতে অপমান বোধ করত। বলত, তোমার টাকা থাকতে আমায় পরের কাছে হাত পাততে হবে কেন? কত বড় সম্মানটা মঞ্জরী আমাকে দিলে, ভেবে দেখুন একবার।—বলিয়া আমাকে ভাবিতে সময় দিবার জন্তই বোধ হয় তিনি পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া ভিতরকার নয় টাকা চৌদ্দ আনা বাহির করিয়া গুনিয়া আবার রাখিয়া দিলেন এবং আবার শুরু করিলেন, কিন্তু বিয়ের কথা তুললেই মঞ্জরী নানা বাজে ওজুহাতে সে কথা এড়িয়ে যেত। জেরা করতে গেলেই তার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠত, কিন্তু কিছু বলত না সে। বোয়, খুব ভাল পুডিং দেখি দুখানা।

চার আনা ক'রে? আরে বাপু, দাম জানতে চাইছে কে? সাধে কি আর শাস্ত্রে লিখেছে, 'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌'?

দুইজনের প্লেটে দুইখানা পুডিং আসিল ও উড়িয়া গেল। আরও দুইখানা এবং আরও দুইখানা। নীলকণ্ঠ-মার্কা হইলেও পুডিংটাই ওই কেবিনের সেরা জিনিস; তাহা ছাড়া পরস্মৈপদী বলিয়া ভোজনে পরমানন্দ লাভ করিলাম। ভদ্রলোক একটি পাঁচ টাকার নোট মনিব্যাগের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ধাঁ করিয়া আমার কোটের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, এই পাঁচটি টাকা এ কেবিনে আজকে খরচা ক'রে যাবই, যেমন ক'রে হোক। ততক্ষণ থাক ও ব্যাটা আপনার পকেটে। গল্প শুনুন। ওরে ছোকরা, দে দেখি তোদের কি কি ভাল জিনিস আছে। ঠিক হিসেব ক'রে পাঁচ টাকা পুরিয়ে দিবি। এক পয়সা কম-বেশি হ'লে গাঁট্টা মেরে মাথা ফাটিয়ে দোব।...তারপর শুনুন মশায়। মঞ্জরীকে একদিন জোর ক'রে চেপে ধরলুম—মানে, চেপে ধরা ঠিক নয়, প্রশ্নের বাণে জর্জ্জর করলুম আর কি—বিয়ের কথাটাকে সে শুধু ধামাচাপা দিয়েই রাখতে চায় কেন? মঞ্জরী বললে, এবারকার বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরলেই জানতে পারবে। জানতে পারলুম, দু বার ফেল-করা পালোয়ান বন্ধু তৃতীয় বারে পাস ক'রে এসে আমাকে ঘুষি দেখিয়ে জানিয়ে গেল, মঞ্জরীর আশা যেন আমি ত্যাগ করি, কেন না সে তিন বারের মধ্যে বি.এ. পাস করতে পারলেই মঞ্জরী তাকে বিয়ে করবে ব'লে কথা দিয়েছিল। মঞ্জরী ছলছল চোখে জানালে, আমি জানতুম, টুল-বেঞ্চিরা যতদিন বি.এ. পাস না করছে, ততদিন বন্ধু কিছুতেই পাস করতে পারবে না। তাই তো ও রকম বলেছিলুম। এখন কি করি বল তো? তুমি তো বুঝতে পার, মনে মনে তোমাকেই আমি...। ভাবলুম, সত্যিই তাই, কেন না বন্ধু ছোঁড়ার চেহারা আমার চাইতে ভাল হ'লেও আমার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টের চেহারার কাছে একেবারে নট কিসসু। কিন্তু বন্ধু যেমন ষণ্ডা, তেমনই বেপরোয়া, কাউকে কেয়ার করে না। ওকে ডোণ্ট কেয়ার করার মত সাহস আমার ছিল না। বি.এ. পাস না করা পর্য্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞামত চুপ ক'রে ছিল, এইবার সে জোর ক'রে নিজের দাবি জানাতে লাগল। কালীঘাটে গিয়ে বললুম, মঞ্জরীকে বুঝি হারালুম। মা কালী, একটা বিহিত কর মা। মা কালী বিহিত করলেন। হঠাৎ এক-দিন শেষরাত্রে বন্ধুর বাড়ি সার্চ হয়ে গেল। কাগজপত্র তার সুটকেসে যা পাওয়া গেল, তার ফলে সরকারী অতিথিশালার দুয়ার তার জন্তে খুলে গেল, আর সে ঢুকতেই ঝপাং ক'রে বন্ধ হয়ে গেল। কত তদ্বির, কত দরখাস্ত, কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার কিন্তু মশাই সত্যি এতে কোনও হাত ছিল না—আমি শুধু মা কালীকে একটু বিহিত করতে বলেছিলুম মাত্র, বন্ধুর এ রকম অহিত করতে আমি বলি নি। অথচ অনেকের সন্দেহ হয়ে গেল, আমিই এ ব্যাপারের জন্তে পুরোপুরি দায়ী, বন্ধুর কাগজপত্রের গোপন খবর

যথাস্থানে আমিই দিয়েছিলুম। বন্ধুর ডজন খানেক পালোয়ান বন্ধু আমায় শাসিয়ে গেল, আমায় টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে গঙ্গার জলে না ভাসিয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত ওরা টেঁকি কাটবে না। দেখুন, প্রেম করতে গিয়ে কি ফ্যাসাদ! অজয় ভটাচায্যি সাধে কি আর লিখে গেছে—'প্রেমের পূজায় এই তো লভিলি ফল'! আমি তো ভয়ে আর বেরোতে পারি না বাড়ি থেকে। বললুম, এ কি করলে মা কালী? মা কালী আর একবার বিহিত করলেন। যণ্ডারা সবাই বন্দী হ'ল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরলুম। কিন্তু আর এক চিন্তায় প'ড়ে গেলুম। মঞ্জরীর বাড়ি গিয়ে দেখি, সামনে টু-লেট ঝুলছে। পাড়ার কেউ বলতে পারলে না, কোথায় তারা গেছে। তারপর পুরো আটটি বছর চ'লে গেছে, আজও মঞ্জরী রায়ের দেখা পাই নি। খোঁজ করেছি অনেক, তবু খোঁজ পাই নি। আপনি সিগ্রেট খান তো? খান না? বেশ করেন। ফর নাথিং বাজে খরচা। দাঁড়ান সিগ্রেট ধরিয়ে নিই একটা।—বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, মঞ্জরীকে আমার মনপ্রাণ পুরোপুরি দিয়ে ফেলেছিলুম। আর ফিরিয়ে নেবার উপায় ছিল না। তাই ও ব্যাপারের পর মন একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল। বাবাও আবার সময় বুঝে পটল তুললেন। সব সম্পত্তি এল আমার হাতের মুঠোয়। দু হাতে টাকা উড়িয়ে দিতে লাগলুম। মঞ্জরী নেই, কার জন্যে আর টাকার মায়া করব? শেষকালে সব ফুঁকে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। ও কি?

ভদ্রলোক অকস্মাৎ যেন ইলেক্‌ট্রিক শক পাইয়া চমকাইয়া উঠিয়া ওধারের ফুটপাথে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিলাম, একজন বেঁটে ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন লম্বা ভদ্রমহিলা ফুটপাথ ধরিয়া চলিয়াছেন। প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল?

ভদ্রলোক কহিলেন, ওই দেখছেন, ভ্যানিটি-ব্যাগ হাতে ভদ্রমহিলা হাই-হীল জুতো প'রে খটখটিয়ে যাচ্ছেন, উনিই মঞ্জরী রায়।

বলেন কি?

কি আর বলব? এইজন্যেই কবি টেনিসন বলেছেন, 'Men may come and men may go, But I go on for ever.' আপনি একটু বসুন। ওই মঞ্জরী রায়কে যদি আজ এই রেস্তরাঁয় আনতে না পারি তো আমার নাম—।

বলিয়া তিনি মঞ্জরী রায়কে পাকড়াও করিবার জন্য চট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু ভদ্রলোক তখনও ফিরিলেন না। বয় আসিয়া বিল দিল, দেখিলাম পুরাপুরি পাঁচ টাকা হইয়াছে। ভদ্রলোকের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আর অপেক্ষা না করাই ভাল। তিনি যে পাঁচ টাকার নোটটি আমার পকেটে জোর করিয়াই গুঁজিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এইবার বাহির করিয়া দেখিলাম, একটি

পুরাতন সিনেমার টিকেট। প্রথমটা বড় দমিয়া গেলাম। পরক্ষণে নিজের মনিব্যাগ খুলিয়াই পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, লোকসান কিছুই হয় নাই। ভদ্রলোক ধাপ্পা দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু গল্পের যে খোরাক দিয়া গেলেন, তাহার দাম অন্তত পাঁচটি টাকা হইবেই।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নূতন পরিকল্পনা

গত মহাযুদ্ধের পর প্রগতিশীল সকল রাষ্ট্রই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। শিক্ষা যে একটা সমগ্র জাতিকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তা অনেক দেশেই মনীষী এবং সংগঠকরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মোটামুটিভাবে গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালকে আমরা নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনার ও প্রবর্ত্তনের একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ ব'লে মনে করতে পারি।

আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব ও শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ আমাদের দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মনেও একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। আমরাও অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। তা ছাড়া স্কুল-কলেজের পাস-করা ছেলেমেয়েরা জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারছে না, বেকার-সমস্যা ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে, এসব লক্ষ্য ক'রেও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোথাও গলদ আছে—এই সন্দেহটাই মনে জাগছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশ যেমন তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আগাগোড়া বিশ্লেষণ ক'রে নূতন ছাঁচে গ'ড়ে তুলছিল, তেমন ভাবে আমাদের ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করবার বা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার আয়োজন আমরা করি নি। আমাদের দেশটা গরিবের, ছেঁড়া কাপড় আমরা জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। ছেঁড়া-খোঁড়া শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকেও আমরা জোড়াতালি দিয়েই ব্যবহারের উপযোগী ক'রে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের মুখুজ্জে মশাই তাঁর বিরাট শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন স্কুল-কলেজের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া ক'রে তুলতে। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে অনুসরণ ক'রেই আমরা এতদিন পর্য্যন্ত প্রধানত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা করেছি। আমরা কখনও সন্দেহ করি নি যে, গলদটা আমাদের ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। বিষের গাছকে যত্ন ক'রে বাড়ালেই তাতে

অমৃতের ফল ধরে না, বিষ-ছড়ানোর ব্যবস্থাটাই পাকাপোক্ত হয়। বছরের পর বছর ধ'রে আমরা যে শক্তি দিয়ে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, তাতে সমগ্র জাতির মঙ্গল যতটুকু হয়েছে তার চাইতে অমঙ্গলই হয়েছে বেশি, শিক্ষিতদের মধ্যে হিংস্র পশুর মত স্বার্থের কাড়াকাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক অভিযান দেখে এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবু আমরা বিরাট ব্যয়ে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খুলছি, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্দরের থালা-ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে বৈঠকখানা সাজাবার মত।

আমরা যে শুধু অস্বস্তিই বোধ করেছি, গলদটা ঠিক কোথায় তা নির্দ্দেশ ক'রতে পারি নি, তার কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমত পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তিকে নষ্ট ক'রে দেবার আয়োজন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটার মধ্যেই রয়েছে ;—নইলে অন্ধভাবে বিদেশী-ভাষার বিরাট ভূতকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা ইংরেজীনবিস হচ্ছি ব'লে গর্ব্ব অনুভব করতাম না বা একটা বিদেশী ভাষা শেখার প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনের এতখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করতাম না।

প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই, সে যে রকমই হোক না কেন, একটা আদর্শ থাকে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, এই আদর্শের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এর প্রভাব এত বড় যে, সমগ্র জাতির ভাগ্য এরই দ্বারা পরিচালিত হয়, যতক্ষণ না পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর চাপে এর ঘোর কেটে যায়। শিক্ষার এই বিরাট প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতাই বিগত মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন জাতির নূতন ক'রে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ'ড়ে তোলার মূলে রয়েছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, শিক্ষার্থীকে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল ক'রে তোলাই এই ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। হাতে-খড়ির পর শিশু যেদিন থেকে বিদ্যালয়ের শীর্ণ পরিসরের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করে, সেদিন থেকে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও চিন্তাকে বলিদান করাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আদর্শ ব'লে ধরা হয়। যার কোন স্বাধীনতার বালাই নেই, সজীব ইচ্ছাশক্তি যার মধ্যে নিষ্ক্রিয়, সেই আমাদের দেশে ভাল ছেলে! বিদ্যালয়ে যে ছেলেটি বিনা প্রশ্নে, নির্ব্বিরোধে বইয়ের ছাপার অক্ষরের মন্ত্রগুলি হজম করে, নিজে পরখ না ক'রে বিনা অনুসন্ধানে যে পরের ভাষায় নিজের ঘরের কথা অনর্গল ব'লে যেতে পারে, তাকেই আমরা পুরস্কার লাভের উপযুক্ত ব'লে বিবেচনা করি ; বিদ্যালয়কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণীয় না ক'রে তুললেও, যারা কেবল আদেশ ও উপদেশ পালন করার জন্য নিত্য বিদ্যালয়ে আসে, তাদেরই দিকে আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এই একান্ত মসৃণ বাধ্যতা ও প্রশ্নহীন নির্ভরতা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থারই জারজ সন্তান। আবাল্যের এই অভ্যাসই আমাদের দাসত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতার বনেদকে দৃঢ়তর করেছে।

আমাদের দ্বিতীয় অক্ষমতার কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদ্যুৎস্ফুরণের প্রতি অদম্য শ্রদ্ধা। একে আমরা যাচাই ক'রে গ্রহণ করি নি, ওটা আমাদের ওপর চেপে বসেছে চাষীর কাদা-মাখা গায়ে ফরসা কোটের মত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে যে শক্তি, তা হচ্ছে অন্যের শক্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি। এটা ব্যায়াম ক'রে শক্তি বাড়ানো নয়, নিজকে উন্নত করা নয়, ওটা অন্যের রক্তে নিজের জোর বাড়ানো। এ সভ্যতাটা তাই যখন পরের দিকে তাকায়, তখন অন্যকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজেকে কি ক'রে আরও মহিমান্বিত ক'রে তুলবে এই কথাটাই ভাবে। বাইরের লোকের চোখে এই মহিমাটাই পড়ে, বিরাট প্রাসাদ বিরাট যন্ত্র দেখেই আমরা ভুলি, পর পর দুইটা মহাযুদ্ধের অবতারণা দেখেও আমরা এর গোড়ার দুর্ব্বলতাটুকু ভাল ক'রে দেখতে পাই নি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা এই সভ্যতারই সৃষ্টি, তাই প্রতিযোগিতাকেই এই শিক্ষা পুষ্ট ক'রে তোলে, সহযোগিতাকে নয়।

আমাদেরই শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দুইটি গলদই আমাদের দেশের কোন কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধ'রে কোন কথাই এত বার বার বলেন নি, যতটা বলেছেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই দুষ্ট ব্রণটির কথা। বিদ্যালয়ের পলাতক ছেলেকে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় তার গণ্ডির মধ্যে সসম্মানে আমন্ত্রণ করেছিল, সেদিন তিনি সেখানে প্রবেশ করেছিলেন আনন্দে বিগলিত হয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করতে নয়, দুঃখের কথা জানাতে। হয়তো তাঁর ভরসা ছিল যে, অপাঠ্য পুঁথিতে লেখা তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবাগীশরা উপেক্ষা ক'রেও থাকেন, তবু হয়তো তাঁদের সর্ব্ববিশ্বাসের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদী থেকে উচ্চারিত কথাগুলি একটু আলোড়নের সৃষ্টি করবে। তাঁর সে বিশ্বাস তাঁর অনেক স্বপ্নেরই মত কার্য্যকরী হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল ব্যাধিটাকে সনাক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে শিক্ষাকে জীবনের সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী আদর্শ থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক জগতের বিশ্লেষণের চাঁচা-ছোলা যন্ত্রপাতি নিয়ে কোমর বেঁধে তিনি কাজেতে নামতে পারেন নি, নানা কারণে কবির কল্পদৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের দুরদৃষ্টের কুয়াশা-ঢাকা সত্যের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট পথ দেখিয়ে যেতে পারেন নি। পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি, যদিচ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এখনকার যান্ত্রিক সিঁড়িহীন, অপাংক্তেয় কাঠামোটাকে বুঝতেন না, কল্পনা করতেন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সজীব সমগ্র শিশু-মূর্ত্তিটিকে। কিন্তু ওই ছিদ্রপথেই শনি তার প্রবেশের পথ ক'রে নিয়েছে,

তাঁর গড়া বিশ্বভারতী মামুলী শিক্ষালয়ের উঁচু-নীচু পরীক্ষার ছাঁচে ঢালা একটু স্বতন্ত্র আর একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, সমগ্র জাতির মধ্যে নূতন একটা প্লাবন আনতে পারে নি, নূতন একটি পথ ও পরীক্ষার নির্দ্দেশের মত এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

দগদগে ঘা-টার ওপর নির্ম্মমভাবে ছুরি চালাবার জন্ম গান্ধীজীর মত একজন ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। নিরাসক্ত ডাক্তারের মতই রুচিকে উপেক্ষা ক'রে তিনি প্রাণ-রক্ষার দিকে সমগ্র মনোযোগ দিতে পেরেছেন। আমাদের আসল রোগটা হচ্ছে যে, আমরা কিছু বুঝতে বা করতে পারছি না, কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করে বিদ্যালয়ের ঘরগুলিকে চুণকাম করতে লেগে গিয়েছি। এই বিদ্যালয়গুলি চাষাকে চাষের কাজ শেখায় নি, তাঁতীকে তাঁত বুনতে শেখায় নি, যার যা করার ক্ষমতা আছে তাকে তা করার সুযোগ এবং শিক্ষা দেয় নি, দেশবাসীকে দেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় নি, অথচ চাষীর ছেলেকে বাবু বানিয়ে, তাঁতীকে কেরানী গ'ড়ে দেশের মধ্যে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল কোম্পানির কাজের জন্য উপযুক্ত কেরানী গড়তে। সে পরিকল্পনা আজ পরিবর্ত্তিত হয় নি, সুতরাং কেরাণী গড়ার যন্ত্র কেরানীই গড়ুক, ওটাকে মানুষ গড়ার কাজে লাগানোর চেষ্টা করা বৃথা। সমগ্র জাতিকে কেরাণীতে পরিণত করা যায় না জেনেও যে আমরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই ব্যাপকতর করবার চেষ্টা করেছি সেটা আমাদেরই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের যে আদর্শের অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছিল, সে ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য শতভাবে পরিবর্ত্তিত করেছে। শিক্ষাকে নিয়ে কতভাবে পরীক্ষা যে ওরা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মরা নদীর মত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বাস্তবের সঙ্গে একে মানিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থা নেই; তাই অব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে এত বীভৎসতা জন্ম নিয়েছে।

আমাদের শিশুদের ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের কোন শিক্ষা, কোন উপযোগিতাই নেই, এঁরাই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে শিশুর জীবনের শিক্ষার প্রতি প্রথম আগ্রহকে বিভীষিকায় পরিণত করেন; প্রথম থেকেই আমাদের বিদ্যালয়গুলির কাজ হচ্ছে শিশুকে এইটুকু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যে, বিদ্যালয়টা জীবনের অন্য সব কিছু থেকে আলাদা, এই সময়টা হাসতে মানা, পৃথিবীর দিকে চাইতে মানা, সহজ হতে মানা। বইয়ের পৃথিবীর ভেতর দিয়ে চলতে হ'লে রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকতে হবে। শিক্ষাকে এমন ক'রে স্বাভাবিক জগৎ থেকে আলাদা ক'রেই আমরা শিশুর বিতৃষ্ণাকে জাগ্রত করি। যার পক্ষে ছুরি থেকে কাঁচিকে আলাদা করা কঠিন নয়, বিড়াল থেকে কুকুরকে আলাদা করা কঠিন নয়, তার পক্ষে ক থেকে খ-কে আলাদা করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এইজন্য

যে, আমরা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথটাকে একেবারে উল্টে ধরি, তথ্য দেবার আগেই তত্ত্ব কপচাতে শুরু করি। হাত-পা মুড়ে এক জায়গায় ব'সে থাকা শিশুদের পক্ষে অসহ্য—ওটা তার সজীবতারই লক্ষণ, তাই তারা প্রাণের প্রাবল্যে ছটফট ক'রে একটা কিছু গড়তে বা ভাঙতে চায়। যদি তাদের কিছু শেখাতে হয়, তবে ওই ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়েই শেখাতে হবে, শিক্ষকের কাজ সেই খেলাকে সুপরিচালিত ক'রে অর্থময় কাজে পরিণত করা। আমাদের তাই প্রথম সমস্যা, কি ক'রে কাজকে শিক্ষার বাহন ক'রে তোলা যায়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজের সঙ্গে শিক্ষার কোন যোগ নেই। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা ভিক্ষুক তৈরি করার যন্ত্রস্বরূপ—তাই আমরা এত অবজ্ঞার সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। শিক্ষা আমাদের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে না, তাই জীবনের সব চাইতে সুন্দর, সজীব, কর্ম্মক্ষম সময়টুকু বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েও আমাদের ওর বাইরে এসে কি করব এই ভাবনা নূতন ক'রে ভাবতে বসতে হয়। জগতের চলমান স্রোতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাবার এবং সমস্যার সমাধান করবার মত শক্তি অর্জ্জন করার কোন ব্যবস্থাই বিদ্যালয়ের মধ্যে নেই ব'লেই এই অবস্থা ঘ'টে থাকে। সুতরাং শিক্ষাকে নূতন ক'রে গড়তে হ'লে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীরটা কি ক'রে ভেঙে ফেলা যায়, সে কথা আমাদের ভাবতে হবে। বিদ্যালয়গুলি যে সমাজের বোঝা নয়, সমাজের ঐশ্বর্য্য বাড়াবার কেন্দ্র, সেটা প্রমাণিত করতে হবে।

বইয়ের কতগুলি কথা মুখস্থ করাই আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত; ছাত্র-ছাত্রী জীবনে সেগুলি প্রয়োগ করে কি না, তা দেখার কোন দায়িত্ব বিদ্যালয়ের নেই। যে কোন রকমে পরীক্ষা-পাসের ছাপটা জুটলেই সবাই খুশি। এই ব্যবস্থাই আমাদের বিদ্যালয়ে ভাল ভাল বুলি মুখস্থ করতে এবং জীবনে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে শিখিয়েছে। আমরা 'সত্য কথা বলিবে' 'অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে' ইত্যাদি মুখস্থ করি, কিন্তু সত্য কথা বলি না বা কারও সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করি না। জীবনের মধ্যে খানিকটা পুঁথিগত জ্ঞান আত্মসাৎ করাই আমাদের মতে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, তা ছাড়া জীবনের সমগ্র ব্যাপক অংশটিকেই আমরা অবজ্ঞার সঙ্গে হরিজনের দলে ফেলে রাখি। সুতরাং কি ক'রে শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করার কাজে লাগানো যায়, এই আমাদের আর একটি সমস্যা। এত এত শিক্ষা কি ক'রে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক এবং নৈতিক সংস্কারে সহায়ক হবে, সে কথা আমাদের ভাবা প্রয়োজন।

শিক্ষাকে একটা নূতন রূপ দেবার আশু প্রয়োজন দেশের অনেকেই অনুভব করছেন। ওয়ার্দ্ধায় হিন্দুস্থানী তালিমি সঙ্ঘের উদ্যোগে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে একে ব্যাপকভাবে রূপ দেবার চেষ্টাও চলছে। কিন্তু বাংলা দেশে এখনও পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই

হয় নি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি মোটামুটি চারটি প্রস্তাবের ওপর :—(১) সাত বছরের প্রাথমিক, সার্ব্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, (২) শিক্ষার বাহন হবে কাজ, এবং সমাজ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে হবে, (৩) শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হবে, (৪) সত্য ও অহিংসার ওপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

আমরা শান্তি, পবিত্রতা, সহযোগিতা, ন্যায়নিষ্ঠতা প্রভৃতি অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিসের জন্ম চীৎকার করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে যারা ভারতের নাগরিক হবে, তাদের তেমন ভাবে গ'ড়ে তুলছি কি? শূন্য ভাণ্ডারের শিখণ্ডীকে সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের শাসকরা বহুদিন আমাদের শিক্ষা-সম্প্রসারণকে অচল ক'রে রেখেছেন। ওয়ার্দ্ধা-ব্যবস্থা দাবি করছে, শিক্ষার এসব প্রাথমিক সমস্যা জয় করা যায়। তবু যে কেন আমরা দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে এটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখারও সময় পাই নি, সেটাই আশ্চর্য্য। বারান্তরে শিক্ষা-ব্যবস্থার এই নূতন আদর্শটি সম্বন্ধে আলোচনা করার বাসনা রইল।

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত

সংবাদ-সাহিত্য

এশিয়ার পূর্ব প্রত্যন্তের তিনটি মহাদেশ—ভারতবর্ষ, চীন এবং জাপান—তিন মহাদেশেই প্রাচ্য মানুষের বাস, অথচ কত বিভেদ! ভারতবর্ষ পরাধীন, চীন স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার মাঝখানে দোল খাইতেছে, জাপান স্বাধীন। আধ্যাত্মিকতা লইয়া উল্লাস অথবা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে নারকীয় বা পৈশাচিক আখ্যা দিয়া নিন্দা করা সহজ। সেদিক দিয়া বিচার করিব না। ভোগবাদ নয়, জীবনবাদের সহজ বিচারে আমরা মৃত অথবা মুমূর্ষু, চীন অর্ধসচেতন, জাপান সম্পূর্ণ জীবন্ত। আমাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়, চীন মরেও মারেও, জাপান স্বেচ্ছায় মরে অথবা বাঁচে। আয়োজন উপকরণ সবই প্রায় এক, শুধু স্বাধীনতার ইতরবিশেষে একে আরে আসমান-জমিন ফারাক্ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেড় শত পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে আমরা ঠিক কি ছিলাম বলিতে পারিব না; কিন্তু ওই পরিমাণ কাল ইংরেজের সুশাসনে এবং স্নেহচ্ছায়ায় নজরবন্দী থাকিয়া আমরা কি হইয়াছি, ডাঁইনে বাঁয়ে সামান্য একটু চোখ চাহিয়াই তাহা অনুভব করিতে পারি। সুখের বিষয়, মর্মান্তিকভাবে লজ্জিত হইবার মত চেতনা আমাদের অবশিষ্ট নাই।

নাই বলিলে ভুল হইবে, এই চেতনা আমাদের ছিল না। যতদিন ছিল না, ততদিন ইংরেজ আমাদের কি ভালটাই না বাসিত! আমাদিগকে পুতুপুতু করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া শোয়াইয়া খাওয়াইয়া কোমরে ঘুন্‌সি বাঁধিয়া হাতে চুষিকাঠি দিয়া আদর-আপ্যায়নের অবধি ছিল না। উপাধি-চাকুরির চরম করিয়া মৃত ও মুমূর্ষুর মধ্যেও তাহারা রেষারেষি-ঈর্ষার বান ডাকাইয়া ছাড়িয়াছিল। আমরা বিগলিত হইয়াই ছিলাম; মাঝে মাঝে রোগীসুলভ আবদার-বায়না করিতাম—কখনও চোখরাঙানি, কখনও আদর, তাহাতেই আমাদের ক্ষীণ প্রাণবিন্দু টলমল করিয়া উঠিত। সহস্র বৎসরের রোগশয্যায় আমরা কৃতার্থ হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইয়া পড়িতাম। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি সামান্য রুজির লোভে আমাদিগকে ওই শিক্ষাই দিয়া আসিয়াছিল।

কবে ঘুম ভাঙিল, কবে চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ হইল, সেই ইতিহাস ক্রমশ-প্রকাশ্য। তাহারই উপকরণ সংগ্রহের কাজে আমরা লাগিয়াছি। বিস্ময়ের সঙ্গে বহু বিচিত্র ব্যাপার আমাদের নজরে পড়িতেছে। সব গুছাইয়া এই ইতিহাস যিনি রচনা করিতে পারিবেন, তিনি দ্বিতীয় বেদব্যাসের সম্মান পাইবেন। নব মহাভারত সৃষ্টি হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। শতধাবিদীর্ণ বেদনার কাহিনীতে ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস ইতিমধ্যেই করুণ ও ভারী হইয়া উঠিয়াছে; বহুকে, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া যে মহাকবি মহাকাব্য রচনা করিবেন; আমরা তাঁহারই প্রতীক্ষায় আছি, খণ্ড-খণ্ডভাবে আমরা প্রত্যেকে তাঁহারই কাজ আগাইয়া রাখিতেছি। কবে সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, কবে আসিবেন ঋষি বৈশম্পায়ন, নৈমিষারণ্যের যুগান্তরের জড়তা ভাঙিয়া কবে আবার নরোত্তম নারায়ণের বন্দনাগান ধ্বনিত হইয়া উঠিবে, প্রাচীন অখণ্ড ভারতবর্ষ তাহারই দিন গণিতেছে। সেই শুভদিন কি আমাদের আয়ুর আয়ত্তে আছে? কে জানে!

* * *

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কবি এবং সাহিত্যিক ই. ভি. লুকাস ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন মাত্র কয়দিনের জন্য। অসহযোগ-আন্দোলন তখনও আরম্ভ হয় নাই, তাহার প্রস্তাবমাত্র অর্ধজাগ্রতদের মধ্যে কৌতুক-কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। ই. ভি. লুকাস দেশে ফিরিয়া 'রোভিং ইষ্ট অ্যাণ্ড রোভিং ওয়েষ্ট' নামক বই লিখিলেন। ভারতবর্ষ-অংশের প্রথম অধ্যায়ের তিনি নাম দিলেন "নয়েজলেস ফীট"—নিঃশব্দ পদচারণ। তিনি লিখিলেন—

"ভারতবর্ষ যদিও পথচারীর দেশ, এখানে কিন্তু পায়ের শব্দ শোনা যায় না।" অধিকাংশ পা-ই নিরাবরণ এবং সবই প্রায় নীরব। পথ চলিতে গেলেই কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলিকে প্রেতের মত বোধ হয়। শহরে গ্রামে যেখানেই যাও, এই পথচারীরা পথ চলিতেছে। গরুর গাড়িও আছে, মোটর-গাড়িও আছে, অন্যান্য বিচিত্র যানবাহনেরও

অভাব নাই, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিতেছে, পথচলার বিরাম নাই। বাজারে যাও—হাজারে হাজারে তাহাদের দেখিতে পাইবে, সুদূরপ্রসারী ধূলিধূসর পথে মাইলের পর মাইল চলিয়া যাও—দেখিতে পাইবে এক বা একাধিক ক্লান্ত পথিক হয় আসিতেছে, নয় যাইতেছে।

এই ক্লান্ত একঘেয়ে পায়েচলা মাত্র একবার দ্রুত ও চঞ্চল হইতে দেখা যায়, যখন ইহারা স্কন্ধে মৃতদেহ বহন করে।...

হাত? ভারতবাসীদের সম্বন্ধে গোড়ার আর একটি অনুভূতি হইতেছে এই যে, উহাদের হাত অক্ষম। তাহাতে শক্তির কোন প্রকাশ নাই।

হাঁ, এই জাতি শুধু যে অবিরাম পায়ে হাঁটিতেছে তাহাই নয়, অবিরাম আরামও করিতেছে। ঘুম পাইলেই যেখানে খুশি ইহারা লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে অথবা দুই হাঁটু জড়ো করিয়া বসে। ইংলণ্ড হইতে প্রথম আসিয়া সারা দেশজোড়া এই জড়তা দেখিয়া বিস্ময় বোধ হয়।...এই বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায় যখন এই পূর্ণশায়িত দার্শনিকের দেশ, সহজেই-ঘুমে-পটুর দেশ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া জাপানে প্রবেশ করা যায়। সেখানে অলসদের ঠাঁইও নাই, কালও নাই। ভারতবর্ষের পথে পথিককে সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, ঘুমন্ত কোনও মানুষকে বুঝি বা মাড়াইয়া দিলাম—পথই সেখানে প্রকৃষ্ট বিশ্রাম-স্থল—জাপানে সম্পূর্ণ বিপরীত—সেখানে কেহ কখনও চুপ করিয়া বসিয়া নাই, কাহাকেও অবসন্ন অথবা গরিব বলিয়া বোধ হয় না।

India, save for a few native politicians and agitators strikes one as a land destitute of ambition. In the cities there are infrequent signs of progress; in the country none. The peasants support life on as little as they can, they rest as much as possible and their carts and implements are prehistoric. They may believe in their gods, but fatalism is their true religion.

—কয়েকজন কালা পলিটিশিয়ান ও হুজুগে লোক ছাড়া ভারতবর্ষকে আশাহীনের দেশ বলিয়া বোধ হয়। শহরে প্রগতির ছিটেফোঁটা দেখা গেলেও গ্রামে তাহার লেশমাত্র নাই। চাষারা সামান্যতম আহার্যে জীবন-ধারণ করে, প্রভূততম বিশ্রাম গ্রহণ করে, এবং তাঁহাদের যানবাহন হাতিয়ার প্রাগৈতিহাসিক। দেবতাতে তাহাদের বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু আসলে তাহারা অদৃষ্টবাদী।"

* * *

লুকাস সাহেব কবি, মনের আবেগে এই পর্যন্ত লিখিয়াই তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি হঠাৎ অনুভব করিয়াছেন, দেড় শত বৎসর ইংরেজ-শাসনে থাকার পর ভারতবর্ষের এই অবস্থা সমীচীন নয়। ইহাতে স্বজাতির নিন্দা রটিতে পারে, সুতরাং তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া রচনায় একটু প্রাচ্য পাক (twist) দিয়া এই বলিয়া

কৈবল্যমার্গের জয়গান করিতে করিতে শেষ করিয়াছেন—"It is true philosophy to be prepared to live in such a state of simplicity. Most of the problems of life would dissolve and vanish if one could reduce one's needs to the frugality of a fakir.—এই প্রকার অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত হওয়াটা খাঁটি দার্শনিকতা। মানুষ নিজের প্রয়োজন সমূহকে কমাইয়া যদি ফকিরের সংযম অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে তো জীবনের সকল সমস্যাই গলিয়া উবিয়া যায়।"

ঠিক। এই মোহগ্রস্ত অবস্থাতেই আমারা 'ইংলণ্ডস ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া' লিখিতে পারিয়াছিলাম, পোষ্টঅফিস টেলিগ্রাফ রেলওয়ে ইলেকট্রিসিটির সমস্ত গৌরব ইংরেজের স্কন্ধে চাপাইয়া বহু কৃতজ্ঞতা বোধ ও প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আজ সামান্য চৈতন্যসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিতেছি, নাকের বদলে নরুনের মত উক্ত জাতীয় যাবতীয় সুবিধা আমরা অর্জন করিয়াছি, ইংরেজ আমাদিগকে দেয় নাই। আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য পূরাদস্তুর শিক্ষা (পাশ্চাত্য মতে) দিতে পারিত, তাহারা তাহা দেয় নাই। আজ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, ইংরেজের তাঁবে না আসিয়াও জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই সকল সুবিধাই প্রভূতভাবে ভোগ করিতেছে, যাহা লইয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ এবং ইংরেজভক্তরা আজিও বড়াই করিয়া থাকেন। আমরা কিছুই পাই নাই, অথচ আমাদের সর্বস্ব গিয়াছে, এই রূঢ় সত্যটি বুঝিবার মত শিক্ষা দেশের মুষ্টিমেয় লোককে দিয়াই প্রভুদের চৈতন্য হইয়াছে, তাই আজ সর্বসাধারণের শিক্ষার পথে সহস্র বাধার উদ্ভব হইতেছে, কম্যুনাল এডুকেশন, সেকেণ্ডারি এডুকেশন, টেক্সট-বুক কমিটি প্রভৃতি ভাঁওতায় আসল শিক্ষা সুদূরপরাহত হইয়াছে—শিক্ষক-সম্প্রদায়, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্প্রদায় আজ অসহায় বিপন্ন ও নিরন্ন। গত ১৬ ডিসেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে সার্ মরিস গয়ার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সারা ভারতবর্ষে শিক্ষকদিগকে যে হীনতার মধ্যে চাকুরি লইতে বাধ্য করা হয়, যে কোনও গবর্মেণ্টের পক্ষে তাহা অতিশয় নিন্দনীয় ও কলঙ্কজনক। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষকেরা নিশ্চিত বিলুপ্তির পথে যাইতেছে জানিয়াও গবর্মেণ্ট নিশ্চেষ্ট আছেন, তাঁহাদের ব্যবহারে একান্ত হৃদয়হীনতাই প্রকাশ পাইতেছে। সার্ মরিস গয়ার যাহাই বলুন, ভারতবর্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান মানেই ইংরেজ-শাসনের অপমৃত্যু। বাতুল ছাড়া নিজের হাতে কেহ নিজের মৃত্যু ঘটাইতে পারে না। ইংরেজ-সরকার বুদ্ধিমানের মতই কাজ করিতেছেন।

এই কাজ আমাদের নিজেদের করণীয়, গবর্মেণ্টের সহায়তা ব্যতিরেকেও জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে। লর্ড ওয়াভেল—ভারতবর্ষের

একচ্ছত্র বড়লাট বাহাদুর গত শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) কানপুরে, সেবকসেবিকাদের অভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, হয়তো এই ক্রন্দনেরই ফলে দেশী-বিদেশী স্বেচ্ছাসেবিকারা হাজারে হাজারে দয়াধর্মপ্রকাশে অগ্রসর হইবেন, সরকারী ভাণ্ডার অবারিত হইবে, কিন্তু ভারতবর্ষের সার্বজনীন শিক্ষার বারংবার চিন্তিত পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থাকিয়া যাইবে, কোনও দিনই অন্ধের চক্ষু ফুটিবে না। আঘাতে আঘাতে যেটুকু চৈতন্যোদয় আমাদের হইয়াছে, তাহার ফলে দেশের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় যদি নিরক্ষর অজ্ঞ দেশবাসীর শিক্ষার কাজে অগ্রসর হন, তাহা হইলে অজগরের নাগপাশ খুলিতে বিলম্ব হইবে না।

সকল বাধা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় চেতনা, আমাদের নিঃস্বতার পরিমাণবোধ যে জাগ্রত হইতেছে, তাহার আভাস আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। এইটুকু চাঞ্চল্যই নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমাদের আশা। এই চাঞ্চল্যের ঢেউ শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের বাহিরেও সত্যকার মানুষ যাঁহারা—যাঁহারা লোভী নন, সাম্রাজ্যবাদী নন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সমবেতকণ্ঠে নিপীড়িত পরাধীন জাতিসমূহের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। জর্জ বার্নার্ড শ বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মহারথীদের কথা বাদই দিলাম—ইঁহারা বিশ্বপ্রাণ ব্যক্তি—ফেনার ব্রকওয়ে, এডওয়ার্ড টমসন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ইংরেজরাও সম্প্রতি ভারতীয় সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় কর্তৃপক্ষকে তৎপর হইতে বলিতেছেন। টমসন সাহেব স্বীকারই করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ সামান্য খবরই রাখিয়া থাকে, তাহাদের অজ্ঞতা লজ্জাকর। আমরা এখানে আর একজন ইংরেজের কথা উদ্ধৃত করিতেছি, যিনি স্বচক্ষে দীর্ঘকাল ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন এবং ভারত-সমস্যার সত্বর সমাধান চাহেন। ইঁহার নাম লায়োনেল ফীল্ডেন। ইঁহার *Beggar My Neighbour* বইখানির ভারতীয় সংস্করণ মাত্র কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন :

No solution of the Indian problem will ever be found until and unless we on our part, and Indians no less on theirs, are willing to recognize these "blind spots" : no solution, that is, which would absolve Britain from tyranny, and make India her friend. A solution of one kind or another is of course coming : it is daily taking shape, but the shape which it is taking is an evil one for Britain, and very possibly for India too. The profound social and economic changes deriving from—and also causing—the disruptive effects of war are not, and will not be, arrested by a political deadlock, though the deadlock may dangerously

obscure their advance. However engagingly His Majesty's Complacent Ministers may tell us that this fog of obscurity is the "restoration of law and order" or "the only thing we could do," it is a fog in which the last remnants of British-Indian collaboration may be irretrievably lost. And for my part I believe that it is important for Britain, for India, and for the world, that that collaboration should continue, India, spurred and awakened by this war, as well as by her own growing nationalism, can hardly fail to become, in another few decades at most, a mighty power. An India permanently alienated from Britain, and falling willy-nilly into an Asian powergroup in a race for material gain, will be a threat not only to Britain herself and to the British Empire, but a threat also to world peace. An India friendly and grateful to a generous Britain could provide, as perhaps no other country, a much-needed link between East and West, and a tempering perhaps, of the Western Creed of Grab. But if, on either side, faces are to be obstinately saved and prejudices mulishly followed, we may await agreement till Kingdom Come. Some prejudices are breaking down : few people, for instance, can now seriously credit the dear old story that England conquered India in a sort of bumbling absent-minded fit, and just had to stay to keep order. Few can deny that England has exploited India. Few can avoid the conclusion—and I think every decent Englishman hates it—that India is a subjected and occupied country: a country in which, between August 1942 and January 1943, the police and troops opened fire on unarmed crowds no less than 538 times. But the prejudices which remain, on the British side, are still serious enough. The first is that Indians are silly, feckless and corrupt, and therefore cannot govern themselves. The second is that British democratic institutions are suitable to India. The third is that Indian "divisions" make it impossible for the British to relinquish power. The fourth is that India should obediently, at the bidding of Britain, commit herself to a war which was none of her making and from which, like Egypt or Turkey, she might herself choose to hold aloof if she were free.

These prejudices, running like an undercurrent through British politics and British publicity, must poison the atmosphere of all negotiations. They are the expression of domination and aggression : the denial of freedom and free choice. Their adoption, subconscious adoption if you like, by British negotiators must arouse in Indians a natural desire to hurl any offer into the dustbin.

(স্থানাভাবে অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হইল না।)

কিন্তু কোনও এক বা একাধিক দেশের মুখ চাহিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। নিজেদের স্বাধীনতার পথ আমাদের নিজেদেরই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। আমাদের মুক্তির উপায় দেশের মাটি হইতেই বাহির হইবে, কোনও সক্ষম ও সফল দেশের স্থানীয় প্রয়োজনে গড়িয়া উঠা মত ও পথ হুবহু অনুসরণ বা অনুকরণ করিলে আমরা ভুল করিব। এ বিষয়ে চীনের সুবিখ্যাত কম্যুনিষ্ট-নেতা মাওৎ-জী-দাং-(Mao Tse-tung)-এর স্পষ্ট নির্দেশ আমাদের দেশের অনেক বিভ্রান্তকে পথ দেখাইবে। তিনি তাঁহার স্বদেশ চীন সম্বন্ধেই বলিতেছেন—

China should absorb on a great scale the progressive culture of foreign countries. This refers not only to the proletarian and progressive democratic culture, but also the classical culture of foreign countries, that is useful to us; for instance, the cultural heritage of the capitalist countries in their earlier period of growth. However, we should in no way *blindy* accept everything foreign without criticism, but should deal with it just as in metabolism; we first chew our food, then finally our system separates it into two portions, the one that is to be absorbed to nourish us and the other which is to be thrown out.

The thesis of "wholesome Westernization" is a *mistaken* viewpoint. *To import things foreign has done China much harm.* The same attitude is necessary for the Chinese Communists in the application of Marxism to China. Marxism should not be applied subjectively and dogmatically. *Such Marxism is useless.* The point is to grasp the general truths of Marxism and apply them to the concrete practice of the Chinese revolution, i.e., to first achieve the Sinonisation of Marxism; subjective and dogmatic Marxism is *to caricature* Marxism and the Chinese Revolution. For Marxists of this type there is no place in the revolutionary camp. Chinese culture must have its own form, that is, a national form. A national form and a new democratic content—this is our new culture of today.

এই কথা ভারতবর্ষ সম্পর্কে আরও কঠিনভাবে প্রযোজ্য। চীন নানাভাবে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হইলেও আমাদের মত পরপদানত নিশ্চেষ্ট ও হীনবীর্য নয়। আমরা শক্তিহীন বলিয়াই গতানুগতিক উদ্যমের অভাবে খোসা-আঁটি বাদ দিয়া কিছু খাইতে অভ্যস্ত নই। ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া তাহার রাষ্ট্র ও সামাজিক চিন্তার যে পরিবর্তনই আসুক, তাহাতে অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। বাহির হইতে সম্পর্কহীনভাবে আরোপিত ভাবধারা সমস্ত জাতিকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও অনেক চিন্তালেশহীন যুবককে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করিয়া মূল লক্ষ্য হইতে আমাদিগকে

বিচ্যুত করিতে পারে। আমাদের অনেক থাকিলে এই ক্ষতির জন্ত উদ্বিগ্ন হইতাম না। আমাদের পুঁজি কম বলিয়াই অধিক সাবধান ও সতর্ক হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-গবেষণা করিয়া বিরাট দুই খণ্ডে যে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' লিখিয়াছেন, স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, তাহা সমুদয় আয়ত্তে আনিতে পারি নাই। রক্তমাংস-চামড়া ইত্যাদি থাকিলে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে নানাবিধ মজা লাগে, কিন্তু শুধু পাঁজরার হাড় কাঁহাতক গণনা করা যায়, নিউটেষ্টামেণ্টের বিভিন্ন গ্রন্থেই তো তাহার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে! যাহা হউক, আমাদের উদ্যম ও অবসর না থাকিলেও "বাধ্যতামূলক"ভাবেও স্কুলেরা বইখানি পড়িবার লোকের অভাব নাই। তাঁহাদেরই একজন, সম্ভবত সেন মহাশয়ের ছাত্রী কেহ, যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া উক্ত নামবীজমালা সম্পূর্ণই জপ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাইয়া পুলকিত হইয়াছি। পাঠকেরাও হইবেন। বিশেষ ধরনের লরির মত বিশেষ ধরনের ভয়ে লেখিকা নাম প্রকাশে অপারগ হইয়াছেন, আমরা বেনামেই তাঁহাকে তাঁহার পাঠনিষ্ঠার জন্ত প্রশংসা করিতেছি। তাঁহার পত্রটি মায়-শিরোনামা উদ্ধৃত করিলাম।—

সু-কুমার গবেষণা

মান্যবর 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় ভাগের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমি বিশেষ যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি। আপনারা পুস্তকে তথ্যগত যে-সকল ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কতকগুলি ভুল আমার নজরে পড়িয়াছে। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে আমি এখানে মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

(১) অধ্যাপক সেনের পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠায় আছে, "নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন'-এ লিখিয়াছেন যে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'বুঝলে কি না'-র রচয়িতা।" অধ্যাপক মহাশয় 'আমার জীবন' ভাল করিয়া পড়িলে দেখিতে পাইতেন তাহাতে আছে—"একদিন মতি ভায়ার সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কলেজে থাকিতে এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়িতে তাঁহার রচিত 'বুঝলে কি না' প্রহসনের অভিনয় দেখিতে যাই।"

এখানে নবীনচন্দ্র তাঁহার সুপরিচিত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই লিখিয়াছেন, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম করেন নাই। এবং তিনি বলিয়াছেন,

"তাঁহার বাড়িতে তাঁহার রচিত 'বুঝলে কি না' প্রহসন দেখিতে যাই"; ইহার অর্থ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন রচিত প্রহসন; ইঁহার অন্য অর্থ নাই।

(২) ডক্টর সেন তাঁহার পুস্তকের ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, রাজকৃষ্ণ রায় "কতিপয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'রসায়ন-শিক্ষা'ও আছে।" কোন কোন গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকায় রসায়ন-শিক্ষা পুস্তকের লেখক হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম আছে বটে, কিন্তু শুধু গ্রন্থতালিকা না দেখিয়া 'সচিত্র রসায়ন শিক্ষা' (ইং ১৮৭৭) বইখানি দেখিলে দেখিতে পাইতেন যে, ইহার গ্রন্থকার রাজকৃষ্ণ রায় নহে, রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী। ইনি শিক্ষা-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথমাবস্থায় তিনি যে উহার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন, নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নিবেদিকা

(বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী)

কু মার আগেই খাইয়াছেন, এত দিনে সু মার খাইয়া সেন মহাশয়ের পৈতৃক নামটি সার্থক হইল।

বাংলা দেশের কয়েকজন সাহিত্যিককে কংগ্রেসের প্রতি প্রকাশ্য অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখিয়া 'পরিচয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া "ওয়ান্স আপন এ টাইম" বলিয়া মাতৃস্থলভ মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কার্তিকের 'পরিচয়ে' প্রথম প্রবন্ধ "আমাদের সাহিত্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন" দ্রষ্টব্য। মাকে মামার বাড়ি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিবার দুষ্প্রবৃত্তি আমাদের নাই। গোপালবাবুর প্রভুপাদ পি. সি. জোশী মহাশয় যখন কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর সকল মৌলিক কেরামতি তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত 'কংগ্রেস অ্যাণ্ড কম্যুনিষ্টস' পুস্তিকায় ফাঁস করিয়া একরূপ প্রমাণই করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বর্তমান কংগ্রেসী ভাবগঙ্গার তিনি এবং তাঁহার জনেরাই (Saint John!) ভগীরথ, তখন গোপালবাবুই বা অনুরূপ কিছু না করিবেন কেন? কোলে ঝোল টানিবার ব্যাপক পলিসিই তো আজ সর্বত্র জয়যুক্ত হইতেছে! তবে গোপালবাবু এখনও ঝানু অর্থাৎ দু-কানকাটা হইয়া উঠিতে পারেন নাই, তিনি মনগড়া হউক, যাহাই হউক, একটা ইতিহাসের নজির টানিয়াছেন, একেবারে বেপরোয়া অহং চালান নাই। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। বোম্বাই অঞ্চলে হিষ্টরিকাল ডায়ালেকটিক্স ফাঁসিয়া গেলেও কলিকাতায় ভাঙনের ঢেউ আসিয়া লাগিতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে হালদার মহাশয়

ইতিহাস কপচাইয়া ভালই করিয়াছেন। তবে তাঁহার ইতিহাসে কিছু ভুল আছে, অনেকটা শরৎচন্দ্র-বর্ণিত বৃদ্ধা তপস্বিনীর সকড়ি বাঁচাইয়া পা ফেলা গোছের হইয়াছে। বিশদ আলোচনার অবকাশ নাই। এই প্রবন্ধটিকে 'বাজে লেখা'য় স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে তিনি যেন জোনস্ কোলব্রুক কেরী মার্শম্যানের সম্বন্ধে তাঁহার বিদ্যাটা একবার ঝালাইয়া লন, ইঁহাদের কেহ কেহ রামমোহনের জন্মের পূর্বেই প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার রঙ্গমঞ্চেও রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বেই প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রামকমল সেন মোটেই ওরিয়েণ্টালিষ্ট ছিলেন না এবং কেশব সেনের জন্মের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক সরাসরি নয়, মাঝখানে প্যারীমোহন নামধেয় তাঁহার একজন পুত্র ছিলেন, তিনিই কেশবচন্দ্রের জন্মদাতা হিসাবে সে যুগে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধীরে ধীরে একটি সচ্চিদানন্দ আশ্রম হইয়া উঠিতেছে। সৎ-অংশের বিবরণীতে জানা যায় কোনও বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকের পুত্র সেই বিষয়ে পরীক্ষার্থী হইলে তাঁহাকে সেই বৎসর উক্ত পরীক্ষক-পদচ্যুত করা হয়। চিৎ-অংশে দেখিতেছি, সিণ্ডিকেটের সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক এবং কোনও কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ হইলেও তাঁহার মেড ইজি পুস্তক রচনা ও বিক্রয় করিতে বাধা নাই, দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত জে. কে চৌধুরী প্রণীত 'সহজ শিক্ষা ভারত ইতিহাস' প্রভৃতি। এইরূপ চিৎ হইবার অবশ্য নানা সঙ্গত কারণ আছে। আনন্দাংশের বিবৃতি বারান্তরে দিব।

—

অগ্রহায়ণের 'পরিচয়ে' "পত্রিকা-প্রসঙ্গে" একজন প্রধান-সাহিত্যিক লিখিয়াছেন, "কিন্তু বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের "নিরুদ্দেশ" আমি পড়তে এত ধৈর্য্য হারিয়েছি যে, আমি অবাক হই। বিভূতিবাবুর লেখায় সাধারণত একটি মিষ্টি কৌতুক রস থাকে, তাতে পাঠকের আকর্ষণ বাড়বারই কথা। আমি এতগুলি লেখা পড়তে পেরেছি কিন্তু এবার ওঠালেন।"

ভদ্রলোক (রাণুর) প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ ও কথামালা শেষ না করিয়াই "নিরুদ্দেশ" অবধি ধাওয়া করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছেন। ভাষা দেখিয়াই তাহা মালুম হইতেছে। তাঁহাকে ভাল করিয়া ভিত পত্তনের অনুরোধ জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠ
১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ : পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ

৩

নবযুগের প্রেরণায় মানবধর্ম্মের যে নব-আদর্শ-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা মূলে যেমন সর্ব্বমানবীয়, তেমনই সেই এক আদর্শই বাস্তবের দিক দিয়া কেন যে জাতীয়তা-বিরোধী নয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই জাতীয়তাধর্ম্ম আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন, ইহার নীতি প্রাচীন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি হইতে স্বতন্ত্র; তাহাতে, স্ব-পর-কল্যাণ সাধনের যে মর্ম্ম আমাদের সংস্কারগত হইয়াছিল তাহাও ভিন্নরূপ ধারণ করিল—কোন আকারেই ব্যক্তির আত্মচিন্তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান তাহাতে রহিল না। ইহাতেও অন্তর ও বাহিরের সকল বাধাকে জয় করিবার জন্য যে সংগ্রাম অনিবার্য্য—সেই সংগ্রাম বা সাধনাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন', এবং বিবেকানন্দের 'dynamic religion'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অত্যুচ্চ ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে মানবতার যে আদর্শ স্থাপন করিলেন তাহা বিশ্বজনীন—জাতি-বর্ণ-হীন; তাহাতে মানবসাধারণের পরিবর্ত্তে এক মহামানব বা বিশ্ব-মানব অকূল অচিহ্নিত ভাবসাগরে লীন হইয়া আছে; শেলীর সেই আদর্শের মত, 'pinnacled dim in the intense inane' না হইলেও, তাহা অনেক পরিমাণে পৃথিবীর ধূলামাটির অতীত, সেই আদর্শধর্ম্মী জীবনে বাস্তবের সহিত প্রকৃত বোঝাপড়া নাই, ক্রূর-কঠিন-কুৎসিতের সহিত সংগ্রাম নাই—সে সকলকে একরকম অস্বীকার করিয়া, সকল অসম্পূর্ণতা সেই ভাব-কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করিয়া, আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিতে হয়। অতএব এইরূপ আদর্শ সেই 'dynamic religion'-এর আদর্শ নয়—ইহা জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই আদর্শই রবীন্দ্রনাথের অমৃতগন্ধী লিরিকের প্রাণস্বরূপ, ইহাই তাঁহার অতুলনীয় কাব্য-সাধনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা শুধু লিরিকধর্ম্মী নয়, তাঁহার সেই রসদৃষ্টি আরও গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টির ফল; সে দৃষ্টিতে, জীবনের নিয়তি-কঠিন নাটকীয় শক্তিরূপের পরিবর্ত্তে, নিয়তি-নিয়মহীন আত্মস্ফূর্ত্তির লিরিক-রূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই জন্য, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা মানুষের বাস্তব-নিয়তি বা প্রবৃত্তি-বিরোধকে সেই আদর্শ-জীবনের বাধা বলিয়া স্বীকার করে নাই; এই জন্যই তাঁহার বাণী শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মশাসনমূলক discipline বা বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক অভ্যাস মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দকেই শক্তি-সাধনার উপরে স্থান দিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস—প্রাণমনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশই মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর; ফুল যেমন আপন অন্তরের রস-প্রেরণায় বর্ণে-গন্ধে দল বিস্তার করে, মানুষও তেমনই স্বচ্ছন্দে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবে। এরূপ সাধনায়

চরিত্র-শক্তির যেমন পৃথক মূল্য নাই, তেমনই পৌরুষের অর্থও সেইরূপ ভাব-জীবনের আদর্শ-নিষ্ঠা। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-সাধনা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের মত মহাশক্তিমান্ ও স্বতন্ত্র পুরুষের পক্ষেই সত্য ও সম্ভব তাহা আমরাও বুঝি, কিন্তু ঐ মন্ত্র যে অপূর্ব্ব বাণী-রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতেই উহা সাধারণের চিত্তও অধিকার করে; কিন্তু শেষে তাহাতেই আধ্যাত্মিক অভিমান জন্মে—কবির সেই আধ্যাত্মিকতা আমরাও দাবি করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা যে মোহ মাত্র, বর্ত্তমান সমাজে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইবে। জীবনের ক্ষেত্রে সে আদর্শ অচল বলিয়াই তাহা ক্রমেই জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে, শেষে সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেও নির্ব্বাসিত হইয়াছে—বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অরাজক অবস্থা ও চরম স্বৈরাচারনিবারণে তাহা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ বয়সে জরাগ্রস্ত কবি, কবিধর্ম্মবশে, যৌবনের জয়গান করিতে গিয়া—তাঁহারই সেই জীবনবাদকে সুদৃঢ় করিতে গিয়া, নিজেও বিপন্ন হইয়াছিলেন, এই উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত একরূপ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাহার ফলে, তিনি যে তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ হইতেও কতখানি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার প্রায় শেষ রচনা—'ল্যাবরেটরি' নামক গল্পটি তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হয়, জীবনের আর্ট ও আর্টের জীবন এক নয়। বিশুদ্ধ রসসাধনা সর্ব্ববন্ধন অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু জীবন-সাধনায় ঐ বন্ধনের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে—সমুদ্রের তরঙ্গলীলা ও তটিনীর জলোচ্ছ্বাস এক দৃশ্য নয়। কবির কাব্যপ্রেরণারূপে—বিশুদ্ধ আর্টের পুষ্পপরাগরূপে—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যে কত মূল্যবান, রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মরস তাহা চিরদিন প্রমাণ করিবে; কিন্তু জীবনকে জয় করিতে হইলে, অশান্ত ও অশিবের দ্বৈতকে স্বীকার করিয়া, পরে সেই অদ্বৈতে উঠিতে হয়; এই উঠিবার তত্ত্বই dynamism বা জীবনের শক্তিবাদ; আনন্দবাদে সকলই 'হইয়া আছে'—কিছুই 'হইতে' হয় না, তাই শক্তিসাধনার প্রয়োজন নাই।

আমি ইতিপূর্ব্বে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' কথাটি বহুবার একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্পর্কে তাহার বিশেষ অর্থ না করিয়া, তাঁহার রচনা হইতেই কিঞ্চিৎ নমুনা দিব। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে ইহার বিকাশ যে প্রথম হইতেই হইয়াছে—'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র একটি কবিতায় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।—

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি'।
আগে কে জানিত বলো কত কি লুকানো ছিলো
হৃদয়-নিভৃতে,

তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

এখানে কবি যাহাকে সম্বোধন করিতেছেন, তাহার রূপ—তাহার 'আঁখি দুটি'ই—তাঁহাকে মুগ্ধ করিতেছে না, সেই চোখের দৃষ্টি তাঁহার হৃদয়ে যে আলোকপাত করিতেছে, তাহাতে তিনি আপনাকে আপনি দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইতেছেন; তাঁহার নিজেরই হৃদয়-রহস্য তাঁহার নিকটে পরম বিস্ময়ের বস্তু। এই দৃষ্টি শুধুই subjective বা আত্মভাব-রঞ্জিত নয়, ইহা বিশেষভাবে আত্মমুগ্ধ বা egoistic; ইহা এতই স্ব-তন্ত্র ও আত্ম-সচেতন যে, সর্ব্ববিষয়ে আত্মানুভূতি ভিন্ন আর কোন অনুভূতিই যেন নাই। এই ভাব রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায়, তথা মানস-জীবনে, চিরদিন আধিপত্য করিয়াছে; বাল্যের ওই কবিতাটির পর তাঁহার শেষ জীবনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিলেই আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—

"চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি।···তার মধ্যে অনুভব করতে চাই আমার মধ্যে সত্য যা-কিছু জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়-আমি, মহান্ আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।" [রবীন্দ্রনাথের "পত্রধারা", 'প্রবাসী', ১৩৩৮]

—বলা বাহুল্য, ইহাও নিজের মধ্যে, অর্থাৎ ব্যক্তির মারফতে, বিরাটের উপলব্ধি—বহির্জগতের, বা বহুমানবের মধ্য দিয়া নয়। উপরের পংক্তিগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধিলাভের পরিচয় আছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্র ও তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধন-মন্ত্র একই হইবার কথা, বরং কাব্যের সেই সৌন্দর্য্য-সাধনাতেই তাঁহার অন্তর-পুরুষের আসল পরিচয় আছে। আমি এখানে কবির সেই কবি-স্বপ্নেরও কিছু পরিচয় দিব। প্রথমে এমন একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব যাহাতে কবির সেই প্রাণের সুর যেমন গভীর, তেমনই অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।—

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী—
তুমি অন্তরব্যাপিনী!
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

ঐ 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি', ঐ 'অচপল দামিনী' এবং 'চারিদিকে চির-যামিনী'র যে ভাব-সিদ্ধি, তাহা সাধক-ব্যক্তির সফল সাধনা হইলেও, কবির পক্ষে উহা ধ্যানগম্য, এবং মানুষের পক্ষে একরূপ ক্ষণিক চিত্ত-বিলাসমাত্র; কারণ, 'বিপুল বিরতি' বা 'অকূল শান্তি' জীবনের সত্য নয়; 'চারিদিকে চির-যামিনী'র মধ্যে, 'অসীম চিত্ত-গগনে একটি চন্দ্রে'র ঐ যে ধ্যান, উহাতে যে অদ্বৈত-সাধনার ইঙ্গিত আছে, তাহাতেও সকল দ্বৈতকে জয় করিবার প্রয়োজন হয় না—অন্ধকার হইতে চক্ষুকে ফিরাইয়া আলোকের দিকে নিবদ্ধ করিবার উপায় করিতে পারিলেই হয়; এইরূপ "intellectual attitude in all its naive simplicity" কবির পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনই গৌরবজনকও বটে; কিন্তু জীবনপথযাত্রী মানুষের পক্ষে ইহার মত ভ্রান্তি আর নাই। জীবনের দামিনী অচপল নয়—অতিশয় চপল, এবং তাহার পক্ষে, good ও evil—শিব ও অশিব, দুই-ই সমান সত্য। ইহারই প্রসঙ্গে, মঃ রোলাঁ তাঁহার বিবেকানন্দ-চরিতে, বিবেকানন্দের এই উক্তিটি বিশেষ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমিও তাহা উদ্ধৃত করিতেছি এইজন্য যে, তাহা দ্বারা, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ যে ভাবান্তর আনিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—"Learn to recognise the mother in Evil, Terror, Sorrow, Denial, as well as in sweetness and joy"। এই কথাই আর একটু বিস্তারিত করিয়া, মঃ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

Similarly the smiling Ramkrishna from the depths of his dream of love and bliss could see and remind the complaisant preachers of a "good God", that Goodness was not enough to define the force which daily sacrificed thousands of innocents.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের মূলমন্ত্র ঐরূপ। তাঁহার শিল্পী-মন বহু-বিচিত্রের পিপাসায় কত ভাবকেই না রূপ দিয়াছে—কত চিন্তাকে, কত তত্ত্বকে, কত অনুভূতিকে, কত অপরূপকে বাংলা ভাষার বীণা-ধ্বনিতে বাঁধিয়া দিয়াছে! আমি এখানে তাঁহার সেই কবিকীর্ত্তি বা কবিপ্রতিভার আলোচনা করিতেছি না—বাংলার নবযুগের সেই ধারাটির সঙ্গে তাঁহার বাণী, তথা ব্যক্তি-ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিচার করিতেছি। তাহাতে দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ সেই যুগকে যেরূপে বরণ করিয়া তাহার যে গতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের সেই ধারাকে ধরিতে চাহিলেও তাঁহার ব্যক্তিধর্ম্ম অতিশয় স্বতন্ত্র বলিয়া তিনি শেষে সেই ধারাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,

অথচ কোন নূতন ধারার প্রবর্ত্তন বা নায়কত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার মত, রস-শিল্পী কবির পক্ষে কোন একটি বিশেষ জীবন-বাদকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া—তাহারই ভেরী বাজাইয়া জনারণ্যের পথপ্রদর্শক হওয়া যে কতখানি স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাহা তিনিও বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি শেষে আপন ব্যক্তি-সাধনার সেই মন্ত্রটিকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া, ভাবমার্গে বিশ্বাত্মার সহিত ব্যক্তি-আত্মার যোগস্থাপন এবং তাহারই ফলে একটা মহামানবীয় কালচারের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্যকলা ও তন্নিহিত মানস-মুক্তির রস-পিপাসা প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া শিক্ষিত বাঙালী-মনকে যে ভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছিল, তাঁহাতে বাংলার নবযুগের সেই আদর্শ অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াছে—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সেই জয়গান বিংশ শতাব্দীর ভগ্ন-জীর্ণ বাঙালী-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া, তাহার আত্মসুখপরায়ণতাকেই একটি উদার ভাবসাধনার মহত্ত্ববোধে আশ্বস্ত ও চরিতার্থ করিয়াছে। ইহার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ দায়ী নহেন, দায়ী আমাদের চরিত্র ও আমাদের ভাগ্য—অবস্থাবশে অমৃতও এ জাতির পক্ষে বিষ হইয়া উঠিয়াছে। মঃ রোলাঁ বিবেকানন্দের ধর্ম্মমন্ত্র সম্বন্ধে এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলার নবযুগের সেই জীবনাদর্শ কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

Those who have followed me up to this point, know enough of Vivekananda's nature, with its tragic compassion binding him to all the suffering of the universe, and the fury of action wherewith he flung himself to the rescue, to be certain that he would never permit or tolerate in others any assumption of the right to lose themselves in an ecstasy of art or contemplation.

—এই "ecstasy of art or contemplation"—"রস-সাধনা বা ধ্যান-কল্পনার আত্যন্তিক সুখ-সম্ভোগ"—যে-জীবনের আদর্শ, তাহা 'tragic compassion' বা 'fury of action'-এর জীবন নয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন নিজের নিকটে তাহা বার বার স্বীকার করিয়াছেন; এইরূপ স্বীকারোক্তি তাঁহার একটি কবিতায় বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; 'এবার ফিরাও মোরে' নামক সেই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবি ও ব্যক্তি-স্বভাবের সুগভীর আত্ম-পরিচয় আছে। মানুষের বাস্তব-জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিচলিত হইলেও তিনি সেই দুঃখের জগতে বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারেন না; যেখানে—

> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

—সেখানেও তিনি সেই বাস্তব দুঃখকে একরূপ অস্বীকার করিয়া, এই দুর্গত মনুষ্যসমাজের আর্ত্তিনাশনের জন্য অতি উচ্চ ভাবসাধনার পন্থাই নির্দ্দেশ করিলেন; ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির

অন্ত যে অন্নজল তাহার পরিবর্ত্তে পরম সত্যের অমৃত-পায়স, মনুষ্যজীবনের পরিবর্ত্তে বিশ্বজীবন, এবং নিষ্ঠুর নিয়তি-রূপিনীর পরিবর্ত্তে নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার আধ্যাত্মিক আরাধনাকেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

…ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তার পর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভৎর্সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

—এমন যে দুর্গত সমাজ, যাহারা "শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া"—তাহাদিগের সেই সাক্ষাৎ দুঃখের প্রতিকার-চিন্তা না করিয়া, কবি উপদেশ দিলেন–

মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা—

এবং মুহূর্ত্তে ভাবাবিষ্ট হইয়া, তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া, নিজেরই জবানিতে—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

দুর্দ্দিনের অশ্রু-জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'।—কে সে? জানি না কে, চিনি নাই তারে…

তারপর কবি পৃথিবীর এই কঙ্করকণ্টকময় পথ কোনরূপে অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্বপ্রিয়ার—সেই নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার—চরণতলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এই দুঃখের জগতে দুঃখীদের সঙ্গে বাস করিয়া বলিতে পারেন নাই—

নত্বহং কাময়ে স্বর্গং নচরাজ্যং পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্।

রবীন্দ্রনাথের দোষ নাই; রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা মনুষ্য-সাধারণের জীবন-দেবতা নয়। তিনি যে জীবনের আরাধনা করিয়াছেন, তাহার অধিষ্ঠান-ভূমি বাহিরে নয়—ভিতরে; তাহার যত কিছু অভাব-অভিযোগ, যত কিছু দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম অতি কঠিন

স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার দ্বারা অন্তরেই প্রশমিত ও দমিত হইয়া যায়। বিশ্ব-প্রিয়ার প্রেমমূর্ত্তিখানিই কবির সেই স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার শক্তি-উৎস ; জীবনের সকল উদ্বেগ ও জ্বর-জ্বালা তাহারই করপদ্মপরশনে জুড়াইয়া যায়—সেই সৌন্দর্য্যকে অন্তরগোচর করিলে জীবনের কোন দৌরাত্ম্যই আর থাকে না ; তখনই—"অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি"। অন্যত্র, রবীন্দ্রনাথ—জীবনকে জয় করিবার নয়—বিস্মৃত হইবার এই মন্ত্র আরও উৎকৃষ্ট কবি-ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—চিত্রাঙ্গদার স্বর্গীয় রূপলাবণ্যদর্শনে মহাভারতের সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুনও গভীর ভাবাবেশে কবির ন্যায় গাহিয়া উঠে—

কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি,
কি আনন্দ কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হ'য়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে।...
চারিদিক হ'তে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ।
...ভাবিলাম
কত যুদ্ধ কত হিংসা কত আড়ম্বর
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষ্ণা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে।

জীবন বলিতে যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—বাধাবিঘ্ন জয়ের যে সংগ্রামশীলতা বুঝায়—এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহার প্রতিষেধক—তাহারই নাম 'জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ'। যে কাম সকল প্রবৃত্তির মূলে তাহাও এই বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্য-প্রতিমার কটাক্ষমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে—রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় সেই তত্ত্ব রূপকচ্ছলে অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেও কবি, রঙ রূপ ও রেখাকে ভাষার অধীন করিয়া, নারী-রূপের যে অনবদ্য সৌন্দর্য্য-প্রতিমা গড়িয়াছেন মদন তাহার দ্বারা পরাস্ত হইল—

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গ দেব। সম্মুখেতে আসি'

থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন, নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি' বসি' নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে। (চিত্রা—বিজয়িনী)

এইরূপ সৌন্দর্য্য-সাধনার সাধারণ নাম—Aestheticism; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির মানস-বিলাস মাত্র নয়; ইহার মূলে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রেরণা রহিয়াছে; ইহা আত্মারই লীলারস-সম্ভোগ, এই সৌন্দর্য্য-চেতনার মধ্যে গভীরতর আত্মচেতনার আনন্দ রহিয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যের সেই মর্ম্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারা সেই সনাতন রস-তত্ত্বকেই এক অপূর্ব্ব কাব্যকলায় পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন, তেমনই তাহার অন্তর্গত আদর্শের সহিত নবযুগের জীবন-সাধনার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এজন্য তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বাণী বা ভাবদৃষ্টিকে বাস্তব জীবন-সমস্যার সহিত যুক্ত করিয়া তাহার মূল্য বিচার করিবেন না, কবি রবীন্দ্রনাথ, তথা ভাবুক ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের যত কিছু উক্তিকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দান করিবেন। বাঙালীর ভাব-জীবনকে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমন আর কেহ করে নাই, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি যে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন এমন বোধ হয় আর কোন সাহিত্যকে কোন একজন কবি করেন নাই। বাঙালী যদি জীবনের অতি দুর্গম দীর্ঘ পথে তীর্থপর্য্যটনের শক্তি লাভ করে, যদি সেই পথের পাথেয় সে কখনও সঞ্চয় করিতে পারে, তবেই হিমালয়ের পারে কবিকল্পিত সেই মানস-সরোবরের স্বর্ণকমল-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সে তাহার সেই পৌরুষ ও প্রাণশক্তির পুরস্কার লাভ করিবে। তৎপূর্ব্বে সেই ফুলকে অলস সুখ-স্বপ্নের লীলা-কমল করিয়া তুলিলে, শুধুই জীবনের প্রতি মিথ্যাচার নয়—রবীন্দ্রনাথেরও অসম্মান, এমন কি তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করা হইবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা মনে পড়িল। খাঁটি পাশ্চাত্যসংস্কারবতী ও আধুনিক বিজ্ঞান-বুদ্ধিশালিনী এক ইংরেজ বিদুষী, একদা তাঁহার আদর্শ-মানব ঋষি রাসেলের (Bertrand Russel) গৃহে ভক্তদল-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দর্শনদান উপলক্ষ্যে দুই মনীষীর দুই মূর্ত্তির তুলনা করিয়া, এবং ভক্তদলের রবীন্দ্র-পূজা ও সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনুমান করিয়া, যে সকৌতুক কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা যেমন অজ্ঞতামূলক, তেমনই

স্বাভাবিক। আমাদের দেশের ধাতুগত যে mysticism—যে mysticismএর অপচারকে রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই এ যুগের সাধনা হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহা পাশ্চাত্য প্রকৃতির পক্ষে এতই বিজাতীয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই ভারতীয় ভাবের গন্ধমাত্র সহ্য করিতে না পারিয়া, এই পাশ্চাত্য বিদুষী যখন মন্তব্য করেন—

I like the picture of Tagore with his flowing beard and his oriental mysticism, his exotic pseudo-philosophic poems, with his pomegranate and lotus-bud imagery...his flowing robes, his reverent disciples, his crescent moon idealism....It is an amusing picture.

—তখন এইরূপ উক্তিকে বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই, ইহার মূলে যে অজ্ঞতা আছে তাহাও যেমন বুঝি, তেমনই, ইহা হইতে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন এই দুয়েরই আদর্শ একটা বিপরীত সংস্কারে কিরূপ আঘাত করে, এবং কেন করে, তাহা বুঝিবার পক্ষে আমাদের সুবিধা হয়। কিন্তু আমার মনে লাগিয়াছে ঐ ভক্তগণের কথা। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার—তাঁহাকে যথার্থভাবে ভক্তি করিবার মত শিক্ষা বা সংস্কৃতি ঐ বিদেশিনীর অবশ্য নাই, কিন্তু আমাদের জীবনেও কি রবীন্দ্রনাথের আসন প্রস্তুত হইয়াছে? রবীন্দ্রভক্তির যে আতিশয্য আমাদের মধ্যে প্রায় একটা ফ্যাশন হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে কি কোন জ্ঞান-বিচার আছে? গড্ডালিকাবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা কি সত্য নয় যে, বর্ত্তমান কালে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যাহারা একটা Cult বা ভক্তি-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অতিশয় কৃত্রিম জীবন যাপন করে—দেশ, জাতি বা সমাজের সহিত তাহাদের যেমন নাড়ীর যোগ নাই, তেমনই তাহারা অতিশয় সুখী ও শৌখিন সমাজে বাস করিতে পারিলেই জীবন ধন্য মনে করে। আমি এখানে, প্রসঙ্গক্রমেই, অতিশয় দুঃখের সহিত ইহার উল্লেখ করিলাম, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও তাঁহার সাধনা এযুগে এ জাতির পক্ষে যে কিরূপ নিষ্ফল হইয়াছে ইহাও তাহারই একটা প্রমাণ।

কিন্তু ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা যায় না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি যদি তাঁহার স্বকীয় সাধনার ও লোকোত্তর প্রতিভাবলে এমন এক স্থানে পৌঁছিয়া থাকেন যেখানে সৃষ্টির সকল পদার্থই জ্যোতির্ম্ময়, অথবা অন্ধকার যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, যেখানে ধ্বনিমাত্রেই সুরময়, অগ্নিরও আলো আছে—তাপ নাই; যেখানে সকল অন্যায় ও অসত্যকে কেবল অস্বীকারের দ্বারা নিরস্ত করা যায়; তবে তাঁহার মত পুরুষের সেই প্রাচীন ঋষি-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার দ্বারা সে অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন। বাংলা দেশে ঠিক ঐ কালে বাঙালীর

বংশে এমন এক প্রতিভার উদয় যে কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইহাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি নব-পুষ্পিত রূপ, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'—এই যে বাণী, রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল ইহাতেই নিহিত আছে। অতএব বাংলার নবযুগ যে পথে যুগ-সমস্যা, তথা জগদ্ব্যাপী আসন্ন মন্বন্তর-সঙ্কটকে বরণ করিয়া তাহার সমাধানে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, এই খাঁটি সনাতনী সাধনা জীবনের রূপ-রসকে আশ্রয় করিয়াও, সেই পথে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং তাহার অন্তরায় হইয়াছে। তাহার কারণ, এই সাধনা আদৌ ব্যক্তিমুখী—সমাজমুখী নয়; বিশ্বকে বিরাটকে নিজ-আত্মায় সংহরণ করিয়া সেই মুকুরবিম্বিত আত্মানুরূপ ছায়ার রূপ-রস-প্রীতিই ইহার সাধন-বস্তু; এই প্রীতিও একরূপ বিশ্বপ্রীতিই বটে, কিন্তু ইহা সেই প্রেম নয়, যে প্রেম আপন আত্মাকে—নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে—বিশ্বে বিলাইয়া দিয়, সেই বিশ্বের ছায়া নয়—কায়াকে আলিঙ্গন করিয়া; "with its tragic compassion binds him to all the sufferings of the universe", এবং 'ecstasy of art or contemplation'এর পরিবর্ত্তে 'fury of action'কেই বরণ করিয়া লয়।

৪

রবীন্দ্রনাথের সাধনা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাধনাই বটে, তাহাতে সেই ব্যক্তিস্বতন্ত্র ভাবদৃষ্টিই আধিপত্য করিয়াছে; তথাপি যুগধর্ম্ম এমনই যে, সেই প্রাচীন, আপন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই, আধুনিক বেশ ধারণ করিয়াছে; সেই ভাবদৃষ্টিতেই একটি নূতন রঙ লাগিয়াছে—মন্ত্র সেই একই বটে, কিন্তু তাহাতেই একটি নূতন পিপাসা যুক্ত হইয়াছে—জীবনে যাহা সম্ভব নয়, কাব্যে তাহা হইয়াছে। যে ভূমানন্দের অনুভূতি এককালে ঋষিকেই কবি করিলেও, জগৎ ও জীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার অবকাশ দেয় নাই, সেই রসই একালের কবিকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছে, সেই বৈচিত্র্যকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার—অসীমকে সীমার মধ্যে উপলব্ধি করিবার—বিপুল উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছে; যেন সেই রসকে জীবনের পাত্রেই আস্বাদন করিতে হইবে; শুধুই মর্ম্মকোষের মধু নয়—সৃষ্টি-শতদলের প্রত্যেকটির বর্ণ, গন্ধ ও রূপরস পঞ্চেন্দ্রিয়-মুখে পান করিতে হইবে। এই যে অরূপের রূপ-পিপাসা, ইহাতে জীবনের যেটুকু আরাধনা আছে, তাহাকেই কালের প্রভাব বলা যাইতে পারে। এবার সেই অমৃতপিপাসু আত্মা দেহেরই দুয়ারে দুয়ারে মাধুকরী করিয়াছে—

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে;
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা—

—এমন কথা বাঙালী কবির মুখে আদৌ অসম্ভব নয়—শাক্ত ও বৈষ্ণবের বংশগত ভাবধারার সেই প্রভাব ব্যর্থ হইবার নহে; তথাপি জীবনের এমন আরতি—মর্ত্ত্যের ধূলামাটিকেও এমন ভাবের ভরে আলিঙ্গন—পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। যুগের সহিত রবীন্দ্র-প্রতিভার যদি কোন গূঢ়তর যোগ থাকে, তবে তাহা ইহাতেই আছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আদর্শে যুগপ্রবৃত্তির এই যে নূতনতর প্রেরণা রহিয়াছে, ইহাতেই অতঃপর বাংলা সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনুষ্যজীবনকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে অন্যবিধ গৌরব দান করিয়াছেন। তিনি মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠতাকে, তাহার কীর্ত্তি বা প্রতিভার উচ্চতম শিখরকে, মহিমান্বিত করেন নাই; যে-মনুষ্যত্ব জীবনের সমতলভূমিতে, সাধারণ জীবনযাত্রায়, তাহার মর্ম্মের মাধুরী বিকাশ করিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে, শত শত পুষ্পবৃন্তে ঝরিয়া যায়, তিনি সেই মনুষ্যত্বের পূজা করিয়াছেন। যদিও কাব্যমন্ত্ররূপে ইহার বীজ আরও পূর্ব্বে বিহারীলালের কবিতায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তথাপি রবীন্দ্রনাথই যেমন ইহাকে সাহিত্যসৃষ্টিতে সার্থক করিয়াছেন, তেমনই সজ্ঞানে এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।—

> আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজকেও ভালরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখ বেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্ত্তব্য। (পঞ্চভূত : 'মনুষ্য')

অন্যত্র—

'জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্ত্তির ধূলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল,
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মত,
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি—
শব্দ তার শুনি অবিরত। (সোনার তরী : 'বর্ষাযাপন')

এই যে মানুষ-পূজা, ইহা লোকোত্তর-চরিত্রের বা বীর মানুষের পূজা নয়—মানুষমাত্রেরই মধ্যে যে মনুষ্যহৃদয় বা মনুষ্যসুলভ সুখদুঃখ-চেতনা সর্ব্বত্র তরঙ্গিত হইতেছে—ইহা তাহারই পূজা। এই মনুষ্যত্বও 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র মত, ইহার জন্যও ঋষির সেই

দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন; ঐ সাধারণ মানুষের উপরে সেই 'কাব্যের আলোকনিক্ষেপ' করিতে হইবে, যাহাকে ইংরেজ কবি আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—'the light that never was on sea or land, the Consecràtion and the Poet's dream"; অর্থাৎ, এখানেও রবীন্দ্রনাথের সেই Idealism—ভাবের আলোকে বস্তুসকলকে মণ্ডিত করিয়া দেখিবার সেই দৃষ্টি—জয়ী হইয়াছে; এবং ইহারই ফলে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে কবিকল্পনার মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। সে কল্পনা, প্রকৃতির মধ্যেও যেমন, মানুষের জীবনেও তেমনই, একটি শান্ত-স্থির সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, উভয়কে একটি আধ্যাত্মিক ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মন্ত্র ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিদৃষ্টির সম্পূর্ণ অনুরূপ। সাহিত্যিক ভাষায় এই আদর্শকে লিরিক আদর্শ বলা যাইতে পারে; মানবপূজা হিসাবে সেই যুগের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও, এই লিরিক আদর্শ পূর্ব্ববর্ত্তী এপিক বা নাটকীয় আদর্শকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা বিবেকানন্দের আদর্শ ও এই আদর্শ এক নয়, বরং বিপরীত; পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শে মানুষ একটা বিরাট শক্তির আধার—কেবল সুখদুঃখ-চেতনার আধার নয়; জীবন একটা নিস্তরঙ্গ সরোবর নয়, ভাবস্থির রস-সাগরও নয়; মানুষের দেহদশাধীন আত্মা বিকাশের অপেক্ষা রাখে—জীবনের গণ্ডি যত বৃহৎ হইবে, কার্য্যের ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হইবে, মানুষের চেতনাও তত উদ্বুদ্ধ হইবে, জীবন ততই সমৃদ্ধি লাভ করিবে। অতএব মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহতের প্রভেদ, অথবা, মহত্ত্বের মাত্রাভেদ না মানিলে, সৃষ্টিগত জীবন-ধারাকে অস্বীকার করিতে হয়, বস্তুকে বাদ দিয়া ভাবের সাধনা করিতে হয়। তাহাতে মানুষের সমাজে মিথ্যাচারই বাড়িয়া উঠে। বস্তু ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর করিবার জন্য ভাব-সাধনাই যদি যথেষ্ট হয়, বস্তুর অসম্পূর্ণতা যদি ভাবের দ্বারাই পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে কোন দুঃখ, কোন অভাবই আর থাকে না, জীবনের সহিত যুঝিবার প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি Idealist; বঙ্কিমচন্দ্র বা বিবেকানন্দও Idealist বটেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হয় জীবনের বাস্তব-সাধনা দ্বারা; এজন্য সে ক্ষেত্রে, ভাব-সাধনা নয়—শক্তি-সাধনাই প্রকৃত সাধনা। তথাপি তত্ত্বের দিক দিয়া এই দুই সাধনাই সত্য; একটি সমাজ-জীবনের সাধনা, অপরটি ব্যক্তি-জীবনের—একটি স্রোতে ঝাঁপ দিয়া, অপরটি কূলে বসিয়া; একটি শাক্ত সাধনা, অপরটি বৈষ্ণব। রবীন্দ্রনাথ যে খাঁটি বৈষ্ণব তাহাতে সন্দেহ নাই; তিনি বিরাট-বিপুলকে ক্ষুদ্রের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত দেখিয়া চরিতার্থ হন, তাঁহার ভগবান তুচ্ছতম জীবকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল—

> "আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
> তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"

শিশিরের বুকে আসিয়া কহিল তপন হাসিয়া
"ছোট হ'য়ে আমি তোমারে বুহিব ভরি'
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি'।"

"অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বম্" বলিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাটের শক্তির দিকটিকে বড় করিয়া দেখেন নাই। জীবনের যে রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার কাব্যে তিনি যে নর-নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি বড় যথার্থ বলিয়া মনে হয়। অপর এক সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয়প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচক বলিতেছেন—

In many ways he was a tremendously intelligent child who, playing on the sea-shore, did not concern himself with the sweep of the great tides, but splashed ecstatically in the less menacing ripples, with the keenest eyes for the adorable jetsam they flung up. He was not at ease, nor at his best in the presence of high tensions, they made him feel uncomfortable, as if a thunderstorm was brewing.

এই যে "keenest eyes for the adorable jetsam"—ইহা রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু এইরূপ জীবন-দর্শন কাব্যের পক্ষে যতই সত্য ও সঙ্গত হউক,—'Criticism of life', বা বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয়-মূলক জীবন-সত্যের দিক দিয়া, সম্যক্-দর্শন নহে। বাংলার নবযুগের সাধনায় মানুষের যে পৌরুষ-ধর্ম্মের উৎকর্ষই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে ; এখানে জীবন মানুষের অধীন নয়, মানুষই জীবনের অধীন, এবং সে জীবনে কর্ম্মের উপরে ধ্যান, বস্তুর উপরে ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই ভাবধারা সম্পূর্ণ নূতন—ইহার অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া—বাস্তব ও আদর্শের ভেদ ঘুচাইয়া দিয়া—জগৎব্যাপী মহা-বিপ্লবের মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এক দিকে সর্ব্বমানব-দেববাদ ও অপর দিকে সর্ব্বমানব-পশুবাদের সাম্য-ঘোষণা হইতেছে। বাংলার নবযুগের সাধনা ও তাহার আদর্শ যে ইহা হইতে কত স্বতন্ত্র, তাহার সেই মানব-বাদ বা মানব-ধর্ম্ম যে এইরূপ বিশ্বমানব-বাদকে—এই universalismকে—স্বীকার করে নাই, বরং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরেই সর্ব্বজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এবং জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও জাতিধর্ম্মকেই—তাহার সেই স্বধর্ম্মকেই, সেই এক আদর্শে আরোহণ করিবার সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এক কালে রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তা বা জাতিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। যথা—

"গোলাপফুল ত বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য্য ত সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল ত বিশেষ ভাবে গোলাপ গাছেরই সামগ্রী,

তাহা ত অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকে প্রকাশ করিতেছে। (আত্মপরিচয়)

* * *

এই বিশ্বধর্ম্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই—এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়; আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়া সত্যের এই রূপটিকে—এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। (আত্মপরিচয়)

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোন ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়।

(হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়)

—ইহা জাতীয়তা-ধর্ম্মেরই কথা, ইহাই বঙ্কিম-বিবেকানন্দের কথা; রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলার নবযুগের সেই সাধনাকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই আদর্শ একেবারে ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানববাদ প্রচার করিলেন, একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন মানুষের জাতিভেদ, স্বধর্ম্ম ও সংস্কৃতিভেদ আর নাই—মানুষের নাম হইল 'বিশ্বমানব', তাহার দেশ হইল—'সর্ব্বমানবলোক'। সেই মানুষের প্রকাশ যেখানে তাহাই স্বদেশ।—

সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তারা যে দেশে থাকে সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক, এই আমার কামনা।

* * *

বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র যে একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

তার মানে হচ্ছে, এই মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, কেন না, অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্ব্বলোকে। ("পত্রধারা", 'প্রবাসী', ১৩৩৮)

'নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না'—রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি বড় সত্য ও মূল্যবান। 'স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি' একদিন তিনিও করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা তাঁহার পক্ষে পরধর্ম্ম, শেষে স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সনাতন'-পন্থী, ভারতের সেই ভূমাবাদে দেশ কাল বা জাতি, কোনটারই স্থান নাই, তাই বাংলার নবযুগের সাধনা রবীন্দ্রনাথকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ সেই সাধনমন্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অসংখ্য রচনা ও অসংখ্য উক্তি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা এই পর্য্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ হইলেও তাঁহার স্থান বিংশ শতাব্দীতেই, তাহার কারণ, তাঁহার প্রতিভা ও মনীষার যে দৃঢ়তর অভিব্যক্তি, এবং কাব্যসাধনার বাহিরেও নব নব ভাব-চিন্তার নায়করূপে তাঁহার যে আত্মপ্রকাশ, তাহা এই বিংশ শতাব্দীতেও ঘটিয়াছে; এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের যাহা কিছু প্রভাব তাহাও এই কালের শিক্ষিত-সমাজের উপর পড়িয়াছে। তাঁহার সেই কবিজীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং সেই প্রভাবের ফলাফল বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়, এজন্য বাংলার নবযুগের পরিশিষ্ট হিসাবেই, সেই যুগকে অনুসরণ করিয়া, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

৫

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সেই নব-জাগরণের কাহিনী শেষ করিবার পূর্ব্বে সমগ্রভাবে দুই-চারিটি কথা বলিব। এই কাহিনীতে আমি বাঙালী-জাতির প্রতিভা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এবং বিশেষ করিয়া, একটা যুগের যুগ-সমস্যার পরিচয় দিয়াছি। আজ এই জাতি প্রায় মরণোন্মুখ বলিলেও হয়; জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে আজ আত্মচৈতন্যহীন ও হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থা তাহার কখনও হয় নাই। বহু পূর্ব্বকালের না হইলেও, দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের যে অসন্দিগ্ধ ইতিহাস আজও স্মরণাতীত হয় নাই, তাহাতে এই জাতির মনীষা ও প্রাণশক্তির, এবং জাতি হিসাবে একটি অতিশয় বিলক্ষণ সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার যে অসাধারণ উদ্দীপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহারই আলোকে তাহার সেই অতীতকে যেমন, তেমনই তাহার ভবিষ্যৎকেও ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়। আজিকার এই মহা দুর্দ্দিনে—এই মোহ ও মস্তিষ্কবিকার এবং পরধর্ম্মপিপাসার প্রবল উপসর্গ-পীড়ার মধ্যে, প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য অতিশয় ধীরভাবে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন আছে। সেই আত্ম-পরিচয় লাভ করিবার জন্য বেশি দূরে দৃষ্টি করিতে হইবে না, মাত্র দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে বাঙালী কি ছিল তাহা জানিলেই যথেষ্ট হইবে। এই উদ্দেশে, আমি আমার অভ্যস্ত

সাহিত্য-চিন্তা ত্যাগ করিয়া, অতিশয় স্বাস্থ্যভগ্ন অবস্থায়, এই দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি জানি, আমার এই আলোচনায় বহু ভ্রম-প্রমাদ আছে, বিশেষত ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি ইতিহাস লিখি নাই; সে যুগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জাগৃতির লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করিয়া, কেবল সাহিত্যিক ভাব চিন্তার সাহায্যে, জাতির গূঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রেরণা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি; তাহাতেই তাহার যে প্রতিভা ও প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, সে পরিচয় মিথ্যা নহে। ইহাও সত্য যে, আমি সেই নব-জাগরণের একটা দিক ধরিয়াই আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আর একটা দিকও আছে, এইবার সেই দিকটির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব। এই নব-জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল একটি মাত্র কারণে—জাতির দেহও যেমন সুস্থ ছিল, তেমনই তাহার প্রাণশক্তিও ছিল অটুট; যেন বহুকালসঞ্চিত শারীরিক শক্তি ও হৃদয়বল একটা অভাবনীয় সুযোগে শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল—শুধুই মনের নয়, প্রাণের প্রাবল্যও ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। সে কি উল্লাস! কি উৎসাহ! অতি দরিদ্র নিঃসহায় পল্লীবালকও কেবল দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনশক্তি ও প্রাণের অদম্য পিপাসায় শহরের বিদ্বৎসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। ধনীর সন্তান নিশ্চিন্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, নূতনতর জীবনযাপনের জন্য দারিদ্র্য বরণ করিতেছে। কোথাও বা নবশিক্ষার সেই আলোক প্রাণের আতশ কাচে পড়িয়া অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিতেছে; গোঁড়া হিন্দুর সন্তান দারুণ ম্লেচ্ছাচারে মাতিয়া উঠিতেছে। আজন্ম সংস্কারে আচারে অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ থাকিয়াও, শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতও গুরুতর সমাজসংস্কারে বদ্ধপণ করিতেছে—জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য উচ্চশিক্ষা হইতেও ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনকে বহিষ্কার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে! যে নিজে জাগিয়াছে সে অপরকে জাগাইবার জন্য অধীর হইয়াছে। যে নিজে খ্রীষ্টান হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক হইয়াছে, মাতৃভাষার উন্নতি ও স্বজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য তাহারও কি উৎসাহ! অসাধারণ মেধাশক্তির বলে দেশী ও বিদেশী বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া যাহার প্রত্যয় হইল যে জীবনের বাহিরে আর কিছু নাই, সে সারাজীবন নাস্তিক হইয়া কাটাইয়া দিল, কোন মোহ মানিল না, নিজের অমূল্য প্রতিভার কোন মূল্য চাহিল না! আর একজন আরও বলিষ্ঠ, আরও প্রতিভাশালী—জীবনের সমস্যাকে এমনই দুর্ব্বোধ্য ও মূল্যহীন মনে করিল যে, পূর্ণযৌবনে, সম্পূর্ণ সুস্থদেহে আত্মহত্যা করিল; সে আত্মহত্যা দুর্ব্বলের আত্মহত্যা নয়। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে। সাহিত্যসেবার পূর্ণ উৎসাহ এবং নিশ্চিত কবিখ্যাতি সত্ত্বেও একজন সুস্থ ও হৃদয়বান ব্যক্তি কেন যে আত্মহত্যা করিল, তাহার কারণ কেহ

(ইহার শেষ অংশ ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সপ্তর্ষি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরমানন্দ অনামিকা সোম-শুভ্রের কাছে নানা ভাবে উপকৃত। এমন কি তাদের আশাও আছে যে, হয়তো সোম-শুভ্র তাদেরই তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে যাবেন। সুতরাং সোম-শুভ্রের যে কোন প্রকার অদ্ভুত আচরণই তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তারাও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল (নবকুমার ইলার কাছে) যখন তিনি অবিচলিত গাম্ভীর্য্য সহকারে ব্যক্ত করলেন যে, গাছেরাও মানুষের মতই কথা কয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে। তাঁর মতে আমরা যাকে 'মর্ম্মর' বলি, তা ঠিক একই ধরনের ধ্বনি নয়। বিভিন্ন গাছেরই মর্ম্মর যে বিভিন্ন তাই শুধু নয়, একই গাছের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঋতুতে মর্ম্মরধ্বনি বিভিন্ন—এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। বাতাসের গতি-বেগ এবং পত্রের আকৃতির ওপরই মর্ম্মরধ্বনি প্রধানত নির্ভর করে তা তিনি জানেন, কিন্তু এ-ও তিনি অনুভব করেছেন এবং তার কতকটা প্রমাণও পেয়েছেন যে, কেবল বাতাসের গতি-বেগ ও পত্রের আকৃতি দিয়েই সর্ব্বপ্রকার মর্ম্মরধ্বনির ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে গাছেদের নিজেদেরও যেন সজ্ঞান কিছু প্রচেষ্টা আছে ব'লে মনে হয় তাঁর। যন্ত্র দিয়ে তিনি মেপে দেখেছেন যে, একই উত্তাপে ও বায়ুমণ্ডলের চাপে একই বাতাসের গতি-বেগে একই গাছ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম মর্ম্মরধ্বনি শোনায়। ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র থাকলে তিনি প্রমাণ রাখতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর মতে গাছের ভাষা শুধু শ্রাব্য নয়, দর্শনীয়ও। চক্ষু এবং কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে সে ভাষার মর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়। গাছের সব পাতা একসঙ্গে কাঁপে না, সব পাতার ওপর সূর্য্যালোক সমভাবে প্রতিফলিত হয় না। শুধু ফোনোগ্রাফ নয়, সিনেমাটোগ্রাফও দরকার, যদি কেউ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছের ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা করতে চান। গাছের ভাষা শ্রাব্য এবং দৃশ্য তো বটেই, তা ছাড়া আর একটা জিনিস আছে ব'লেও তাঁর মনে হয়। সিম্বায়োসিস ব'লে যেমন এক ধরনের জীবনযাত্রাপ্রণালী উদ্ভিদ ও পশু জগতে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন—যাতে দুটি বিভিন্ন প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যৌথভাবে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে প্রাণ ধারণ করে—তেমনই, সোম-শুভ্রের ধারণা, গাছের ভাষা ও পাখীর গান, গাছের ভাষা ও পতঙ্গের গুঞ্জন, পরস্পর-পরিপূরক। একের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরে ঠিক যেন মূর্ত্ত হতে পারে না।

তাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে গাছের ভাষার রূপও বিভিন্ন। সোম-শুভ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, তারা তাদের এই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাব-বিনিময়ও করে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কলকে ফুলের গাছের পাতায় পাতায় হঠাৎ একটা শিহরণ জাগল, একটা কোকিল ডেকে উঠল তার ডালে। ঠিক পাশেই একটা আতা গাছ, একই রকম হাওয়া বইছে, কিন্তু তাতে শিহরণও নেই, কোকিলও নেই। কিন্তু আর একটু দূরে আর একটা কলকে ফুলের গাছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাগল অনুরূপ শিহরণ, তার ডালেও ডেকে উঠল কোকিল। মনে হ'ল, দুটো গাছ যেন কথা ক'য়ে উঠল একই ভাষায়। এসব ঘটনা এত বার তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, এদের তিনি কাকতালীয়বৎ ব'লে উড়িয়ে দিতে চান না। তবে তাঁর এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য যে সব প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা ঠিক ক'রে উঠতে পারেন নি তিনি। তবু তিনি এগুলো ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে চান এই উদ্দেশ্যে যে, ভবিষ্যৎ যুগের কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো এ নিয়ে কাজ করতে পারবেন, তাঁর এ কল্পনাও হয়তো সত্যরূপে মূর্ত্ত হবে কোনদিন ভবিষ্যৎ কোন জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাবলে।

সম্পাদক নবকুমারের মনে হ'ল, সোম-শুভ্র বোধ হয় এই সব প্রলাপ তার 'অধরা' পত্রিকায় ছাপাতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাকে বোধ হয় নিমন্ত্রণ করিয়েছেন আজ। এই হাস্যকর ব্যাপার বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই নিবৃত্ত করা উচিত, নবকুমারের মনে হ'ল। কর্ত্তব্য-প্রণোদিত অপ্রিয় কার্য্যটাকে কৌশলে মোলায়েম করবার উদ্দেশ্যে তাই সে বললে, আপনার প্রবন্ধটা আমার কাগজে নিতে পারতাম; কিন্তু তাতে এত গম্ভীর প্রবন্ধ ঠিক চলবে কি না, বুঝতে পারছি না। আমার কাগজ ঠিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা তো নয়। তবে—

সোম-শুভ্রকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখে নবকুমার থেমে গেল।

তোমার কাগজ আছে নাকি?

আমার ঠিক নয়। প্রোপ্রাইয়েটর হচ্ছেন রামদাস মল্লিক। আমি সহকারী সম্পাদক।

প্রোপাইটার না ব'লে প্রোপাইয়েটর বললে, কারণ তার গর্ব্ব, ইংরেজী কথা যখন বলে, তখন অভিধান-সম্মত শুদ্ধ উচ্চারণই ক'রে থাকে সে।

সব সময় সফল হয় না যদিও, কারণ সে ইংরেজ নয়, তবু চেষ্টা করে। বেণীমাধবের অভিধান উলটে পালটে আজই সকালে 'প্রোপাইয়েটর' তার চোখে পড়েছিল। তাক মাফিক লাগিয়ে দিলে।

সোম-শুভ্র প্রশ্ন করলেন, রুবি মিলের রামদাস মল্লিক নাকি?

হ্যাঁ।

কাগজের নাম কি?

অধরা।

রামদাস মল্লিক সোম-শুভ্রের অপরিচিত নন। তিনিও ব্রাহ্ম। এই ওজুহাতে এবং অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এই কারণ দেখিয়ে বহুকাল পূর্ব্বে তিনি সোম-শুভ্রের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা চাঁদা নিয়েছিলেন। অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন,—হাজার টাকা অবশ্য আর কেউ দেন নি, কিন্তু দশ, বিশ; পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো—যার কাছে যতটুকু নেওয়া যায় তিনি নিয়েছিলেন। অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য হয় নি, কিছুকাল পরে একটি তেলের কল স্থাপিত হয়েছিল। বিধবার সঙ্গে এই তেলের কলটির কিছু সম্পর্ক যে ছিল না, তা নয়। রুবি-নাম্নী যে বিধবা মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে রামদাস মল্লিক দ্বিতীয় পক্ষে তাকে বিয়ে করেছিলেন, তার নামের সঙ্গে মিলটির নাম যুক্ত ক'রে বিধবা-প্রীতির কিছু পরিচয় মল্লিক মশায় দিয়েছিলেন। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যায় না যে মল্লিককে, তিনি আজকাল 'অধরা' নামক এক পত্রিকারও স্বত্বাধিকারী হয়েছেন—এই বার্ত্তা শুনে সোম-শুভ্রের মনের নেপথ্যে যে রসিকতা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তার আভাস মুখে অবশ্য ফুটল না কিছু। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, ও। তোমাদের কাগজে চলে না বুঝি এ ধরনের লেখা?

আজ্ঞে না। আমরা পোস্ট জর্জিয়ান লিটারারি 'মুউভ্‌মেণ্ট' নিয়েই আছি। তারই রূপটা বাংলা ভাষায় ফোটাতে চেষ্টা করছি।

হচ্ছে না কিন্তু কিছুই।—কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে ব'লেই সোম-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে ইলা বুঝলে যে, কথাটা এখন এ ভাবে বলাটা অশোভন হয়েছে। ইলার অপ্রতিভ ভাবটা দেখে অনামিকাকে ঘাড় ফিরিয়ে হাস্য গোপন করতে হ'ল। পরমানন্দ দৃষ্টির ইঙ্গিতে নবকুমারকে অনুরোধ করতে লাগল, যেন সোম-শুভ্রকে খুব বেশি নিরুৎসাহিত না করা হয়। সোম-শুভ্র প্রবন্ধের পাতাতেই

নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। এসব তিনি দেখতে পেলেন না। বলা বাহুল্য, 'অধরা' পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপাবার কোন আগ্রহ তাঁর জাগল না। জাগলেও তার জন্যে নবকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থী হবার দরকার হ'ত না তাঁর, রামদাস মল্লিক যখন সে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। কিন্তু এত কথা তিনি নবকুমারকে বললেন না। ক্ষণকাল নীরব থেকে একটু সসঙ্কোচেই তিনি বললেন, আমি যা লিখেছি তা বিশেষ কিছু নয় হয়তো, কিন্তু তবু এটা ছাপাব ঠিক ক'রে ফেলেছি। ছাপালে পঞ্চাশ ষাট পাতার একখানা চটি-বই হবে। এক হাজার কপি ছাপাতে কত খরচ পড়তে পারে?

নবকুমারই উত্তর দিলে, দেড়শো টাকার মধ্যেই হবে।

দেড় হাজার টাকায় তা হ'লে দশ হাজার কপি হবে।

একেবারে দশ হাজার কপি ছাপাবেন? অত কি বিক্রি হবে?

বিক্রি করব না, বিতরণ করব।

এর জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। চতুর্দ্দিকে সকলের যখন এত অভাব, তখন শুধু শুধু দেড় হাজার টাকার এই অপব্যয়! পরমানন্দকে মানুষ করেছিলেন ব'লেই বোধ হয় তার ধারণা ছিল যে, সোম-শুভ্রের টাকাকড়ির ওপর তার একটা ন্যায্য দাবি আছে। তাই সে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, তার মানে?

মনে করেছি, লাখ খানেক টাকা কোনও ভাল ব্যাঙ্কে জমা ক'রে যাব। তারই সুদ থেকে প্রতি বছর এই বই ছাপা হয়ে বিতরিত হবে। হাজার দুই-তিন সুদ হবে বোধ হয়। দেড় হাজার যদি বই ছাপানোর খরচ হয়, বাকিটা হবে বিতরণের খরচ। যিনি বিতরণ করবেন, তাঁকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে, টিকিট প্রভৃতিও লাগবে কিছু—

ইলা আবার কথা ক'য়ে উঠল অপ্রত্যাশিতভাবে, আপনার টাকা অবশ্য আপনি যেমন ভাবে খুশি খরচ করতে পারেন—

তারপর একটু হেসে বললে, এদেশে এখনও সে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতগুলো টাকা আরও ঢের ভালভাবে 'ইউটিলাইজ' করা যেত।

সোম-শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন এবং চুপ ক'রেই হয়তো থাকতেন, যদি না তাঁর মনে হ'ত যে, তাঁর নীরবতাকে হয়তো উপেক্ষা ব'লে মনে করবে মেয়েটি। মৃদু হেসে তাই উত্তর দিলেন, সেটা নির্ভর করে ইউটিলিটি কাকে বল

তুমি, তার ওপর। তোমার শাড়ি দেখে আমার কিন্তু ভরসা হচ্ছে যে, আমাদের দুজনের আদর্শে খুব বেশি তফাত নেই।

ইলার দামী রেশমের শাড়িটার দিকে সস্নেহে চাইলেন তিনি।

ইলা লজ্জিত মুখে বললে, এর দামই বা কত? আর এ কটা টাকা দিয়ে কটা লোকেরই বা উপকার হবে? কিন্তু আপনার ওই এক লাখ টাকা দিয়ে—

তেত্রিশ কোটি লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভাবলে এক লাখ টাকাও কিছু নয়। আর একটা স্কুল তৈরি ক'রে আরও গোটাকতক লোককে কেরানী হবার সুযোগ দিতে চাও? না, আর কোন হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে কতকগুলো চোরকে প্রশ্রয় দিতে চাও? তোমার মতে কি হ'লে ভাল হয়, শুনি?

আপনার ওই বই ছাপিয়েই বা কি হবে?

হয়তো কিছুই হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে, আজ যা আজগুবি ব'লে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাই হয়তো কোন বৈজ্ঞানিকের প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয়ে মানব-সভ্যতার রূপই বদলে দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—

কথাটা বলতে গিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে থেমে গেলেন তিনি। ঘড়িতে আটটা বাজল। অনামিকাকে উঠে পড়তে হ'ল। সোম-শুভ্রের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। রাত্রে অবশ্য দুধ ছাড়া তিনি খাবেন না কিছু এবং সে দুধটুকুও নিজের প্যানে নিজের স্টোভে গরম ক'রে নেবেন, কিন্তু তারও ব্যবস্থা করতে হবে অনামিকাকেই। অনামিকা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি, সোম-শুভ্রের কথাবার্ত্তা শুনে কিছু বলবার আর প্রবৃত্তিও ছিল না তার। অলেয়াকে নির্ভরযোগ্য আলো মনে ক'রে বিভ্রান্ত পথিক অবশেষে যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, সোম-শুভ্রের আলোচনা শুনে অনামিকার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনই হয়েছিল। নিরীহ নির্দ্দোষ পরমানন্দের ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তার। একেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ। সোম-শুভ্রের টাকার ওপর নির্ভর ক'রে বালীগঞ্জের চৌমাথার ওপর জমির দর করা হচ্ছিল। দেড়শো টাকা মাইনের কেরানীর আশাও কম নয়! বামন হয়ে চাঁদে হাত! মনের মধ্যে তুষানল জ্বলছিল অনামিকার। সে আর ব'সে থাকতে পারলে না, উঠে গেল। পত্নীর মনের অবস্থা পরমানন্দেরও অজ্ঞাত রইল না। হঠাৎ বেফাঁস কিছু ব'লে না বসে! অনামিকার পিছু পিছু সেও উঠে গেল।

নবকুমার বললে, আপনার সবচেয়ে বড় কথাটা কি, তা তো বললেন না?

আমার নিজের তৃপ্তি।

একটু চুপ ক'রে থেকে সোম-শুভ্র আবার বললেন, লম্বা লম্বা বক্তৃতার আড়ালে এই সত্য কথাটা ঢাকা প'ড়ে যায় অনেক সময়। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ, পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক, কবি দার্শনিক, দেশনেতা সকলেই যা সন্ধান করেছেন, তার নাম আত্ম-তৃপ্তি। দৈবক্রমে তাতে আর পাঁচজনের উপকার হয়ে গেছে। না-ও যদি হ'ত, তা হ'লেও তাঁরা স্বধর্ম্মচ্যুত হতেন না।

এতটা ব'লে সহসা তাঁর মনে হ'ল, আত্ম-প্রশংসা করা হচ্ছে। সসঙ্কোচে চুপ ক'রে গেলেন।

ইলা মুখরা মেয়ে। ব'লে উঠল, দশজনের উপকার ক'রে যাঁরা তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁরাই পৃথিবীতে পূজনীয় কিন্তু।

ঈষৎ হেসে সোম-শুভ্র বললেন, পৃথিবীতে এ রকম লোক থাকাও অসম্ভ নয়, যাঁরা দশের পূজা এড়াতে চান। মানুষ অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণাকেই পূজো করে কিনা। গ্যালিলিও যদি লোকের পূজা চাইতেন—

এখন কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই পূজনীয় নন কি?

এখন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মতকে সমসাময়িক বিজ্ঞেরা শুধু আজগুবি ব'লেই মনে করে নি, তাঁকে লাঞ্ছিতও করেছিল সেজন্যে।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা ব'লে আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে, আমি গ্যালিলিওর সমকক্ষ। এটা হয়তো আমার বাজে খেয়াল মাত্র। তর্কের খাতিরেই তর্ক করছিলাম শুধু।

এই পর্য্যন্ত ব'লে স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

একটু পরে নবকুমার কথা কইলে, ইলা দেবী কম্যুনিস্ট, তাই আপনার খেয়াল বোধ হয় ভাল লাগছে না ওঁর।

সোম-শুভ্র সস্নেহে ইলার দিকে চাইলেন।

ইলা ব'লে উঠল, যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কম্যুনিস্ট না হয়ে পারে না। বর্ত্তমান যুগে কম্যুনিজ্‌মই মুক্তি। আপনার মনে হয় না তা?

সোম-শুভ্র বললেন, হ্যাঁ, যাদের প্লেটে খেতে হবে, তাদের পক্ষে মুক্তি বইকি।

সকলেরই খেটে খাওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সভ্যসমাজের উচিত—প্রত্যেক কর্ম্মীকে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া।

সব মানুষের পক্ষে কি এক নিয়ম খাটে? তুঁতগাছ গুটিপোকার পক্ষে হিতকর স্বীকার করি, কিন্তু সব পোকার পক্ষে নয়। এমন কি সেই গুটি-পোকাই যখন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, তার পক্ষেও নয়। সেও তখন তুঁতপাতায় আবদ্ধ থাকে না, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। গুটিপোকার চক্ষে যেটা নিরর্থক বিলাস, প্রজাপতির পক্ষে সেইটেই সার্থক কর্ম্ম। এক নিয়ম কি খাটে সকলের বেলায়? বিশেষত মানুষের বেলায়?

উপমা দিয়ে কথা কইলে পারব না। নবকুমারবাবুর মত সাহিত্যিক তো আমি নই, লেখাপড়া শিখে বেকার ব'সে আছি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই। তাই মনে হয়, সোভিয়েটের দেশে থাকলে হয়তো সসম্মানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতাম।

সোম-শুভ্র চুপ ক'রে রইলেন। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল তাঁর। তাঁর বিশ্বাস যে, প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম-অনুসারে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য। মানুষের তৈরি সাম্যবাদের ছদ্মবেশ এত বার ধরা পড়েছে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, জীবনটা সত্যিই যদি একটা যুদ্ধ হয় এবং তার প্রধান অস্ত্র যে শক্তি, তা প্রকৃতিই সকলকে যদি সমানভাবে না দিয়ে থাকেন, তা হ'লে নিখুঁত সাম্যের আশা দুরাশা মাত্র, আদর্শবাদীর স্বপ্ন শুধু। বাস্তব-জগতে সেটাকে মুখোশরূপে ব্যবহার ক'রে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নিজেদের কাজ হাঁসিল ক'রে নেবেন হয়তো, কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্য অথবা খ্রীষ্ট-বিরোধী লেনিনের সাম্যরাজ্য দুর্ব্বলের কল্পলোকে অথবা আদর্শবাদীর স্বপ্নলোকেই থেকে যাবে। জীবলোকে তা কোন দিনই মূর্ত্ত হবে না, হবার উপক্রম করবে, কিন্তু হবে না। এ সবই জানেন তিনি। তবু রঙিন-শাড়ি-পরা ছিমছাম এই মেয়েটির—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যার কোন দুঃখই নেই, অথচ অন্তরে যার এত গ্লানি—এর স্বরূপ জানতে পেরে এবং নিজের সচ্ছলতার সঙ্গে তার তুলনা ক'রে তাঁর ভদ্র-অন্তঃকরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

নবকুমার একটু অধীর হয়ে উঠেছিল। সোম-শুভ্র অথবা ইলা কাউকেই

ডাক লাগাতে না পেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। অবশেষে সে উঠে পড়ল।

কিছু যদি মনে না করেন, আমি উঠি এখন।

খাবে না এখানে?

পরমানন্দ খেতে বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ এখন মনে পড়ল, সার্ নীলরতনের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে আমার—থাকতে পারব না।

আচ্ছা।

নবকুমার রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের পানের দোকানে একটা পাসিং-শো সিগারেট কিনে দেশলাইয়ের ওপর সেটা লঘুভাবে ঠুকতে ঠুকতে আগের মতই অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল। ওখান থেকে উঠে এসে বা মিছে ক'রে সার্ নীলরতনের নাম ক'রে অস্বস্তির কিছুই উপশম হ'ল না। নবকুমার চ'লে যাবার পর ইলা সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললে, আমি কিন্তু অত সহজে নিস্তার দিচ্ছি না আপনাকে। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব।

আমি বুড়ো মানুষ, তোমার সঙ্গে পারব কি?

দ্বারপ্রান্তে অনামিকাকে দেখা গেল। সমস্ত মুখ থমথম করছে তার।

স্টোভ জ্বেলেছি, আসুন। ইলা তুমিও এস, খাবার দেওয়া হচ্ছে। নবকুমারবাবু কোথা গেলেন?

তাঁর একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছিল, চ'লে গেছেন তিনি।

সকলে উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন।

গ

সোম-শুভ্র নিবিষ্ট চিত্তে ব'সে হিসেব লিখছিলেন। প্রত্যহ নিখুঁতভাবে পাই-পয়সার হিসেব মিলিয়ে তবে তিনি শুতে যান। বহুকাল থেকে এ কাজ ক'রে আসছেন। আধ পয়সার হিসেব গোলমাল হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না—আধ পয়সার জন্যে নয়, হিসেব গোলমালের জন্যে। কোন হিসেবের একচুল গোলমাল অসহ্য তাঁর পক্ষে। সারাজীবন তিনি এমন নিখুঁতভাবে হিসেব রেখেছেন যে, যে কোন মুহূর্ত্তে ব'লে দিতে পারেন জীবনে কত কুলি-ভাড়া দিয়েছেন, কত কাপড় কিনেছেন, কত চাল-ডাল কিনেছেন। সমস্ত প্রকার খরচের নির্ভুল হিসেব আছে তাঁর কাছে। শুধু টাকাকড়ির ব্যাপারেই নয়,

সব ব্যাপারেই তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ম-নিবদ্ধ। কোন প্রকার অনিয়ম তাঁর সহ্য হয় না। এমন কি বিছানার চাদর কোথাও যদি সামান্য কুঁচকে থাকে, তা হ'লেও তাঁর অস্বস্তি বোধ হয়। ঘুম আসতে চায় না, সেটা ঠিক ক'রে না নেওয়া পর্য্যন্ত মনের ভেতর খচখচ করতে থাকে। এ রকম লোকের জীবন অশান্তিপূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু সোম-শুভ্রের জীবন আশ্চর্য্য রকম শান্তিপূর্ণ, কারণ তিনি স্বাবলম্বী, কারও কাছে—এমন কি নিজের চাকরদের কাছেও—জোর গলায় কিছু দাবি করবার আত্মম্ভরিতা তাঁর নেই। বরং তাঁর ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয়, তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, যেন নিজের অস্তিত্ব দ্বারাই তিনি অপরের জীবনযাত্রায় বাধা-সৃষ্টি করছেন এবং সকলে তা সহ্য করছে ব'লে সকলের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ।

ইলা এসে প্রবেশ করলে।

আমি আপনার বিছানাটা ঠিক ক'রে দিয়ে যাই।

না না, কিছু দরকার নেই, তুমি বাড়ি যাও। আমি নিজেই ক'রে নিতে পারব। অনু কেমন আছে?

ভাল আছে। সে-ই আসছিল, আমিই মানা করলাম তাঁকে। একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাকুক।

এর আগে কি ওর ফিট হয়েছিল কখনও?

কই, শুনি নি তো।

ইলা সোম-শুভ্রের বিছানা খুলে পাড়তে লাগল। সোম-শুভ্র বাধা দিতে পারলেন না, কোন ব্যাপার নিয়ে বেশি বাদ-প্রতিবাদ করাটাও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি হাসি-মুখে হিসেব লিখতে লাগলেন।

মশারির দড়ি নেই বুঝি? নিয়ে আসি।

সব আছে; দাঁড়াও, দিচ্ছি।

সোম-শুভ্র উঠে তোরঙ্গ খুলে (স্যুটকেস পছন্দ করেন না তিনি) এক গুলি টোয়াইনের শক্ত সুতো, চারটি ছোট পেরেক এবং একটি ছোট হাতুড়ি বার ক'রে ইলাকে দিলেন।

এসব আপনি সঙ্গে রাখেন বুঝি?

সোম-শুভ্র একটু হাসলেন শুধু। ওই তোরঙ্গের মধ্যে কত রকম জিনিস যে তাঁর সংগ্রহ করা আছে, তা দেখলে ইলা অবাক হয়ে যেত। থাম,

পোস্টকার্ড, টিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম, চিঠি লেখার কাগজ, কলম, নিব, আলপিন, ফাউণ্টেন পেন, ব্লটিং, সাধারণ পেন্সিল, লাল-নীল পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, দেশলাই, গালা, শিলমোহর, হরিতকী, মাজন—এসব তো আছেই, অনেকেরই থাকে; কিন্তু এসব ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে, যা অনেকের থাকে না। কয়েকটা ছোট ছোট কৌটোতে আধলা, পয়সা, আনি, দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা, এমন কি কয়েকটা গিনিও আলাদা আলাদা করা আছে। কয়েকটা শক্ত খামে আছে নানা মূল্যের নোট। এসব ছাড়া ছোট একটা পুঁটুলিতে নানা রকমের কাপড়ের টুকরো, নানা রঙের সুতোর গুলি, সরু মোটা ছুঁচ, নানা ধরনের ছোট বড় বোতাম সংগ্রহ করা আছে। যখনই যে কাপড়ের জামা অথবা মশারি করান, তখনই তার খানিকটা ছাঁট সংগ্রহ ক'রে রেখে দেন, ভবিষ্যতে যদি তালি দিতে হয়—এই ভেবে। পড়বার সময় চশমা লাগে, দু জোড়া করিয়ে রেখে দিয়েছেন—এক জোড়া হঠাৎ হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেলে অসুবিধেয় যেন পড়তে না হয় অথবা অপরকে যেন অসুবিধেয় ফেলতে না হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সোম-শুভ্র এটা বুঝেছেন যে, অ-গোছালো হ'লে নিজের তো অসুবিধে হয়ই, আশপাশে যারা থাকে তারাও অস্বস্তি ভোগ করে। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি না পেলে জীবনযাত্রার ছন্দে তাল কেটে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায় যেন।

না না, ও ঠিক হচ্ছে না, ঠিক সমান ক'রে মেপে নাও, যেখানে সেখানে পেরেক ঠুকলে ঠিক হবে না। মশারির চারটি খুঁট ঠিক সমান হওয়া চাই তো।

আপনি কি লিখছেন লিখুন না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। সোম-শুভ্র আর বাধা দিলেন না, লিখতে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে বুঝলেন, ঠিক হচ্ছে না, ও চ'লে যাবার পর ঠিক ক'রে নিলেই হবে। যথাসাধ্য ভাল ক'রেই ইলা মশারি টাঙানো বিছানা-পাতা শেষ ক'রে বললে, দেখুন।

চমৎকার হয়েছে।

যাবার আগে ইলা লীলাভরে হেসে বললে, আপনার যে এত কাজ ক'রে দিচ্ছি, আমার একটু স্বার্থ আছে।

কি?

আমি যে স্কুলে পড়াই; সেখানে আমাকে মাইনে দেয় না। ভবিষ্যতে

মাইনে পাব—এই আশায় ঢুকেছিলাম। স্কুলের যিনি সেক্রেটারি, তিনি এখন বলছেন, বি. টি.-পাস লোক নেওয়া হবে। আমি যদি এক বছরের মধ্যে বি. টি. পাস করতে পারি, তা হ'লে তাঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন, না পারলে অন্য লোক নেবেন। স্কুলের সেক্রেটারি অনাদি সেন আপনাকে খুব খাতির করেন, আপনি যদি একটু রেকমেণ্ড ক'রে দেন আমাকে—

কি রেকমেণ্ড করব?

আমাকে যেন চাকরি করতে করতে বি. টি. পাসের সুযোগ দেওয়া হয়। ওঁরা ইচ্ছে করলে তিন বছর পর্য্যন্ত সময় দিতে পারেন। আমি তা হ'লে টাকা কিছু জমিয়ে নিতে পারি, বি. টি. পড়ার অনেক খরচ তো।

কত খরচ?

তা মাসে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এক বছরে ছ-সাতশো টাকা লাগবে। আপনি একটা চিঠি লিখে দিলেই কিন্তু হয়ে যায়।

তাদের স্কুলের বিষয় তো আমি কিছুই জানি না। তারপর একটু হেসে বললেন, তোমার বিষয়েই বা এমন কি জানি! চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে?

বেশ, তবে দেবেন না।

প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল ইলা। সোম-শুভ্র লক্ষ্য করলেন, তার হাসি-হাসি মুখখানি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। খুব খারাপ লাগতে লাগল তাঁর। কিন্তু কি করবেন তিনি, এমন ভাবে চিঠি দেওয়াটা কি উচিত হ'ত? উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব নেটাতেই সারাজীবনটা কেটে গেল! কি যে কর্ত্তব্য, তা ঠিক করা এত কঠিন! ইলার মুখখানা বারম্বার ভেসে বেড়াতে লাগল মনের ওপর। একখানা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেই বোধ হয় ওর সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু এমনভাবে মহত্ত্ব আস্ফালন ক'রে অপরিচিত একজন মেয়েকে একটা চেক ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে যে ইতরামি আছে, তার মধ্যে যেতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তারপর হঠাৎ আর একটা কথাও মনে হ'ল। যে শিব-শুভ্রের টাকা তিনি পেয়েছেন, তাঁর আত্মা যাতে তৃপ্ত হবে, টাকাটা কি সেই ভাবেই খরচ করা উচিত নয়? শশাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে হ'ল। কে জানে, তার ব্যবসা কেমন চলছে আজকাল! বহুদিন তার কোন খবর পান নি। গায়ে প'ড়ে খবর নিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। সে-ও বোধ হয় সঙ্কোচভরেই তাঁর কাছে

আসতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজনবশেই সেবার আসতে হয়েছিল ব'লে মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে বোধ হয়। শশাঙ্কের ছেলে শঙ্খ, তারও আবার ছেলে হয়েছে! শিশু শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখটা মনের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

তৃতীয় অঙ্ক

(ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো। বনমালা, রমলা ও কমলা প্রথম অঙ্কের মত জানালায় দণ্ডায়মান)

বনমালা। সেই থেকে আমরা জানলায় দাঁড়িয়ে আছি। নাঃ, কারও দেখা নেই। এত ভোগান্তি তোমার জন্যেই বাপু! মাগো, আমার পিনটা গুঁজে নিই; মাগো, আমার পাউডার লাগানো হয় নি! কেন যে ওসব কথা শুনতে গেলাম! পথে কি একটা জনপ্রাণীও আছে! শহরের সব লোক যেন মরেছে।

কমলা। মা ব্যস্ত হ'য়ো না। এখনই সব জানতে পারা যাবে। মিছরি অনেকক্ষণ হ'ল গিয়েছে, এখনই ফিরবে। [জানালায় উঁকি মারিয়া] মা, দেখ দেখ, কে যেন আসছে! ওই যে, পথের মোড়ে।

বনমালা। কই? সেই থেকে কেবলই আসছে আসছে বলছ! তোমার মাথা আর মুণ্ডু! হ্যাঁ, একজন লোক বটে! কে লোকটা? বেঁটে!...ভদ্র-লোকের মতই পোশাক। লোকটা কে হতে পারে? কি মুশকিল!

কমলা। আমার মনে হয় বলরামবাবু।

বনমালা। বলরামবাবু! কখনই বলরামবাবু নয়। [রুমাল নাড়িয়া] এদিকে এদিকে—তাড়াতাড়ি।

কমলা। ও বলরামবাবু ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

বনমালা। আবার তর্ক! আমি বলছি, কখনই বলরামবাবু নয়।

কমলা। দেখ মা, তখনই বলেছিলাম বলরামবাবু। এখন তো বুঝতে পারছ?

বনমালা। বলরামবাবুই তো বটে। তোমার বাপু মিছিমিছি তর্ক করা। আমি যেন বুঝতে পারি নি—এমনই তোমার ধারণা। [চীৎকার করিয়া] তাড়াতাড়ি আসুন। এত ধীরে হাঁটেন আপনি! ওঁরা সব কোথায়? বাড়িতে ঢোকা অবধি অপেক্ষা করবেন না। কি রকম লোক? খুব কড়া? আর ওঁর খবর কি? কি বিপদ! বাড়িতে না ঢোকা অবধি একটি কথাও বলবেন না?

(বলরামবাবুর প্রবেশ)

আচ্ছা, আপনার কি লজ্জা করছে না? এমন ক'রে একজন অবলাকে কষ্ট দিচ্ছেন? আপনার ওপরেই আমি আশা-ভরসা ক'রে ব'সে আছি। সেই যে গেলেন, আর দেখাটি নেই। সকলেই চুপচাপ! এতেও কি লজ্জা করছে না? আমি আপনার সিদু-বিশুর ধর্ম্ম-মা—আর আপনার শেষে এই ব্যবহার!

বলরামবাবু। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি ব'লেই ছুটতে ছুটতে আসছি। ওঃ, ঘাম ঝরছে দেখেছেন! কমলা যে, কেমন আছ?

কমলা। আপনি ভাল বলরামবাবু?

বনমালা। ব্যাপার কি এবার খুলে বলুন।

বলরামবাবু। রায় বাহাদুর আপনাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন?

বনমালা। লোকটা কি? জেনারেল, না—

বলরামবাবু। না, ঠিক জেনারেল নয়, কিন্তু কোন জেনারেলের চেয়ে কম নয়—যেমন কালচার, তেমনই ব্যবহার!

বনমালা। তা হ'লে এঁরই বিষয়ে উনি চিঠি পেয়েছিলেন।

বলরামবাবু। সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ঘনরামবাবু আর আমি—আমরা দু'জনেই প্রথমে তাঁকে আবিষ্কার করি।

বনমালা। ভাল ক'রে সব খুলে বলুন।

বলরামবাবু। ভগবানের কৃপায় এখন সব ভালই চলছে। প্রথমে রায় বাহাদুরকে···হ্যাঁ প্রথমে রায় বাহাদুর বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব খুব রেগে ছিলেন, তিনি বললেন যে, হোটেলের ব্যবস্থা

খারাপ, শহরের অবস্থা ততোধিক খারাপ। তিনি কিছুতেই ম্যাজিস্টেটের বাংলোতে আসবেন না, আর তাঁর জন্যে জেলে যেতেও পারবেন না। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, রায় বাহাদুরের দোষ নেই, তখন ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা বলতে শুরু করলেন, তার পর থেকে ভালই চলছে। ওঁরা সব দাতব্য-বিভাগ পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। রায় বাহাদুরের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন রিপোর্ট গিয়েছে—আমিও যে একেবারে ভয় পাই নি, তা নয়।

বনমালা। কিন্তু আপনার ভয়টা কিসের? আপনি তো সরকারী চাকরে নন।

বলরামবাবু। সে আপনি কি ক'রে বুঝবেন? একজন বড়লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, বিশেষ যখন তিনি কথা বলতে শুরু করেন—তখন ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

বনমালা। ওসব বাজে কথা যাক। এখন বলুন, তাঁকে দেখতে কেমন? বুড়ো, না ছোকরা?

বলরামবাবু। ছোকরা, একেবারে ছোকরা। তেইশের বেশি কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু কথা বলেন বুড়োর মতন। আমরা বলি—ওখানে যাবই। কিন্তু নাঃ, ও রকম ক'রে তিনি বললেন না, তিনি বললেন—হ্যাঁ, ওখানে বোধ করি যেতেই হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। দেখুন, কথার ভাঁজে ভাঁজে কি রকম বুদ্ধি আর কালচারের গন্ধ! তারপরে বললেন, আমার একটু লেখা-পড়ার বাতিক আছে, কিন্তু ঘরে হোটেল-ওয়ালা বাতি দেওয়া বন্ধ করেছে। বাতি আর বাতিক! দেখুন, কি কাল্‌চার! শুনে আমি আর রায় বাহাদুর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

বনমালা। রঙ কি রকম? ফর্সা না, কালো?

বলরামবাবু। ফর্সাও নয়, কালোও নয়—বাদামী। আর চোখ দুটো যেন কাঠবিড়ালির কাছে থেকে ধার ক'রে নেওয়া, সর্ব্বদাই নড়ছে। ওঃ, সে চোখের দিকে তাকালে বুকের ভেতরে চাকরির ইতিহাসের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বনমালা। গোঁফ আছে?

বলরামবাবু। বনমালা দেবী, একজন বড়লোকের, যাকে গ্রেট ম্যান বলে, তার মুখের দিকে তাকালে গোঁফের মত তুচ্ছ জিনিস চোখেই পড়ে না।

বনমালা। গোঁফ হ'ল তুচ্ছ! আরও কত কি শুনতে হবে! দেখি এবার, চিঠিতে কি আছে। (পাঠ) প্রথমে আমার অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভগবানের কৃপায় কচুভাজা, পুঁইচচ্চড়ি আর আড়াই টাকা হিসাবে দুই বোতল বিয়ার—(থামিয়া) নাঃ, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ভগবানের কৃপার সঙ্গে কচুভাজা পুঁই-চচ্চড়ির সম্বন্ধ কি?

বলরামবাবু। রায় বাহাদুর তাড়াতাড়িতে হোটেলের বিলের ওপরে লিখেছেন।

বনমালা। ওঃ, তাই বলুন। (পাঠ) কিন্তু আমি চিরদিন ভগবানে বিশ্বাসী, তাই সমস্তই এখন আমাদের অনুকূলে আসিয়াছে। শীঘ্র দোতলার দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরটা পরিষ্কার করাইয়া ফেলিবে। গ্রেট ম্যান দয়া করিয়া আমাদের বাড়িতেই···পাঁউরুটি, মাখন, ডিমের মামলেট, মোট ছ আনা।

বলরাম। ওটুকু বিলের, ও কিছু নয়।

বনমালা। সে কি আর আমি বুঝতে পারি নি! (পাঠ) পদধূলি দিবেন। দুপুরবেলা আমরা দাতব্য-বিভাগে আহার করিব। কাজেই কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। কিন্তু মদের ব্যবস্থা রাখিবে। আবদুল্লার দোকানে এখনই লোক পাঠাইবে। সে যদি ভাল মাল না পাঠায়, তবে হতভাগাকে দেখিয়া লইব। ইতি তোমারই একান্ত আলুর দম এক প্লেট। আলুর দম—এ কি রকম ঠাট্টা!

বলরামবাবু। ওটা হোটেলের বিলের অংশ।

বনমালা। আপনি ভাবছেন, আমি বুঝতে পারি নি! এই যে পরেই আছে—একান্ত অনুগত স্বামী। কি সর্বনাশ! আর তো সময় নেই। এসে পড়ল ব'লে। মিছরি! মিছরি! সে ছুঁড়ীর কি আর দেখা পাওয়া যাবে—পাড়ার ছোঁড়াগুলোর পেছনে···ঝগড়ু! ঝগড়ু!

(ঝগড়ুর প্রবেশ)

এখনই আবদুল্লার দোকানে যাও, দাঁড়াও, আমি চিঠি দিচ্ছি তাই নিয়ে যেতে হবে। (টেবিলে বসিয়া লিখিতে লিখিতে বলিতে লাগিল) কোচম্যানকে বল, এই চিঠিখানা নিয়ে আবদুল্লার দোকানে যেন যায়—

আর ক বোতল মদ নিয়ে আসে। আর তুমি গিয়ে দোতলার ঘরটা পরিষ্কার ক'রে টেবিল চৌকি দিয়ে সাজিয়ে ফেল্‌গে গিয়ে—শিগগির।

বলরামবাবু। আমি তা হ'লে যাই। দাতব্য-বিভাগের পরিদর্শন কি রকম হচ্ছে, দেখি গিয়ে।

বনমালা। আপনাকে আমি ধ'রে রাখতে চাই না, আপনি শিগগির যান।

বলরামের প্রস্থান

কমলা মা, এবার আমাদের কঠিন পরীক্ষা। মেয়েদের পোশাক-নির্বাচনের চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছু আছে? এমনটি পরতে হবে, যাতে দশজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সকলের আগে তোমার দিকে নজর পড়ে। বিশেষ ইনি আসছেন কলকাতা থেকে, ওঁদের রুচিই অন্য রকম। লক্ষ্য রাখতে হবে, পাড়াগেঁয়ে ব'লে নিন্দে না হয়।

কমলা। আমি বলি কি মা, তুমি সেদিনের মত কানন-শাড়িখানা পর। তোমাকে সেদিন পেছন থেকে ঠিক কানন দেবীর মত দেখাচ্ছিল।

বনমালা। আমি তো ভাবছি, বেনারসীখানা পরব।

কমলা। না মা, সত্যি বলতে কি, বেনারসীতে তোমাকে মানায় না।

বনমালা। কেন?

কমলা। আরও রঙ ফর্সা দরকার।

বনমালা। আমার রঙ ফর্সা না হ'লে এ পাড়ায় আর কার রঙ ফর্সা শুনি?

কমলা। বাড়ির বাইরে যেতে হবে না। রমলাদি তোমার চেয়ে অনেক ফর্সা।

বনমালা। বটে! বটে! সেই মা-মরা জলার পেত্নী? তবু যদি না হ'ত টব-চাপা-পড়া ঘাসের মত গায়ের রঙ। কই, সে ছুঁড়ী কই?

কমলা। রমলাদি, এদিকে এস।

(রমলার প্রবেশ)

রমলা। কেন মা?

বনমালা। (রমলার গায়ে খদ্দরের শাড়ি দেখিয়া) আবার খদ্দর পরা হয়েছে?

রমলা। কেন মা, এ তো বেশ ভাল জিনিস।

বনমালা। সেদিন পোস্ট-মাস্টার বলেছিল, খদ্দরে তোমাকে বেশ দেখায়—

সেই থেকে আর খদ্দর ছাড়তে চাও না। তুমি ভাবছ, ও তোমাকে বিয়ে করবে! ও যে আড়ালে তোমাকে মুখ ভেংচায়। তবু হ'ত, যদি কমলা—

কমলা। কেন মা, দিদিকে খদ্দরে তো বেশ দেখায়!

বনমালা। হ্যাঁ, বেশ দেখালেই হ'ল! ওতে যে তোমার বাবার চাকরি যেতে পারে। (এমন সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল) ওই বুঝি ওঁরা সব আসছেন। চল, সাজগোজ ক'রে নিই।

কমলা। কিন্তু মা, আর যাই কর, বেনারসীখানা প'রো না।

বনমালা। ফের তর্ক!

তিনজনের প্রস্থান

(মুকুন্দর একটি বাক্স কাঁধে লইয়া প্রবেশ। অন্য দিক দিয়া মিছরির প্রবেশ)

মুকুন্দ। কোন্ দিকে?

মিছরি। এই দিকে এস।

মুকুন্দ। একটু জিরিয়ে নিই। খালি পেটে বোঝা দ্বিগুণ ভারী মনে হয়।

মিছরি। জেনারেল সাহেব কখন আসবেন?

মুকুন্দ। কোন্ জেনারেল?

মিছরি। কেন, তোমার মনিব।

মুকুন্দ। একেবারে চার পুরুষের জেনারেল।

মিছরি। মাগো! আমরা শুধু এক পুরুষের ভেবেছিলাম।

মুকুন্দ। দেখ, আমাকে কিছু খেতে দিতে পার?

মিছরি। তোমাদের খাবার তো এখনও তৈরি হয় নি।

মুকুন্দ। না হয় তোমাদের খাবারই কিছু নিয়ে এস।

মিছরি। তবে তুমি এদিকে এস।

মুকুন্দ। চল। তোমার নামটি কি?

মিছরি। মিছরি।

মুকুন্দ। মিছরির মতই মিষ্টি।

মিছরি। হাত দিতে গেলে দেখতে পাবে, মিছরির মত ধারও আছে।

মুকুন্দ। বাঃ, বেশ বলেছ! (গুনগুন করিয়া গান)

মেরেছিস্ মিছরির দানা
তাই বলে কি প্রেম দেব না!

মিছরি। চল ওই ঘরে—ওঁরা সব আসছেন।

দুইজনের প্রস্থান

(একজন কন্‌স্টেব্‌ল সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া ধরিল। অনঙ্গমোহনকে অনুসরণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাষ্টার, ঘনরাম ও বলরাম প্রবেশ করিল। ঘনরামের নাকে একটা পটি। ম্যাজিষ্ট্রেট মেঝের উপরে এক টুকরা কাগজ দেখাইয়া দিতেই—কয়েকজন পুলিস দৌড়িয়া গিয়া তাহা কুড়াইয়া লইল)

অনঙ্গমোহন। চমৎকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠান। আপনারা যে ভাবে শহরের সব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করালেন, তা বাস্তবিক চমৎকার। অন্যান্য শহরে আমাকে কেউ কিছু দেখায় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট। সত্য কথা বলতে কি, অন্যান্য শহরের ম্যাজিস্ট্রেট ও অফিসাররা কেবল নিজেদের স্বার্থই চিন্তা ক'রে থাকে। কিন্তু এখানে আমরা কর্ত্তব্য-পালন দ্বারা উচ্চতর অফিসারদের সন্তুষ্টি-বিধান ছাড়া আর কিছু কখনও ভাবি না।

অনঙ্গমোহন। দাতব্য-বিভাগের আহারটিও খুব উপাদেয় হয়েছিল। উঃ, খুব বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে! আপনারা কি প্রত্যেক দিন এমনই খান নাকি?

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার মত সম্মানিত অতিথির জন্যেই আজ বিশেষ আয়োজন হয়েছিল।

অনঙ্গমোহন। সুখাদ্য আমার অত্যন্ত প্রিয়। জীবন তো এইজন্যেই—জীবন মালঞ্চ থেকে সুখের পুষ্প চয়নের জন্যেই। মাছটার কি নাম?

দাতব্য-কর্ত্তা। (ছুটিয়া আসিয়া) বাঁশপাতা মাছ, সার্।

অনঙ্গমোহন। চমৎকার! কোন্ প্রতিষ্ঠান আমরা দেখে এলাম? হাসপাতাল না?

দাতব্য-কর্ত্তা। আজ্ঞে হ্যাঁ। শহরের দাতব্য-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা।

অনঙ্গমোহন। তাই বটে। চারদিকে বিছানা দেখলাম। সব যেন খালি ছিল—রুগী অবশ্যই সব সেরে উঠেছে। বেশি লোক তো দেখি নি।

দাতব্য-কর্ত্তা। হ্যাঁ, জন বারো মাত্র এখন আছে। বাকি সব সেরে বাড়ি গিয়েছে। এর মূলে আছে আমাদের ব্যবস্থা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। আমি এখানে আসবার পরে থেকে এই রকমই চলছে—রুগী ভর্ত্তি হবা মাত্র,

বাস্—সেরে ওঠে। অবশ্য ওষুধের গুণ আছে—কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান ছাড়া ওষুধ কি করতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট। আর সার্, ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ত্তব্যের মত এমন দায়িত্ব আর নেই। কি বলব, এত কাজ! শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথাই ধরুন না কেন—অন্য লোক হ'লে পাগল হয়ে যেত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এখানে সব ঠিক চলছে। অন্য সবাই যখন নিজের স্বার্থ চিন্তা করছে, আমি রাত্রে বিছানাতে শুয়েও কেবলই ভাবতে থাকি—ভগবান, আমি যেন দায়িত্ব-পালন দ্বারা উচ্চতর অফিসারদের সন্তুষ্টি সাধন করতে সক্ষম হই। তাঁরা যদি পুরস্কার দেন ভাল—না দেন, তবু আমি মনে শান্তি পাব। শহরটি যদি পরিষ্কার থাকে, কয়েদীরা যদি যথানির্দ্দিষ্ট বরাদ্দমত খাদ্য পায়, শহরে যদি গণ্ডগোল না হয়—তার চেয়ে আর কি বেশি প্রার্থনা করতে পারি? আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সম্মানের প্রত্যাশী আমি নই। অবশ্য সম্মান লোভনীয়, কিন্তু কর্ত্তব্যের তুলনায় তা ধূলিমুষ্টি।

দাতব্য-কর্ত্তা। (স্বগত) ওঃ, লোকটা কি ভণ্ড! এ গুণ ভগবদ্দত্ত!

অনঙ্গমোহন। ঠিক বলেছেন। আমিও মাঝে মাঝে ওই রকম চিন্তা ক'রে থাকি। অধিকাংশ সময়েই সাদা গদ্যে—কিন্তু কখনও কখনও কবিতাও এসে যায়।

বলরাম। (ঘনরামকে) চমৎকার বলেছেন। ঘনরাম, দেখ, ওঁর কথা শুনলেই বুঝতে পারা যায়, খুব পড়াশুনো আছে।

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি সময় কাটাবার মত কোন আড্ডা নেই—যেমন ধরুন একটা ক্লাব, যেখানে তাস খেলা যেতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট। (স্বগত) বুঝেছি চাঁদ, তুমি কি খবর জানতে চাও! (প্রকাশ্যে) সর্ব্বনাশ! ওরকম ক্লাব থাকা তো দূরের কথা, কেউ এখানে কানেও শোনে নি। জীবনে আমি কখনও তাস খেলি নি—কি ক'রে যে লোকে তাস খেলে, তা আজও জানতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, চিড়িতনের সাহেব দেখলেই আমার মাথা ঘুরে ওঠে। একদিন ছেলেদের সঙ্গে ব'সে একটা তাসের ঘর তৈরি করেছিলাম, সেদিন সারারাত ঘুম হ'ল না—নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখলাম। কি ক'রে যে লোকে জীবনের অমূল্য সময় তাস খেলে কাটায়— ভগবান!

হেডমাস্টার। (স্বগত) কাল রাত্রেই আমার কাছে থেকে একশো টাকা জিতেছে। রাস্কেল!

ম্যাজিস্ট্রেট। দেশের মঙ্গলের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।

অনঙ্গমোহন। এ আপনার বাড়াবাড়ি। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি তাস খেলেন, তার ওপরেই সব নির্ভর করে। আপনারা মফস্বলের লোক জানেন না, কিন্তু আমরা কলকাতায় জানি, দেশের মঙ্গলের জন্যেও তাস খেলা যেতে পারে।—ধরুন, মনটা খারাপ আছে, কর্ত্তব্যে মন লাগছে না—একবাজি তাস খেলে নিলাম, মনটা ভাল হ'ল, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হ'ল—এতে কি দেশের মঙ্গল করাই হ'ল না? না না; আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না—মাঝে মাঝে এক-আধ বাজি ভালই লাগে।

(বনমালা ও কমলার প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার স্ত্রী; আর আমার মেয়ে কমলা।

অনঙ্গমোহন। (মাথা নীচু করিয়া) আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি।

বনমালা। আপনার মত সম্মানিত অতিথি লাভ ক'রে আমাদের আনন্দ আরও বেশি।

অনঙ্গমোহন। কি বলছেন আপনি! আমার আনন্দ আপনাদের চেয়েও বেশি।

বনমালা। সে কি ক'রে সম্ভব? অবশ্যই আপনি ভদ্রতা ক'রে এসব কথা বলছেন। দয়া ক'রে বসুন।

অনঙ্গমোহন। আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবার আনন্দই কি কম? তবে যদি ইচ্ছা করেন, বসতেও পারি। এতক্ষণে আমি সত্যিই সুখী—আপনার পাশে উপবেশন ক'রে।

বনমালা। এ কেবল আপনি ভদ্রতা ক'রেই বলছেন। কলকাতা থেকে যাত্রা ক'রে অবধি নিশ্চয় অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। অসুবিধা ব'লে অসুবিধা! কলকাতা ছেড়ে মফস্বলে বেরুনো যেন স্বর্গ ত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্যে অবতরণ। নোংরা হোটেল, ছারপোকাওয়ালা

গদি, লোকের অজ্ঞতা! কিন্তু এখানে এসে সমস্ত কষ্ট ভুলে গেলাম। (বনমালার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত)

বনমালা। নিশ্চয় এখানেও আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। বিশ্বাস করুন, এই মুহূর্ত্তে আমি সুখের চূড়ায় অবস্থান করছি।

বনমালা। সে কি ক'রে সম্ভব? এ সম্মান আমার আশাতীত।

অনঙ্গমোহন। আশাতীত! বলুন, যোগ্যতার চেয়ে অনেক কম।

বনমালা। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—

অনঙ্গমোহন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কি সৌন্দর্য্য নেই? পাড়াগাঁয়ের বিল খাল নদী? ধান বাঁশ বেত? অবশ্য কলকাতার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। কলকাতাই তো জীবন, না জীবন-দুধের চাঁছি। বোধ করি আপনারা ভাবছেন, আমি সামান্য একজন কেরানী। ভুল করছেন। আমার আফিসের বড় সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বলে—চল না হে, ফিরপোতে ডিনার খেয়ে আসা যাক। আমি আফিসে কেবল দু-চার মিনিটের জন্যে একবার ঘুরে আসি—তারপরে বেচারা কেরানীর দল সারাদিন ধ'রে কলম পিষে পিষে মরে। আফিসে যখন আমি ঢুকি···তিন-চারজন জুতো-বুরুশ আমার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে···হুজুর বুরুশ, হুজুর বুরুশ···আমি তাদের তাড়াবার জন্যে এমনই ভাবে পা ছুঁড়ি···[পা ছুঁড়িল] ওঃ, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন, বসুন।

ম্যাজিস্ট্রেট, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাস্টার। [সমস্বরে] পদমর্য্যাদার বিচারে আমরা বসতে পারি নে, আমরা দাঁড়িয়েই থাকব। আমাদের জন্যে আপনি ভাববেন না।

অনঙ্গমোহন। পদমর্য্যাদা চুলোয় যাক। বসুন, আমি অনুরোধ করছি, বসুন। [সকলে বসিল] পদমর্য্যাদানুসারে চলাফেরা আমি পছন্দ করি নে। বরঞ্চ লোকে যাতে আমার পদমর্য্যাদা বুঝতে না পারে, তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু বিপদ কি জানেন—কিছুতেই আমি লোকের চোখ এড়াতে পারি নে। অসম্ভব! পথে বেরুলেই লোকে বলতে আরম্ভ করে—ওই যাচ্ছে মিঃ এ. এম. রায়। মহা মুশকিল! একবার তো লোকে আমাকে স্বয়ং কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ব'লে মনে করলে। দেখতে দেখতে পথের দুধারে সিপাহীর দল জুটে গেল। সে কি স্যালুট করবার ধুম! সিপাহী-দলের

কর্নেল—সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার পিঠ চাপড়ে বললে, জান তোমাকে প্রথমে সবাই আমরা কম্যাণ্ডার ব'লে মনে করেছিলাম।

বনমালা। না শুনলে এ ঘটনা কখনও বিশ্বাস করতাম না।

অনঙ্গমোহন। থিয়েটারের সুন্দরী সব অভিনেত্রীদের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বোধ করি আপনারা খোঁজ রাখেন যে, থিটোরের জন্যে দু-চারখানা নাটক লিখেছি। সাহিত্যিকদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব আছে—বুদ্ধদেব সজনীকান্ত তারাশঙ্কর—এরা তো আমার chums, মানে···একদিন এস্‌প্ল্যানেডের মোঁড়ে তারাশঙ্করের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। পিঠ চাপড়ে বললাম, কি রকম আছ হে? সে চমকে উঠে বললে—কে, অনঙ্গমোহন বটে! কথায় আজও বীরভূমী টান গেল না। অদ্ভুত লোক ওই তারাশঙ্কর!

বনমালা। তা হ'লে আপনি লিখেও থাকেন? আহা, সাহিত্যিক হওয়া, সে কি দুর্লভ সৌভাগ্য! নিশ্চয় কাগজে আপনার লেখা বের হয়।

অনঙ্গমোহন। কাগজে লেখা পাঠাই বইকি। অনেকগুলো বই লিখে ফেলেছি। কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকুমারী, গীতাঞ্জলি, গৃহদাহ। সবগুলোর নাম আবার এখন মনে পড়ছে না। আমার নতুন নাটক মানময়ী গার্লস স্কুল নিশ্চয় দেখেছেন? সেখানার রচনার ইতিহাস অদ্ভুত। ক্লাবে থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। সে বললে, ভাই, চটপট কিছু লিখে দাও না—থিয়েটার তো আর চলে না। তখনই বললাম, বেশ, দাও কাগজ। কিন্তু ক্লাবে কাগজ কোথায়? শেষে মদের বিল জোড়া দিয়ে দিয়ে এক রাত্রের মধ্যে লিখে ফেললাম মানময়ী গার্লস স্কুল। শরৎ চাটুজ্জের ছদ্মনামে যত লেখা বেরিয়েছে, সব আমার।

বনমালা। আপনারই ছদ্মনাম তা হ'লে শরৎ চাটুজ্জে।

অনঙ্গমোহন। সব সাহিত্যিকের লেখা আমি সংশোধন ক'রে দিয়ে থাকি। প্র. না. বি.-র লেখা সংশোধন করবার জন্যে আমি মাসে দু হাজার ক'রে পেয়ে থাকি।

বনমালা। পথের পাঁচালী নিশ্চয় আপনার লেখা?

অনঙ্গমোহন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওখানা তো দু সপ্তাহে লিখে ফেলা।

কমলা। মা, বইয়ের মলাটে তো বিভূতি বাঁড়ুজ্জের নাম—

বনমালা। কমলা, কিছুতেই তোমার তর্ক করার স্বভাব গেল না!

অনঙ্গমোহন। উনি যা বললেন, তা সত্যি। ওখানা বিভূতি বাঁড়ুজ্জের বটে। কিন্তু আরও একখানা পথের পাঁচালী আছে, সেখানা আমার লেখা।

বনমালা। [কমলার প্রতি] নাও, হ'ল তো? কর এখন তর্ক। আমি আপনার খানাই পড়েছিলাম। কি মিষ্টি ভাষা!

অনঙ্গমোহন। সাহিত্যের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। কলকাতায় আমার বাড়ি সবচেয়ে শৌখিন। সকলেই এক ডাকে চেনে। [সকলকে সম্বোধন করিয়া] আপনারা যখন কলকাতায় যাবেন, আমার বাড়িতে উঠবেন। এ আমার বিশেষ অনুরোধ রইল। আমি প্রায়ই পার্টি দিয়ে থাকি।

বনমালা। সেসব পার্টিতে যে কি রকম ধুমধাম হয়ে থাকে, তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি।

অনঙ্গমোহন। সে ধুমধাম আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। অসম্ভব। এক-একটা বোম্বাই আমের দাম অষ্টআশি টাকা। বরাবর বোম্বে থেকে এরোপ্লেনে ক'রে আমদানি করা। আর সুপের কথা যদি বলেন। প্যারিস থেকে তৈরি করিয়ে বরাবর জাহাজে ক'রে কলকাতায় আনানো। ঢাকনা তুলতেই সে কি গন্ধ!

নিজের বাড়ি যেদিন পার্টি না থাকে, সেদিন হয় দ্বারভাঙ্গার বাড়িতে, নয় বর্দ্ধমানের বাড়িতে, নয় তো কুচবিহারের বাড়িতে। একদিনও বেকার ব'সে থাকবার উপায় নেই।

সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে প্রায়ই তাস খেলবার ডাক পড়ে। হয়তো গিয়ে দেখব, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, চীফ মিনিস্টার আর আমেরিকার কন্‌সাল আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। খেলতে খেলতে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি—থাকি সেই পাঁচতলার ওপরে, অমনই একসঙ্গে ষোলজন খানসামা দৌড়ে আসে···কি বাজে বকছি, একতলাতেই থাকি। ওরকম সিঁড়ি আপনারা কখনও দেখেন নি—সিঁড়িটার দামই হবে······ভোরবেলা ঘুম ভাঙবার আগেই আমার ড্রয়িংরুম লোকে ভ'রে যায়···রাজা, জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী···ঘরখানা মৌমাছির চাকের মত সরগরম হয়ে ওঠে··· এমন কি মাঝে মাঝে মন্ত্রীরা···

ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি ভীত বিস্ময়ে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

চিঠিপত্র আমার নামে ইওর এক্সেলেন্সি ব'লে আসে। একবার এক মজা হ'ল! গভর্মেণ্টের এক ডিপার্টমেণ্টের বড় সাহেব কোথায় উধাও হ'ল। কোথায় গেল? খোঁজ, খোঁজ। কোন পাত্তা নেই। আফিস তো চালাতে হবে। কাকে বসানো যায়? কে যোগ্য লোক? পুরনো সব আই. সি. এস., বড় বড় জেনারেল কত জনে গেল। যত শিগগির যায়, তার চেয়ে শিগগির বেরিয়ে আসে—সবাই বলে আমাদের সাধ্য নয়। আপনারা ভাবছেন, কাজ খুব সহজ, কিন্তু আপনারা গেলেও ওই কথাই বলতেন। গভর্মেণ্টের নিয়ম হচ্ছে, যখন আর যোগ্য লোক খুঁজে যায় না, তখন আমার শরণাপন্ন হয়। তখনই গভর্মেণ্টের চাপরাসী আসতে শুরু হ'ল। চাপরাসীর পর চাপরাসী; চাপরাসী আসবার জন্যে পথের ট্রাম, বাস, ট্র্যাফিক বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল—ক্রমে ক্রমে পঁয়ত্রিশ হাজার চাপরাসী এসে আমার বাড়িতে পৌছল। সকলেরই মুখে এক কথা—মিঃ রায়, আপনি ভার নিন। আমার ইচ্ছা ছিল, রিফিউজ করব। তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউনে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু মনে হ'ল, গভর্নরের কানে কথাটা যেতে পারে। ভাবলাম, কাজ কি, অ্যাক্সেপ্ট ক'রে ফেলি। কিন্তু তখনই সাবধান ক'রে দিলাম, দেখুন, এ আর কেউ নয়—স্বয়ং অনঙ্গমোহন চম্পটি। আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না। বললে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু যখন আমি আফিসে গিয়ে ঢুকলাম, মনে হ'ল, ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। আফিসের চাপরাসী আরদালী থেকে আরম্ভ ক'রে বড়বাবুর দল পর্য্যন্ত সব কাঁপতে শুরু ক'রে দিলে।

(এই কথা শুনিয়া ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কাঁপিতে শুরু করিয়া দিল)

আমার কথা অমান্য করে এমন সাহস কার? সকলেই আমার নামে কাঁপে? স্বয়ং মন্ত্রীমণ্ডল আমাকে ভয় ক'রে চলে। তাদের আর দোষ কি? আমাকে কে না জানে? আমি তাদের বলি, দেখ, আমাকে শেখাতে এসো না। সব জায়গায় আমার যাতায়াত। গভর্নরের বাড়িতে হামেশাই আসা-যাওয়া করছি⋯কালই আমাকে ফিল্ড মার্শাল উপাধি দেবে⋯

(পা হড়কিয়া মেঝেতে পতনোন্মুখ। সকলে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। [কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে ভয়ে] ইওর···ইওর···ইওর···

অনঙ্গমোহন। (তাড়া দিয়া) কি হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। (ভীত কম্পিত) ইওর···ইওর···ইওর···

অনঙ্গমোহন। (তাড়া দিয়া) কি মাথামুণ্ড বকছেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। ইওর···ইওর···সেন্সি···একটু শুলে ভাল হ'ত। পাশের ঘরেই আপনার বিশ্রাম করবার জায়গা প্রস্তুত।

অনঙ্গমোহন। মন্দ কি! শুলে মন্দ হ'ত না। আপনি আজ খুব খাইয়েছেন। আপনাদের ওপর আমি খুব খুশি হয়েছি। মাছটার কি নাম যেন?

দাতব্য-কর্ত্তা। বাঁশপাতা।

অনঙ্গমোহন। (নাটকীয় ভঙ্গীতে) বাঁশপাতা! বাঁশপাতা! (পুনরায় পতনোন্মুখ; সকলে তাহাকে ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল)

বনমালীর প্রস্থান

বলরাম। ঘনরাম, এতদিনে একটা মানুষ দেখলাম বটে! মানুষের মত মানুষ বটে। এতবড় লোকের সামনে জীবনে আমি পড়ি নি। উনি কি?

ঘনরাম। আমার তো বিশ্বাস, জেনারেল হবেন।

বলরাম। কি যে বলছ? জেনারেল ওঁকে দেখলে টুপি খুলে সেলাম করবে। শুনলে তো, মন্ত্রীরা ওঁর ভয়ে কি রকম জড়োসড়ো! চল, শিগগির গিয়ে জজ সাহেবকে সব বলা যাক।

উভয়ের প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তা। (হেডমাস্টারের প্রতি) আমার বিষম ভয় করছে, কাঁপছি, কিন্তু কেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছি না। দেখুন, আমরা আফিসের পোশাক প'রে আসি নি। উনি জেগে উঠে, তখন নেশা ছুটে যাবে, যদি কলকাতায় রিপোর্ট পাঠান, তখন কি হবে?

হেডমাস্টার। চলুন, যাওয়া যাক।

দুইজনের প্রস্থান

রমলা। কি চমৎকার লোক!

কমলা। সত্যি, এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি।

রমলা। কি কাল্চার! কাল্চার্ড মানুষ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আচার, ব্যবহার, পোশাক, চেহারা সবতাতেই কাল্চারের ছাপ-মারা।

এমনি ধারা অল্প বয়সের লোক আমার খুব পছন্দসই। আমার সমস্ত মন উতলা হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তুই লক্ষ্য করিস নি, আমার দিকে উনি ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন ?

কমলা। কি যে বলছ দিদি! উনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

রমলা। কি যে বলিস! কথা বলছিলেন বটে তোদের সঙ্গে, কিন্তু চোখ ছিল আমার দিকে।

কমলা। কখখনো না।

রমলা। ফের তর্ক! ওইজন্যেই তো তুমি মার কাছে বকুনি খাও। তোমার দিকে তাকাবার আছে কি শুনি ?

কমলা। যখন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন দেখ নি—এমনই ক'রে দু-তিন বার আমার দিকে তাকালেন। (দেখাইয়া দিল) আর সেই কন্‌সালের সঙ্গে তাস খেলবার সময়ে—মনে পড়ে না ?

রমলা। আচ্ছা, না হয় তাই হ'ল। কিন্তু সে চাহনিতে কোন অর্থ ছিল না।

(ম্যাজিষ্ট্রেটের ধীরে প্রবেশ। অন্য দিক দিয়া বনমালার প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ।

বনমালা। কি হয়েছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট। মদের মাত্রা কিছু বেশি হ'য়ে গিয়েছিল। যা বললেন তার যদি সিকিও সত্যি হয়! হুঁ হুঁ বাবা, পেটের কথা টেনে বের করতে মদের মত আর কিছু নেই। একবার নেশা মাথায় গিয়ে চড়লে মনের কথা উপচে মুখে চ'লে আসে...মন্ত্রীদের সঙ্গে তাস খেলে; গভর্মেণ্ট হাউসে নিত্য যাতায়াত। যতই চিন্তা করছি, ততই মাথা বেশি ক'রে ঘুরছে—মনে হচ্ছে, যেন গভীর খাদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা ফাঁসি দেবার জন্যে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বনমালা। আমার তো আদৌ ভয় করে নি। আমি ওঁর পদমর্য্যাদার কেয়ার করি নে। আমি ওঁর মধ্যে কি দেখলাম জান তো—শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শ।

ম্যাজিস্ট্রেট। এই মেয়েদের নিয়ে কিছুতেই পারা গেল না। ওরা কখন যে কি ক'রে বসবে, তা জানতে পারা যায় না। ওদের আর কি ? হয়তো ক ঘা

চাবুক দিয়ে ছেড়ে দেবে, স্বামীদের সর্ব্বনাশ! তুমি এমন ভাবে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলে, যেন উনি ঘনরামবাবু কি বলরামবাবু।

বনমালা। আমি তুমি হ'লে কিছুমাত্র চিন্তা করতাম না। আমরাও মানুষ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি।

ম্যাজিস্ট্রেট। (স্বগত) মিছি মিছি ব'কে কি লাভ? কি বিপদেই পড়েছি, এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি। (দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া) ঝগড়ু, চন্দন সিং আর ঢুলবাজ খাঁকে ডেকে দাও—ওরা ওখানেই আছে। (কিছুক্ষণ পরে) কালে কালে কত কি যে দেখব! হ্যাঁ, গভর্ণমেণ্ট-ইন্সপেক্টর একটা দর্শনধারী লোক হবে—এই তো সবাই আশা করে। ইয়া গোঁফ, টলমল করছে সোনালী ইউনিফর্ম, বুক-ভরা মেডেল! এই রকম ছোকরাকে আশা করেছিল কে? ইউনিফর্ম পরলে একটা ইঁদুরকেও মানুষের মত দেখায়। হ্যাঁ, ইউনিফর্মের ওই এক মস্ত গুণ। কিন্তু লোকটার মধ্যে কি যেন আছে, বিনা ইউনিফর্মেই যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে! ভগবানের কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত ফাঁদে পা দিয়েছে। অনেক গুপ্ত তথ্য ফাঁস ক'রে ফেলেছে। নেহাত ছোকরা কিনা!

(মুকুন্দর প্রবেশ। সকলে দৌড়িয়া তাহার কাছে গেল)

বনমালা। এস বাপু, এস।

ম্যাজিস্ট্রেট। উনি কি ঘুমোচ্ছেন?

মুকুন্দ। না, হাই তুলছেন আর এপাশ ওপাশ করছেন—এইমাত্র জাগলেন।

বনমালা। তোমার নামটি কি বাপু?

মুকুন্দ। মুকুন্দ, মা-ঠাকরুণ।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমাকে ভাল ক'রে খেতে দিয়েছে তো?

মুকুন্দ। হ্যাঁ হুজুর, খুব খাওয়া হয়েছে।

বনমালা। তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয় অনেক রাজা-মহারাজা আসেন?

মুকুন্দ। ঠিক ধরেছেন মা-ঠাকরুণ। রাজার নীচের ধাপের কোন লোকের মনিবের সঙ্গে দেখা করবার হুকুম নেই।

কমলা। মুকুন্দ, তোমার মনিব বড় সুপুরুষ।

বনমালা। আচ্ছা মুকুন্দ, তোমার মনিব কিসে খুশি হন?

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমাদের বাজে কথা রাখ। আচ্ছা বাপু, তোমার মনিব—

বনমালা। কি চাকরি করেন ?

ম্যাজিস্ট্রেট। আবার সব বাজে কথা। কাজের কথা কইতেই দেবে না। আচ্ছা বাপু, তোমার মনিব খুব কড়া ? দোষ ধরতে কি ভালবাসেন ?

মুকুন্দ। কাজকর্ম্ম ঠিকমত হ'লে তবে তিনি খুশি হন।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমার চেহারাটি বেশ বাপু। তোমাকে ভাল লোক ব'লেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বল তো—

বনমালা। তোমার মনিব বাড়িতে কি রকম পোশাক পরেন ?

ম্যাজিস্ট্রেট। আঃ, চুপ কর না। আমার পক্ষে এ যে জীবন-মরণের সমস্যা। (মুকুন্দকে) শীতের দিনে খাওয়া-দাওয়া একটু ভাল হওয়া দরকার। এই নাও, দুটো টাকা রাখ।

মুকুন্দ। (টাকা লইয়া) ভগবান আপনার ভাল করুন হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিছু না, কিছু না। আচ্ছা বাপু, বল তো—

রমলা। আচ্ছা মুকুন্দ, তোমার মনিব কি রকম চোখ পছন্দ করেন ?

কমলা। মুকুন্দ, তোমার মনিবের নাকটি কি সুন্দর !

ম্যাজিস্ট্রেট। আঃ তোমরা একটু চুপ কর না। (মুকুন্দকে) আচ্ছা বাপু, দেশভ্রমণের সময় তোমার মনিব সবচেয়ে কি বেশি পছন্দ করেন ?

মুকুন্দ। সে কি সব সময়ে বলা যায় হুজুর ! যখন তাঁর যে রকম মেজাজ থাকে, সেই রকম।

ম্যাজিস্ট্রেট। খুব মেজাজী লোক, নয় ?

মুকুন্দ। খু-ব, হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ ! তবু কি শুনি ?

মুকুন্দ। ভাল খাওয়া-দাওয়া। ভাল বাড়িতে থাকা।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি বললে, ভাল খাওয়া-দাওয়া ?

মুকুন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। আমি তো সামান্য চাকর মাত্র—, কিন্তু আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মনিবের খুব নজর। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন—মুকুন্দ, কি রকম খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। ভাল নয় ? আচ্ছা, বাড়ি পৌঁছুলে মনে করিয়ে দিও। তবে আমি ওসব কথায় বড় কান দিই নে হুজুর, আমি গরিব লোক—যা পাই তাই যথেষ্ট।

ম্যাজিস্ট্রেট। কখখনও যথেষ্ট নয়। নাও নাও, আরও কিছু নাও। বাজার থেকে কিছু কিনে খেও। (টাকা দিল)

মুকুন্দ। হুজুরের বাড়-বাড়ন্ত হোক।

বনমালা। এস বাপু, আমার কাছে এস, আমিও কিছু দেব এখন।

কমলা। (মুকুন্দকে, নীচু স্বরে) মুকুন্দ, তোমার মনিবকে ব'লে দিও। ওর (রমলাকে দেখাইয়া) রঙ পাউডার ঘ'ষে ফর্সা করা—আসলে কালো।

(এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে অনঙ্গমোহনের কাশির শব্দ শ্রুত হইল)

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ। আর যাই কর, গোলমাল ক'রো না। বরঞ্চ তোমরা এখন ভেতরে যাও, সেখানে গিয়ে যা হয় করগে।

কমলা। সেই ভাল দিদি, ভেতরে গিয়ে আমরা কথা বলিগে। এমন অনেক কথা আমার বলবার আছে, যা লোকের সামনে বলবার নয়।

রমলা। চল, তাই ভাল।

উভয়ের প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট। (বনমালাকে) তুমি যাও না।

বনমালা। কি আপদ! আচ্ছা বাপু, তুমি আমার সঙ্গে এস।

মুকুন্দকে লইয়া বনমালার প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান কেবল যদি মেয়েদের বোবা আর পুরুষদের কালা ক'রে দিতেন!

(চন্দন সিং ও তুলবাজ খাঁর প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। অত জোরে পায়ের শব্দ ক'রো না। যেন পাঁচমণি হাতুড়ি পড়ছে! কোথায় ছিলে সব এতক্ষণ ?

তুলবাজ খাঁ। হুজুরের হুকুম মাফিক—

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ। (মুখে আঙুল দিয়া) ঢাকের আওয়াজের মত গলার স্বর! (তাহাকে অনুসরণ করিয়া) হুজুরের হুকুম মাফিক—মাথা আর মুণ্ডু! শোন, সদর-দরজায় খাড়া থাকবে—এক মিনিটের জন্যেও সরবে না। সাবধান, কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না—বিশেষ ক'রে দোকানদারদের। কেউ যদি ভেতরে ঢুকে পড়ে, তবে…তবে…বুঝতেই পারছ—। আর দেখ, দরখাস্ত নিয়ে, এমন কি না নিয়েও, মানে চেহারা

দাতব্য-কর্ত্তা। অদৃষ্টের হাত নেই হেডমাস্টার মশায়, এ হচ্ছে গিয়ে পুণ্যের পুরস্কার। [স্বগত] যত সৌভাগ্য এই নরাধমগুলোরই হয় দেখছি!

জজ। সেই কুকুরের বাচ্চাটা আপনাকে দিয়ে যাব।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন কুকুরের বাচ্চার বিষয়ে ভাববার সময় আমার নেই।

জজ। আচ্ছা, ওটা না নেন, সেই বড়টা নিতে পারেন।

কামিনী। এখন হিজ একসেলেন্সি কোথায়? শুনলাম, হঠাৎ কি কারণে যেন তিনি কোথায় গিয়েছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। জরুরি কাজে একদিনের জন্যে গিয়েছেন।

বনমালা। তাঁর মাতুলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্যে।

ম্যাজিস্ট্রেট। গিয়েছেন বটে, কিন্তু আগামী কালই…[হাঁচি]

সকলে সমস্বরে। জীব সহস্র।

ম্যাজিস্ট্রেট। ধন্যবাদ। আগামী কালই ফিরবেন। [হাঁচি]

সকলে সমস্বরে। জীব সহস্র।

বনমালা। আমরা শীঘ্রই কলকাতায় উঠে যাচ্ছি। এ রকম পাড়াগাঁয়ে বাস করা কঠিন। সেখানে ওঁকে জেনারেল ক'রে দেবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। সত্যি, জেনারেল হ'লে তবে আমার যোগ্য চাকরি হয়।

হেডমাস্টার। তা আপনি হবেন।

রঘুনাথবাবু। ভগবান এখন আপনার মুরুব্বি, কিছুই অসম্ভব নয়।

জজ। বড় জাহাজেই বেশি জল লাগে।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ আপনার যোগ্য সম্মান।

জজ। [স্বগত] জেনারেল হ'লেই প্রহসন সম্পূর্ণ হয়। গরুর পিঠে লাগাম ক'ষে উঠলে ঠিক মানায়। যাক, কর্ত্তার নেমন্তন্ন, না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই।

দাতব্য-কর্ত্তা। [স্বগত] সব মাটি করলে! আরও কত কি দেখতে হবে! অযোগ্য লোকেই বড় পদ পায়। হতেও বা পারে জেনারেল। [প্রকাশ্যে] আমাদের যেন ভুলবেন না রায় বাহাদুর।

জজ। আমাদের দরকারের সময়ে যেন সাহায্য পাই।

কামিনী। আগামী বছরে আমার বড় ছেলেটিকে চাকরির খোঁজে কলকাতা

নিয়ে যাব। আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে, এখন থেকেই ব'লে রাখছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না।

বনমালা। তুমি তো সকলকেই ভরসা দিচ্ছ। কিন্তু এসব কথা ভাববার সময়ও তোমার হবে না। আর এসব দায় বইতেই বা যাবে কেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। বইব না কেন? পুরনো বন্ধুদের কাজ কি করতে নেই?

বনমালা। নিশ্চয়ই করতে আছে। কিন্তু এসব ছোটখাটো লোকদের কাজ করলে বড়লোকদের কাজ করবার সময় পাবে কি ক'রে?

কুমুদিনী। [স্বগত] ও মাগী চিরদিনই ওই রকম। ছোটর সৌভাগ্য হ'লে এমনিই হয় বটে।

বনমালা। আমাদের এই সৌভাগ্যে সবাই আনন্দিত। কেবল ঘরের শাঁকচুন্নি মুখ ভার ক'রে কোথায় গিয়ে ব'সে আছে।

হেডমাস্টারের পত্নী। কে গো?

বনমালা। ওই যে সাধ ক'রে নাম রাখা হয়েছে রমলা! রমলা, না 'কানমলা'।

(কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

কমলা। দিদি কি ছেনালিই না আরম্ভ করেছিল। উনি যত তাড়াতে যান, তত যেন জড়িয়ে ধরে।

বনমালা। সত্যি, মাগো! আমি যেতেই আমাকে বললেন, আপনার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে—

কমলা। ও কথা তো আমাকে বললেন মা।

বনমালা। ফের তর্ক!

(হেনকালে পোষ্টমাষ্টার ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একখানা চিঠি)

পোস্টমাস্টার। অদ্ভুত ঘটনা! আশ্চর্য্য সংবাদ! যাকে আমরা গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে করেছিলাম, সে মোটেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর নয়।

সকলে। কি? ইন্সপেক্টর নয়?

পোস্টমাস্টার। মোটেই নয়, আদৌ নয়। একখানা চিঠি থেকে আমি আবিষ্কার করেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি সর্ব্বনাশ! কার চিঠি?

পোস্টমাস্টার। আমি ডাকঘরে ব'সে আছি। মেলব্যাগ বাঁধা হচ্ছে—এখনই সীল করা হবে। এমন সময়ে আপনার বাড়ির চাকর দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে বললে, একখানা চিঠি আছে। আমি বললাম, আজ আর হবে না। সে বললে, সে হবে নি, স্বয়ং হুজুরের চিঠি, খুব জরুরি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ হুজুর? বললে, হুজুর আবার কে? কলকাতার হুজুর। আজই যাওয়া চাই। আমি বললাম, দাও। ব্যাগে ভরতে যাব, হঠাৎ কি ভেবে খুলে ফেললাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি ভরসায় খুললেন? সর্ব্বনাশ!

পোস্টমাস্টার। জানি না কিসের ভরসায়। মনে হ'ল, কোন দৈবশক্তি যেন আমাকে ভরসা দিলে। ঠিকানা দেখি, পরশুরাম, বকুল বাগান, কলিকাতা। মনে মনে ভাবলাম, বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি! আমি ত্রিশ বছর এই কাজ করছি। বেশ বুঝতে পারলাম, এ নাম হচ্ছে গিয়ে ছদ্মনাম। নিজেও যেমন ছদ্মবেশে এসেছে, তেমনই ছদ্মনামে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। কার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, কে জানে? হয়তো খোদ গভর্নরের হাতে। একবার দেখা দরকার—কি লিখল, পোস্টাফিসের কোন গলদের কথা আছে কি না! কি বলব, মশায়, কত চিঠিই তো রোজ খুলি, কিন্তু এ তো চিঠি নয়, যেন জলন্ত অঙ্গার। হাত যেন পুড়ে যায়। এক কানে কে যেন বলতে লাগল, সাবধান, খুলো না। আর এক কানে কে যেন বললে, খোল, খোল, কোন ভয় নেই। গা কাঁপতে লাগল, কপালে কাল-ঘাম দেখা দিলে। কেমন ক'রে যে খুলে ফেললাম, তা নিজেই জানি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি সাহস আপনার! এতবড় অফিসারের চিঠি খুলে ফেললেন!

পোস্টমাস্টার। সেই তো রহস্য। লোকটা মোটেই অফিসার নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। তা হ'লে আপনার মতে উনি কি, তাই শুনি?

পোস্টমাস্টার। কেউ নয়, কিচ্ছু নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [রাগিয়া] 'কেউ নয়, কিচ্ছু নয়' ব'লে আপনি কি বোঝাতে চান? আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি, জানেন?

পোস্টমাস্টার। কে? আপনি? সে আপনার সাধ্য নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন নয়? জানেন, উনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?

শীঘ্রই আমি কলকাতায় গিয়ে মস্ত অফিসার হব ? আপনাকে ধ'রে আমি আন্দামানে পাঠাতে পারি ?

পোস্টমাস্টার। আন্দামানের কথা এখন রাখুন, বরঞ্চ চিঠিখানা প'ড়ে শোনাই। কি, পড়ব তো ?

সকলে। পড়ুন, পড়ুন।

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] প্রিয় পরশুরাম, এই চিঠিতে এক অভিনব সংবাদ তোমাকে পাঠাচ্ছি। কলকাতা থেকে রওনা হবার পরে নৈহাটিতে একবার নামি। সেখানে তাস খেলায় হেরে টাকা-পয়সা যা ছিল সব গেল। কোন রকমে দিনাজসাহীতে এসে এক হোটেলে উঠলাম। এমন অবস্থা হ'ল যে, হোটেলের বিল শোধ করতে পারি না, হোটেলওয়ালা জেলে দেয় আর কি! এমন সময়ে আমার কলকাতার পোশাক এক আশ্চর্য্য ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ক'রে দিলে। এখানকার লোকেরা হঠাৎ আমাকে এক মস্ত গভর্মেণ্ট অফিসার ব'লে মনে করলে। তারপরে আর কি ? এখন আমি ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় তোফা আরামে আছি, আর তার স্ত্রী ও মেয়ে দুটির সঙ্গে দিবারাত্রি প্রেম করছি।...কাকে দিয়ে যে আরম্ভ করব, জানি না। আচ্ছা, ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। সে এক নম্বরের ছেনাল, যা খুশি ওকে দিয়ে তাই করানো যায়। সেই সেদিনকার কথা মনে আছে, যখন এক হোটেলে খেতে গিয়ে দেখি, পয়সা নেই ? হোটেলওয়ালা গলা-ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিলে ? এখন আমার অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম, সবাই টাকা ধার দিচ্ছে। এরা সব অদ্ভুত জীব, তুমি দেখলে হাসতে হাসতে মরতে। তুমি তো হাসির গল্প লেখ। এদের কাহিনী নিয়ে একটা কিছু লেখ না। মাইরি, সে বেশ হবে! প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরা যাক। সে একটি নিরেট গর্দ্দভ...

ম্যাজিস্ট্রেট। এ হতেই পারে না। নিশ্চয় এ কথা নেই

পোস্টমাস্টার। [চিঠি দেখাইয়া] নিজেই প'ড়ে দেখুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। [পড়িয়া] একটি নিরেট গর্দ্দভ। হতেই পারে না, এ কথা আপনি বসিয়ে দিয়েছেন।

পোস্টমাস্টার। আমার প্রয়োজন কি ?

দাতব্য-কর্ত্তা। পড়ুন, পড়ুন।

হেডমাস্টার। তার পরে কি ?

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] ম্যাজিস্ট্রেট একটি নিরেট গর্দ্দভ।

ম্যাজিস্ট্রেট। থাক থাক। ফিরে ফিরে পড়তে হবে না। আমরা সবাই জানি, কি লেখা আছে।

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] এই যে…এই যে…নিরেট গর্দ্দভ। পোস্টমাস্টারটি মন্দ নয়। [থামিয়া] আমার সম্বন্ধেও খানিকটা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। থামলে চলবে না, পড়ুন।

পোস্টমাস্টার। কি দরকার ?

ম্যাজিস্ট্রেট। পড়ছেন যখন সবটা পড়তে হবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। আচ্ছা, আমাকে দিন, আমি পড়ছি। [চশমা পরিয়া পাঠ] এখানকার পোস্টমাস্টারটির চেহারা ঠিক তোমার অফিসের দরোয়ানজীর মত। তার ওপরে লোকটা আবার পাঁড় মাতাল।

পোস্টমাস্টার। লোকটাকে আচ্ছা ক'রে চাবুক মারা দরকার।

দাতব্য-কর্ত্তা। [পাঠ] আর দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা…কর্ত্তা…ইয়ে, ইয়ে—

কামিনীবাবু। থামলেন কেন ?

দাতব্য-কর্ত্তা। হাতের লেখা অস্পষ্ট। লোকটা যে বদমাইশ, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কামিনীবাবু। আমাকে দিন, আমার চোখ ভাল আছে। [চিঠিখানা লইল]

দাতব্য-কর্ত্তা। ওটুকু বাদ দিলেই হয়। পরের লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট।

কামিনীবাবু। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমি সবটাই পড়তে পারব।

পোস্টমাস্টার। না না, সবটা পড়তে হবে।

সকলে। কামিনীবাবু, পড়ুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। আচ্ছা, তবে এখান থেকে পড়ুন। ওপরের ওটুকু থাক।

পোস্টমাস্টার। না না, কোন অংশ বাদ দিলে চলবে না। সবটুকু পড়ুন।

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা আস্ত একটি টুপি-পরা ভোঁদড়।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ কি রকম রসিকতা ! টুপি-পরা ভোঁদড় ! ভোঁদড় আবার কবে টুপি পরে ?

কামিনীবাবু। [পাঠ] আর হেডমাস্টারটির সর্ব্বাঙ্গে রসুনের গন্ধ।

হেডমাস্টার। রসুনের গন্ধ! জীবনে আমি রসুন স্পর্শ করি নি।

জজ। [স্বগত] ভগবান্ রক্ষা করেছেন, আমার সম্বন্ধে কিছু নেই—

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার জজ···

জজ। এই মাটি করেছে! [জোরে] দীর্ঘ চিঠি অত্যন্ত বিরক্তিকর। এসব বাজে জিনিস প'ড়ে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করা?

হেডমাস্টার। মোটেই বিরক্তিকর নয়।

পোস্টমাস্টার। পড়ুন, পড়ুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। বাদ দেবেন না, সবটা পড়ুন।

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার জজ সাহেবটি একটি 'অজভুশ'।···ওটার মানে কি?

জজ। ভগবান্ জানেন, মানে কি! 'বদমাইশ' হ'তে পারে, কিম্বা হয়তো তার চেয়েও কিছু খারাপ।

কামিনীবাবু। [পাঠ] কিন্তু এরা সবাই ভালমানুষ, আর এদের মস্ত গুণ, এরা চাইবামাত্র টাকা ধার দেয়। ভাই পরশুরাম, আমি ঠিক করেছি, কেরানীগিরি ছেড়ে দিয়ে তোমার মত সাহিত্যিক হতে চেষ্টা করব। আজ আসি। আমাকে শিলিগুড়ির ঠিকানায় চিঠি দিও; গাঁয়ের নাম মনে আছে তো?—কদমকুঁড়ি।

একজন মহিলা। কি দুঃসংবাদ!

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। কোথায় গেল সে বেটা? গ্রেপ্তার ক'রে আন তাকে, গ্রেপ্তার ক'রে আন।

পোস্টমাস্টার। আর গ্রেপ্তার! এতক্ষণে সে পগার পার। আমি আবার বেছে বেছে তাকে শহরের সেরা ঘোড়া দুটো যোগাড় ক'রে দিয়েছিলাম।

কুমুদিনী। মাগো!—এ রকম ঘটনা কখনও শুনি নি।

জজ। ঘটনা! ঘটনা! এদিকে যে আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা ধার নিয়েছিল।

দাতব্য-কর্ত্তা। আমার কাছ থেকেও তিনশো।

পোস্টমাস্টার। আমিও তিনশো—

বলরাম। আমি আর ঘনরাম মিলে পঁয়ষট্টি টাকা দিয়েছিলাম।

অজ। কিন্তু এ কেমন ক'রে ঘটল? আমাদের পক্ষে এ রকম ভুল কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

ম্যাজিস্ট্রেট। [কপাল চাপড়াইয়া] আমি এমন ভুল কি ক'রে করলাম! হায় হায়! আমাকে কি এখনই বাহাত্তুরে পেল? ত্রিশ বছর চাকরি করছি, কোন দোকানদার, কোন কনট্রাক্টার আমাকে ঠকাতে পারে নি। বড় বড় ঠক বদমাশ আমার কাছে কাত। তিন-তিনটে কমিশনারের চোখে ধূলো দিয়েছি···আর শেষে—

বনমালা। কিন্তু এ যে অসম্ভব। উনি যে কমলাকে বিয়ে করবেন বলেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। [রাগিয়া] বিয়ে করবেন! বিয়ে করবেন! কোথাকার ধাপ্পাবাজ! [পাগলের মত] দেখ, দেখ, সকলে চেয়ে দেখ, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট নির্ব্বোধ, বাহাত্তুরে, নিরেট গর্দ্দভ। [নিজের প্রতি] তোমার উচিত দণ্ড হয়েছে। এই রকম একটা ছোঁড়াকে গভর্মেণ্ট-অফিসার ব'লে কল্পনা করা! যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। ওই ছোকরা যেখান দিয়ে যাবে, এই গল্প করতে করতে যাবে। তারপর হয়তো কোন কলম-বাজ নাট্যকার এই নিয়ে এক ফার্স লিখে ফেলবে। দেশ-বিদেশের লোক হাসবে। এই কলম-বাজ কালি-ছুঁড়নেওয়ালারা কাউকে খাতির করে না—না ধনীকে, না মানীকে। সবাই হাসবে আর হাততালি দেবে। [দর্শকের প্রতি] দাঁত বের ক'রে এত হাসি কিসের? নিজেদেরও এমন ঘটতে পারে। [মেঝেতে পা ঠুকিয়া] এই সাহিত্যিকদের একবার আমি দেখে নেব। দেখে নেব এই সরস্বতীর দিনমজুর-গুলোকে, দু আনা ক'রে পৃষ্ঠা লিখনে-ওয়ালাদের, ভদ্রলোকের গায়ে কালি-ছুঁড়নে-ওয়ালাগুলোকে। সবগুলোকে ঠেলে আমি যমের বাড়ি পাঠাব। এগুলো না থাকলে অপমানের কথা লোকে দুদিন বাদে ভুলে যেত! এগুলোই যত···এগুলোই যত···আবার হাসি! [মেঝেতে পা ঠুকিয়া, বক্ষে করাঘাত। কিছুক্ষণ পরে] নাঃ কিছুতেই এ অপমান ভুলতে পারছি না। এমন ভুল কেমন ক'রে হ'ল? ওই ছোঁড়াটার মধ্যে কি ছিল, যাতে তাকে গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে করলাম? হঠাৎ কি হ'ল, সকলেই 'ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর' ব'লে রব তুললে? কে প্রথম এ রব তুললে? কে?

দাতব্য-কর্ত্তা। বাস্তবিক, কেমন ক'রে সকলের যে একই ভুল হ'ল, তা বুঝতে পারছি না!

জজ। বাস্তবিক, প্রথমে কে রব তুললে? এই যে, এঁরাই প্রথমে এই সংবাদ এনেছিলেন। [ঘনরাম ও বলরাম বাবুকে দেখাইয়া]।

বলরাম। কখখনও আমি নই।

ঘনরাম। আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।

দাতব্য-কর্ত্তা। আপনারাই প্রথমে এই রব তুলেছিলেন।

হেডমাস্টার। আমার বেশ মনে আছে, এঁরা দুজনেই প্রথমে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন—তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন, হোটেলে আছেন, অথচ বিল শোধ করছেন না। খুব লোক চিনেছিলেন বটে!

ম্যাজিস্ট্রেট। ঠিক ঠিক, এঁদেরই কীর্ত্তি। হতভাগা গুজবদার সব।

দাতব্য-কর্ত্তা। গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টরের গল্পও এঁদের রটানো।

ম্যাজিস্ট্রেট। গুজব রটিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই আপনাদের? —আপনারা দুজনে শয়তানের ডুগি-তবলা।

জজ। কেচ্ছা-কাহিনীর ঝাড়ুদার।

হেডমাস্টার। জোড়া গাধা।

দাতব্য-কর্ত্তা। টুপি-পরা জোড়া ভোঁদড়। [সকলে তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

বলরাম। সত্যি বলছি, আমি নই, ঘনরামবাবুই প্রথমে—

ঘনরাম। কি বলছ বলরাম? তুমিই তো প্রথমে—

বলরাম। তুমিই প্রথমে—

ঘনরাম। তুমিই—

(এমন সময়ে ইউনিফর্ম-পরা একজন আরদালী প্রবেশ করিল)

আরদালী। কলকাতা থেকে গভর্মেণ্টের হুকুম নিয়ে যে ইন্সপেক্টর এসে পৌছেছেন, তিনি আপনাদের সেলাম জানিয়েছেন। তিনি ডাকবাংলোতে আছেন।

(এই সংবাদে যাঁদের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল। যে যেমন বসিয়া ছিল তেমনই রহিল, যেন সব পাথরে তৈয়ারি মূর্ত্তি। এমন কি ভয় পাইবার শক্তিও যেন তাহাদের লোপ পাইয়াছে। ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দ্বার দিয়া হাসিমুখে রমলার প্রবেশ। বনমালা ও কমলা এমনই পাথর হইয়া গিয়াছে যে, রমলার হাসিমুখ দেখিয়াও রাগিতে ভুলিয়া গেল। মিনিট-খানেক এই ভাবে পাষাণ-সংঘ থাকিবার পরে যবনিকা পড়িয়া গেল)

সমাপ্ত

প্র. না. বি.

আগস্ট, ১৯৪২

মহাত্মাজী বললেন, শেষবারের মত বড়লাটের কাছে দুতিয়ালি করব। ব্যর্থ হ'লে অসহযোগের দরকার হবে হয়তো।

কিন্তু দরকার হয় নি কোন কিছুরই। কারাগারে তাঁরা নিস্তব্ধ। কংগ্রেস বে-আইনী।

পান্নালাল মুষড়ে গেছে। যেন কাণ্ডারীহীন নৌকায় ভেসে যাচ্ছে। উমাকে বলে, কি আর করব! খাই-দাই, খবরের কাগজ পড়ি, আর রাজা-উজির মারি লড়ায়ের ম্যাপ দেখে দেখে। খুশি তো এবার?

কিন্তু গোলমাল খবরের কাগজেও। আমেরি সাহেব সগৌরবে বলছেন, চিরকেলে বজ্জাত বাংলা দেশ কেমন ঠাণ্ডা এবারে দেখ!

অনন্ত মাস দুই জেল থেকে বেরিয়েছে। আগুন হয়ে সে বলে, অসহ্য!

চা পরিবেশন করতে এসে উমা দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। অনন্ত তবু বলতে লাগল, কি লজ্জার কথা দাদা! রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দেশ—বাঘেরা নির্বংশ হ'ল নাকি?

পান্নালাল ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক তাই। সুন্দরবনে অতি-সুন্দর ধানের আবাদ হচ্ছে। যেখানে বাঘ ডাকত, চাষারা সেখানে লাঙল ঠেলে।

তাড়াতাড়ি উমা রেডিও খুলে দিলে। গানের গোলমালে এই সব বেয়াড়া কথার অবসান হোক। কিন্তু কপাল মন্দ, গান সে সময়টা নেই। রেডিওরও ওই এক খবর—সুশীল সুবাধ্য ভক্তিমান বাংলা দেশ। মিঃ আমেরি টিটকারি দিয়ে বলছেন—

অনন্ত উঠে এসে রেডিওর চাবি বন্ধ করলে।

অসহ্য দাদা, পাগল হয়ে যাবার দাখিল।

পান্নালাল সায় দিলে, ঠিক।

উমার প্রদীপ্ত চোখ দুটি অনন্তর মুখের উপর পড়ল। পান্নালাল বলে, এমনিতেই মানুষ এত কথা বলে যে টেঁকা মুশকিল। তার ওপর আবার এক-একটা কথা এই রকম যদি লাখ বার হড়ানোর বন্দোবস্ত হয়, উপায় কি পাগল না হয়ে?

অনন্ত বলে, আর কথাটাও ভাবুন দিকি! পরশুরাম একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তবু জড় মারতে পারেন নি। এরা এমন বাহাদুর যে, দু-চার মাস জেল কি দু-দশ ঘা বেতের বাড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা করবে চারিদিক!

উমা টিপ্পনী কেটে বলে, বাহাদুর সত্যিই। পরশুরাম শুধু ডান হাতেই কুড়ুল চালিয়েছিলেন, তাই পেরে ওঠেন নি। সব্যসাচী এরা, ডান হাত বাঁ হাত সমানে চালাচ্ছে। জেল, জরিমানা, অথবা মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট, প্রকাণ্ড ও গোপন চাকরি—

চারিদিকে নানা গুজব, ছাপানো ও সাইক্লোষ্টাইল-করা নানারকম কাগজ হাতে আসছে, আর উমা বিষম উখিন্ন হচ্ছে মনে মনে। ভিন্ন জাতের মানুষ এই এরা। চড়কের সময় ঢাকের বাজনা শুনলে সন্ন্যাসীর পিঠ চড়চড় ক'রে ওঠে, এদেরও তেমনি। তার উপর সময় নেই অসময় নেই, অনন্ত 'দাদা' 'দাদা' ক'রে আসছে।

সন্ধ্যার পর একদিন অনন্ত টিপিটিপি এসে উঠল একেবারে তেতলায়। উমা নেই। স্বস্তির শ্বাস ফেলে সে দরজায় খিল এঁটে দিলে। চোখে কালো গগ্‌লস্; চিনতে পারা যায় না। পুঁটলি থেকে বের করলে চকচকে ছোরা একখানা।

আর ওই টিনের ভিতর কি হে—অত যত্নে কাপড় মুড়ে এনেছ?

অনন্ত বলে, এখন খালি। খাবার মুখে পেট্রোল ভরতি করে নেবে।

একটা যন্ত্র বের ক'রে বলে, দেখে নিন দাদা, তার কাটতে হবে এই রকম ক'রে। টেলিগ্রাফ-লাইন সাবাড় ক'রে তারপরে কাজের আরম্ভ কিনা!

শুনেছ? ম্লানমুখে পান্নালাল বলে, আজ দুপুরেই একটাকে মেরে ফেলেছে রাস্তায়।

অনন্ত বলে, কাটছিল না, মেরামত করছিল—ইলেকৃট্রিক কোম্পানির লোক। কারও মাথার ঠিক নেই দাদা, না ওদের, না আমাদের।

উমা এসে খিল-দেওয়া দরজা ঝাঁকাচ্ছে। খুলে দিতে অনন্তর দিকে কটমট ক'রে সে তাকালে।

পান্নালাল বলে, বিশ-পঁচিশটা টাকার দরকার প'ড়ে গেল যে!

কি হবে?

কলকাতায় থাকা যাচ্ছে না।

উমা অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বলে, তাই চল পান্নুদা, আমার সঙ্গে সুপ্রিয়াদের গাঁয়ে। তোমার বিশ্রামের দরকার।

পান্না হেসে উঠে বলে, বিশ্রামের তো তোফা জায়গা রয়েছে ভাই। পাকা বাড়ি, পরের খরচ।

গান্ধীর ছোট্ট একটা ছবি টেবিলে, সত্যাগ্রহে চলেছেন, সেই সময়কার। হিমালয়ের প্রত্যন্ত থেকে বঙ্গের সমুদ্র-বিস্তার অবধি নিখিল মানব-মানসের সত্য ও দুঃখের পথে বিজয়-যাত্রা চলেছে যেন। ছবির দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস পড়ল পান্নালালের। বলে, যেমন ওই ওঁরা হাজারে হাজারে বিশ্রাম করছেন আজকে। জবরদস্তি ক'রে বিশ্রাম করাচ্ছে।

উমা শান্ত হয়ে ওঠে। বলে, শোন পান্নুদা, দরজার শত্রু—হুজুগের সময় নয়। শেষ কথাগুলো ওঁর মনে রেখো।

পুণ্য বৈদিক মন্ত্রের মত পান্নালাল গান্ধীবাণী আবৃত্তি করলে, অহিংসায় স্বাধীনতা যদি না আসে, আমি মরব। আমি মরলে দেশ যেন যে উপায়ে পারে স্বাধীনতার চেষ্টা করে।*

অনন্ত বললে, তা গান্ধী তো মারাই গেছেন।

উমা চমকে ওঠে।—বলছ কি?

মরা নয় তো কি! যাকে বলে সিভিল ডেথ।

সহসা ভীষণ হৈ-চৈ উঠল রাস্তায়। অসংখ্য ভারী জুতোর সমবেত ধ্বনি।

পান্নালাল বলে, দিব্যচক্ষে দেখছি, জেলের দুয়োর খুলতে হ'ল ব'লে। বিক্ষুব্ধ কোটি কোটি মানুষকে ঠেকাতে পারে টিয়ার-গ্যাস বা পিস্তলের গুলি নয়—বেঁটে ওই বুড়ো মানুষটি ও তাঁর দলবল।

ট্রামে চলেছে পান্নালাল আর অনন্ত। বড় রাস্তার মোড়ে থামতে জন আষ্টেক উঠল গাড়িতে। বলছে, নামুন তো মশায়েরা। শিগগির নেমে যান, শিগগির।

ট্রলির দড়ি টেনে ধ'রে কেটে দিলে একজন।

দেশলায়ের কাঠি ফুরিয়েছে যে, ও সোনাদা! কণ্ডাক্টরকে হেসে বললে, দাও তো ভাই তোমারটা, সিগারেট ধরাই।

দাউদাউ ক'রে গাড়ির সামনেটা জ্ব'লে উঠল। সারি সারি পিছনে আরও খানদশেক দাঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত জ্বালিয়ে দেবে, লঙ্কাকাণ্ড চলবে সমস্ত রাত রাস্তায় রাস্তায়!

ধুলো উড়িয়ে তীরের মত আসে একটা লরি। মানুষ পালাচ্ছে। লরি থামতে না থামতে লাফিয়ে পড়ল লাঠি আর রিভল্‌ভারধারী লালমুখ পুলিসেরা। এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে, যাকে পাচ্ছে বেদম পিটাচ্ছে, ছুঁড়ে মারছে হাতের লাঠি।

ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে মাথার উপরে অকস্মাৎ আগুনের গোলা লোকালুফি শুরু হ'ল। বর্মার পাহাড়ে জঙ্গলে যে কাণ্ড চলছে, এই কলকাতার বুকের উপর এ-ও প্রায় তেমনি। বড় বাড়ির দোতলার বারান্দা—কংক্রিটের বেষ্টনী। তারই আড়াল থেকে অগ্নিপিণ্ড একের পর এক এসে পড়ছে অবিরল ধারায়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিসের দল গুলি ছুঁড়ছে, কিন্তু মানুষ দেখা যাচ্ছে না, দেয়ালের বালি খসিয়ে গুলি নিচে পড়ছে।

ফটক গলির মধ্যে, ভিতর থেকে বন্ধ। লাথির উপরে লাথি মারছে—সেকেলে ভারী দরজা একটু নড়ে না। রাস্তার ওপারের পুরানো লোহার দোকান থেকে একটা জয়েষ্ট নিয়ে আসে সাত-আটজনে। তারই আঘাত দিতে দিতে খিল ভেঙে পড়ল।

বারান্দায় কেউ নেই—কা কস্য পরিবেদনা। অর্ধেক ভর্তি কেরোসিনের টিন আর

অজস্র পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি প'ড়ে রয়েছে। আর গোটা কুড়িক ন্যাকড়ার পুঁটলি একদিকে—এক-এক টুকরা দড়ি ঝোলানো তাতে। এই এক নূতন অস্ত্র বের করেছে। একজনে দড়ি ধ'রে পুঁটলি ভেজায় কেরোসিনে, পাশের মানুষ দেশলাই জ্বেলে দেয়, অগ্নি-গোলা অবিরাম নিচে পড়তে থাকে।

প্রহর দেড়েক রাত্রি। পান্নালালেরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল শহরের বাইরে বটতলায়। সবসুদ্ধ বাইশজন হাজির; ভোরের ট্রেনে রওনা হবে। নিরন্ধ্র আঁধার—মুখ দেখা যায় না। ফিসফিস ক'রে তালিম দেওয়া হচ্ছে, কে কোথায় নামবে, আত্মগোপন ক'রে কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে। আঠারোই আগষ্ট—মঙ্গলবার। নিশিরাত্রে চাঁদ ডুবে গেলে ছোট লাইনের সমস্ত ষ্টেশন একসঙ্গে জ্ব'লে উঠবে; পরদিন সকালবেলা লোকে দেখবে ছাইয়ের গাদা।

খুব স্ফূর্তি পান্নালালের। আজকে এই রাত্রেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত সৈন্য যুদ্ধে যাচ্ছে। এরাও যেন তেমনই একটা দল। কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নেই, এক যাত্রায় চলেছে মৃত্যু-আকীর্ণ রাস্তায়।

পান্নালালের হাতে ছোট সুটকেস। তাতে নানারকম জিনিসপত্র—আর আছে গান্ধীজীর ছবিখানা—উমার টেবিল থেকে নিয়ে এসেছে। মনে মনে জপমন্ত্রের মত আবৃত্তি করছে, আঠারোই—রাত্রি যখন ঠিক একটা। কেন চলেছে, পান্নালাল তা জানে না। সে সৈনিক, জানবার গরজ নেই। শুধু এক দুরন্ত ক্ষোভ কালকূটের মত দেহমন আচ্ছন্ন ক'রে আছে। লক্ষ কোটি নরনারীর চিত্তবিজয়ী বাট বছরের ত্যাগ আর দুঃখ-বরণে মহিমান্বিত কংগ্রেস রাজার আইনমতে আর জীবিত নেই। নির্লোভ নির্মোহ তার নেতৃবৃন্দ—শ্বেত শুদ্ধ খদ্দরে আবৃত-দেহ, আলাপ করতে যাও,—যা বলছ তাতেই হাসি, হাতজোড় করছেন কথায় কথায়, প্রবলের সঙ্গে শক্তি ও বুদ্ধির যখন মারপ্যাঁচ চলছে, তখনও প্রতি কথায় রসিকতা। বন্দী এঁরা চোর-ডাকাতের মত। ভারতের নির্মল আত্মা কঠিন কারাগারে নিপীড়িত।

কলকাতা থেকে অনেক—অনেক দূরে ছোট লাইনের ছোট ষ্টেশনটি। দুখানা আপ আর দুখানা ডাউন—সাকুল্যে এই চারখানা গাড়ি দিনে রাত্রে চলাচল করে। বাকি সময় প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত অবধি বিস্তৃত আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গলে মশার গুঞ্জনটুকুও পরিষ্কার শোনা যায়। দিনেও কখন কখন শিয়াল ডেকে ওঠে।

ষ্টেশন-মাষ্টার জয়চন্দ্র সরকারের দশ বছর কাটল এখানে। অন্য লোক এসেই পালাই পালাই করে, তিনি কিন্তু দিব্যি আছেন। পেন্‌শনের আর দু বছর সাত মাস বাকি,

এর মধ্যে আর কোনখানে ঠেলে না দেয়—তাদের তাদের এই আড়াইটা বছর কেটে গেলে বাঁচেন। স্ত্রী শহরের মেয়ে, অহরহ খিটমিট করছেন; সুবিধা পেলেই বাপের বাড়ি কিংবা মামার বাড়ি ঘুরতে যান, মেয়ে অণিমাও যায় সঙ্গে। কিন্তু জয়চন্দ্রকে নড়ানো যায় না, পয়েন্টস্‌ম্যান পুরন্দর সিং ঘর-গৃহস্থালীর ভার নেয় সেই সময়টা। কোম্পানির পেন্‌শন কিংবা যমরাজের পরোয়ানা ছাড়া কেউ তাঁকে নড়াতে পারবে না এ জায়গা থেকে।

দুপুরের গাড়িতে ধবধবে পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক নামলেন। দেখতে পেয়ে জয়চন্দ্র ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁকে অফিস-ঘরে বসালেন। অণিমা জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ির সাড়া পেলে সে জানলায় এসে দাঁড়ায়। হাসিখুশি মেয়েটা, কিন্তু ভদ্রলোক দেখে মুখ অন্ধকার হ'ল, স'রে এল তাড়াতাড়ি জানলা থেকে।

এবং যা ভাবছিল—জয়চন্দ্র এসে স্ত্রীকে ডাকলেন, শুনছ?

এর পরের ব্যাপারও মুখস্থ অণিমার। খবর যাবে ছোটবাবুর বাসায়। ছোটবাবুর বউ এসে পড়বেন, তাকে নিয়ে প্রাণপণে ঘষামাজা লেগে যাবে। কালো রঙে একটু চিকণ আভা ধরানোর চেষ্টা।

কিন্তু গিন্নির আজ মেজাজ খারাপ। তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ভাত চাপাতে হবে তো? পারব না, যা করবার কর। এত বলছি, রেণুপদ আসব আসব করছে, মচ্ছব থামাও এখন কয়েকটা দিন।

অনুচ্চকণ্ঠে জয়চন্দ্র বলেন, ইনি তা নন গো।

আরও আগুন হয়ে গিন্নি বলেন, সকলে যা, উনিও তাই। বোকা পেয়ে গেছে তোমাকে। পথ-চলতি মানুষ ষ্টেশনে নামে, মেয়ে দেখার ছুতো ক'রে ভালমন্দ খেয়ে স'রে পড়ে।

আর কথা না বাড়িয়ে জয়চন্দ্র স'রে পড়লেন। গিন্নিও গজর-গজর করতে করতে সরু চাল বের করলেন এ হাঁড়ি ও হাঁড়ি হাতড়ে।

কুটুম্বটি কোয়ার্টারেই এলেন না। ষ্টেশনে ভাত গেল, পুরন্দর সিং দিয়ে এল। মেয়ের বাপ হয়ে জয়চন্দ্র যেন যুক্তকর শরণাপন্ন হয়ে আছেন; ছেলেওয়ালারা এসে যা বলবে, তাতেই রাজি। খবর শুনে কাজের ফাঁকে ছোটবাবুর বউও একবার এসেছেন, গালে হাত দিয়ে তিনি বলেন, মেয়েটাকেও সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অফিস-ঘরে? ওমা, কি ঘেন্না

খাওয়াটা গুরুতর হ'ল। কুটুম্ব এসে এইটে উপরি লাভ। জয়চন্দ্র গড়াচ্ছেন। অণিমা টিপিটিপি এসে বাপের পাকাচুল তুলতে বসল।

সহসা অণি কাতর কণ্ঠে ব'লে ওঠে, আমি পারি না বাবা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আর আমায় টানাটানি ক'রো না।

চমকে ঘাড় তুলে তাকালেন জয়চন্দ্র। মেয়ের দু চোখে জল টলটল করছে।

কি বলছিস ?

অণিমা বলে, গুরুঠাকুরের মত এত খাতির-যত্ন কর, সবাই তো মুখ বেঁকিয়ে চ'লে যায়। রাস্তার লোক ডেকে ডেকে এত অপমান কেন সহ্য কর ? আমায় দুটো পেটে খেতে দাও ব'লে ?

জয়চন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠে বসলেন। এই দেখ কাণ্ড !

মেয়ের চোখ মুছে দিলেন কোঁচার কাপড়ে। তবু কাঁদে। বিব্রত হয়ে বলেন, সে সব কিছু নয়—তোকে দেখতে আসে নি। মানুষ এলেই মায়ে-বেটীতে তোরা আঁতকে উঠবি ?

বিশ্বাস করছে না দেখে বললেন, আজ রাত্রে বিষম কাণ্ড হবে এই ষ্টেশনে।

গলা খাটো ক'রে বলতে লাগলেন, খবরদার, খবরদার ! কেউ জানতে না পারে, তা হ'লে চাকরি থাকবে না। ষ্টেশন জ্বালিয়ে দেবে স্বদেশিরা, লাইন ওপ্‌ড়াবে।

চোখের জলের উপর রামধনু ঝিকমিক ক'রে উঠল অণিমার মুখে। ছোটবাবু খবরের কাগজ রাখেন, তাঁদের পড়া হয়ে গেলে বিকেলবেলা সেটা নিয়ে এসে প্রতিটি ছত্র সে যেন গোগ্রাসে গেলে। আইন বাঁচিয়ে এবং নিজেদের ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা আখের বাঁচিয়ে যা লেখে কাগজওয়ালারা, তার ভিতর দিয়েও এতদূরে অণিমা দেশের দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পায়। এল বুঝি এতদিনে ভাটশ্যাওড়ায় আচ্ছন্ন ষ্টেশনে, পানা-ভরা নিঃস্রোত ভৈরবের ধারে দুর্মদ সৈনিক-দল—স্বাধীনতার স্বপ্ন অনারোগ্য ব্যাধি হয়েছে যাদের ! লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চলার মত নির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা জীবন। লাইন ওলটাতে আসছে—অণিমার মন কেমন নেচে ওঠে, লাইন-বাঁধা জীবনটাও উলটে যাবে বুঝি আজকে রাত্রির অন্ধকারে !

ছুটে সে জানলায় গেল, অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে ষ্টেশনের মাষ্টারটিকে। ঈজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন, ফরসা জামার হাতা আর মাথার খানিকটা মাত্র দেখা যাচ্ছে।

বেশ মানুষ তুমি বাবা। ষ্টেশনে রেখে এলে, নিয়ে এলে কি হ'ত ? আনবে তো বিকেলবেলা ? আলো থাকতে থাকতে এনো, ভাল ক'রে দেখব।

কাছে এসে দেখে, জবাব দেবেন কি—জয়চন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আকাশ মেঘে থমথম করছে। ষ্টেশন নির্জন। পুরন্দর সিং অবধি ওজন-কলের

পাশে চট পেতে প'ড়ে আছে। কেউ দেখতে পাবে না, একটি বার সে শুধু দেখে আসবে তাঁকে।

কিন্তু ভদ্রলোকই অণিমাকে দেখে ফেললেন।

এস, এস মা। খবর কি? ভাল আছ?

অপ্রতিভ অণিমা তাড়াতাড়ি বললে, ঘুম ভেঙেছে কি না দেখতে এলাম কাকাবাবু। ডাব কেটে আনিগে যাই।

আসতে আসতে ভাবে, এই রকম পোশাকে এসেছেন! বেল্টে আঁটা রিভল্ভারটা ঘপঘপে ওই আদ্দির পাঞ্জাবির নিচে?

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। প্ল্যাট্‌ফর্মে আলো মাত্র একটি। তিনটি জ্বালাবার কথা, ঘোটের উপর জ্বলছেও তাই। একটি এখানে, আর দুটো জয়চন্দ্র আর ছোটবাবুর কোয়ার্টারে। পুরন্দর সিং কেরোসিন নিয়ে রোজ হ্যারিকেন ভর্তি ক'রে দিয়ে আসে।

অণিমা জিজ্ঞাসা করলে, কি করছেন রে এখন কাকাবাবু?

পুরন্দর বলে, চুল বাগাচ্ছেন হাত-চিরুনি দিয়ে, দেখে এলাম।

ঘণ্টা বাজল। অনেক দূরে অস্পষ্ট গুমগুম আওয়াজ। ডিবা হাতে অণিমা এসে অফিস-ঘরে ঢুকল।

কাকাবাবু, পান।

গাড়ি আসার সময়টায় এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েকে দেখে জয়চন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন, আঁধারে লাইন পার হয়ে এলি, পুরন্দর সিংকে দিয়ে পাঠালেই হ'ত।

অণিমা বলে, রেণুদা আসছেন যে এই গাড়িতে। তুমি বেরিয়ে আসার পর চিঠি এল।

আসছে নাকি? উল্লাসে প্রায় আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটল জয়চন্দ্রের মুখে। আগন্তুকের কাছে পরিচয় দিতে লাগলেন, এর মাসীর ভাশুরের ছেলে রেণুপদ—এম. এ. পড়ে। মাসতুতো বোনের বিয়েতে গিয়ে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। বড্ড ভাল ছেলে—বাড়ির ওদেরও খুব পছন্দ। এসেছিস, ভাল হয়েছে খুকী, আমি তো চিনি নে।

গাড়ি এল চারিদিক কাঁপিয়ে। আবছা অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। অণিমা পাগলের মত ইঞ্জিন থেকে শেষ গাড়ি অবধি ছুটছে। ছোট্ট ষ্টেশন—যারা ওঠা-নামা করে, তারা প্রায় সবাই আশপাশের দু-তিনখানা গ্রামের। সকলের মুখ চেনা। এই রাত্রে বর্ষার জল-জঙ্গল ভরা গ্রামে কাদা-জোঁক আর কেউটে সাপের মধ্যে নূতন কেউ আসছে না, নিতান্ত যাদের কাঁধে ভূত চেপে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সেইরকম মানুষ ছাড়া।

পান্নালাল নামল। নেমে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সাব্যস্ত ক'রে ফেললে, কোন্ দিক দিয়ে বেরুনো সুবিধা।

পিছন থেকে হাতে টান আর উচ্ছ্বসিত হাসি।

এই যে রেণুদা, হাঁ ক'রে দেখছেন কি?

সুটকেসের দিকে নজর পড়তে অণিমা সেটা ছিনিয়ে নেয়।

কি ওতে—কাপড়চোপড়? দিন আমাকে, আমি নিয়ে যাচ্ছি। থাক থাক, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে না। চলুন।

এক হাতে সুটকেস ঝোলানো, আর এক হাত দিয়ে যেন সে পান্নালালকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলল। এমন বিপাকে পান্নালাল কখনও পড়ে নি। গেটের দিকে গেল না, নিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে।

ওই যে আমাদের বাসা। গুমটির ওখান থেকে গুঁড়ি মেরে তার পেরুতে হবে। সত্যি রেণুদা, ভাবতেই পারি নি, আপনি আসবেন এই জংলী পাড়াগাঁয়ে!

নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত গা ঘেঁষে চলেছে। হঠাৎ সামনে অণিমার কাকাবাবুটি। যেন সমস্ত দৃষ্টি পুঞ্জিত ক'রে তাদের দিকে তাকাচ্ছেন। অন্ধকারে উজ্জ্বল হিংস্র চোখ দুটি। কাছাকাছি গিয়ে অণিমা বললে, আমাদের কাকাবাবু। বড্ড ভালমানুষ আর বড্ড ভালবাসেন সকলকে। দাঁড়াবেন না রেণুদা, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসে তারপরে আলাপ-টালাপ করবেন।

পান্নালাল যুক্তকরে ভদ্রলোককে নমস্কার ক'রে অণিমার সঙ্গে চলল।

প্লাটফর্মের শেষে ঢালু জমি, এক-পেয়ে পথ। লাইনের তার ডিঙিয়ে শাপলা-ভরা বিলের কাছে অণিমা থমকে দাঁড়াল।

আপনার নাম রেণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. পড়েন। বুঝলেন তো?

মুগ্ধচোখে চেয়ে পান্নালাল বললে, বুঝেছি। হাওয়া খেতে এসেছি আপনাদের এখানে, কেমন?

এমন অবস্থায়ও মৃদু হাসির আভা খেলে গেল অণিমার মুখে। বলে, শুধুই হাওয়া খেতে নয় অবিশ্যি। সে থাকগে। খাওয়া হয় নি নিশ্চয়? চলুন। যাকে কাকাবাবু আর ভালমানুষ বললাম, ভালমানুষ উনি মোটেই নন। পুলিস-ইন্স্পেক্টর—পীরনগরের পথে খুব আসা-যাওয়া আছে এখানে। আজ সকাল থেকে জাল পেতে ব'সে আছেন।

পান্নালাল দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, তা হ'লে নাই বা গেলাম আপনাদের বাসায়। অস্ত্র কিছু আছে সুটকেসে। ওতেই চলবে। দুঃখিত হলেন?

অণিমা সুটকেসটা নিঃশব্দে তার হাতে তুলে দিলে।

পালান, ওইদিক দিয়ে অমনই মাঠ ভেঙে। ছুটে চ'লে যান।

মেয়েটিকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে পান্নালাল দ্রুতপদে চলল। আর কোনদিন জীবনে দেখা হবে না। মুখ-ফিরিয়ে একবার বললে, নমস্কার।

প্যাসেঞ্জার পেরিয়ে দূরবিস্তৃত খেজুর-বনের আড়ালে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে পা কাঁপছে অণিমার। পুলিস-লোকটার সন্দেহ হয়ে থাকে যদি? রেণুপদর সম্পর্কে যদি তদন্ত করতে আসে কোয়ার্টারে? তাকে ধরবে, বাপের চাকরি-সুদ্ধ টান প'ড়ে যাবে, 'কাকাবাবু' ব'লে ত্রাণ পাওয়া যাবে না। নিপাট ভালমানুষ তার বাবা, বাংলা দেশের ছা-পোষা ভদ্রলোকেরা যেমন হয়।

কি হচ্ছে ওদিকে, আশাভঙ্গ ইন্‌স্পেক্টর কি করছে—একটু না দেখে বাসায় ফিরতে পারে না। গাড়ি চ'লে গেছে, ষ্টেশন আবার চুপচাপ। বৃষ্টি এসেছে? ওয়েটিং-রুমের পিছনে বকুলগাছের নিচে ভিজতে ভিজতে অণিমা দেখতে লাগল। না, খাঁচা ভর্তি ওদের। একটা কোথায় স'রে পড়েছে, অতি আনন্দে সে খেয়াল নেই। তারপর মেলা ওয়েটিং-রুমে। স্বাস্থ্যবান হাসিমুখ ছেলেগুলি, কোমরে মোটা মোটা দড়ি বাঁধা। অনাহারে শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল উড়ছে, চোখের দৃষ্টিতে তবু বিদ্যুতের আলো। খবরের কাগজে যুদ্ধবন্দীদের ছবি দেখে থাকে, সেই রকম যেন কতকটা।

অনন্তও এদের মধ্যে। অণিমা তাকে চেনে না, কাউকেই সে চেনে না। দলের মধ্যে থেকেও ছেলেটি যেন তবু দলছাড়া।

দিন তো আর একটা সিগারেট।

ইন্‌স্পেক্টর তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেস এগিয়ে ধরে। একটা তুলে নিয়ে বিজয়ীর মত অনন্ত ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে অণিমার মনে। রেণুপদ সত্যিই যদি আসে, বিয়ে হয়ে যায়—স্বর্গ হাতে পাবেন তার গরিব বাবা-মা। সুন্দর পাত্র, ভাল অবস্থা, এম. এ. পড়ছে কলকাতায় হষ্টেলে থেকে, বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে তপস্যা করছে এমন বরের জন্য। কুশ্রী মেয়েটা কিন্তু আরও বেশি চায়। যাকে রেণুপদ ব'লে ডাকল, সত্যি সত্যি যদি এইরকম হ'ত তার রেণুদা। কপালের ঘামের মত জীবন থেকে সুখ-দুঃখ যারা মুছে ফেলেছে, দুটো দিন শান্তিতে ঘরে থাকবার জো নেই, যুদ্ধের সৈনিক—প্রিয়তমার মুখে হেসে কথা বলবার সময় কখন?

পান্নালাল ছুটছে, ছুটে পালাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে অণিমার কথা। কুরূপা কিন্তু চোখ দুটো ভারি উজ্জ্বল। খনির মধ্যে হঠাৎ-দেখা একজোড়া দামী হীরের মত, অন্ধকারের মধ্যে চোখের আলো ছড়িয়ে সাবধান ক'রে দিচ্ছে—

পালান—ছুটে চ'লে যান।

ক্লান্ত পান্নালাল এক পুকুর-ঘাটে জিরিয়ে নিচ্ছে। দাঁড়িতে বসা যায় না, কানের কাছে সমুদ্যত চাবুকের মত কালো মেয়েটার কণ্ঠ, পালান।

সুটকেসটা খুললে। রুটিখানা চিবিয়ে নেওয়া যাক। খেতে খেতে সে গান্ধীজীর ছবিখানা দেখে। তপঃকৃশ একখানি শান্ত মুখ—দূর-দূরান্তর পুণ্যনগরে আগাখাঁর প্রাসাদ-কারা থেকে মমতা-মাখা চোখে যেন চেয়ে আছেন। পান্নালালের দু চোখ অকস্মাৎ জলে ভ'রে যায়। মনে মনে বলতে থাকে, পথ আমাদের অন্ধকার, আলো দেখতে পাচ্ছি নে। কিছু বুঝতে পারছি নে। কি করব আমরা? কোন্ পথে চলব?

যখন পনরো-ষোল বছর বয়স, লাঠির বাড়ি আর কারাগারে সে জীবন শুরু করেছে। সামনে অনির্বাণ স্বাধীনতার শিখা, পথের দিকে দেখে নি তাকিয়ে। যখন জেলে থেকেছে, দু-চার মাস তখনই যা একটু অবসর। আজ সন্দেহ হচ্ছে, ব্রতভ্রষ্ট হ'ল কি এতকাল পরে? প্রায়োপান্তে ভাঙা থানার উপর বিভ্রান্তের মত সে ব'সে রইল।

শ্রীমনোজ বসু

সংবাদ-সাহিত্য

তেরো শ পঞ্চাশের অন্নঘটিত মন্বন্তরলব্ধ অর্ধকোটি বাঙালীর অকালমৃত্যুর বিনিময়ে জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা আমাদিগকে কি কি দিয়াছেন—তাহারই একটা ফিরিস্তি মনে মনে প্রস্তুত করিতেছিলাম। কারণ তেরো শ বাহান্নের বস্ত্রঘটিত আসন্ন মন্বন্তরের ফলে আরও কিছু বিনিময় ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পূর্ব ফিরিস্তি লইয়া আগে হইতে প্রস্তুত থাকিতে পারিলে আমাদের ঠকিবার সম্ভাবনা কম। দুর্গতদের দুর্গতিনিবারণী রিলিফ ফণ্ডের দুর্গে যাঁহারা সুকৌশলে আত্মগোপন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের তালিকার ভিতর পড়িবেন না, যাঁহারা সরকারী সতর্কতার ফাঁদে পড়িয়া মামলায় ঝুলিতেছেন তাঁহারাও আমাদের ফিরিস্তি-বহির্ভূত থাকিবেন, ইস্পাহানী প্রমুখ যে সকল সহৃদয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ন্যায্যলাভে চাউলাদি বিক্রয় করিয়া মাত্র কয়েক কোটি টাকার মুনাফা করিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমরা হিসাবের মধ্যে ধরিব না, কারণ আর্থিক ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিবার মত পারমার্থিক শিক্ষা আমাদের আছে। মৃত্যুর বিনিময়ে যে অমৃত আমরা লাভ করিয়াছি, ক্ষয়শীল জীবন উৎসর্গ করিয়া যে অক্ষয় সম্পদ আমরা অর্জন করিয়াছি, সেইগুলির কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। সে অমৃত আমরা লাভ করিয়াছি সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়া। পাঁচখানি উপন্যাস, দুইখানি

নাটক, এক শ তেরোটি গল্প, দুই হাজার সাত শ বিয়াল্লিশটি কবিতা এবং তিন শ বাইশখানি ছবি—অর্ধকোটি প্রাণের মূল্য হিসাবে নিতান্ত কম নয়। মৃত্যুর দুস্তর সমুদ্রে অমৃতত্ত্বের এই যে কোকনদগুলি বিকসিত হইল, একদা মৃত্যুর সমুদ্র যখন শুকাইয়া সাহারা হইয়া যাইবে সেদিনও এইগুলি মরুভূমির মধ্যে স্থলপদ্মের মত ফুটিয়া থাকিয়া অতীতের স্মৃতি বহন করিবে। বাংলা দেশের চিহ্নও হয়তো ইতিহাস বা ভূগোলের পৃষ্ঠায় থাকিবে না, কিন্তু মরমী কবির টাকার চারখানি কবিতা, অথবা দরদী নৃত্যশিল্পীর "ক্ষুধায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল" নৃত্য সেই অনাগত ভবিষ্যতে নূতন গণমনের বিস্ময় উৎপাদন করিবে, ইণ্ডিয়া রসাতলে গেলেও তাহার "স্পিরিট" মৌতাতী জনের নেশা জমাইতে কসুর করিবে না।

• • • •

এইরূপই হয়। স্বর্ণলঙ্কা এবং এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি সমেত বিসকুল ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া দশমুণ্ড বিশহস্ত রাবণ কবি বাল্মীকির কৃপায় মহাকালের বক্ষে রামায়ণ হইয়া ফুটিয়া আছে। আমরাও থাকিব। তেরো শ পঞ্চাশের মন্বন্তর ছানিয়া কবি ঔপন্যাসিক ও শিল্পীরা অমৃত তুলিয়াছেন, তেরো শ বাহান্নের বস্ত্র-সঙ্কটও বৃথা যাইবে না। গণশিল্পীরা পেন্সিল-তুলি শানাইতেছেন—সময়ের সাদা পর্দায় আমাদের অমৃতায়ন কল্পনাচক্ষে এখনই দেখিতে পাইতেছি; কালো, মোটা, বেঁটে, লম্বা, রোগা, লিকলিকে, ভুঁড়িওয়ালা, ভুঁড়িহীন, শীর্ণা ও নিবিড়নিতম্বা পুরুষ নারীর দিগম্বর মিছিল—ভবিষ্যৎ মানবের দৃষ্টিক্ষুধার কি পরিপূর্ণ ভোজ! ডুমুরপত্রেরও আবরণ নাই, বল্কলের শোভা—

গোপালদা প্রবেশ করিলেন। "এক অপূর্ব দৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাধারী মহাপুরুষে"র বেশ, হাতে কমণ্ডলু। ঠিক 'আনন্দমঠে'র শেষ দুই অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসকের মত; একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিলেন, বৎস, আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।

আমি সত্যানন্দ নহি, সুতরাং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। গোপালদা কমণ্ডলু হইতে খানিকটা জল লইয়া আমার মুখে ছিটাইয়া দিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ তুলিয়া দাও, উহাতে আর প্রয়োজন নাই। তোমাদের সাহায্য ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষ অচিরাৎ স্বাধীন হইবে।

রহস্যটা কোন্ দিকে গড়াইতেছে, ঠাহর করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। গোপালদা গলায় বজ্রনির্ঘোষ আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, আমি ঠিকই বলিতেছি। এগারো শ ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তরের পরের অবস্থা স্মরণ কর। তখন বুঝিয়াছিলাম, এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত,

লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। তাই ইংরেজকে রাজা করিয়াছিলাম।' ইংরেজী-শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে, ইহা জানিতাম। আমার সে ধারণা আজ সার্থক হইয়াছে। তোমরা বহিস্তত্ত্বে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছ।'

আশ্চর্য, গোপালদা কি হিপ্‌নটিজ্‌ম জানেন? তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ আমার বোধ হইল, আমিই সত্যানন্দ।' বলিলাম, প্রভু—'

গোপালদা হাসিলেন, বলিলেন, বল বৎস।

কিছু বলিতে পারিলাম না, ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

গোপালদা বলিলেন, বৎস, অবিশ্বাসী হইও না। প্রমাণ চাও? দিব।

গোপালদা কমণ্ডলু হইতে আবার জল লইয়া আমার মুখে ছিটাইলেন। অকস্মাৎ আমার মাথা কেমন ঘুরিয়া গেল। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতেই অনুভব হইল, আমি রঙ্গমহল প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া আছি। আমার বাম পার্শ্বে আকলেজ-সুহৃদ্ গোপাল হালদার; দক্ষিণে বন্ধু বলাই অর্থাৎ বনফুল, ষ্টেটসম্যান-সম্পাদকের সহিত ঘনিষ্ঠ বাক্যালাপরত পি. সি. যোশী ও গ্লোব নিউজ এজেন্সীর আমেরিকান কার্যাধ্যক্ষের পাশে সত্যেন মজুমদারকেও দেখিলাম। সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের পাটাতনে নাচ চলিতেছে, অন্ধ্র দেশের ধোবারা সোভিয়েট লাল-বাহিনীর বিজয়ে উদ্দাম উল্লাস-নৃত্য করিতেছে। সে কি উন্মাদনা! আমার মাথা আবার ঘুরিয়া গেল, বোধ হইল, ধোবাদের আনন্দোৎসবে গাধারাও যোগ দিয়াছে। সমবেতকণ্ঠে ঐক্যতান-সঙ্গীত রুশবিজয়কে মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে।

কমণ্ডলু-জলস্পর্শে আত্মস্থ হইতেই গোপালদা বলিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় একবার ইংরেজের বহিস্তত্ত্ব শিক্ষার সামান্য একটু পরিচয় পাইয়া প্রসন্ন হইয়াছিলাম। ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মনস্বী রামমোহন রায়ই মাত্র সেদিন দীর্ঘদিনের জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগিয়াছিলেন, স্পেন দেশে স্বাধীন নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তনে আনন্দোৎফুল্ল রামমোহন কলিকাতার টাউনহলে ভোজ দিয়াছিলেন। সেদিন একা রামমোহন, আর আজ? দেখিলে না বৎস, মাদ্রাজী ধোবীরা সুদূর রুশের বিজয়ে কি কাণ্ডটাই না করিল! এ নৃত্যগীত তাহাদিগকে শিখাইয়াছে অন্ধ্রদেশের কৃষাণকর্মীরা। বোঝ, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বহিস্তত্ত্বের শিক্ষা আজ সমাপ্তপ্রায়।'

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইংরেজ?

গোপালদা নির্ভয় দিয়া বলিলেন, সেদিন ইংরেজ বণিক ছিল, অর্থ সংগ্রহেই তাহার মন ছিল; রাজ্যশাসনের ভার সে লইতে চাহে নাই। মন্বন্তরের পর তোমাদের বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইয়াছিল, কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইত না। আজ তেরো শ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর রাজা আবার বণিকবৃত্তি ধরিয়াছে, সস্তায় চাউল-আটা খরিদ করিয়া অধিক মূল্যে প্রজার নিকট বেচিয়া

তাহারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। তেমো শ বাহাদের বস্ত্রসংকটেও যে তাহারা মানচেষ্টারের বিলুপ্ত-প্রায় বস্ত্রব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করিবে, তাহার আভাস পাইতেছি। শাসক আবার বণিকবৃত্তি ধরিয়াছেন, সুতরাং তোমাদের আত্মনিগ্রহকারী আন্দোলনের আর কোনই প্রয়োজন নাই। বহিস্তত্বে যাহারা চূড়ান্ত শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদেরই থাকিতে দাও বৎস, আইস আমরা চলিয়া যাই।

আমার কণ্ঠে, আমার অজ্ঞাতসারে ধ্বনিত হইল, কিন্তু প্রভু, আমরা যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, তাহা পালন করিব না?

—বৎস, তাহার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস-লীগ এক হইতেছে, আজ ইংরেজের যুদ্ধ তোমাদের জনযুদ্ধ। দেখিতেছ না যুদ্ধজয়ে এ-দেশের কামার-কুমার-চাষা-ধোপারাও নাচিতেছে! বলিতে বলিতে গোপালদা আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি মূঢ়ের মত তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আর লেখা হইল না। বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

—

"তৃতীয় বার্ষিক ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে"র নিমন্ত্রণ-পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি: "আজ আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্মিলিত হ'য়ে জনসাধারণকে নতুন আশায় ও নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়োজন যে কত বড়, তা বিস্তারিত-ভাবে বলা বাহুল্য। গত তিন বছর ধ'রে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আমাদের এই দেশ ছারখার হয়েছে; বিপদ এখনও কাটে নি। বিপদকে প্রতিরোধ করবার এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজীবনের সৌধ গড়ে তুলবার কাজে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব কারো চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশি। কারণ তাঁরাই দেখিয়ে দিতে পারেন, বাঁচবার কী উপকরণ দেশবাসীর মধ্যে রয়েছে এবং বাঁচবার পথে তাঁরাই সর্বসাধারণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করবার ক্ষমতা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের হাতে। সেই পুনরুজ্জীবনই বর্তমান সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

উদ্দেশ্য অর্থাৎ থিওরি চমৎকার। কাহারও কিছু বলিবার নাই। এবার কার্য অর্থাৎ প্র্যাকটিসে কিরূপ দাঁড়াইতেছে দেখা যাক। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। সচরাচর সভাপতি এবং সম্পাদকেরাই হন সভা বা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ! একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিবার মত এই যে, এই কম্যুনিষ্টশাসিত প্রতিষ্ঠানেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য—অব্রাহ্মণ-নহ-ছুমিয়া অর্থাৎ সুধী প্রধানেরা এখনও প্রধান হইবার সুযোগ পাইতেছেন না। অবশ্য এই উক্তি

এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর এবং আমাদের রসিকতার সামান্য প্রয়াসমাত্র।] এখন এই প্রাণেদের আধুনিক চাঞ্চল্য বিচার করা যাক। উক্ত সম্মেলনের সময়েই শৈলজানন্দের একটি সবাক্ ছায়াছবি কলিকাতার কোনও চিত্রগৃহের "রূপালি" পর্দার সুমুখে হইয়াছে। ছবিটি আমরা দেখিয়াছি এবং দেখিয়া এত ঘৃণাবোধ করিতেছি যে, নিজেদের সাহিত্যিক বলিয়া প্রচার করিতে লজ্জানুভব করিতেছি। উপরোক্ত নিমন্ত্রণ-পত্রের প্রত্যেকটি পংক্তিকে শৈলজানন্দের গল্প এবং সংলাপ অন্তত দশ-দশবার জুতাপ্রহার করিয়াছে। "সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারে"র ইহাই যদি নমুনা হয়, তাহা হইলে 'চুম্বনে খুন' 'কিসমিস' প্রভৃতি কাসিষ্ট শিল্পসৃষ্টি কি দোষ করিল? উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের একবার সভাপতির কীর্তি দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি।

অন্যতম সম্পাদক ফ্যাশস্থাল ফ্রন্টের শিরোভূষণ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণে'র সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন, তিনি কি ভাবে "ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজীবনের সৌধ" গড়িয়া তুলিবার কাজে তৎপর আছেন। মাণিকবাবু-বিবৃত "সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে"র কিঞ্চিৎ আধুনিক নমুনা দিতেছি।

—ওমা, সুবলবাবু যে! পেন্নাম।

—এ তোমার কেমন ব্যাভার সুখময়ী?

—তোমারি বা এ কেমন ব্যাভার সুবলবাবু, দিন দুকুরে নাগাল ধরা?

দুহাতে কানা ধরে কলসীটা সে নামিয়ে রাখল। যে কাঁধে কলসী ছিল তার উল্টো দিকে বেঁকে বেঁকে সোজা করে নিল কোমরটা। অবহেলায় সঙ্গে কাঁধে ফেলা ভিজে আঁচলটি নামিয়ে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে আবার ভালো করে গায়ে জড়াল।

—গোড়ায় তো ডরিয়ে গেলাম, কোন্ মুখপোড়া উঁকি মারছে গো? শেষে দেখি মোদের সুবলবাবু। নিশ্চিন্দি হয়ে তখন সাঁতার কেটে চান করলাম। ফিক্ করে হেসে লজ্জায় মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, তোমার জন্তে। সত্যি তোমার জন্তে—কাল ফিরে যেতে হল তোমায়!

সুবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, কাল ইত্তা প্রথম নয়। ফিরেই তো যাচ্ছি। এলে না কেন কাল? রাত দুপুর তক্ শিরীষতলায় মশার কামড় খেলাম। মা মনসা না করুন,—চুপ্রাতু জড়ো হয়ে সুবলের কপালে ঠেকে গোক্ষুর সাপের কামড়ে মরব একদিন।

সুখময়ী আপসোসের আওয়াজ করল চকচক্ বালাই বাট। কিন্তু কী করি. জেনা যে ফিরে এল্ গো!

—একবার জানান দিয়ে তো যেতে পারতে, সবাই ঘুমুলে পর? ঘুরঘুটি আঁধারে একটা মানুষ হাঁ করে—"

—ঘুমিয়ে পড়লাম যে! ওনার সাথে ঝগড়া করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।

—ঝগড়া হল? বেশ, বেশ! তা ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?

—সোয়ামির সাথে মেয়েমানষের আবার কী নিয়ে ঝগড়া হয়? শাড়ি গয়না নিয়ে।

সুবল হঠাৎ উত্তেজিত, উৎসুক হয়ে বলল, তুমি যত শাড়ি গয়না চাও—

—ইস্? ফতুর হয়ে যাবেন। ছায়ায় চাপা আলো লেগে সুখময়ীর পান খাওয়া দাঁতের ঘষামাজা অংশগুলিতে ভোঁতা ঝকমকি খেলে গেল।—ফতুর নয় হলে। মোর তরে ফতুর হতেই তো চাইছ তুমি হাজারবার। কিন্তু শাউড়ি সোয়ামি যখন শুধোবে মোকে, অ বউ, শাড়ি গয়না কোথা পেলি লো, কী জবাব দেব শুনি? বলব নাকি, কুড়িয়ে পেইছি গো, ঘাটের পথে কুড়িয়ে পেইছি?"

—কাল নিয়ে চারবার ঠকালে আমায়।

—ওগো মাগো, ঠকালাম! আমি তোমায় ঠকালাম! ভেস্তে গেল তো কী করব আমি? হাত-পা বাঁধা মেয়েলোক বই তো নই! ঘরের বউ, পরের দাসী, কী খ্যামতা মোর আছে বলো? তোমায় ঠকাব, তোমার জন্যে মরণ হয়েছে আমার? কিন্তু ভালো লাগে না সুবলবাবু, একদণ্ড ঘরে মন বসে না। মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি।

আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দ্বিধা-সঙ্কোচের ভঙ্গি করে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বুক দিয়ে সে সুবলকে গাছের সঙ্গে চেপে ধরল, মুখ উঁচু করল, সুবলের মুখের নাগাল কিন্তু পৌছল না।"

* * *

অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিত 'অরণি'র "কথাপ্রসঙ্গে হিটলার-মুসোলিনির ব্যক্তিগত শ্রাদ্ধের সহিত যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা "আমাদের বিমানবন্দরে"র যোগাযোগ নির্ণয় করিতে পারিবেন, তাঁহারাই উপরে উদ্ধৃত পত্রের "বিপদকে প্রতিরোধ করবার" সঠিক আদর্শের সন্ধান পাইবেন। অন্য অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

"কবি অমৃতকুমার দত্ত আমাদের বর্তমান বস্ত্রসমস্যার চমৎকার সমাধান করিয়াছেন। "শকুন্তলাকে" সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"এখন যদি ডাক দি, যদি বলি—এসো।
এসো তোমার আভিজাত্যকে অতিক্রম করে'

শান্তি আর সাম্যের মিথ্যা মোহকে ছেড়ে
ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের আলো-কে অন্ধ করে'
এসো, আমার এই রিক্ত [illegible] হাতে
রাখো তোমার নরম হাত।"

[illegible]রা যদি শান্তি আর সাম্যের মিথ্যা মোহকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা দুর্মতেরাও না কোন্ যুক্তি-মুক্তির মোহ ছাড়িতে পারিব। "তোমার আভিজাত্যকে অতিক্রম করে" হইতেই মালুম হইতেছে লেখক কোন্ সম্প্রদায়ের। ইহারা যদি একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আসন্ন দৌর্ভিক্ষ্য বস্ত্রসঙ্কটে যাঁরা বাংলা দেশই মিথ্যা মোহ ছাড়িয়া সরকারকে এবং পুঁজিবাদীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে পারিবে।

—

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ করিতেছেন, তাঁহারা সম্ভবত এ যুগের গণমনের খবর রাখেন না। রাখিলে এতখানি উত্তম প্রকাশ না করিয়া তাঁহারা বিরত হইতেন। গণমন (শ্রী) বলিতেছেন—

"কালধর্মী রবীন্দ্রকাব্য-দর্শন মুখ্যত অনেকগুলি বাদের ঐক্যতান—ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদই যার মূল সুর। ওটা আবার ভাববাদী দর্শনের অকৃত্রিম ধারাবাহকও। কিন্তু যে ফিউডাল ও যৌবন-বুর্জোয়া সমাজে ওর কার্যকারিতা সক্রিয় ছিল, সাম্প্রতিক বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার গঙ্গাযাত্রায় তার স্বরূপ গলিতকুষ্ঠের মতন কেটেফুটে বেরিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ!

যৌবন-বুর্জোয়া-র সামাজিক পরিবেশে মন তাঁর দানা বেঁধেছিল। ফিউডাল সমাজের গলিত বংশগৌরবের ওপর অভিশাপচার করে শিশু-বুর্জোয়া সমাজ-জীবনে যে নবজাগরণের স্পন্দন এনেছিল তারই প্রাণবন্ত সংগীত রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন, শুনিয়েছিলেন উদাত্তকণ্ঠে। বুর্জোয়ার উদারতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন…কিন্তু সশ্রেণী সমাজে মানুষের শুভবুদ্ধির ভ্রূণহত্যা যে অবশ্যম্ভাবী শেষবয়সে তার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেও দিশাহারা ছিলেন।"

ক্রিটিসিজম হইলেও "অস্তিপরিকার তার নব আবিষ্কার"। রবীন্দ্রনাথ আর বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে মারা যাইতেন। স্মৃতিসমিতির কর্মকর্তাদের এ সংবাদ কাজে লাগিতে পারে।

স্মৃতিসমিতি বলিতে মনে পড়িল, গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটে' —পত্রে শ্রীযুক্ত অমল হোম "নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ-স্মৃতিসমিতি" সম্বন্ধে যাহা

বলিয়াছেন তাহা বিবেচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে নিখিল-ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অপর কোনও বাঙালী এই কমিটিতে থাকিলে কাজ সহজে সিদ্ধ হইত। কমিটির গঠন সম্পর্কেও শ্রীযুক্ত ঘোষের মত আমরা সমর্থন করি। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এফ. আর. এস., শ্রীযুক্ত অমল হোম ও শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লইলে কমিটির গৌরব বৃদ্ধি হইত। শ্রীযুক্ত হোম নানাভাবে রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষায় [নিয়ে] যে যেরূপ পরিশ্রম ও সহায়তা করিয়াছেন—তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সমিতি সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। আর এক কথা, এই ঘোরতর সন্দেহবাদীদের দেশে একই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে জেনারেল সেক্রেটারি করিয়া অন্যতম ডিরেক্টরকে অডিটার নিযুক্ত করিয়া কর্মকর্তারা ভাল করেন নাই। আশা করি, কমিটি কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিবেন।

—

কাপড়ের বাজারে যে ভাবে আগুন লাগিয়াছে, এখন ঢাকেশ্বরী মিলের মত প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙালী-পরিচালিত মিলের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অব্যবস্থার কথা উঠিলে দেশের সমূহ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানা গুরুতর অভিযোগ আমাদের কানে আসিয়াছে, শুনিতেছি অংশীদারদের তরফ হইতে একটি মামলাও দায়ের করা হইয়াছে। এই অবস্থায় মিলের কর্তৃপক্ষের উচিত প্রকাশ্যভাবে সকল অভিযোগ খণ্ডন করা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দ সমস্ত দেশের ভালমন্দের সহিত জড়িত বলিয়া এই মন্তব্য করিতে বাধ্য হইলাম।

—

গোপালদার ডাইরি হইতে—

"এ যুগের জনযুদ্ধ ঘটিতেছে দুটি বস্তু লাগি—
দুটি পুরাতন বস্তু—এক ধন, আর অধিকার।
ধনী আর অধিকারী তাই সর্ব কৃতিত্বের ভাগী।
অধম গোপালদের এ অর্ণবে লগি ঠেলা সার।"

—

বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেনের "কংগ্রেসের অর্থনৈতিক দৃষ্টি" সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। তারাশঙ্করের উপন্যাস 'মন্বন্তর' ওই সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি

১৭ম বর্ষ

প্রথম ভাগ

কার্তিক—চৈত্র ১৩৫১

ষাণ্মাসিক সূচী

শনিবারের চিঠি
১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

"All great doctrine, as it recurs periodically in the course of the centuries, is coloured by reflections of the age wherein it appears ; and it further receives the imprint of the individual soul through which it runs. Thus it emerges anew to work upon men of the age. Every idea as a pure idea remains in an elementary stage, like electricity dispersed in the atmosphere, unless it find the mighty condenser of personality"—M. Romain Rolland : *The life of Vivekananda.*

বিবেকানন্দের চরিত-কথা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহার পর তাঁহার বাণীর কিছু পরিচয় দিলেই আমার প্রয়োজন সমাধা হইবে। সে বাণীর বিশেষত্ব এই যে, তাহা কেবল ভাবুকতা, চিন্তাশক্তি, অথবা যাহাকে উৎকৃষ্ট প্রতিভা বা মনীষা বলে—তাহারই জীবন-বিচ্ছিন্ন, বস্তুসম্পর্কহীন তত্ত্ব বা সত্য-প্রতিষ্ঠার বাণী নয়; তাহাতে বাস্তব জীবনের গূঢ়তম ও বৃহত্তম সমস্যার সম্মুখীন সত্ত্বপরিত্রাণপ্রয়াসী এক অতিশয় শক্তিমান পুরুষের দুর্দ্দমনীয় উদ্যম স্ফুরিত হইয়াছে; বিবেকানন্দের জীবনও সেই বাণীকে সপ্রমাণ করিয়াছে। সেই সমস্যা মূলে এক হইলেও তাহার শাখা-প্রশাখা আছে, এই বাণীতেও তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। আমি বিশেষ করিয়া তাহার একটা দিকই লইব—যে দিকটির সহিত বর্ত্তমান আলোচনার সাক্ষাৎ যোগ আছে, যে দিকটি তাঁহার বাণীর খুব প্রয়োজনীয় ও সার্থক দিক বলিয়া মনে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে, শাস্ত্র ও দর্শনঘটিত নানা তত্ত্বের মৌলিক ব্যাখ্যাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে—সে সকলও তাঁহার বাণীর অন্তর্গত, চিন্তার দিক দিয়া তাহাদের মূল্য কম নয়। কিন্তু মানব-ইতিহাসের এই মহাযুগান্তরকালে, তিনি নব জীবন-যজ্ঞের উদ্গাতারূপে যে প্রাণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃত 'বাণী'; আমি সেই বাণীরই যথাসাধ্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

আমার মনে হয়, এই ভারতবর্ষেই—এই অতি-দুর্গত, মোহগ্রস্ত, ভয়ার্ত্ত ও বহু-শৃঙ্খলিত মানবাত্মার দেশেই,—সর্ব্বমানবের মুক্তিসংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে; এই দেশেই তাহার ক্রুশবিদ্ধ বিরাট দেহের অবতারণ ও পুনরুত্থানের মন্ত্রোচ্চারণ হইতেছে—এই মহাশ্মশানই যে মানুষের সেই নবজন্মের সূতিকাগাররূপে ক্রন্দন-শেষে হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তমের দর্শন এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষই অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া ভূমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল—তমসার পারে হিরণ্যবর্ণ মহান্ পুরুষের চকিত দর্শন লাভ করিয়া, "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং

invalid for that activity of mind." ইহার পর যে কথাটি বলিয়াছেন তাহার মত গভীর ও মূল্যবান কথা আর নাই—"In poetry, qua poetry, there are neither particulars, or universals, abstracts or concretes." ইহা শুধুই কাব্যের তত্ত্ব নয়—জগৎ-ব্রহ্মের এই অভেদ-তত্ত্বই পরমতত্ত্ব বলিয়া, এতকাল পরে ভারতবর্ষের সেই পুরাতন বাণীই এক নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—জ্ঞান ও প্রেম, কাব্য ও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব, অস্তি-ভাতি ও নামরূপ, এক অখণ্ড সত্যের অধীন হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও একটু গোল থাকিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'বিশ্বমানব'-বাদ নামে এক অভিনব তত্ত্ব সুলভ কুলচুর-বিলাস ও অজ্ঞতামূলক প্রাজ্ঞতার পক্ষে বড়ই উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বমানব' নামটার কোন দোষ নাই—বরং আমরা যে 'মানব'-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি, ঐ নাম তাহার খুবই উপযোগী; কিন্তু যে-অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাতে 'ভাবের ঘরে চুরি' আছে। একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী দার্শনিক-পণ্ডিত বোধ হয় উহারই অনুবাদ করিয়াছেন—'Cosmic Man', যদিও তাহার অর্থ ঠিক রাখিয়াছেন। বিবেকানন্দের Humanity যে অর্থে Universal, সে অর্থে Particular-ই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ও পরিচয়; তাহাতে বৈচিত্র্যও যত বেশি, সেই একের মহিমাও তত প্রকট; 'অনেকে'র মধ্যেই সেই 'একে'র গভীরতর উপলব্ধি সম্ভব—বিশেষই নির্ব্বিশেষের নামাঙ্কিত পাদপীঠ। কিন্তু ঐ 'বিশ্বমানব'—সর্ব্ব-মানবের একটা পিণ্ডীভূত সত্তা, একটা বর্ণহীন রূপহীন ভাবনির্য্যাস মাত্র। বিবেকানন্দে ধ্যান-ধৃত যে বিশ্বমানব তাহা ইতিহাসের ধারায়, দেশ-কাল-পাত্রের নানা রূপে ও নানা অবস্থায় নিত্য-নব প্রকাশশীল; তাই অতি প্রাচীন হইতে অতি-আধুনিক পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই বিচিত্র ও বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি Universal-এর চক্ষে Particular-কে দেখিতেন না, Particular-এর মধ্যেই Universal-কে দেখিতেন। এই দেখার দুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিব। ইটালি-ভ্রমণকালে রোমের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন সকল তাঁহাকে যেমন অভিভূত করিয়াছিল, তেমনই, খ্রীষ্টীয় উপাসনা-মন্দিরের অভ্যন্তর দৃশ্য ও উপাসনার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ কিছুমাত্র বিজাতীয় বলিয়া মনে হয় নাই—"He was profoundly touched by the memories of the first Christians and martyrs in the Catacombs, and shared the tender veneration of the Italian people for the figures of the infant Christ and the Virgin Mother." তেমনই, একবার ইংলণ্ড যাত্রাকালে তাঁহার জাহাজ যখন জিব্রাল্টার প্রণালীতে প্রবেশ করিল, তখন, ঐখানে আফ্রিকা হইতে আরব-মূরগণের স্পেন-আক্রমণের সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সেই মূরগণের সহিত 'দীন্ দীন'-শব্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি উক্তি বড়ই যথার্থ, তিনি লিখিয়াছেন—

"That which emerges most clearly is his 'universal sense'—he had hopes of democratic America; he was enthusiastic over the Italy of art, culture, and liberty. He spoke of China as the treasury of the world. He fraternised with the martyred Babists of Persia. He embraced in equal love the India of the Hindus, the Mahomedans and Buddhists. He was fired by the Moghul Empire."

তাঁহার জীবনচরিতকার (*Life of the Swami Vivekananda*, by His Disciples) লিখিয়াছেন—

"In Egypt he was specially interested in the Cairo Museum, and his mind often reverted, in all the vividness of his historic imagination, to the reigns of those Pharaohs who made Egypt mighty and a world-power in the days of old....And here in Egypt it seemed as if he were turning the last pages in the Book of Experience."

এই সকল হইতে বিবেকানন্দের "Universal Sense" যে কি অর্থে Universal তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই যে 'Book of Experience', ইহা কিসের 'experience'?—কোন্ মানুষের পরিচয়-কাহিনী? 'বিশ্বমানব' যদি একটা ভাবগত বস্তু হয়—বাস্তব মানব-সত্তা হইতে কতকগুলি সাধারণ মানবীয় গুণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সেইগুলির সমবায়ে গঠিত একটা নির্ব্বিশেষ আইডিয়াল বা মানস-বিগ্রহকে 'বিশ্বমানব' নাম দিয়া, যদি তাহারই পূজা করা হয়, তবে তাহা এই Universal মানুষ নয়,—যে মানুষ এক হইয়াও বহু,—যে মানুষ সর্ব্বত্র Concrete বা রূপময়। এজন্য ঐ 'বিশ্বমানব' নামটির অর্থবিভ্রাট নিবারণের জন্য আমি উহার নাম দিব 'মহামানব' এবং ইহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিবার জন্য, ইহার একটা সাহিত্যিক ব্যাখ্যাও দিব।

৩

মহাকবি শেক্স্পীয়রের কবি-দৃষ্টিতে (কবিরও এই দৃষ্টির কথা আগে বলিয়াছি) এই Humanity বা মহামানবই কত অপরূপ রূপে ধরা দিয়াছিল! তাঁহার সৃষ্ট সেই ব্যষ্টি-মানবের অগণিত অনন্য-সদৃশ চরিত্ররাজিতে সেই এক মানুষই সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ কাব্যসমালোচক সেই কথাই বলিয়াছেন, যথা—

It was Shakespeare's prerogative to have the universal which is potential in each particular, opened out to him, the *homo generalis*, not as an abstraction from observation of a variety of men, but as the substance capable of endless modifications.

এই *home generalis*-ই সেই মহামানব—যাহা পিণ্ডীভূত সমষ্টির abstraction বা ভাবনির্য্যাস নয়, বরং এমন একটা বস্তু যাহার ব্যষ্টি-রূপের অন্ত নাই। তথাপি শেক্স্পীয়র particular-এর মধ্য দিয়াই সেই universal-এর উপলব্ধি

করিয়াছিলেন, কারণ, উহাই খাঁটি কবি-কল্পনার জ্ঞানযোগ; এবং "whoever has a living grasp of this particular grasps the universal with it, knowing it either not at all, or long afterwards"। আমাদের রবীন্দ্রনাথেরও কবিজীবনের পূর্ণযৌবনে—particular হইতে universal নয়, universal হইতে particular-এ তাঁহার কল্পনার আসক্তি লক্ষ্য করা যায়; তাঁহার সুবিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতাটি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। সেখানে কবি তাঁহার ব্যষ্টি-জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই, যাহা সর্ব্ববৈচিত্র্যের মূল উৎস—বিরাট প্রাণধারার সেই মূলাধার 'বসুন্ধরা'য় নিমজ্জিত হইয়া, বস্তুত্বের—particular-এর রস আস্বাদন করিতে অধীর হইয়াছেন—

ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিয়া বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত।...
...শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে।

তার পর—

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্ম-অনুরত; সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।

—কিন্তু এই ইচ্ছাও সেই দৃষ্টিসম্ভূত নয়, যাহাতে—"there are neither particulars or universals, abstracts or concretes"। ইহাতে universal-এর চেতনাই প্রবল ও মুখ্য—ইহা সেই শেকসপীরীয় দৃষ্টি নয়। কিন্তু এই সঙ্গে শেলীর কাব্যমন্ত্রের

তুলনা করিলে আমাদের ঐ জগৎ-ব্রহ্ম-অভেদের তত্ত্ব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। শেলীর কল্পনা খাঁটি বৈদান্তিক—সর্ব্বপ্রকার Concrete ও particular-এর বিরোধী। শেলীর আদর্শ 'মানুষ' সর্ব্ববন্ধন ও সর্ব্ব-উপাধিমুক্ত 'মানবাত্মা'—

The loathsome mask has fallen, the man remains
Sceptreless, free, uncircumscribed, but man
Equal, unclassed, tribeless, and nationless,
Exempt from awe, worship, degree, the king
Over himself ; just, gentle, wise : but man
Passionless ;

—এই গুণগুলি সব একত্র অবস্থান করার উপায় না থাকিলেও, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, মানবাত্মার আদর্শ-হিসাবে ইহা চূড়ান্ত বটে ; ইহাকে বিবেকানন্দের আদর্শও বলা যায়, আবার আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীর আদর্শও প্রায় এইরূপ বটে ; কিন্তু সৃষ্টি-সত্যের সহিত কোনরূপ বোঝাপড়া ইহাতে নাই—যাহা বিবেকানন্দের বাণীতে আছে ; ইহার জন্য অপর সম্প্রদায়ের কোন মাথাব্যথাই নাই, কারণ শেলীর যাহা আদর্শ তাহাই তাহাদের বাস্তব ; তাহাদের চিন্তাভিত্তিও শেলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। শেলীর ঐ আদর্শ বাস্তব-নিরপেক্ষ হইলেও, শেলী বাস্তবের বাধাকে অস্বীকার করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্ষেপের অন্ত নাই। মানুষের দেহটাই তাহার আত্মার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির একটা বড় বাধা ; 'Chance and death and mutability'-র নিয়তি-নিগড় যদি না থাকিত তাহা হইলে ঐ আত্মা—

Might oversoar
The loftiest star of unascended heaven,
Pinnacled dim in the intense inane.

—এমন একটা ভাবনার প্রশ্রয় দিতে আধুনিক মহাবস্তুবাদীরা শিহরিয়া উঠিবে, যদিও, আত্মাহীন বস্তু যে-মানুষ, তাহার অধিকার ঘোষণায় শেলীর কবিতার ঐ বিশেষণগুলিকে অগ্রাহ্য করিবে না।

৪

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা এই পর্য্যন্ত, এখন সেই 'বিশ্বমানব' ও এই 'মহামানব'-বাদের পার্থক্য-বিচার শেষ করিব। একটিতে দেহদশাধীন মানুষকে বাস্তব নিয়তি-নিয়মের বন্ধনে, বিশিষ্ট গুণে ও রূপে, নানা অবস্থায় দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে ; অপরটিতে দেশকাল প্রভৃতির উর্দ্ধে তুলিয়া তাহার একটা ভাব-রূপের ধ্যান মাত্র আছে ; এজন্য এই অপরটিতে—বিশ্বমানবের ঐ মানস-বিগ্রহ-পূজায়—মানুষ-হিসাবেই মানুষকে যে শ্রদ্ধা, তাহারি প্রতি প্রেমের যে বাস্তব-অনুভূতি—সেই বিশেষের প্রীতি নাই। বিবেকানন্দের বাণী যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি ; তিনি সকল জাতির সকল

মানুষকেই একথা abstract, তথা universal মানবতার আইডিয়াল দ্বারা বিচার করিতেন না; প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই মানবতার বিশিষ্ট বিকাশকে বুঝিতে চাহিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। উপরে মূরগণকর্ত্তৃক স্পেন-বিজয়ের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া বিবেকানন্দের যে ভাবোল্লাস হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি—তাহার কারণ ইহাই। তিনি মূরগণের সেই ধর্ম্মোন্মাদ-প্রজ্জ্বলিত বীরত্ব-বহ্নিকে তাহাদের জাতিসুলভ একটা গুণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া, তাহাতেও মানবতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একবার পরিব্রাজক-বেশে কাশ্মীরভ্রমণকালে পিপাসার্ত্ত হইয়া তিনি এক কৃষক-রমণীর কুটীরে জল চাহিয়াছিলেন; পিপাসানিবৃত্তির পর তিনি গৃহস্বামিনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'মাঈ, তোমার ধর্ম্ম কি?' তাহাতে সে এমন কণ্ঠে উত্তর করিল, 'খোদাকে ধন্যবাদ—আমি মুসলমানী' যে, বিবেকানন্দ তাহাতে মুগ্ধ হইলেন; তাহার কণ্ঠে ও মুখে চক্ষে একটি শান্ত গভীর সাত্ত্বিক আবেগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, সেই সরল ভক্তির অন্তরালে একটি খাঁটি ভারতীয় মনোভাব রহিয়াছে; সম্প্রদায় যাহাই হউক—রক্তের ভারতীয় সংস্কৃতি মুছিবার নয়। এখানেও সেই একই কারণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের Humanism বা মানবপ্রীতিও যে কিরূপ তাহার দৃষ্টান্তও প্রচুর আছে। যেমন জাতি, যেমন সমাজই হউক—তিনি মানুষের অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। আমেরিকায় তাঁহার গাত্রবর্ণদৃষ্টে অনেকে তাঁহাকে নিগ্রো বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সেজন্য পথেঘাটে তাঁহাকে অনেক অসুবিধাও সহ্য করিতে হইয়াছে। নিগ্রোগণও তাহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বহু সম্মানে তাহাদের সমাজে আহ্বান করিয়াছে এবং তাঁহার খ্যাতিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। তিনি একদিনের জন্য তাহাদের সেই ভুল ভাঙিয়া দেন নাই। কেহ কেহ এ বিষয়ে অনুযোগ করিলে তিনি সরোষে বলিয়াছিলেন, 'কি! আমি মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করিয়া নিজের মান বাড়াইব!" একবার কথাপ্রসঙ্গে কোন আদিম অসভ্য জাতির পাথর-পূজা সম্পর্কে একজন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহাতেও বিবেকানন্দ ব্যথিত হইয়া সেই জাতির পক্ষ সমর্থন করেন; সেই জাতির অপরিণত জ্ঞানবুদ্ধির দিক দিয়া দেখিলে ঐরূপ আচরণ যে দূষ্য নয়, বরং উহাতে মানব-মনের শৈশব-সারল্যের এমন একটি কল্পনা ও বিশ্বাস-প্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে যে, উহাও শ্রদ্ধার যোগ্য—এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা সত্যই বলিয়াছেন—

It was his love of Humanity, and his instinct on behalf of each in his own place, that gave to the Swami so clear an insight.

There was the perpetual study of caste, the constant examination and restatement of ideas; and above all, the vindication of Humanity, never

abandoned, never weakened, always rising to new heights of defence of the undefended, of chivalry for the weak. Our Master has come and he has gone, and in the priceless memory he has left with us who knew him, there is no other thing so great, as this his love of man.

মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধা, এই প্রেম—ইহার মূলে, কেবল একটা বিশাল হৃদয় নয়, একটা বিরাট সত্যোপলব্ধি ছিল; সেই সত্যও কোন শাস্ত্রবচন, ভগবদ্বাণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়: যে তত্ত্বের উপরে তাহা প্রতিষ্ঠিত মানুষের জ্ঞান তাহার উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। আমি এতক্ষণ সেই তত্ত্বেরই আলোচনা করিয়াছি; সেই 'মহামানব'-বাদই মানুষের চিন্তার ইতিহাসে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক দান। এ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থে যে একটি অতি মূল্যবান সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এই—

"Did Buddha teach that the many was real and the ego unreal, while Orthodox Hinduism regards the One as the Real, and the many as unreal ?" he was asked. "Yes," answered the Swami, "And what Ramakrishna Paramahansa and I have added to this is, that the Many and the One are the same Reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes."

—আইনষ্টাইনের Theory of Relativity-র তখনও জন্ম হয় নাই—এখানে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন-মীমাংসায়, এক বেদান্তবাদী সেই তত্ত্বের ঘোষণা করিতেছে।

৫

বিবেকানন্দের এই বাণী শুধুই নবযুগের বাংলার বাণী নয়—পৃথিবীতে যে নবযুগ আসন্ন হইয়াছে তাহারই বাণী। মানুষকে, মানুষের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা—বৈরাগ্যব্যাধিকে মানুষের মনের কোণ হইতেও দূর করিয়া, এই জগৎকেই মহাতীর্থভূমিতে পরিণত করার যে প্রয়াস ইদানীন্তনকালে নানা আকারে দেখা দিতেছে;—মানুষের শুধুই দুঃখ মোচন নয়, এই জীবনেই তাহাকে স্বমর্য্যাদা ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার যে আকুল কামনা জাগিয়াছে, আমার মনে হয়, বিবেকানন্দই তাহার প্রথম প্রফেট বা প্রবক্তা। মানুষ যে পাপী নয়—তাঁহার গুরুর এই মহাশিক্ষায় প্রবুদ্ধ হইয়া, হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ চিন্তার দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া, এবং নিজের পৌরুষ-বিশ্বাসের অসীমশক্তি তাহাতে যুক্ত করিয়া, তিনিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিত্রাণ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন; মানুষকে এমন দৃষ্টিতে পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। তাঁহার সেই মন্ত্র এক অভিনব শক্তি-মন্ত্র, মানুষকেই আত্মার অনন্ত শক্তির আধার বলিয়া বিশ্বাস করার মন্ত্র। তিনি বলিতেন, "I have never quoted anything but the Upanishads, and of the Upanishads, it is that one idea, *strength*"। এই শক্তিও মানুষের দুষ্প্রাপ্য বা সাধনলভ্য কিছু নয়; সে তাহার birthright, তাহার আদিম জন্মগত অধিকার—প্রাপ্ত-প্রাপ্তির মত। অতএব এই শক্তিলাভ কালসাপেক্ষ নয়, কোনরূপ

শিক্ষার দ্বারা তাহাকে ধীরে জাগাইতে হয় না; চাই কেবল চরিত্র-বল—দৃঢ় সংকল্প, তাহাতেই দুর্ব্বলতার বন্ধনপাশ নিমেষে ছিন্ন হইয়া যাইবে। কবি শেলীর উক্তি যদি এই হয় যে, "Man has but to will it, and there shall be no evil in the world," তবে বিবেকানন্দের উক্তি হইবে, "জগতে যত দুঃখ যত অমঙ্গলই থাক, মানুষ যদি বলবান বীর্য্যবান হয়, তবে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না"। বিবেকানন্দের নিকটে এই শক্তির চেতনাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—অশক্তির নামই অজ্ঞান; এই শক্তি হইতেই যে প্রেমের জন্ম হয় তাহাতেই মানুষের মধ্যে দেবতার দর্শন হয়। কবিদের চিত্তেও আর এক পথে যখন সেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তখন তাঁহারাও তাঁহাদের ভাষায়, সেই দিব্য-দর্শনের আভাস দেন, সেও যেন এক একটি ঋকমন্ত্রের মত—'the human face divine'; 'They seek no wonder but the human face', অথবা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'; তাহারই গভীরতর প্রেরণায় মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসীও বলিয়া উঠেন—

"Above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races."

এই শেষের কথাগুলিতে মানুষের নামেই এ যুগের 'তারকব্রহ্ম নাম' রচিত হইয়াছে। অধুনা যে নূতন মানবকল্যাণবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা যতই বিলক্ষণ বা বিসদৃশ হউক —জগদ্ব্যাপী যে অন্যায় ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান, তাহার ঘোষণা এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ করে নাই। সেই সমস্যাকেই বিবেকানন্দ সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টি অনুযায়ী তাহার সমাধান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এত গূঢ় ও ব্যাপক না হইলেও তাহাতে জড়তত্ত্বের আস্ফালন অপেক্ষা মানুষেরই মাহাত্ম্যবোধ ছিল—পূরা আধ্যাত্মিক না হইলেও তাহা অধ্যাত্মমুখী ছিল; তিনিও মানুষের মনুষ্যত্বের উৎকর্ষকেই সর্ব্ববিধ জাগতিক উন্নতির মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা অতি গভীর ও আন্তরিক ভাবনার বিষয় ছিল, বিবেকানন্দ তাহার বাস্তব মূর্ত্তিকে আরও প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, কেবল উপায়-নির্দ্দেশ নয়—প্রতিকারের জন্য একটা কর্ম্মযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তাহাই ছিল তাঁহার সকল বাণী ও সকল কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। সত্য বটে এই সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি জগৎ ও জীবনের একটা পারমার্থিক মূল্যই স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতেও তিনি তাঁহার সেই দুর্দ্ধর্ষ অধ্যাত্মবাদকে মানবহিতবাদেরই অধীন করিয়াছিলেন। দুঃখকে স্বীকার করিলেও, তাহার দ্বারা মানুষের আত্মার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র তাঁহার বিপরীত—সে মন্ত্র যেমন একান্তভাবে আত্মধর্ম্মী, এ মন্ত্র তেমনই অনাত্মধর্ম্মী। ইহাতে মানুষমাত্রের বাস্তবদশা-নিরপেক্ষ কোন মাহাত্ম্যই স্বীকার্য্য নয়, এবং ভিতরের সাম্য

অপেক্ষা বাহিরের সমানাধিকারই সর্ব্বাগ্রে গণনীয়।' দুঃখেরও কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, অর্থাৎ তাহার অনুভূতি হয় দেহে; উহাও সামাজিক কুব্যবস্থার ফলে ঘটিয়া থাকে; ঐ দুঃখ দর্শনে যে দুঃখবোধ হয় তাহাও মিথ্যা, তাহাও অসুস্থ দেহের স্বাভবিক ব্যাধি মাত্র, অথবা, প্রকারান্তরে একরূপ আত্মপূজা; এই 'আত্মা'ই সর্ব্ববিধ ভণ্ডামি ও প্রবঞ্চনার আবরণ ও আশ্রয়। অতএব এই তত্ত্ব ও ইহার প্রয়োগবিধি সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি ইহার উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, সমস্যার নিদান ও তাহার চিকিৎসা যতই বিসদৃশ হউক, এই সমস্যাই এ যুগের প্রধান সমস্যা, এবং বিবেকানন্দের জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মমন্ত্রের মূল প্রেরণা ছিল ইহাই। আজিও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক মুক্তিসাধনার যিনি কর্ম্মগুরু—তাঁহার ধর্ম্ম যেমনই হউক, কর্ম্মমন্ত্র প্রায় অক্ষরে অক্ষরে বিবেকানন্দের এই বাণীমন্ত্রের অনুবাদ; ভারতবাসীর পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া বা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব নয়, কিন্তু বাঙালীও যে তাহা ভুলিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য! অতঃপর আমি বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিব—তাহাদের ভাষা ইংরেজী, তথাপি সেই ভাষারও মূল্য আছে, কারণ সেই ভাষাতেও বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন এমন পরিস্ফুট হইয়াছে যে, বাংলা অনুবাদে তাহার কিছুই থাকিবে না। তথাপি অনুবাদের হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু উপস্থিত তাহার স্থানাভাব। বিবেকানন্দের ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সম্যক পরিচয় এইরূপ বিচ্ছিন্ন বাক্যসমষ্টিতে মিলিবে না, নতুবা, তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে সকলেই মঃ রোলাঁর সহিত একমত হইবেন; তিনি স্বামিজীর ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of Handel choruses. I cannot touch these sayings of his...without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the hero!

[প্রথমেই বিবেকানন্দের এমন এক উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহাতে তাঁহার একটি অতিশয় মৌলিক চিন্তা ব্যক্ত হইয়াছে]

Oh how calm would be the work of one who really understood the divinity of man. For such there is nothing to do save to open men's eyes. All the rest does itself.

* *

He who does not believe in himself is an athiest.

* *

One may desire to see again the India of one's books, one's studies, one's dreams. My hope is to see again the strong points of that India, reinforced by the strong points of this age, only in a natural way. The

new state of things must be a *growth* from within (এই শেষের বাক্যটি আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।)

* * *

And here is the test of truth—anything that makes you weak physically, intelectually and spiritually, reject as poison ; there is no life in it, it cannot be true.

* * *

Individuality is my motto, I have no ambition beyond training individuals.

* * *

No religion on earth preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, and no religion on earth treads upon the necks of the poor and the low in such a fashion, as Hinduism. Religion is not at fault, but it is the Pharisees and Saducees.

* * *

If your brain and your heart come into conflict, follow your heart.

* * *

Man never progresses from error to truth, but from truth to truth.

* * *

The greatest men in the world have passed away unknown. Silently they live and silently they pass away ; and in time their thoughts find expression in Buddhas and Christs.

* * *

Fools put a garland of flowers around Thy neck, O Mother, and then start back in terror and call Thee "The Merciful'. ("One realised the infinitely greater boldness and truth of the teaching that God manifests through evil *as well as* through good."—Sister Nivedita.)

* * *

The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves, That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself, and then in Cod.

* * *

Europe is on the edge of a volcano. If the fire is not extinguished by a flood of spirituality, it will erupt.

* * *

The next upheaval that is to usher in another era, will come from Russia or from China. I cannot see clearly which, but it will be either the one or the other. (ইহার অর্থ এই নয় যে, অতঃপর পৃথিবীতে, তথাকথিত কম্যুনিজম্ জয়ী হইবে—রুশ জাতি এখনও তাহার সাধনা শেষ করে নাই।)

* * *

As I grow older, I find that I look more and more for greatness in little things...Anyone will be great in a great position, even the coward will grow brave in the glare of the footlights. The true greatness

seems to me that of the worm doing its duty silently, steadily from moment to moment and hour to hour.

* * *

Everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Do even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale!

* * *

A strong and true, type is always the physical basis of the horizon. It is all very well to talk of universalism, but the world will not be ready for that for millions of years.

* * *

[সর্ব্বশেষে আমি একটি অপূর্ব্ব কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—শুধু বাণী নয়, কাব্য-হিসাবেও ইহা অনবদ্য]

Awake, arise and dream no more!
This is the land of dreams, where Karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts,
Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth! Be one with it! Let visions cease.
Or, if you cannot, dream but truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

গৃহিণীর স্বপ্ন

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গৃহিণীর জীবনে একটা অঘটন ঘটিল। আজ একুশ দিন হইল, গৃহিণী শয্যাগতা। শৈশবে একবার নাকি তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু সেসব এখন রূপকথার ন্যায় মনে হয়। চারিটি সন্তানের মা হইয়াছেন, কিন্তু কখনও অসুস্থা হন নাই। শীতই হউক আর গ্রীষ্মই হউক, ঘড়িতে চারিটা বাজিতে না বাজিতে গৃহিণী শয্যাত্যাগ করেন, প্রথমেই প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করেন। মিনিট পনরো পরে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাইয়া তরকারি কুটিতে বসেন। কবে যেন কোন্ শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছিলেন, পরিপাটিরূপে সংসারধর্ম্ম পালন করিলেই নারীজাতির দেবপূজা হইল; সেই হইতে সংসারপূজা করিয়াই তিনি দেবপূজার ত্রুটি সারিয়া লইতেছেন।

তরকারি কোটা সম্পন্ন হইলে গৃহিণী রন্ধনঘরে প্রবেশ করেন। ছেলেদের তরকারিতে পেঁয়াজ পড়িবে, কর্ত্তার তরকারিতে পেঁয়াজ পড়িবে না, মেয়েদের মাছে খুব ঝাল দিতে হইবে, ছেলেদের মাছে ঝাল পড়িবে না, ছোট ছেলের তরকারিতে বেগুন পড়িলে অনর্থ হইবে, আর ছোট মেয়ের তরকারিতে লাউ—পাচক-ঠাকুরটি পাঁচ বৎসর এ বাড়িতে কাজ করিয়াও রন্ধনের পাঠটি এখনও কণ্ঠস্থ করিয়া উঠিতে পারে নাই;

গৃহিণী চক্ষের আড়াল হইলেই সে অন্ধকার দেখে। বেলা একটার সময় কর্ত্তা এবং ছেলেদের খাওয়া হইয়া গেলে মেয়ে ও বউকে লইয়া গৃহিণী খাইতে বসেন। বড় বড় মাছগুলি সকলকে দিয়া গৃহিণীর ভাগে কিছুই থাকে না। বউ বলে, এ কি অন্যায় মা! আমাদের দিলেন এতগুলো মাছ, আর আপনার ভাগে কিছুই রইল না? গৃহিণী বলেন, মাছে বড় অরুচি ধ'রে গেছে, বুড়ো হয়েছি কিনা, ভাল লাগে না। বুড়া কিন্তু গৃহিণী হন নাই, মাথার চুল অধিকাংশই ঘন কৃষ্ণবর্ণ, নজর না দিলে পাকা চুল চোখে পড়ে না, পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা গৃহিণীর একটিও দাঁত পড়ে নাই। সারা দুপুর রোদে বসিয়া বড়ি দিতে, এ ঘরের ভারী জিনিস ও ঘরে টানিয়া লইতে, গৃহিণীর এতটুকু কষ্ট হয় না।

এ-হেন গৃহিণী আজ একুশ দিন ধরিয়া শয্যাগতা। প্রথম কয়েকদিন দেহের উত্তাপ বিপজ্জনকভাবে বাড়িতেই চোখ লাল করিয়া ত্রস্তে গৃহিণী উঠিয়া ব'সলেন, এই যা! মটরডালের বড়ির সঙ্গে মুসুরডালের বড়ি মিশিয়ে ফেললে কে? ও বউমা! ওলটা যে শুকিয়ে গেল! গম্ভীর মুখে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিল।

আজও গৃহিণী শুইয়া আছেন, গত কুড়ি দিন পর কাল রাত্রে জ্বরের তাপ স্বাভাবিক হইয়াছে, দেহের অস্বস্তি-ভাব কাটিয়াছে; চোখ বুজিয়া ললাটের উপর একটা শিথিল বাহু রাখিয়া গৃহিণী শুইয়া আছেন।

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দুই মেয়ে প্রবেশ করিল। গৃহিণী চোখ খুলিয়া সেই দিকে চাহিলেন। মেয়েরা কাছে আসিল, মায়ের কপালে করস্পর্শ করিয়া কহিল, না, জ্বর নেই, আর একটু ঘুমোলে না কেন মা? শ্রান্ত দুই চোখ টানিয়া টানিয়া গৃহিণী কহিলেন, আর কত ঘুমোব, একুশ দিন ধ'রে তো খালি ঘুমোচ্ছি। ছোট মেয়ে রমা কহিল, কি স্বপ্ন দেখছিলে মা, চমকে উঠেছিলে? রান্নাঘরের মাছ বেরালে খেয়ে গেল? না, বাঁদরে তোমার বড়ি নিয়ে উধাও হ'ল? মায়ের ঘরে কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছোট ছেলে ছুটিয়া আসিল, মাকে আবার কে জাগালে, অ্যাঁ? দুর্ব্বল বাহু দিয়া গৃহিণী ছোট ছেলের বলিষ্ঠ হাতটা ধরিলেন, আমায় তো কেউ জাগায় নি, আমি তো জেগেই ছিলাম। ছেলে কহিল, হ্যাঁ, ঠিক কথা। এইবার উঠে রান্নাঘরে ছোট, তারপর পঞ্চ ব্যাঞ্জন রেঁধে পুত্রকন্যাকে—। বাধা দিয়া রমা কহিল, হ্যাঁ মা, জান তো? ডাক্তারবাবু ব'লে গিয়েছেন, সাত দিন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না, আর চোদ্দ দিন তুমি রান্নাঘরে যেতে পাবে না। একটা রেকাবিতে কিছু ফল লইয়া বড় বধূ প্রবেশ করিল, ওষুধটা কি খেয়েছেন মা? তা হ'লে এই ফলটুকু এখুনি খেয়ে নিন। ছোট ছেলের হাত হইতে ঔষধ লইয়া গৃহিণী চক্ষু বুজিয়া খাইয়া ফেলিলেন, তাহার পর, একটা ফল মুখে দিয়া বিকৃত মুখে কহিলেন, ফল আর কত খাব, বাছা, একেবারে অরুচি ধ'রে গেছে, কুড়ি দিন ধ'রে তো এই গিলছি, মুখটা ভারী বিস্বাদ লাগছে। ছোট ছেলে চীৎকার করিয়া কহিল, উঁহু উঁহু, ওসব হচ্ছে না, দু ঘণ্টা পর পর তোমায় ফল খেতে হবে। এই বউদি, দাও তো আঙুরগুলো আমার হাতে।

ওপাশের দরজার কাছে খুট করিয়া শব্দ হইল—প্রথম একটি ছোট হাত, তাহার পর একটি ছোট্ট দেহ বাহির হইয়া আসিল। বড় ছেলের কনিষ্ঠ পুত্র নোটন। বড় চুপে চুপে নোটন আসিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, গৃহিণীর ঘরে বুঝি কেহ নাই, এখন এতগুলি লোক দেখিয়া অত্যন্ত ভীত চক্ষে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটা পিছন দিকে লুকাইল। বড়বধূ ফল রাখিয়া ত্রস্তে ছুটিয়া আসিল। ও মা! খেতে খেতে উঠে এসেছে, কি দস্যি ছেলে বাবা! ছুঁস নি, ছুঁস নি, এঁটো মুখে ঠাক্‌মাকে ছুঁস নি। নোটন কাহাকেও ছুঁইল না, কেবল ডান হাতটা আরও ভাল করিয়া লুকাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণীর কনিষ্ঠ পুত্র হবিল এইবার খাট হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে নোটনের কাছে গিয়া বলিল, ও সোনা! সোনা! বলি তোমার ও ডান হাতখানাতে কি সোনা? দৃপ্তকণ্ঠে নোটন কহিল, তোমার জন্যে নয়, কখনও তোমার জন্যে নয়, ঠাক্‌মার জন্যে। বড় বধূ কহিল, ঠাকুরপো, ওকে ধ'রে দিয়ে এস না ভজুয়ার কাছে, হাত-মুখ ধুইয়ে দেবে। নোটন এই কথা শুনিয়া তাহাকে ধরার অপেক্ষা না রাখিয়াই পিছন ফিরিয়া ছুট দিল, কিন্তু তাড়াহুড়াতে এত যত্নের জিনিস হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল, কয়েকটা চিংড়িমাছের ঠ্যাং। রমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ও মা দেখেছ? নোটন তোমার জন্যে চিংড়িমাছের ঠ্যাং এনেছিল। বড় বউ হাসিতে হাসিতে কহিল, ওঃ, তাই তো! আজ ভাত খাচ্ছে আর বলছে, মা, ঠাক্‌মা চিংড়িমাছও খেতে পাবে না; কিছুই খেতে পাবে না, খালি শুয়ে শুয়ে ওষুধ খাবে? গৃহিণীও হাসিলেন, ফলগুলি খাইতে খাইতে বলিলেন, যাও বউমা, তুমি ও পাগলাটাকে দেখগে। হাবল, রমা সবাই রয়েছে; তুমি যাও। বড়বউ চলিয়া গেলে গৃহিণী বড় মেয়েকে প্রশ্ন করিলেন, আজ চিংড়ি পেলি কি ক'রে? বড় মেয়ে কহিল, সত্যি, আশ্চর্য্য মা! আজ এত বছর এ পোড়া দেশে এসেছি, চিংড়ির মুখ কখনও দেখি নি, কাল একটা লোক নিয়ে এসেছিল, বিশ্বাস করবে না, এই প্রকাণ্ড, তিনটেতে এক সের হ'ল। আমি বলছিলুম, আহা! মা ভাল থাকলে নিজে আজ রাঁধতে বসতেন। ধীরে ধীরে গৃহিণী বলিলেন, ঠাকুর সব ঠিকমত রাঁধতে পেরেছে তো? বড় মেয়ে কহিল, বড্ড দেরিতে মাছ এল মা। রাঁধতে রাঁধতেই দাদার খাওয়ার সময় হয়ে গেল, দেরি হ'লে বাবাও রাগ করবেন; মুড়ো আর ঠাকুর ভেজে দিতে পারলে না; দাদাই খেতে পেলে না মুড়ো ভাজা, তাই আমি বললাম, কারুরই খেয়ে কাজ নেই, ভেজে রেখে দাও, ওবেলা খাওয়া হবে। সেই ছোটবেলায় মুড়ো ভাজা নিয়ে দাদা আমার সঙ্গে কি রকম ঝগড়া করত, মনে আছে মা? রান্নাঘরের দিক হইতে ডাক আসিল, বড়দিদি, ছোটদিদি, আপনারা সব খেয়ে যান। ছেলে-মেয়েরা সকলে উঠিল। ছেলে কহিল, দিদি, রান্নাঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে যেও, নইলে দুপুরে মা গিয়ে চিংড়ি রাঁধতে বসবেন। মেয়েরা হাসিতে হাসিতে খাইতে গেল। ফলগুলি সব খাওয়া হয় নাই, গৃহিণী বিরক্ত মুখে ফলের পাত্রটা এক ধারে

সরাইয়া রাখিলেন, আজ একুশ দিন ধরিয়া গৃহিণী কেবল এই খাইতেছেন, ফলের পর ঔষধ, ঔষধের পর ফল।

মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করিয়া নাকের ডগায় চশমাটি বসাইয়া, খবরের কাগজ হাতে লইয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিলেন। রোজ কর্ত্তা এই সময়টিতে আসেন, ক্ষীণকণ্ঠে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী বলেন, খাওয়া হ'ল? অতিরিক্ত আহারজনিত একটা শব্দ করিয়া কর্ত্তা বলেন, হ্যাঁ, বড় গুরুভোজন হয়ে গেছে। জ্বরতপ্ত মুখে গৃহিণী একটু তৃপ্তির হাসি হাসেন। আবার বলেন, তোমায় যেন বড় রোগা দেখাচ্ছে, স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ বড় বউমা সব দিচ্ছে তো ঠিক ঠিক? কর্ত্তা মাথা হেলাইয়া বলেন, হ্যাঁ, সব ঠিক। গৃহিণী চুপ করেন। এবার কর্ত্তা প্রশ্ন করেন, তোমার জ্বরটা কি এখন একটু কম মনে হচ্ছে? জ্বর কিন্তু এ সময়ে বাড়ে। গৃহিণী বলেন, হ্যাঁ, বেশ কম মনে হচ্ছে। কর্ত্তা বলেন, মাথার যন্ত্রণাটা? গৃহিণীর মাথায় এই সময় হাতুড়ি-পেটা চলে। বলেন, হ্যাঁ, যন্ত্রণাটা আর নেই। কর্ত্তা তৃপ্ত মুখে নাকের ডগায় চশমাটা আর একবার ঠিক করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যান।

আজও কর্ত্তা আসিলেন, গৃহিণী শুইয়া আছেন, নড়িলেন না। এই সময় গৃহিণী কখনও ঘুমান না। কর্ত্তা অবাক হইয়া গৃহিণীর কপালে হাত দিলেন,—আজ সত্যই জ্বর নাই। গৃহিণী তবুও কোন কথা বলিলেন না। কর্ত্তা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

মেয়েদের যাওয়ার পর সকলেই এক-একবার মাকে দেখিয়া গেল। মা অঘোরে ঘুমাইতেছেন। ছোট ছেলে এক ঘণ্টা কলেজ ফাঁকি দিয়া, ফল লইয়া মাকে ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়াছিল, এ-ঘর ও-ঘর করিয়া সেও চলিয়া গেল। তাহার পর রান্নাঘরে ভৃত্যদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল কিছুক্ষণ, তারপর বাসন মাজার ঠুংঠাং শব্দ, অবশেষে সব চুপ। গ্রীষ্মের শ্রান্ত মধ্যাহ্নের প্রশান্তিতে সকল কোলাহলের অবসান হইল।

গৃহিণী এতক্ষণ শুইয়া ছিলেন, ললাটের উপর দুর্ব্বল বাহু রাখিয়া ঠিক একই ভাবে শুইয়া ছিলেন। এইবার গৃহিণী উঠিলেন, খাটের বাজুর উপর বাহুতে ভর দিয়া, গৃহিণী নামিলেন। না, বেশ জোর পাইতেছেন দেহে। গৃহিণীর শুইবার ঘরের পিছনে ভাঁড়ার, তাহার পর রান্নাঘর। ভাঁড়ারঘরের দরজা এদিক হইতে খোলা ছিল, পা টিপিয়া টিপিয়া ভাঁড়ার পার হইয়া গৃহিণী রান্নাঘরের দরজা খুলিলেন। উনুন নিবানো রহিয়াছে, এক পাশে জালের বড় আলমারির ভিতর অনেক কিছু দেখা যাইতেছে। গৃহিণী আলমারি খুলিলেন, একটি বড় থালা চিংড়িমাছের মুড়া ভাজায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গৃহিণী ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে একবার এদিক চাহিলেন, ওদিক চাহিলেন, তাহার পর একটি মুড়া লইয়া, চক্ষু বুজিয়া মুখে পুরিলেন।

একুশ দিন জ্বরের পর পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা গৃহিণী আজ সারা দুপুর চিংড়িমাছের মুড়ার স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

শ্রীঅলক রায়

সপ্তর্ষি

এক

হংস-শুভ্র

ক

শ্রীযুক্ত হংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায় চিঠিখানা পেয়ে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। বিরক্ত হ'লে তিনি গম্ভীর হবার চেষ্টা করেন। বিরক্তি প্রকাশ করাটা, তাঁর মতে, হার-স্বীকার করারই নামান্তর। কার সাধ্য তাঁকে বিচলিত করতে পারে? তাঁকে, যাঁকে মহাকালের নিষ্ঠুর প্রহার পর্য্যন্ত একচুল বিচলিত করতে পারে নি, তিন-তিনজন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু যিনি গম্ভীরভাবে সহ্য করেছেন—এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে, এত বড় পরিবারের এত বিভিন্ন রকম বিপর্য্যয় যিনি অবিচলিত হয়ে সহ্য করছেন, ধৈর্য্য হারান নি ক্ষণকালের জন্য, সারা জীবনের আদর্শ চোখের সামনে ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েও যাঁকে কাবু করতে পারে নি—হঠাৎ কুন্দর মুখখানা মনে পড়ল তাঁর, গড়গড়ার ডাক বন্ধ হয়ে গেল, গম্ভীরভাবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন তিনি।

সত্যি, বেশ বড় পরিবার তাঁর—এ অঞ্চলে শুভ্র-পরিবার নামে খ্যাত। পিতামহ যোগীশ্বর মুখোপাধ্যায় শুদ্ধ শান্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন ব'লেই বোধ হয় একমাত্র পুত্রের নাম রেখেছিলেন শিব-শুভ্র। তারপর থেকেই এ বংশে সকলের নামের সঙ্গে 'শুভ্র' শব্দটি যুক্ত হয়ে আসছে, এমন কি মেয়েদের নামের সঙ্গেও আ-কার যোগ দিয়ে—কুন্দ-শুভ্রা, ইন্দু-শুভ্রা, শুক্তি-শুভ্রা, মুক্তা-শুভ্রা ইত্যাদি।

শিব-শুভ্র ভদ্রলোক ছিলেন যদিও, কিন্তু ঠিক শিব-প্রকৃতির ছিলেন না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি মৃত্যুকালে নগদ বিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁর দুই পুত্র হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক যোগীশ্বরের পুত্র কি উপায়ে এত বড় সম্পত্তি হস্তগত করলেন তার ইতিহাস এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ইংরেজ-শাসনের প্রথম আমলে যেসব কৃতী পুরুষ এ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের যোগ স্থাপনের মধ্যবর্ত্তিতা ক'রে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র, হংস এবং সোম, সে-যুগের লক্ষ্মী-সরস্বতীর সে-যুগীয় প্রভাব পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়। সাহেব মাস্টারের কাছে সাহেবী কেতায় কেবল ইংরেজী লেখাপড়াই শেখেন নি, পণ্ডিতের কাছে

শিখেছিলেন সংস্কৃত, ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন গান-বাজনা, পালোয়ানের কাছে শিখেছিলেন কুস্তি, গুরুজনদের কাছে শিখেছিলেন সহবৎ এবং সে-যুগের 'ইয়ংবেঙ্গল'দের সাহচর্য্যে শিখেছিলেন সে-যুগের রাজনীতি-চর্চ্চা। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা হংস-শুভ্রকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখনকার কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, সুরেন বাঁড়ুজ্যেরা যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রভাব হংস-শুভ্র এড়াতে পারেন নি। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর মন এসব ব্যাপারে সাড়া দিত। আই. সি. এস. সুরেন বাঁড়ুজ্যের যখন চাকরি গেল (আইনত যদিও সেটা তাঁর নিজের ক্রুটির জন্যই), তখন তা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে যে ক্ষোভ মথিত হয়ে উঠেছিল, কিশোর হংস-শুভ্রের মনেও ছাপ পড়েছিল তার। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে, যে অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের চাকরি গেল সে অপরাধ হামেশাই সকলে ক'রে থাকে, তিনি শাস্তি পেলেন স্বাধীনচেতা বাঙালী ব'লে। কিন্তু এ নিয়ে আইন-সঙ্গত আন্দোলন ক'রেও যখন কোন ফল হ'ল না, তখন হংস-শুভ্রের মনে ধারণা হয়েছিল যে, দোষটা বোধ হয় সুরেনবাবুরই বেশি, কারণ বিলেতের সাহেবরাও যখন সব শুনে এর কোন প্রতিকার করলেন না, এমন কি ব্যারিস্টারি পড়বারও অনুমতি দিলেন না তাঁকে, তখন অপরাধটা লঘু নয় নিশ্চয়ই। সাহেবদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কল্পনাই কেউ করত না তখন। পরে এই সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে এসে—(তাঁর কাছে ফ্রী চার্চ কলেজে প'ড়েই-ছিলেন তিনি)—তাঁর বাগ্মিতা-বিদ্যাবত্তা-স্বদেশপ্রাণতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তা আজও যদিও তাঁর জীবনের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে, কিন্তু একজন খাঁটি সাহেবের তুলনায় যে তিনি নিম্নতর স্তরের জীব এ বোধের জন্য লজ্জিত হন নি তিনি তখন, কারণ দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনায় দেবতাকে উচ্চতর স্থান দিতে কারও লজ্জা হয় না। সদ্য-আগত পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে সকলেই মুগ্ধ তখন। তখন রামগোপাল, রাধানাথ, রসিকমোহনরাই সকলের আদর্শ। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত লোকেরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগানে পঞ্চমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রদীপ্ত প্রতিভায় জ্বলছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উদীয়মান। রাধাকান্ত দেব, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের দল শিক্ষিত-সমাজে উপহাসেরই খোরাক যোগাতেন তখন। স্বয়ং সুরেনবাবু মনে-প্রাণে সাহেব ছিলেন, তাঁর বন্ধু রমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসুও। তখনকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সমাজের উন্মুখ মনোবৃত্তিকে রূপ দেবার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ যে

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত করেছিলেন, তাতেও যেসব বক্তৃতা হ'ত তা ইংরেজী কেতায় ইংরেজী ভাষায়। তখনকার দেশ-প্রেমের নিদর্শন ছিলেন রাণা প্রতাপ নয়, ম্যাৎসিনি। তাঁর বিপ্লববাদকে গ্রহণ করবার কল্পনাও কেউ করত না অবশ্য—তাঁর স্বদেশ-প্রেম, তাঁর আত্মত্যাগ নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন সবাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন ব'লেই তাঁরা যে প্রত্যেকে ইংরেজের দাসখৎ-লেখা গোলাম ছিলেন, ঠিক তা নয়। বস্তুত একটা জাগরণের সাড়াই জেগেছিল তখন দেশে—প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের আতপ্ত আবহাওয়ায় একটা অস্পষ্ট অধীরতাই যেন অনুভব করছিল সকলে এবং ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশও ক'রে ফেলছিল তা। সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলের উত্তেজনাটা আজও ভোলেন নি হংস-শুভ্র। মারকুইস্ অব স্যালিস্‌বেরি আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার বয়স বাইশ থেকে কমিয়ে উনিশ ক'রে দিয়েছিলেন কেবল ভারতীয়দের জন্য। তখনকার কালে প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল—রাজসরকারে অধিক-সংখ্যক চাকরি পাবার জন্যে আবেদন-নিবেদন করা। স্যালিস্‌বেরির এই ব্যবহারে দেশের লোক ক্ষেপে উঠলেন যেন। সিভিল-সার্ভিস-বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ এই সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলকে দেশ-ব্যাপী আন্দোলন ক'রে তুললেন। কংগ্রেস হবার বহুপূর্ব্বে এই আন্দোলনেই সর্ব্বপ্রথম নিখিল-ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায়। সেই সূত্রে হংস-শুভ্র প্রথমে নাম শুনেছিলেন পাঞ্জাবের দয়াল সিং মাঝিটিয়ার, পণ্ডিত রামনারায়ণের, ডাক্তার সুরযবলের, উকিল কালীপ্রসন্ন রায়ের। সেদিনকার সার্ সৈয়দ আহমদ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, রাজা আমীর হোসেন, বাবু ঐশ্বর্য্যনারায়ণ, বাবু হরিশ্চন্দ্র, রামকালী চৌধুরী, বিশ্বনারায়ণ মাণ্ডলিক, কাশীনাথ তেলাং, ফিরোজ শা মেটা, রাণাডেকে এখনও দেশের লোক মনে ক'রে রেখেছে কি না হংস-শুভ্র জানেন না, কিন্তু তখন এঁরাই ছিলেন দেশের অগ্রণী এবং এঁরা সবাই সেদিন বাঙালী সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে যে ভাবে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তা হংস-শুভ্রের অন্তরে আজও স্পন্দন তোলে। আজকালকার বাঙালী-বেহারী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মত কুৎসিত জিনিস তখনকার দিনে ছিল না—সার্ সৈয়দ আহমদ যদিও মুসলমান-সম্প্রদায়েরই মুখপাত্র ছিলেন এবং বিশেষ ক'রে মুসলমানদেরই উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতেন, তবু তিনি সিভিল সার্ভিস মেমোরিয়েলে সই করেছিলেন।

জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রতিবাদ করেছিল ভারতীয়দের প্রতি এই অবিচারের। এই সিভিল সার্ভিস আন্দোলন ভারতেই নিবদ্ধ থাকে নি কেবল। লালমোহন ঘোষ এ' নিয়ে বিলেত পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। টাকা দিয়েছিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী। বৃটিশ গভর্মেণ্ট দেশের দাবি মেনে নিয়ে উনিশ বছর কেটে যখন বাইশ বছর করলেন, তখন ইংরেজদের ন্যায়পরতার ওপর বিশ্বাস আরও অগাধ হয়ে উঠল সকলের। ভারতবর্ষের সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষিত-সমাজের প্রথম বাঙ্ময় বিদ্রোহ যে কর্ত্তৃপক্ষের ভাল লাগে নি, তার প্রমাণ মিলল অবশ্য কিছুদিন পরেই। স্যালিস্‌বেরি কিছুদিন পরেই পাঠালেন লর্ড লিটনকে, দুটি সংঘাতিক 'অ্যাক্ট' তাঁর হাতে দিয়ে—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং আর্ম্‌স অ্যাক্ট। 'সাধারণী' 'সমাজ দর্পণ' 'সোমপ্রকাশ' 'হিন্দু হিতৈষিণী' উঠে গেল। পুলিস সবার হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নিলে। হংস-শুভ্রের বাড়িতে যতগুলো বন্দুক, সড়কি, বল্লম ছিল সমস্ত বাজেয়াপ্ত হ'ল। দেশী ইংরেজী কাগজগুলোতে কড়া-মিঠে মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। হতভম্ব হয়ে পড়ল যেন সবাই। কিন্তু দেশের শিক্ষিত-সমাজের মনে ইংরেজ-ভক্তি তখনও অটুট। হংস-শুভ্রেরও মনে হ'ল যে, যে-ইংরেজ সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে প্রকাশ্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নি, তারা নিশ্চয়ই অকারণে ভারতবাসীকে এমন নিরস্ত্র ও নির্ব্বাক ক'রে রাখবে না। নিশ্চয়ই ভেতরে কোন একটা কারণ আছে, হয়তো আফগান যুদ্ধ, হয়তো দাক্ষিণাত্যের কৃষক-বিদ্রোহ বা ওই রকম একটা কিছু। ওপরে 'মুভ' করলেই যথাকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। 'মুভ' করাও হ'ল। এই সময়ে একটা বিষয়ে তাঁর খটকা লেগেছিল, দেশের জমিদার-সম্প্রদায় এ বিষয়ে কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলেন না। জমিদারদের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একেবারে চুপ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গভর্মেণ্টের পক্ষে ভোট দিয়ে এলেন। কাউন্সিলে তখন জনসাধারণের ভোট নিয়ে সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ত না, গভর্মেণ্ট যাঁকে মনোনীত করতেন তিনিই সভ্য হতেন। এ রকম সভ্য যে কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধিতা করবেন, এ আশা দুরাশা হ'লেও, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যবহারে দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। বিরোধিতা করেছিলেন রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি। হংস-শুভ্রের কাছে ওই খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি আজও পূজ্য হয়ে আছেন। তাঁর মত ইংরেজী-নবিস অথচ ভারতীয়, তাঁর মত স্পষ্টবক্তা অথচ মিষ্টভাষী, তাঁর মত বিধর্ম্মী অথচ ধর্ম্মপ্রাণ লোক আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না হংস-শুভ্রের। তখন

যদিও পলিটিক্যাল সভা রাজদ্রোহসূচক ব'লে গণ্য হ'ত না, তবু ইনি এবং রেভারেণ্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড থাকাতে সবাই যেন নির্ভয় হয়েছিল—তা ছাড়া এই দুজন গণ্যমান্য খ্রীষ্টান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ-সভায় যোগ দেওয়াতে প্রতিবাদের মূল্যও ঢের বেড়ে গিয়েছিল। টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, তার ছবিটা এখনও মনে পড়ে হংস-শুভ্রের। তিলধারণের স্থান ছিল না। তখন সবাই, এমন কি রাজকর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। সি-আই-ডি ব'লে কিছু ছিল না। সেদিনকার সভার ভিড়ে আর উত্তেজনায় হংস-শুভ্র সোনার ঘড়ি ঘড়ির-চেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চিঠি লেখা হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোনকে। চিঠি মুসাবিদা করেছিলেন সুরেন ব্যানার্জি, সংশোধন করেছিলেন কে. এম. ব্যানার্জি। স্বয়ং গ্ল্যাড্‌স্টোনকে চিঠি লিখতে পারাটাই মস্ত বড় একটা পৌরুষ ব'লে মনে হয়েছিল সেদিন এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে সমস্ত দেশে যে উত্তেজনা জেগেছিল, আজকালকার সস্তা ওপেন লেটারের ছড়াছড়ির দিনে সে উত্তেজনার মূল্য কেউ বুঝবে না। ফল ফলেছিল সে চিঠির, কিন্তু আংশিকভাবে। গ্ল্যাড্‌স্টোন তাঁর 'মিড্‌লোথিয়ান ক্যাম্পেনে' দুটো অ্যাক্টের বিরুদ্ধেই যদিও বক্তৃতা করেছিলেন, কার্য্যকালে কিন্তু দেখা গেল, প্রাইম মিনিস্টার গ্ল্যাড্‌স্টোন একটা অ্যাক্টকেই বাতিল করেছেন। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট উঠে গেল, আর্ম্‌স অ্যাক্ট উঠল না। রিপন সাহেব এই শুভবার্ত্তাটি নিয়ে এলেন। এই উপলক্ষ্যে যেসব কৃতজ্ঞতা-গদগদ সভাসমিতি হ'ল, তাতে হংস-শুভ্র খুব প্রসন্নচিত্তে যোগ দিতে পারেন নি। আর্ম্‌স অ্যাক্টটা থেকে যাওয়াতে ক্ষুন্ন হয়েছিলেন তিনি। ক্ষোভ কিন্তু বেশিদিন রইল না। লর্ড রিপনের মত বড়লাটকে বেশিদিন অগ্রাহ্য ক'রে থাকা সম্ভব ছিল না। সত্যিই তিনি ভারতের বন্ধু ছিলেন। তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়েছিল লোকাল সেল্‌ফ-গভর্মেন্ট। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গড়বার ধুম প'ড়ে গেল। সুরেনবাবু এই নিয়ে মেতে উঠলেন একেবারে। স্বায়ত্তশাসনের কিঞ্চিৎ অধিকার পেয়ে শিক্ষিত-সমাজ আকাশের চাঁদই হাতে পেলে যেন। হংস-শুভ্রকেও এই সময় একটা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানগিরি করতে হ'ল দিনকতক। প্রথম প্রথম তাঁরও মনে হয়েছিল, সত্যি সত্যি আমরা স্বাধীনতার পথে কিছুটা এগোলাম বুঝি। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। লোকাল সেল্‌ফ-গভর্মেন্টের ওপর নয়,

দেশের লোকের ওপর। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র ক'রে যে জঘন্য দলাদলি স্বার্থপরতা নীচতা শঠতা অসাধুতা কুৎসিত আকারে আত্মপ্রকাশ করল, তা আরও বেশি ক'রে তাঁর ইংরেজ-ভক্তিকে বাড়িয়ে তুলল যেন। ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা ক'রে নেটিভদের অযোগ্যতাই যেন তিনি দেখতে পেলেন প্রতি পদে। বিরক্ত হয়ে শেষে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক ত্যাগই করলেন। তাঁর ধারণা হ'ল, এমন একটা সুযোগ পেয়েও যখন দেশের লোক কিছু করতে পারলে না, তখন এদের আর কোন আশা নেই। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন ইংরেজ হবার। মাঝে মাঝে দু-একটা বদখত ইংরেজ তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিত অবশ্য। একটা নীলকর সাহেব এবং দুর্দ্দান্ত ম্যাজিস্ট্রেটের জ্বালাতেই নিজের জমিদারি বিক্রি ক'রে দিয়ে কলকাতায় চ'লে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ইংরেজ-ভক্তি কমে নি তাঁর। কারণ আদালতে মকদ্দমা ক'রে উক্ত নীলকর সাহেবের কাছে তিনি খেসারৎ আদায় করে-ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও বদলি করিয়েছিলেন। ব্রিটিশ জাস্টিসের ওপর ভক্তি অচলা ছিল তাঁর। সে ভক্তিও অবশ্য কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিল সুরেন বাঁড়ুজ্যের কোর্ট-কন্‌টেম্‌প্ট কেসে। কিন্তু সেটাকেও একটা ব্যক্তি-বিশেষের দোষ ব'লেই মনে হয়েছিল—ইংরেজ-জাতের ওপর চটবার কোন কারণ ঘটে নি। বরং এ নিয়ে আন্দোলন করলে যে ফল হবে, এও তাঁর আশা ছিল। আন্দোলন হয়েওছিল খুব। শালগ্রামশিলার ওপর যে খুব একটা ভক্তি ছিল তা নয়, কিন্তু জাস্টিস নরিস সেটাকে আদালতে নিতে বাধ্য করাতে সকলের আত্মসম্মানে যেন ঘা লেগেছিল। সুরেনবাবু তা নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী'তে যখন বেশ কড়ারকম একটা 'লিডারেট' লিখলেন, তখন সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। এই অপরাধে তাঁর দু মাস জেল হয়ে গেল। সমস্ত দেশে যেন ঝড় উঠল একটা। যেদিন তাঁর বিচার হয় আদালত-প্রাঙ্গণে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছিল সেদিন। কলেজের সমস্ত ছেলেরা গিয়েছিল, হংস-শুভ্রও ছিলেন সে ভিড়ের মধ্যে। যখন রায় বার হ'ল, তখন সে কি উদ্দাম উত্তেজনা! আদালতের জানলার একটি কাচও অক্ষত থাকে নি। শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও সাড়া জেগেছিল। সুরেনবাবুর অপমান সারা ভারতেরই অপমান ব'লে গণ্য হয়েছিল সেদিন। জাতীয়ত্ব-বোধ জাগছিল ধীরে ধীরে। জেল থেকে বেরিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আরও জাগিয়ে তুললেন সেটাকে। কিছুদিন আগে থেকে

ইলবার্ট বিল নিয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী একটা গাত্রদাহ ছিলই—এ সম্পর্কে আলাব্যার্টি হলে স্থরেনবাবুর বক্তৃতা ভোলবার নয়—এই স্থরেনবাবুর অপমানে সারা দেশ যেন জেগে উঠল। স্থরেনবাবু আর একবার ঘুরে এলেন ভারতের নানা স্থানে, ন্যাশনাল ফাণ্ডের জন্যে টাকা উঠল। জাষ্টিস নরিসের বিশেষ কিছু হ'ল না যদিও, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে দেশের লোকের আত্মসম্মান-বোধ প্রবুদ্ধ হ'ল যেন। ঠিক এর পরই বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স। সভাপতিত্ব করলেন আনন্দমোহন বসু। এ ঠিক বিদ্রোহীয় সভা নয়, উপযুক্ত পুত্র পিতার কাছে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে বৈষয়িক ব্যাপারে অধিকার দাবি করে যে ভাষায়, ভারতবাসীরাও ঠিক তেমনই ক'রে অধিকার দাবি করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের কাছে। দাবি করেছিলেন—শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাবার, স্বায়ত্তশাসনের, শিক্ষাবিস্তারের, শাসনকর্ত্তা ও বিচারকের কর্ত্তব্য পৃথক পৃথক লোকের হাতে দেওয়ার এবং অধিক-সংখ্যক ভারতবাসীকে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করবার। এর কিছুদিন পরে যা ঘটল, তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই। ইংরেজরা সত্যিই যে এই অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করতে এসেছেন, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও। কিছুদিন আগে রিপন সাহেব চ'লে গেছেন, এসেছেন লর্ড ডাফরিন। তাঁর আনুকূল্যে এবং হিউম সাহেবের প্রেরণায় বম্বেতে বসল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ডব্লিউ. সি. বনার্জি হলেন তার সভাপতি এবং ইংরেজী ভাষায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-বিষয়ে যা বললেন, তাই তখনকার দিনে কাম্য ছিল—ইংরেজ গভর্মেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ভারতকে সভ্য করা। এইই সকলে তখন চাইত এবং হবে ব'লে বিশ্বাস করত। হংস-শুভ্রেরও ধারণা ছিল, ভারতের উন্নতি-সৌধ উঠবে রাজ-ভক্তির বনিয়াদের ওপর এবং সে সৌধ অলঙ্কৃত হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে। হোয়াইট ম্যান্‌স বার্ডেনের আন্তরিকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর। তাই কংগ্রেসের প্রথম কয়েক বছর তিনিও নিষ্ঠাভরে দেশের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে এই বার্ষিক পিকনিকে যোগ দিতে যেতেন এবং রাজ-ভক্তির সঙ্গে দেশ-ভক্তি 'পাঞ্চ' ক'রে যে বক্তৃতা-সুরা প্রস্তুত হ'ত তারই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন সারাটা বছর। এ নেশাও কিন্তু ছুটে যেতে লাগল মাঝে মাঝে। লর্ড ডাফরিন যাবার সময় কংগ্রেসকে ঠাট্টাই ক'রে গেলেন, শিক্ষিত-সমাজকে ব'লে গেলেন—'মাইক্রস্কপিক মাইনরিটি'! দিনকতক পরে এক

সার্কুলারে গভর্মেণ্ট-অফিসারদের কংগ্রেসে যোগ দিতে মানা করা হ'ল। এলাহাবাদে কংগ্রেস করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল প্রায়—তাঁবু গাড়বার জায়গাই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু এঁরা ভগ্নোদ্যম হলেন না। ইংরেজদের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার ওপর আস্থা রেখে তাঁদের কনস্টিট্যুশনাল আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন মোলায়েম ভাষায় এবং এর ফলেই সম্ভবত শাসন-পরিষদে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত জনকয়েক দেশী সভ্যের স্থান হ'ল, শিক্ষারও বিস্তার হ'ল কিছু। কিন্তু কিছুদিন পরেই এলেন লর্ড কার্জন, তারপর ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট এবং তারই পিঠোপিঠি বেঙ্গল পার্টিশন। হংস-শুভ্রের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন হঠাৎ। তিনি আরও হতাশ হলেন পরবর্ত্তী নেতাদের সুর শুনে। তিলক নিজেকে 'ন্যাশনাল' ব'লে ঘোষণা করলেন এবং যে 'নেটিভ' কুপ্রথাগুলোকে এতকাল তাঁরা বিদ্রূপ ক'রে এসেছেন, সেইগুলোকে আস্ফালন ক'রেই 'ন্যাশানালিজ্‌ম' জাগাতে চাইলেন সকলের। তিনি বাল্য-বিবাহের সপক্ষে দাঁড়িয়ে কন্‌সেণ্ট-বিলের বিরোধিতা করলেন, গো-হত্যা-নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, গণেশ-পূজো নিয়ে মাতলেন, এবং ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্‌ডি, নেল্‌সন, নেপোলিয়নকে ছেড়ে শুরু করলেন শিবাজী-উৎসব। বাংলা দেশেও ধর্ম্ম-বাই জেগেছিল কিছুদিন আগে—ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিল অনেকে, পরমহংসকে নিয়ে নরেন দত্তর দল হৈ-হৈ করছিল, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনেরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করছিলেন। এসব জিনিস হাসিরই খোরাক যোগাত হংস-শুভ্রের বিলিতী মদের আড্ডায়। কিন্তু এই সব জিনিসেরই পলিটিকাল রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই সব কুসংস্কারগুলোই যেন নূতন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে অরন্ধন আর রাখীবন্ধনের হিড়িকে, কালীপূজো করবার আর 'সন্তান' হবার আগ্রহে। বঙ্গভঙ্গের জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি, সাময়িকভাবে বিদেশী জিনিস বয়কট করবার চেষ্টাও যে করেন নি তা নয়, কিন্তু বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে পিসীমা সাজতে প্রস্তুত ছিলেন না মোটেই। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যে 'আর্য্যামি' আত্মপ্রকাশ করছিল, তা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না তিনি। তখনকার স্বদেশী সভা, সে সভা ভেঙে দেবার জন্যে পুলিসের বলপ্রয়োগ, রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশী গান, পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা, সেকালের 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' 'বন্দেমাতরম্‌', ফুলার সাহেবের হুমকি, সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা তাঁর দেশ-

ভক্তিকে খুবই উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছিল, যে স্বদেশী তখন বাংলা দেশের আকাশে-বাতাসে, যে স্বদেশীতে তাঁর নিজের বন্ধুরা মেতেছেন, সে স্বদেশীকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেন নি—কিন্তু প্রথম যৌবনে যে কব্‌ডেন ডিজ্‌রেলি বার্ক শেরিডন, যে শেক্‌স্‌পিয়র মিল্টন স্কট ডিকেন্স, যে ম্যাল্‌থস মিল কাণ্ট হেগেল, যে নিউটন ডার্‌বিন ওয়াট কেলভিন্ তাঁর চিত্তকে আলোকিত করেছিল, এই নতুন ঝড়ের ঝাপটায় তাদের শিখা নিবে যাবে এ কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। মাইকেলের কাব্য পড়ার পর হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা'ও যেমন তাঁর ভাল লাগল না, দেবেন ঠাকুরের ছেলের মিহি-সুরের ছড়াও তেমনই কানে লাগল না। ঝড় এলে লোকে যেমন ঘরদোর সামলাতে ব্যস্ত হয়, তিনিও তেমনই নিজের আদর্শ বাঁচাতে ব্যস্ত হলেন। ভিক্টোরীয় সভ্যতার যে উদাত্ত গম্ভীর আদর্শে তিনি মানুষ, কোন কারণেই তা যে বর্জ্জন করা সম্ভব, এ কথা ভাবতেই পারলেন না তিনি। মুখে স্বীকার করতে না পারলেও মনে মনে সাহেবই তখনও তাঁর কাছে দেবতা ছিল। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন 'বম' পড়ল মজঃফরপুরে। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে লাগল না—মারা গেলেন দুজন নিরীহ মেমসাহেব। এর পর আর কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। কংগ্রেসের খাতায় অবশ্য নাম রইল, কিন্তু 'মডারেট' দলে। এই মডারেটরাও কিছুদিন পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেদের নতুন দল গড়লেন—গোখলের সঙ্গে তিলকের বনল না। তাতে যোগ দেবার আর উৎসাহ পান নি হংস-শুভ্র। নিজের আদর্শ নিয়ে একান্তভাবে নিজের পারিবারিক জীবনেই নিবদ্ধ হয়ে রইলেন তিনি। দেশে আন্দোলন অবশ্য চলছিলই এবং তার ফলাফলও শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। বয়সও বাড়ছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর ইংরেজ-প্রীতি অনেকটা ক'মে গেছে যেন। ইংরেজ-ভক্তির যে দুর্গে তিনি আত্মরক্ষা করছিলেন, ইংরেজরা নিজেরাই একটার পর একটা গোলা ছুঁড়ে সে দুর্গকে ভূশায়ী ক'রে ফেললেন ক্রমে। সিডিশাস মীটিং অ্যাক্ট, প্রেস অ্যাক্ট, মর্লি-মিণ্টো বিলের কৃপণতা, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই আইনটার জোরে বিনা-বিচারে দেশের লোককে আটক রাখা—প্রত্যেকটি এক-একটি গোলা। খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে তিলকের ছ বছর জেল হয়ে গেল—ম্যাণ্ডালেতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁকে। বাংলা দেশের কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনীকুমার

দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধ মল্লিক, শচীন বোস, সতীশ চাটুজ্যে, ভূপেন নাগ, অরবিন্দ ঘোষ সবাই জেলে। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' সব উঠে গেল। দেশ ছেয়ে গেল সি-আই-ডির গুপ্তচরে। কিছুদিন পরে হঠাৎ আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করলেন। তাঁর সমসাময়িক যেসব নেতারা বড় বড় স্বদেশী ছিলেন, এখন তাঁদের অধিকাংশই বড় বড় চাকরে হয়েছেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার থেকে শুরু ক'রে মাদ্রাজের যত আয়ার এবং নায়ারের দল, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, এ. চৌধুরী, এস. পি. সিন্‌হা, প্রভাস মিত্তির, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, হাসান ইমাম সকলেই গভর্মেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারী। মনে হ'ল, এই মোক্ষ-লাভের জন্যেই যেন এঁরা এতদিন আন্দোলন করছিলেন। ফিরোজ শা মেটাও 'সার্' হলেন। হলেন না কিছু কেবল গোখলে। তিনিই শুধু গোপালকৃষ্ণ গোখলে থেকে গেলেন। কিন্তু গোখলে কটা আছে? গোখলের সগোত্র যাঁরা, গভর্মেণ্টের বিরোধিতা করেছিলেন ব'লে তাঁরা সবাই জেলে। এর কিছুদিন পরে উপর্যুপরি কয়েকখানা বই তাঁর হাতে এসে পড়ল। ওয়েডার্‌বার্নের লেখা হিউমের জীবনী, ডব্লিউ. সি. বনার্জির লেখা 'ইন্‌ট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স', লায়ালের লেখা 'লর্ড ডাফ্‌রিনের জীবনচরিত'। প'ড়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন, আমাদের দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে নয়, আমাদের দেশের উদীয়মান স্বাধীনতা-স্পৃহাকে একটা ভদ্র গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখবার জন্যেই হিউম সাহেব লর্ড ডাফ্‌রিনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন। এর পর ইংরেজদের ওপরও আর ভক্তি রাখা গেল না। কিন্তু কংগ্রেসেও আর ফিরতে পারলেন না তিনি—তাঁর কাছে সমস্তই যেন বাজে হুজুক ব'লে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এরা সব সুবিধাবাদীর দল, চাকরি বা বকশিশ পেলেই সব লম্ফঝম্ফ থেমে যাবে এদেরও।

ইংরেজ এবং দেশের লোক দুয়েরই ওপর আস্থা হারিয়ে হংস-শুভ্রের অবলম্বনহীন মন যখন আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন হঠাৎ একদিন নজর পড়ল বুড়ো দরোয়ানটার ওপর। দেশের বড়লাট কে হ'ল, না হ'ল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই ওর। ও ঠিক ভোরবেলা উঠে গঙ্গাস্নান করে, তুলসী-তলায় জল ঢালে, পূজোপাঠ করে, রামায়ণ পড়ে, তিলক কাটে, ভজন গায়। বড়লাট রিপনই হোক বা মিণ্টোই হোক, ওর স্বাধীনতা হরণ করতে পারে নি কেউ। বাইরের উত্তেজনার অভাবে আমাদের মন যেমন ক্ষণে ক্ষণে নিরাশ্রয়

হয়ে পড়ে, ওর তেমন হয় না। ওর দিনচর্য্যা ঠিক আছে—কার্জনের আমলেও যেমন ছিল, হার্ডিঞ্জের আমলেও তেমনই আছে। অথচ মানুষ হিসেবে ও কারও চেয়ে ছোট নয়। হংস-শুভ্র ওকে যত বিশ্বাস করেন, নিজের ছেলে শশাঙ্ককে তত করেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, ভুল করেছি, এতদিন তিলকই ঠিক বলেছিল। হিন্দুধর্ম্মই আমাদের সনাতন আশ্রয়—ওই আমাদের 'ন্যাশনালিজ্‌ম'—বাদ বাকি "সব ঝুটা হ্যায়"। গীতা মহাভারত প'ড়ে সে মত আরও দৃঢ় হ'ল। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সনাতন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অবশেষে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। যেগুলোকে আগে কুসংস্কার ব'লে মনে হ'ত, সেইগুলোরই নূতন নূতন অর্থ যেন প্রতিভাত হতে লাগল তাঁর মানসচক্ষে। উগ্র সাহেব ছিলেন যিনি একদিন—খানসামা-বাবুর্চ্চী-ডিনার-লাঞ্চ-স্যুট-সিগারেট-সর্ব্বস্ব সাহেবই নয়, মনে-প্রাণে সাহেব, স্ত্রী কাঞ্চনমালাকে মেম মাস্টারনী রেখে মেমসাহেব করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত যিনি করেছিলেন (সফল হন নি যদিও, কাঞ্চনমালা পানের বাটা ত্যাগ করতে রাজি হলেন না কিছুতে), ছেলেদের বিলেত পাঠিয়েছিলেন, মেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলেন, কোর্টশিপ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন, বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পর্য্যন্ত ত্রুটি করেন নি, তিনি শেষ বয়সে একেবারে উলটে গেলেন। এখন পাঁজি ছাড়া এক মুহূর্ত্ত চলে না। নামাবলী গায়ে, কানে খড়কে গোঁজা, তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি অলঙ্কৃত এই লোকটির মধ্যে প্রাক্তন মিস্টার এইচ. এস. মোকার্জিকে খুঁজে বার করা সত্যিই অসম্ভব এখন।

একই শিক্ষার ফলে এবং এক রকম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে দু ভাই কিন্তু ঠিক এক রকম হন নি। সোম-শুভ্রের ওপর এই শিক্ষার ফল ফলেছিল একটু ভিন্ন রকমের। তিনি ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সে-যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের যে দুর্ভোগ, তা সবই ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। পিতা বেঁচে থাকলে হয়তো ত্যাজ্যপুত্রই করতেন, বিষয় থেকেও বঞ্চিত হতে হ'ত, কিন্তু সে লাঞ্ছনাটা সইতে হয় নি, বিষয়ের অর্দ্ধেক ভাগ ঠিকই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছিল। উগ্র সাহেব হংস-শুভ্র ব্রাহ্মদের দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না, বিশেষ ক'রে কেশব সেনের মেয়ের বিয়ের পর থেকে। তাঁর কেমন যেন ধারণা জন্মেছিল, ওরা সবাই ভণ্ড। দাড়ি রেখে চশমা প'রে বেদ-উপনিষদের মুখস্থ বুলি আওড়ায় কেবল, মনের এতটুকু প্রসারতা নেই, স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনী-শক্তি নেই,

চিবিয়ে চিবিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে চারদিক বাঁচিয়ে ওজন-করা কথা বলার প্রয়াসেই ওদের জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হয়েছে। হয়তো হংস-শুভ্রের ধারণাটা ভুল, কিন্তু সেটা তাঁর বদ্ধ ধারণা হওয়াতে কিছুতেই তিনি সোম-শুভ্রের আকস্মিক ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি। সোম-শুভ্রকে পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্নই করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের পরিবারও গ'ড়ে ওঠে নি, কারণ তিনি বিবাহই করেন নি। বিহার-অঞ্চলে খানিকটা জমি কিনে কৃষি-কর্ম্ম ক'রেই কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় সারা জীবনটাই। তাঁর এক কলেজী বন্ধু সুরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিবারের সঙ্গেই সোম-শুভ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সুরেশ্বরও ব্রাহ্ম। প্রায় বছর দশেক আগে তিনি মারা গেছেন একটিমাত্র ছেলে রেখে। ছেলেটির মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। কৃষিকর্ম্ম এবং এই পিতৃমাতৃহীন পরমানন্দই সোম-শুভ্রের মনের আশ্রয় ছিল। পরমানন্দকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন একটি মনোমত পাত্রীর সঙ্গে তার বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। পাত্রী অনামিকা তাঁর এক বন্ধুরই মেয়ে। এদের কেন্দ্র ক'রে সোম-শুভ্রের জীবন এক রকম কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের খবর তিনি নিতেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। শশাঙ্ক-শুভ্র, মৃগাঙ্ক-শুভ্র এবং কুন্দ-শুভ্রাকে তিনি কোলে করেছেন, কিন্তু বাকি কজনের—সিতাংশু-শুভ্র, হিমাংশু-শুভ্র, সুধাংশু-শুভ্র, ইন্দু-শুভ্রা—এদের সংস্পর্শ পান নি তিনি। সিতাংশুর জন্ম হবার আগেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তার পর থেকেই ছাড়াছাড়ি। দেখা হয়েছে অবশ্য বহুবার। সেদিনও শশাঙ্ক তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল। হিমাংশু যেবার ডি. এস-সি. হ'ল, সেবার সে নিজেই এসে কাকামণির সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছিল। সিতাংশু ব্যারিস্টারি পাস ক'রে কলকাতায় এসে নামল যেদিন, সেদিন তিনি নিজেই স্টেশনে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। সুধাংশুও অক্সফোর্ড থেকে বরাবর চিঠি লিখত তাঁকে। হিমাংশু, সিতাংশু কেউ নেই আজ, সব অকালে মারা গেছে। কুন্দও নেই—হয়তো সেও মরেছে, বেঁচে থাকলেও ভদ্রসমাজে তার অস্তিত্ব আর স্বীকার করা সম্ভব নয়। কুন্দর চিঠিখানা কিন্তু সোম-শুভ্রের কাছে এখনও আছে। মাঝে মাঝে চিঠিখানা এখনও খুলে দেখেন তিনি। ছোট চিঠি, দুটি ছত্র মাত্র লেখা—"কাকামণি, চললুম। আপনার বিদ্রোহ সমাজ মেনে নিয়েছে—আমার বিদ্রোহও যেদিন নেবে সেদিন ফিরে আসব, যদি বেঁচে

থাকি।” যদিও তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে নীতিবাগীশ ব'লে বিখ্যাত, তবু কুন্দর জন্যে অন্তরের নিভৃত কন্দরে তিনি বেশ একটু দুর্ব্বলতা পোষণ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়—আহা, মেয়েটার ঠিকানাটা যদি পেতাম, দেখা ক'রে আসতাম গিয়ে। তার কচি সুন্দর মুখটা মনের ওপর ভেসে ওঠে। তাকে যখন তিনি শেষবার দূর থেকে দেখেছিলেন, তখন তার বয়স বছর দুই হবে। দূর থেকেই তিনি এতকাল দাদার পরিবারের খবর নিয়েছেন এবং ভেবেছিলেন, চিরকালই তাই হয়তো নিতে হবে, কিন্তু বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন হংস-শুভ্রের এক চিঠি পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। একটু পুলকিতও যে না হলেন তা নয়, কিন্তু একটু দুঃখও হ'ল। যে সংসার থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, সে সংসার তো আর নেই। সে সংসারের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বস্তু ছিলেন যিনি, সেই বউদিদিই নেই, হঠাৎ মারা গেছেন সেদিন।··· হংস-শুভ্র রীতিমত সনাতন পদ্ধতিতে পত্র লিখেছিলেন।—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

আশীর্ব্বাদভাজন শ্রীমান্ সোম-শুভ্র মুখোপাধ্যায়
পরমকল্যাণবরেষু,

গতকল্য আমার আশী বৎসর পূর্ণ হইল। অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। তোমার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাও একটা ভুল। ইহার জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু কখনও অনুতপ্ত হই নাই। কারণ মনে একটি সান্ত্বনা ছিল, যাহা করিয়াছি তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছি। আজ কিন্তু আর সে সান্ত্বনা নাই, তাই অনুতপ্তচিত্তে ভুল সংশোধন করিতে বসিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এতকাল যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আজ তাহাই বেঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। হিন্দু কখনও পরমত-অসহিষ্ণু নয়। হিন্দুধর্ম্মে যত মত তত পথ এবং সব পথই এক লক্ষ্যাভিমুখী। হিন্দুধর্ম্মে মতের বিভিন্নতা আছে, অভিনবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা আছে—কলহ নাই। বাস্তবধর্ম্মী পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া তোমার সহিত মনোমালিন্য করিয়াছিলাম। সে মোহ কাটিয়াছে। তুমি আবার ফিরিয়া এস, আমি অনুতপ্তচিত্তে আমার নিষেধ প্রত্যাহার করিতেছি। তুমি সত্যই ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা অবশ্য তোমার বিচার্য্য। বলা বাহুল্য, আসিলে আমি অতিশয় সুখী হইব।

সংসারে কাহারও সহিত মতের মিল হয় না। ছেলেরা এবং নাতিরা যাহার যাহা খুশি করিতেছে। সৎ পরামর্শ দিলে কেহ শোনে না। নিজের মতামত আস্ফালন করিয়া অপরের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন জন্মাইবারও প্রবৃত্তি নাই। তাই আমি দমদমের বাড়িতে তারাপদকে লইয়া একাই থাকি। ইন্দুও আমার কাছে থাকে। কেন যে থাকে, বুঝি না। বার বার তাহাকে বলি, তুমি একাই যদি থাকিতে চাও, পার্ক স্ট্রীটে তোমার আলাদা একটা বাড়ি আছে, সেইখানেই যাও না, আমার কাছে কেন? সে কোন উত্তর দেয় না. যায়ও না, আমার বকুনি শুনিবার জন্য আমার কাছে পড়িয়া থাকে।

তুমি যদি এ অঞ্চলে আস, আমার সহিত দেখা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই। আমার আশীর্ব্বাদ লও। আশা করি ভাল আছ। ইতি আশীর্ব্বাদক

শ্রীহংস-শুভ্র মুখোপাধ্যায়

এ বছর দুই আগের ঘটনা।

তার পর থেকে সোম-শুভ্র মাঝে মাছে দাদার কাছে যান। গেলে দাদা মনে মনে আনন্দিতই হন নিশ্চয়ই, অন্তত সোম-শুভ্রের তাই ধারণা, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ বা প্রমাণ বড় একটা পান নি তিনি। হংস-শুভ্র তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন, তাঁর যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। ঠিক ভাইয়ের মত নয়, সম্মানিত অতিথির মত আলাপ করেন তাঁর সঙ্গে। সোম-শুভ্রের মনে হয়, ঠিক সুর যেন মিলছে না, কোথায় কিসের যেন একটা অভাব থেকে যাচ্ছে। তবু তিনি যান মাঝে মাঝে।

বাসন্তীর চিঠিখানা আর একবার প'ড়ে, হংস-শুভ্র অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন, ছেলেটাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—

পাশের ঘরেই ইন্দু ছিল। বাবার অনুচ্চ কণ্ঠস্বরও তার কর্ণ এড়ায় না, সে বেরিয়ে এল।

কিছু বলছ বাবা?

না।—একটু হাসবার চেষ্টা করলেন হংস-শুভ্র।

ডাক এল নাকি? কার চিঠি ওখানা?

তোমার বড়বউদিদির।—মুখে হাসি ফুটিয়ে গড়গড়ার নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন, এমন একটা ভাব করলেন যেন খুব কৌতুকজনক একটা সংবাদ আছে চিঠিখানাতে। স্মিত মুখে নীরবে হাঁটু দোলাতে লাগলেন। ইন্দুর বুঝতে বাকি রইল না যে, বাবা বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল। বাবা যদি বুঝতে পারেন যে, সে তাঁর মনোভাব টের পেয়েছে, তা হ'লে আরও বিরক্ত হবেন তিনি। তাই সে হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হ'ল।

আজকের কাগজখানা দেখেছ? হিন্দু মহাসভা—

না, দেখি নি।

তারপর ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বললেন, কোন দিনই দেখি না। দেশের লোক দুটো পয়সা পাবে ব'লে কিনি।

সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দুকে বলতে হ'ল, তা বটে, একটা খবরও সত্যি নয়।

কি করবে বেচারারা? পিঠের চামড়ার মায়া তো সবাই ত্যাগ করতে পারে না, মানুষের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মত শক্তও নয়, চাবকালে বেশ লাগে।

তোমার খড়মের ফিতেটা তারাপদ ঠিক ক'রে দেয় নি দেখছি এখনও।

ইন্দু একটু ঝুঁকে খড়মটা তুলে নিলে।

একটা ছোট পেরেক দিয়ে দিলেই তো হয়, আমিই দিচ্ছি, তারাপদর অবসর হবে না কোনও কালে।

খড়মটা নিয়ে ইন্দু চ'লে গেল। হংস-শুভ্র হাসলেন একটু। মেয়েটা সর্ব্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, ও অদরকারী নয়, খড়মের ফিতে থেকে আরম্ভ ক'রে বালিশের ওয়াড়ের ঝালর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিজের প্রতিপত্তিটুকু জাহির ক'রে রাখা চাই সর্ব্বক্ষণ। সহসা হংস-শুভ্রের কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়ল। সব সময়ে সুযোগ পেত না যদিও, কিন্তু সেও সর্ব্বদা নিজের আয়ত্তের মধ্যে সব জিনিস রাখতে চাইত। খাওয়া-শোওয়া আসবাব পোশাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, গামছা-খড়মের দরকার হ'লেও তার শরণাপন্ন না হ'লে পাওয়া যেত না। পুরুষদের স্বাধীনতা-হরণের এ কৌশলটা আজকালকার মেয়েদের ঠিক জানা নেই বোধ হয়। অনেক বাড়িতেই পুরুষদের আলাদা আলমারি, আলাদা ওয়াড্রোব স্ত্রী-সংস্পর্শ-বর্জ্জিত হয়ে খানসামার তদারকে থাকে। শঙ্কর যেমন।

হঠাৎ মৃগাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, বিয়ে করলেই স্ত্রী-লাভ হয় না সকলের ভাগ্যে,—কনকের মত অমন— .

এই নাও। খড়মটা ঠিক ক'রে ইন্দু নিয়ে এল। হংস-শুভ্র পায়ে দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে! খড়মটা পরতে গিয়ে চিঠিখানা কোল থেকে মেঝেতে প'ড়ে গেল। সেটা তুলে নিয়ে পাশের তেপায়াতে রাখলেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

কি লিখেছেন বউদিদি?

প'ড়ে দেখ।

ইন্দু চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।—

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আগামী রবিবারে আমাদের ছোট্ট খোকনের মুখে ভাত দেব ঠিক করেছি। রবিবার ছাড়া অন্য দিনে হওয়ার অসুবিধে। কারও ছুটি নেই। সেদিন মনে করেছি সবাইকে বলব। ছোটঠাকুরপোর বম্বে চ'লে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাকে ধ'রে রেখেছি। কাজলের বাবা দানাপুর থেকে এসে পৌঁছবেন—মানে, পৌঁছবার কথা—আগামী শুক্রবারে। কাল তাঁকে টেলিগ্রাফ করেছি, ঠিক যেন আসেন। বিয়ের পর থেকে তিনি তো আসেনই নি, হয়তো ভাবছেন, আমরা কিছু মনে করেছি, এই উপলক্ষ্যে এসে তাঁর সে ধারণাটা দূর হোক। কনককে অনেক ক'রে লিখেছিলাম আসবার জন্যে, কোন উত্তর পাই নি। মুক্তা আর শুক্তিকে বোর্ডিং থেকে আনিয়ে নেব সেদিন, সে দুদিন ওরা আমার কাছেই থাকবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি পাওয়া গেছে, শুনলাম ঠাকুরপোর কাছে। ভারী কড়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমি 'ফোন' করাতে বললেন যে, গার্জেনের চিঠি না পেলে ছুটি দিতে পারবেন না। ভাগ্যিস ঠাকুরপো এখানে ছিল। ঠাকুরপোকে কতবার বলেছি, আমাকে ওদের লোকাল গার্জ্জেন ক'রে দাও, ওদের মাসীর চেয়ে তো আমি বেশি আপনার—ঠাকুরপো মুখে প্রত্যেক বারই বলে, আচ্ছা, তাই ক'রে দেব, তোমরা ঝঞ্ঝাটে পড়বে ব'লেই করি নি। এতে ঝঞ্ঝাটটা কি বলুন তো? আর একটা কি মজা হয়েছে জানেন, কাকামণিও ঠিক সেই সময় এদিকে আসছেন। তিনি তো আমাদের পারিবারিক উৎসবে বড় একটা যোগ দেন নি কখনও, এবার আসবেন লিখেছেন। আমার বাবাকেও চিঠি লিখেছিলাম আসবার জন্যে। তিনি বুড়ো হয়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, তিনি

যে আসতে পারবেন সে আশা অবশ্য করি নি, তবু লিখতে হয়, লিখেছিলাম। টুনি লিখেছে, তিনি নাকি আসবার জন্যে ক্ষেপেছিলেন, গাড়ি রিজার্ভ করতে লোক পর্য্যন্ত পাঠিয়েছিলেন নাকি, শেষে মণি কর্নেল হাউডকে ডেকে এনে থামায় তাঁকে। তিনি আসবেন না বটে, কিন্তু কত জিনিস যে পাঠিয়েছেন নাতির ব্যাটার জন্যে, তা এলে দেখতে পাবেন। দিল্লী শহরের যত মেওয়া ছিল সব ঝুড়ি ঝুড়ি, তা ছাড়া কত রকম টফি লজেন্জ বিস্কুট, কত হরেক ধরনের শিশি বাক্স কৌটো—একটা ঘর ভ'রে গেছে একেবারে। এর ওপর পাঁচশো টাকার চেকও পাঠিয়েছেন একখানা। চেকটা ভাগ্যে ওঁর হাতে পড়ে নি, পড়লেই ফুট-কড়াই হয়ে যেত। ও আমি খরচ করব না, খোকনের নামে জমা ক'রে দেব। উপহার আরও অনেক এসে জুটেছে। ওঁর বন্ধু মেজর চণ্ডী চমৎকার একটা দোলনা কিনে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো একরাশ রেশমের খদ্দরি বিছানা এনে হাজির করেছে। বললাম, যা মুতুড়ে ছেলে হয়েছে, ওকে রেশম কেন, এক গাদা অয়েল-ক্লথ কিনে দাও বরং। মুক্তি-মুক্তা দুজনে মিলে একটা পেরাম্বুলেটার দেবে বলেছে। নবনী তো বড় একটা আসে না, সেও সেদিন সুন্দর একটা ঝারা কিনে দিয়ে গেছে। ছেলের পাওনা-ভাগ্য খুব। শঙ্খ বলছে, আমি কিচ্ছু দেব না। কেবল কান ম'লে দিচ্ছে ব্যাটার। বেশ জোরে জোরে ম'লে দেয়—সেদিন তো ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। হিমু-ঠাকুরপো ঠিক অমনই ক'রে হীরুর কান ম'লে দিত—মনে আছে আপনার? কোথায় আজ হিমু-ঠাকুরপো, কোথায় বা হীরু! ভগবান যাদের নিয়ে নিয়েছেন, তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, কিন্তু হীরু যে আমার থেকেও নেই। কবে যে জেল থেকে ছাড়া পাবে, কে জানে! দাদার ছেলে হয়েছে শুনে কি আনন্দ তার, কি চমৎকার চিঠি লিখেছে! কি নামই রেখেছিলেন ওর আপনি—হীরকের মতই উজ্জ্বল, হীরকের মতই কঠিন! আপনার দেওয়া নামের মর্য্যাদাও রেখেছে। সবই বুঝি, তবু কষ্ট হয়—মনে হয়, ও যদি কঠিন না হয়ে আর একটু কোমল হ'ত, হয়তো ওকে ধ'রে রাখতে পারতাম। রজতের ব্যাপার তো জানেন, সে এখানে থেকেও নেই, কাজল মাঝে মাঝে আসে, সে কিন্তু ঘর থেকে আর বেরোয় না। সেদিন গিয়ে অনেক ক'রে ব'লে এসেছি, যা খামখেয়ালী ছেলে আসবে কি না জানি না।

আপনি ইন্দুকে নিয়ে নিশ্চয় আসবেন। আমি আগের দিন বিকেলে

গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বিকেলে মানে দুপুরবেলাই পাঠাব, আপনি যাতে তিনটে নাগাদ এখানে এসে পৌছতে পারেন। পাশাপাশি আরও দুখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি—অনেকে আসবে তো, একটা বাড়িতে কুলোবে না। আমাদের একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলো আপনার জন্যে ঠিক ক'রে রাখছি, ওপরে আপনার কষ্ট হবে। বেশি কিছু জিনিসপত্র আনতে হবে না, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়গুলো আনবেন কেবল। পূজোর জিনিসপত্র আনবার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যে এক সেট সব কিনে রেখেছি, এমন কি শ্বেতপাথরের বাসন পর্য্যন্ত। আপনাকে আসতেই হবে, অমত করবেন না। আপনার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশনে আপনি না থাকলে চলে? ইন্দুকে আর আলাদা চিঠি লিখলাম না। আর তারাপদকেও আলাদা নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে হবে না আশা করি।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন। ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ দেবেন। ইতি—প্রণতা বাসন্তী

ক্রমশ

"বনফুল"

মাধুকরী

এক

এস সখি, চল যাই দূরে—
যেথা পাহাড়ের পথ ঘুরে
দূরান্তরে মিশে গেছে আকাশের কোলে,
তীব্র বায়ু-স্রোতে ঝাউ দোলে,
ঘন-মধুগন্ধভরা আকাশ-লতিকা
আঁকিয়াছে বনস্পতি-শিরে রাজটীকা
বহুবর্ণ অর্কিড-কুসুমে,
শৈবাল-আচ্ছন্ন দেহে ঘুমন্ত নিঝুমে
অতিকায় মহাশিলা যেথা—
চল সখি, চল যাই সেথা।

তারপর আরও দূরে ধরি মোর হাত
হে প্রেয়সি, অবহেলি সহস্র সংঘাত
ঝঞ্ঝা বৃষ্টি তুষারের বাধা না মানিয়া
ভয় ক্লান্তি কোন কিছু মনে না জানিয়া
চ'লে যাব মোরা দুইজনে
দুর্গম অরণ্যপথে গভীর গহনে
সহস্র শিখর লঙ্ঘি ;
তুমি শুধু চিরসঙ্গী ;
নব কিশলয়ে শয্যা রচিব শয়নে,
লক্ষ তারা চমকিবে তোমার নয়নে,
উষার রক্তিম আলো রাঙাইবে
মসৃণ কপোল ; ঘুম ভাঙাইবে
অজানা পাখীরা কলরবে,
হইলে প্রভাত তুমি যবে
হাসিয়া চাহিবে মোর পানে,
সলজ্জে কহিবে কানে কানে
প্রণয়ের বাণী,
হাতে ল'য়ে তব হাতখানি
চলিব আবার আরও দূরে
অনন্তের পথে ঘুরে ঘুরে।

দুই

হে সখা, নীরবে এস দখিনের বাতায়ন-পথে
যখন চন্দ্রমা যাবে পশ্চিমের বিশ্রাম-আলয়ে—
দীর্ঘ অভিসার তব অতিক্রমি নিস্তব্ধ নির্জনে—
যেথা বায়ু বাজায় কঙ্কণ তার শিরিষের শুকানো কুসুমে,
আমের মঞ্জরী ঝরে প্রণয়ের অভিষেক সম ;
সহসা-জাগ্রত পাখী কলরব করে হেথা সেথা,
পুরানো দীঘির পাড়ে তাল শোভে প্রহরীর মত,
স্তব্ধ চরাচর, সুপ্ত প্রকৃতি-মায়ের কোলে যেন।
সেই পথে এস সখা, দখিনের বাতায়ন-পথে ;

জ্বালিয়া প্রদীপ আমি বিরহের উৎকণ্ঠায় একা
তোমার চরণশব্দ না শুনিয়া শুনিব অন্তরে'।
আসিবে যখন সখা, পথক্লান্ত উত্তপ্ত নিশ্বাসে
ভাষিবে অস্পষ্ট ভাষে মোর কর্ণে প্রণয়-বারতা
শুনিবে না কেহ তাহা, জানিবে না যবে তুমি ধীরে
ভোরের আলোকরশ্মি-রঞ্জিত সে পুরাতন পথে
চ'লে যাবে আর বার শেফালি-বিকীর্ণ বনপথে ॥

তিন

তড়িৎ বহিয়া যায় অঙ্গে প্রিয়া, তুমি থাক যদি সঙ্গে,
এ কথা জেনেও সখি দূরে যদি চ'লে যাও
নিদয়ার সেরা তুমি রঙ্গে।
কি মায়া মাখানো তব হাস্য, নব নব রূপে ঢালা লাস্য,
স্তব্ধ মোহিত চোখে তোমারে হেরিয়া আমি
মেনে যে নিয়েছি চির-দাস্য।
বাক্যে তোমার মোহমন্ত্র, ও নয়ন মায়াবীর যন্ত্র,
নাগপাশে বেঁধেছ যে ওগো মায়াবিনী মোর,
সব হতে তুমি যে স্বতন্ত্র।
সাগরের ঢেউ মৃদুমন্দ, লীলায়িত চলনের ছন্দ,
হে রূপসী প্রিয়া মোর, প্রথমেই পরাজিত
তব সনে হ'লে কভু দ্বন্দ্ব।
আমি উন্মাদ তুমি শান্ত, তুমি নির্ভুল আমি ভ্রান্ত,
জীবনের সংঘাতে আহত পরাণে সখি,
তব পাশে যাই হয়ে ক্লান্ত।
দিনশেষে হয়ে আসে সন্ধ্যা, ওগো সুন্দরী মধুগন্ধা,
আজ নিশি ভোর হ'লে নবজীবনের উষা
হবে না মোদের তরে বন্ধ্যা।
আবার জাগিবে তব বক্ষে সে জীবনে সহসা অলক্ষ্যে
প্রণয় আমারই তরে স্থির দীপশিখা সম,
দেখিব সে আলো তব চক্ষে ॥

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

বঙ্গে কৌলীন্যপ্রথা

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে সাধারণ মানুষ কি চায়? চায়, পিতামাতার স্নেহচ্ছায়াশীতল সংসারে, ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবৃত হয়ে, যথাসম্ভব দুপয়সা রোজগার ক'রে, যথাসম্ভব তাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রেখে নিজেও সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে থেকে, জীবনটা কাটিয়ে দিতে। কিন্তু বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদির মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা নামে যে এক অদ্ভুত প্রথা গজিয়ে উঠেছিল, তার প্রভাবে, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে, ওই শান্তিময় স্বাভাবিক গৃহস্থজীবন একেবারে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। কুলীন ব্রাহ্মণগণ, পরিবার প্রতিপালনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে অর্থলোভে একাদিক্রমে দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, এমন কি শতাধিক বিবাহ করতে কুণ্ঠিত হতেন না, এবং সমাজও এমনই মোহগ্রস্ত হয়েছিল যে তাদের কাছে মেয়ে দেবার লোকেরও অভাব হ'ত না। এই বহুবিবাহকারীগণের স্ত্রীদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। স্বামীসুখে বঞ্চিত হয়ে, প্রায় বিধবার মত জীবনযাপন ক'রে, মাতুল বা ভাইয়ের সংসারে দাসীপনা ক'রে, দুঃখে, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায় সারাজীবন এঁরা চোখের জল ফেলে চলতেন এবং পশুর অধম জীবনযাপন ক'রে অবশেষে মরণের কোলে এঁরা শান্তিলাভ করতেন। যে আমলে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সে আমলে আরও চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। স্বামীর মৃত্যু হ'লে, সে স্বামীকে জীবনে হয়তো চেনবার সুযোগও যাদের হয় নি, আর্য্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করতে তার মৃতদেহের সঙ্গে পুড়ে মরতে তখন সেই স্ত্রীগণের ডাক পড়ত। অনেক সময় জোর ক'রে, বা আফিম খাইয়ে বিবশ ক'রে, এক কুলীন স্বামীর সঙ্গে তার বহুসংখ্যক স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হ'ত। আর সমাজ এমনই হৃদয়হীন ও বিকৃতবুদ্ধি হয়েছিল যে, এই বীভৎস ব্যাপারের ঘৃণ্য কুশ্রীতা, হীন কাপুরুষতা কারও চোখেও পড়ত না। শুনতে পাই, আমাদের শাস্ত্রে নাকি বলে, এক নারীর অভিশাপে রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে সময় সময় ভাবি, ভাবতে ভাবতে আপাদমস্তক শিউরে ওঠে যে, বাঙালী আমরা শত সহস্র নারীকে যে যুগ যুগ ধ'রে আজীবন অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করেছি, বিধাতা আমাদের কপালে না জানি কত শতাব্দব্যাপী কত দুঃখ-দুর্গতি লিখে রেখেছেন!

এই অদ্ভুত প্রথা সমাজে কি ক'রে গ'ড়ে উঠল, অতি সংক্ষেপে এবার তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। আদৌ বাংলা দেশ অনার্য্য দেশ ছিল, তীর্থযাত্রা ছাড়া এদেশে এলে নাকি আর্য্যদের জাত যেত। ক্রমশ কিন্তু আর্য্য-সভ্যতা বিস্তৃত হতে হতে আসামের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে গেল। সদিয়ারও পঞ্চাশ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত আর্য্যদের এক তীর্থস্থান হয়ে উঠল। বাংলা দেশ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল এবং মহাভারতের বর্ণনা যদি সত্য হয়, তবে ভারত-যুদ্ধের আগেই বাংলা দেশে ও আসামে আর্য্য-রাজ্যসমূহ ও আর্য্য-সভ্যতা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর্য্য-সভ্যতার ভাণ্ডারী

ব্রাহ্মণরাও যে এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন, সেই বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম লৌহিত্য। সেই প্রাচীন যুগে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কারও কারও গোত্র ছিল লৌহিত্য। লৌহিত্য গোত্রের এক ব্রাহ্মণ পালকাপ্য হস্তীবিদ্যা শাস্ত্রের রচয়িতা। ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী একখানা তাম্রশাসনে ভূমি-গ্রহীতা ব্রাহ্মণের গোত্র ছিল লৌহিত্য। এঁরা যে খাঁটি পূর্ব্বভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তা তাঁদের লৌহিত্য গোত্র দেখেই বোঝা যায়। অনেকেরই সম্ভবত জানা আছে, প্রাচীন আমলে তামার পাতের ওপর দানপত্র লিখে গোত্র-বেদ উল্লেখপূর্ব্বক রাজা ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। এই দানপত্র-সম্বলিত তামার পাতগুলিকেই তাম্রশাসন বলে। তাম্রশাসনগুলি প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। গুপ্তযুগ থেকে আরম্ভ ক'রে হিন্দু আমলের শেষ পর্য্যন্ত বহু তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। ঢাকা মিউজিয়মে এইরকম তাম্রশাসন এগারোখানা আছে। রাজশাহী মিউজিয়মে, কলকাতার বড় মিউজিয়মে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মিউজিয়মে, আশুতোষ মিউজিয়মে এবং মালদহ মিউজিয়মে আরও অনেকগুলি তাম্রশাসন সংগৃহীত আছে। এই সমস্ত তাম্রশাসন থেকে নানা গোত্রের বহু ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভূতিবর্ম্মা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক তাম্রশাসনে দেখা যায়, তিনি বহু বিভিন্ন গোত্রের তিনশতের বেশী ব্রাহ্মণকে ভূমি দান ক'রে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড পরগণায় উপনিবিষ্ট করিয়েছিলেন।

এই ভাবে বাংলা দেশে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি হয়েছিল। কিন্তু বাংলা দেশে আদিশূর নামে একজন রাজা হয়ে যখন বৈদিক যজ্ঞ করতে চাইলেন, তখন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেন, ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যাগযজ্ঞ সব ভুলে ব'সে আছে। ভারতবর্ষে মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জ সদাচারী ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ব'লে চিরপ্রসিদ্ধ। কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন আদিশূরের শ্বশুর। তিনি যজ্ঞ করার জন্যে শ্বশুরের কাছে পাঁচজন ব্রাহ্মণ চেয়ে পাঠালেন। কান্যকুব্জরাজ পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলা দেশে পাঠিয়ে দিলেন। কথিত আছে যে, এই ব্রাহ্মণেরা মল্লবেশে ঘোড়ায় চ'ড়ে জুতো পায়ে দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে রাজার দরজায় এসে হাজির হন। দ্বারী তাঁদের এই বীরবেশ দেখে রাজাকে গিয়ে জানায় এবং রাজা অশ্রদ্ধায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন না। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের আশীর্ব্বাদী ফুল জল হাতী বাঁধবার একটা গজারী-খুঁটির ওপর রেখে বাসায় ফিরে যান। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের এমনই জোর যে, দেখতে দেখতে সেই গজারী-খুঁটি পাতা ছেড়ে বেঁচে উঠল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে রাজা নূতন-আগত ব্রাহ্মণদের মহিমা বুঝতে পারলেন এবং তাঁদের সমাদরের আর সীমা রইল না। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্ব্বপুরুষ। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে এঁরা বাংলায় এসেছিলেন।

ক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ বাড়তে লাগল। কিছুদিন পরে উত্তরবঙ্গে পাল-রাজাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। আদিশূরের বংশধরেরা গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ় প্রদেশে

এসে রাজ্য স্থাপন করলেন। কতক ব্রাহ্মণ তাঁদের সঙ্গে গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ়ায় চ'লে এলেন, কতক আবার পাল-রাজাদের অধীনস্থ দেশ বরেন্দ্রীতেই রয়ে গেলেন। এই ভাবে ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। রাঢ়া দেশে ৫৬জন এসেছিলেন, আর বরেন্দ্রীতে রয়ে গিয়েছিলেন ১০০জন। এঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজার নিকট থেকে এক একখানা গ্রাম দান লাভ করেন। পরবর্ত্তী কালে এঁদের বংশধরেরা এই গ্রামের নামে খ্যাত হয়ে পদবী নিলেন অমুক গ্রামীন্। এ ভাবে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ৫৬টি গাঞী বা পদবী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ১০০টি গাঞী বা পদবীর সৃষ্টি হয়। প্রকাণ্ড গঙ্গানদীর ব্যবধানে ক্রমশ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে বিবাহাদি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এইরূপে আদৌ এক হয়েও দেশান্তরে ও রাজ্যান্তরে বাস করার দরুন ব্রাহ্মণেরা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীতে পরিণত হ'য়ে পড়েন।

প্রথমে সমস্ত ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয় ব'লে পরিচিত ছিলেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে দুই ভাগ দেখা দিলে। যাঁদের ধন মান কুল উচ্চতর, তাঁদের নাম হ'ল কুলাচল, বাকি সব শ্রোত্রিয়ই রইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে প্রাচীন শূর-বংশের মেয়ে বিয়ে ক'রে সেন-বংশের বিজয় সেন রাঢ়ায়, অর্থাৎ বাংলা দেশের ভাগীরথী-পশ্চিমস্থ অংশে প্রবল হয়ে ওঠেন। এই সেন বংশ দাক্ষিণাত্য থেকে এসে বাংলায় প্রবল হচ্ছিলেন। এই বিদেশী বংশ দেখলেন, বাংলায় ব্রাহ্মণেরা বেশ প্রবল, কিন্তু তাদের কুলে নানা দোষ প্রবেশ করেছে। পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসবার আগে বাংলা দেশে যে ব্রাহ্মণ ছিল, তারা সাতশতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ এই সাতশতীদের সঙ্গে ক্রমশ মিশে যাচ্ছিল। বিজয় সেনের ছেলে বল্লাল সেন ভারী কূটবুদ্ধি লোক ছিলেন। তিনি রাজা হয়েই বাংলা ও বিহার থেকে পাল-রাজত্বের শেষ চিহ্ন লোপ ক'রে দেন। এই ভাবে বাংলা ও বিহারে একচ্ছত্র হয়ে তিনি ব্রাহ্মণ দমনে মনোনিবেশ করলেন। রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী মিশে এক সমাজে পরিণত হ'লে তাদের জোর অনেক বেড়ে যেত। বল্লাল ব্রাহ্মণদের ডেকে বল্লেন, তোমাদের কুলে নানা দোষ প্রবেশ করছে, এস, তোমাদের কুল যাতে বিশুদ্ধ থাকে তার উপায় ক'রে দিই। ঘটকদের বইতে আছে, কুল বিচারের জন্যে রাজা একদিন এক সভা আহ্বান করলেন। সভায় কেউ এক প্রহরে, কেউ দ্বিপ্রহর-কালে, কেউ বা দিনের তৃতীয় প্রহরে উপস্থিত হ'লেন। রাজা স্থির করলেন, যিনি যত দেরি ক'রে এসেছেন, তিনিই তত সদাচারশীল ব্রাহ্মণ। কারণ ব্রাহ্মণের আচারনির্দ্দিষ্ট পূজা-অর্চ্চা করতে যে সময় লাগে, তা তো আর এক প্রহরে হবার কথা নয়, তিন প্রহর লাগাই স্বাভাবিক। কাজেই যাঁরা এক প্রহর কালে এসেছেন তাঁরা সদাচারী নন, দ্বিপ্রহরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কিছুটা সদাচারী, তিন প্রহরে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই পূর্ণ সদাচারী। ঢাকায় দেখি, নাটক-নৃত্যাদি উৎসবে নিমন্ত্রিতদের যিনি যত দেরি ক'রে আসেন, তিনিই তত এগিয়ে বসতে পারেন, কারণ এঁদের জন্যে সামনে অনেকগুলি জায়গা

খালি রাখা হয়। বল্লালী পদ্ধতিতে তেমনই ধারায় যেন কুলের বিচার হয়েছিল। তিন-প্রহরীরা হলেন কুলীন, দ্বিপ্রহরীরা হলেন গৌণকুলীন, আর একপ্রহরীরা শ্রোত্রিয়ই রয়ে গেলেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, বেশির ভাগ ব্রাহ্মণই রাজার এই অদ্ভুত ব্যবস্থা মানতে রাজি হলেন না, কিন্তু ৫৬ গাঞীর মধ্যে ২২ গাঞীকে রাজা কুলের লোভ দেখিয়ে হস্তগত ক'রে ফেললেন। তাঁদের মধ্যে ৮ গাঞী কুলীন, আর বাকি ১৪ গাঞী গৌণকুলীন হলেন। প্রতিবাদকারী ৩৪ গাঞী ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় রয়ে গেলেন। প্রতিবাদকারী অনেকে নাকি বল্লালের রাজ্য ছেড়ে উড়িষ্যা রাজ্যে মেদিনীপুর জেলায় চ'লে গেলেন। বর্ত্তমানে এঁদের বলা হয় মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এঁদের মধ্যে বল্লালের কুলবিধি চলে না।

নিজের রাজ্যমধ্যে বল্লাল কিন্তু কুলবিধি চালিয়েছিলেন, এবং তার ফলে অখণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজ ভেঙে শতধা হয়ে গিয়েছিল। বল্লাল নিয়ম করলেন, শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কন্যাদান করলে তাদের সমাজে সম্মান বৃদ্ধি হবে। গৌণকুলীনের কন্যা কুলীনে গ্রহণ করলে কুলীনের কুল নষ্ট হবে বটে, তবে গৌণকুলীনের সম্মান বৃদ্ধি হবে। এই ব্যবস্থার ফলে কুলীনের বহুবিবাহের পথ খুলে গেল, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয় সমাজের পুরুষদের জন্যে পাত্রীর অভাব ঘটতে লাগল। এদিকে কুলীনগণ গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মেয়ে বিয়ে করতে ব্যস্ত হওয়ায় কুলীনের ঘরের মেয়েরা অবিবাহিত থাকতে লাগল।

ব্রাহ্মণ-সমাজে এই ব্যবস্থার ফলে গোলযোগ বেড়েই চলল। সেন-বংশের পতন হ'লে দেশে ক্রমশ মুসলমান-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশৃঙ্খলা আরও বেড়েই গেল। এই সময় সমাজে ঘটকদের বড় প্রতাপ ছিল, কারণ তারা ছিল কুলবিধির ও বংশ-মর্য্যাদার লিপিকার বা রেকর্ড-কিপার। তাদের কথায় লোকের জাত থাকত বা যেত। ঘটক-বংশে এই সময় দেবীবর ঘটক নামে একজন প্রতাপশালী ঘটক ছিলেন। তিনি দেখলেন, কুলীন-সমাজ নানাপ্রকার দোষে দুষ্ট হয়েছে। এই দেখে দোষ যাতে আরও না ছড়ায়, সেজন্যে দোষ বিচার ক'রে কতকগুলি পরিবার নিয়ে এক-একটি মেল বা সার্কল সাব্যস্ত করলেন। এ যেন আমের দিনে আমের দোকানে দাগ ও পচার পরিমাণ দেখে আম বাছাইয়ের মত। চারি-দোষযুক্ত পরিবারগুলি শান্তিপুরের নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামের নাম অনুসারে ফুলে মেল হ'ল। এইরূপে সমান-দোষযুক্ত আরও কতকগুলি পরিবার নিয়ে খড়দহ গ্রামের নামানুসারে খড়দহ মেল হ'ল। এইভাবে বিরাট কুলীন-সমাজকে ৩৬টি মেলে ভাগ করা হ'ল। নিয়ম হ'ল, বিবাহ-ব্যাপারে নিজ মেলের বাইরে কেউ যেতে পারবে না, তা হ'লেই দোষ আর ছড়াবে না।

এই নিতান্ত ছেলেমানুষী সংস্কার-চেষ্টার বিষময় ফল দুই-এক পুরুষেই ফলতে আরম্ভ করল। কোন মেলে হয়তো পাত্র কম; কন্যা বেশি। এদিকে শ্রোত্রিয়েরা এবং গৌণ-কুলীন বা বংশজেরা অবিরাম কুলীন পাত্র সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। ফলে

কুলীনের ঘরে শ্রুত পাত্রের অভাব ঘটতে লাগল। মেলের বাইরে গিয়ে বিয়ে করবার নিয়ম না থাকাতে, বহু কুলীন কন্যা অবিবাহিতা থাকতে লাগল, অথবা এক পাত্রে শত কন্যা নামেমাত্র বিবাহিতা হতে লাগল। অবস্থা গুরুতর দেখে ঘটকেরা অবশেষে দুটি দুটি ক'রে মেল জোড় বেঁধে দিলেন ; নিয়ম হ'ল, ওই দুটি মেলে আদান-প্রদান চলতে পারবে। কিন্তু মেল-বন্ধনের বিষময় ফল এতে নিবৃত্তি হ'ল না, কুলীন-সমাজের নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হ'ল। অনেক কুলীনের বিবাহ করাই ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল, এবং অম্লান-বদনে তাঁরা আজীবন ৫০-৬০-৭০-৮০টা বিয়ে করতে লেগে গেলেন। কুলীন কন্যাগণের চোখের জলে বাংলার মাটি ভিজতে লাগল।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষার ফলে জনসাধারণের হৃদয়ের এই অসাড় পঙ্গু ভাব কেটে যেতে লাগল;—কুলীন কন্যাগণের এই ভয়ানক দুর্দ্দশার প্রতিকারের উপায় অনেক সহৃদয় ব্যক্তি চিন্তা করতে লাগলেন। এই চিন্তার প্রথম ফল রামনারায়ণ তর্করত্ন নামক একজন পণ্ডিতের প্রণীত "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক। পরবর্ত্তীকালে "নীলদর্পণ" যেমন নীলকরগণের অত্যাচার লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছিল, এই নাটকও তেমনই কুলীন কন্যাগণের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে বাঙালী জনসাধারণকে সজাগ ক'রে তুলতে লাগল। এই নাটক দেশময় অভিনীত হতে আরম্ভ হ'ল এবং এর কশাঘাতে সমাজ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। এই নাটক প্রকাশের ১৩।১৪ বছর পরে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর "বহুবিবাহ" পুস্তক প্রচার করেন। এ পুস্তকে দেশময় প্রবল আন্দোলন জেগে উঠল। ঠিক এই সময়েই মহাপ্রাণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গে তাঁর "বল্লাল সংশোধিনী" নামক পুস্তক প্রচার ক'রে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

রাসবিহারী চমৎকার গান রচনা করতে পারতেন। কুলীনের বিবাহের আসরে তিনি অনাহুত গিয়ে উপস্থিত হতেন, এবং লাঞ্ছনা অপমান স'য়েও গানে গানে আসর মাতিয়ে তুলতেন। একবার শোনা গেল, এক কুলীনপুঙ্গব বিশ বছর পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চিনতে না পেরে নিজের স্ত্রীকেই 'মা' ব'লে সম্বোধন ক'রে ফেলেছেন। অমনই রাসবিহারী গান রচনা করলেন—

বহুদিন পরে এসেছি, চিনি নাকো শ্বশুরবাড়ি,
কোন্ পথে যাইব মা গো বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যের বাড়ি ?
যারা ছিল ছেলেপেলে
তাদের হ'ল ছেলেপেলে
বিয়ে ক'রে গেছি ফেলে, হ'য়ে গেছে বছর কুড়ি।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আর তো হাসি রাখতে নারি।
ওহে, যাঁকে তুমি মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী।

রাসবিহারীর এই রকম কৌতুকবিয়ে পূর্ণ অনেক গান আছে, এর মায়ে সমাজের বিবশ বিবেক ক্রমশ সচেতন হতে লাগল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ আইনবলে নিষেধ করবার জন্যে রাজদ্বারে আবেদন পেশ করলেন, পূর্ববঙ্গে রাসবিহারীর নায়কতায় অনুরূপ আবেদন প্রেরিত হ'ল। নানা কারণে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় নি বটে, কিন্তু কৌলীন্য-প্রথার বিষদাঁত ভেঙে গেছে। মেলবন্ধন সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে, বহুবিবাহও দেশ থেকে প্রায় লুপ্ত। স্ত্রীশিক্ষার দ্রুত প্রচারে মেয়েদের মেরুদণ্ডে জোর হয়েছে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা সেই শক্তিশালী সমাজ-সংস্কারকের পথ চেয়ে ব'সে আছি, যিনি বজ্রকণ্ঠে এসে প্রচার করতে পারবেন যে, সমস্ত বল্লালী কৃত্রিম ভেদবন্ধন একান্ত মিথ্যা ও মূল্যহীন, সমস্ত ব্রাহ্মণ পদমর্য্যাদায় সমান এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র মাপকাঠি।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

জেলিমাছ ও আনুরূপ্য

একটু ভাববার চেষ্টা *

১

অদ্ভুত এক ধরনের জীব জগতে আছে, যা আঁকবার জন্যে, কলাভবনে শিক্ষালাভ করবার দরকার নেই; সে হ'ল জেলিমাছ। একটা জ্যামিতিক গোলই আঁকুন, আর সেই গোলকে বাঁকিয়ে তুবড়ে অক্টাগন বা 'অষ্টাবক্র' ক'রেই আঁকুন, তলায় লিখে দিলেই হ'ল 'জেলিমাছ'। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী কেউ নিন্দে করতে পারবেন না। হয়তো প্রথম চেষ্টায় কেউ ফল আঁকবার সাধনায় নিযুক্ত। দামী পুরু কাগজের ওপর পেন্সিলের সরু ডগা দিয়ে তাঁকে আমদানি করতে হচ্ছে আম জাম কলা লিচু, কখনও বা বেগুন। যে ফলগুলির চেহারা উত্তরে গেল, ভালই; কিন্তু যদি কোন ফলের চেহারা ভয়ানক অবাধ্যতা করে এবং এঁকে বেঁকে দুষ্টু ছেলের মত শরীর ভ্যাংচাতে থাকে, তখন তার উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে, তলায় লিখে দেওয়া—'এটা একটা জেলিমাছ'।

* ইংরেজী 'essay'র বাংলা কি? আধুনিক ঘরোয়া সুরে লেখা যে রসরচনা 'essay' নামে খ্যাত, আমাদের 'প্রবন্ধ' বা 'নিবন্ধ' তার নামকরণের পক্ষে গুরুভার। 'জল্প' বা 'জল্পিতা' নাম দিলে যদি তা পাঠকপাঠিকার হাস্যোদ্রেক করে, এবং সম্পাদক মশায় যদি সেই সংবাদ সংগ্রহ ক'রে জানান, তবে ভবিষ্যতে সেই নামই দেওয়া যাবে; কারণ, পাঠকপাঠিকার মুখে একটু হাসি ফুটলে লেখকের লাভ বই ক্ষতি নেই।—লেখক

ঠাট্টা নয়, জীবসৃষ্টি-মহাভারতের আদিপর্বেই জেলিমাছের আবির্ভাব। তখনও পৃথিবী ছিল সমুদ্র মুড়ি দিয়ে। জন্মানো এবং বাঁচা সহজ কাজ ছিল না। যদি বা সেই আকৃতিহীন একাকারের মধ্যে কোনক্রমে বিন্দু-জীবন লাভ করা যেত, সেই অনাসৃষ্টির তাড়নে একটা নির্দিষ্ট মূর্তি রক্ষা করা ছিল দুরূহ। রূপের যুগ সে নয়, সে ছিল উচ্ছ্বাসের যুগ, তীব্র ঘোলাটে অনুভূতির যুগ। কি অগঠিত আনন্দে বেদনায় ভয়ে উত্তেজনায় সেই সমুদ্র সীমা থেকে সীমা পর্যন্ত কেঁপে উঠত, টলমল ক'রে উঠত, তার ঠিকানা নেই। সেই অপ্রকৃতিস্থ সমুদ্রের গর্ভে জন্মলাভ করল যে জেলিমাছ, সে বুঝে নিয়েছিল, চেহারা নিয়ে খুঁতখুঁত করাটা তার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হবে না, বরং জলের বেগ আর চাপের খেয়ালের কাছে চেহারার দায়িত্ব সমর্পণ ক'রে দেওয়াই তার প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। হোক না চেহারাটা কখনও লম্বা কখনও বেঁটে কখনও ফুলো কখনও চ্যাপ্টা, প্রাণটা তো বাঁচবে।

এই মানিয়ে নেবার ক্ষমতাকেই নাম দিচ্ছি আত্মরূপ্য। আধুনিক চিন্তাধারায় এই আত্মরূপ্য-ক্ষমতা বা adaptability মানুষের পক্ষেও একটা খুব বড় গুণ ব'লে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। অবশ্য আত্মরূপ্যেরও স্তরবিভাগ আছে। মানুষ যখন নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে, তখন তার প্রক্রিয়াটা জেলিমাছের প্রক্রিয়ার চেয়ে নিশ্চয় স্বতন্ত্র আর উন্নত। তবু ভাবতে ব'সে মনে খটকা লাগে, সত্যিই কি আত্মরূপ্য একটা বাঞ্ছনীয় গুণ? যদি তাই হয়, কোন্ ধরনের আত্মরূপ্য? মানুষের সভ্যতার প্রধান লক্ষণ কি এই আত্মরূপ্য-চেষ্টা, না তার ঠিক বিপরীত?

সর্বদেশের মানুষদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সভ্য, সবচেয়ে শিক্ষিত, তাদের দিকে লক্ষ্য করুন। দেখবেন, তারা দাঁতে দাঁত চেপে ভীষণ-প্রতিজ্ঞায় নিজের নিজত্ব বাঁচাচ্ছে, শুধু উন্নত পশু থেকে নয়, অপর মানুষ থেকেও; সদম্ভে নিজের শরীর-মনের চেহারা বাঁচাচ্ছে, পাছে তা মিশিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। তাই দেহের কত প্রসাধন আয়না সামনে রেখে, মনের কত প্রসাধন বই সামনে রেখে। এদের এই চেহারা আর চরিত্র তৈরির চেষ্টাকে কে নিন্দে করবে? কে চায়, সমস্ত মানুষ সমস্ত স্বাতন্ত্র্য, সব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে একেবারে একরকম পিণ্ডাকার হয়ে যাক?

আবার অপর পক্ষে বলা যায়, নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দেওয়ারও একটা আনন্দ আছে। শুধু আনন্দ নয়, বাঁচতে হ'লে অনেক সময় এ ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। এ পৃথিবী অহরহ নানা ভাব, নানা রীতিনীতি, নানা ইচ্ছা, চেষ্টার আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ। এর বিরুদ্ধে সব সময় মনকে পাহাড়ের মত কঠিন, একগুঁয়ে ও উদ্ধত ক'রে রাখতে গেলে দিনের পর দিন বহু আঘাত নিতে হবে বুক পেতে। সইতে হবে অনেক ভূকম্প, অনেক ভূ-স্খলন, সযত্নে অঙ্কিত চেহারার জায়গায় জায়গায় পড়বে প্রহারচিহ্ন, গভীর গহ্বরের মত ক্ষতগুলি কেড়ে নেওয়া বস্তুটুকুকে ফিরে পাবার আশায় হাঁ ক'রে থাকবে চিরকাল।

তার চেয়ে নিজেকে নরম, তরল ক'রে দেওয়াই ভাল। ঠেলা পেলে চল, বাধা পেলে থাম; আঁকাবাঁকা পথকে দাও বঙ্কিম আলিঙ্গন, সোজা খোলা রাস্তায় নিজেকে দাও ছড়িয়ে, যদি দেখ সামনে হঠাৎ ফাঁক—লাফিয়ে পড় দুরন্ত প্রপাতে।

সত্যি, ভাবতে ভাল লাগে, যেন পুরাণের দেবতাদের মত আমাদের নব নব রূপগ্রহণের ক্ষমতা হয়েছে। শুধু দেবতা কেন, রাক্ষসরাও আমাদের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ছিল; খেত অবশ্য অসভ্যের মত, কিন্তু তাদের শরীর ছিল ইণ্ডিয়া রবারের চেয়েও স্থিতিস্থাপক। ঘটোৎকচ পড়ল কুরুকুল চেপে; আর আজকের দিনে এমন একটা প্রাণী নেই, যে, মিছামিছি যারা জগৎ-জোড়া যুদ্ধ বাধালে, তাদের চাপা দেয়। আর মনে কর, দেবতা বা রাক্ষসরা কোন অভিনয় করবে। ওই ষ্টেজের ভাড়াটা যা লাগবে, নইলে সাজপোশাক আর চেহারা-তৈরি বা মেক্‌-আপের জন্যে ভাবনা নেই। আর ফিমেল্স পার্ট—, থাক; আধুনিক নাট্য-সম্প্রদায়রা ভাববেন, বুঝি তাঁদের কটাক্ষ করা হচ্ছে।

২

আমার এই গোলমেলে ধরনের সাক্ষ্য দেবার চেষ্টা দেখে যদি ভারতীয় কোন মনীষীকে বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয় ও আমাকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয়, তবে যে কথোপকথন হবে, তা অনেকটা এইরকম—

মনীষী—ঘটোৎকচের কথা কি বলছ? ওইরকম রূপগ্রহণ ক্ষমতাকে তুমি আনুরূপ্য বল নাকি?

আমি—আজ্ঞে, ওটা আমি একটা রূপক হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি। সত্যি কি আর শরীরটা কমাতে বাড়াতে চাই, বা একবার জন্তু, একবার মানুষ, একবার জার্মান, একবার আমেরিকান হয়ে দেখতে চাইছি! সহানুভূতি ও কল্পনা দিয়ে নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা যায়, মনের দ্বারাই জগতের সব কিছুর রূপ পরিগ্রহ করা যায়, তারই কথা বলছিলুম।

মনীষী—কিন্তু তার আগে ঝরনা আর পাহাড়ের উপমা দিয়ে যে কথাটা বললে, তার সঙ্গে তো এর কোনই মিল নেই। কোন্‌টা তোমার আনুরূপ্য?

আমি—আজ্ঞে, দুটোই। ঝরনার আনুরূপ্য হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যেটা সব মানুষকেই অল্পবিস্তর করতে হয়। রোগ শোক বিপদ বিঘ্ন এমন অনেক আছে, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে ঠকতে হয়; সেখানে বুদ্ধিমানই হোক আর বোকাই হোক, বীরই হোক আর কাপুরুষই হোক, সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ যুক্তি—পরাজয়স্বীকার ও যথাসম্ভব মানিয়ে নেওয়া, স্রোতের সঙ্গে ভাসা। যেমন একটা খরস্রোতা নদী পার হতে গেলে—

মনীষী—থাক, উপমা দিয়ে বিষয়টাকে আরও ঘোরাটে ক'রে তুলো না, সোজা ভাষায় বল।

আমি—আচ্ছা। তা হ'লে দু রকমকেই আমি বলছি আনুরূপ্য। ঝরনার আনুরূপ্য না থাকলে প্রাণীর প্রাণ বাঁচে না, দেহীর দেহক্ষয় হয়, জ্ঞানীর জ্ঞান হয় অস্বাভাবিক, ভিত্তিহীন। কিন্তু দ্বিতীয় রকমের আনুরূপ্য অনেক শিক্ষা অনেক সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। প্রথম রকমের আনুরূপ্য শেখানো যায় না, ও একটা জীবতত্ত্বের আদিম নিয়ম, দ্বিতীয়টার দ্বারাই মানুষ নিজেকে বিস্তৃত করে, উন্নত করে। প্রথমটা জেলিমাছের দশা, দ্বিতীয়টা—

মনীষী। মহাপুরুষের দশা। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তুমি, এই রকম দশা—যাকে তুমি বলছ আনুরূপ্য, কিন্তু আমি যাকে বলব সারূপ্য—তাই চাও। তা হ'লে স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিচ্ছলে তার কি হবে?

আমি। আজ্ঞে, স্বাতন্ত্র্যও তো চাই।

মনীষী। (রুষ্টস্বরে) স্বাতন্ত্র্যও চাও, সারূপ্যও চাও! দানা-বাঁধা মিছরিও চাও, অথচ সেই মিছরিকে জলে-গোলা মিছরির জল হিসেবেও চাও! মতি স্থির ক'রে তারপর প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কইতে এস, বুঝলে?

আমি। (ভয়ে ভয়ে) আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?

মনীষী। তুমিও তো ভারতীয়। কিন্তু 'যোগ' কথাটার মানে কখনও ভেবে দেখেছ কি? বাইরের সঙ্গে অন্তরের যোগ, অনাত্মীয়ের সঙ্গে আত্মার যোগ। তুমি এত ঘটা ক'রে যা বলতে চাইছ, তা ভারতীয় মনীষীরা বহুকাল আগে থেকেই জেনেছেন, অভ্যাস করেছেন, এবং প্রচার করেছেন। তাঁরাই বলেছেন যে, নিজেকে বিস্তার ক'রে, স্বার্থের মধ্যে থেকে পরমার্থে বেরিয়ে এসে তবেই নিজেকে লাভ করা যায়; তাঁরাই দেখিয়েছেন, কোথায় কেমন ক'রে ওই সারূপ্য ও স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় করা যায়, কেমন ক'রে আমি 'আমি'ই থাকি, অথচ সেই আমিই আবার সোঽহম্, অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সাম্য ও সারূপ্য—

আমি। (মরিয়া হয়ে) কিন্তু ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি লোক সকলেই তো আর মনীষী নয়। তা আশা করাও উচিত নয়। তাদের সঙ্কীর্ণ জগতে তারা কেমন ক'রে বাঁচবে, সেই হ'ল প্রশ্ন। তাদের জন্যে যোগের, সারূপ্যের একটা শিশু-সুলভ সংস্করণ দরকার নয় কি? তারই নাম আমি দিচ্ছি আনুরূপ্য। ইংরেজীতে যাকে বলে—

মনীষী। ইংরেজীতে কি বলে, আমি শুনতে চাই না। দেখতে পাচ্ছি, তাদের স্বাতন্ত্র্য আর তাদের আনুরূপ্যের ধারণা ধার ক'রে তুমি চালাবার চেষ্টা করছ। [এইখানে আমার মুখটা হাসিহাসি হয়ে উঠল, মনীষী পর্যন্ত আমার 'আনুরূপ্য' কথাটা ব্যবহার করছেন; ওটা তা হ'লে চলল!] ওদের স্বাতন্ত্র্য মানে কি জান, নিজেকে

চাবি দিয়ে রাখা, অহঙ্কারের উঁচু বাঁধ তুলে দিয়ে প্রীতি, সহানুভূতির স্রোতটাকে আটকে ফেলা। [আমি (স্বগত)—এবার কিন্তু ইনি নিজেই উপমা ব্যবহার করছেন।] মনের একটা দিকে একটু ছিদ্র ওরা খুলে রেখেছে, বুদ্ধির দিক। বাদ বাকি সব দিক বন্ধ। আর ওদের আমুল্লপ্য মানে অভিনয়, ভণ্ডামি, নিজেকে ও অপরকে প্রতারণা; মোট কথা, যাতেই কাজ উদ্ধার হয়, তা সে যত নীচ উপায়েই হোক না কেন, তাই করতে না বাধা। তুমি যে আমুল্লপ্যের কথা বলতে চাইছ, সে হচ্ছে মনকে অবস্থা হিসেবে নতুন ক'রে গড়া, কিন্তু এদের আমুল্লপ্য খুবই সহজ, কেন না গড়বার কিছুই নেই, মনটাকে বাদই দিয়ে দিয়েছে। (হঠাৎ গম্ভীরভাবে) এখন যাও, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। এক মাস ধ'রে যা বললুম ভাবো, তারপর যদি আর কোনও প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

কাঠগড়া থেকে আমি নেমে যাবার পর রায় লিখলেন, "এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এর বুদ্ধি বাছুরের নতুন-ওঠা শিঙের মত; সব কিছুকেই গুঁতোতে চায়, কিন্তু জোর নেই, হাড় শক্ত হয় নি।"

৩

বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে আমরা ভারতীয়েরা এক কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীতে পরিণত হয়েছি। আমাদের কিছুটা পুরনো ধরন, কিছুটা অনুকরণ। আমরা কখনও বা জেলিমাছের মত মেরুদণ্ডহীন, নিজেকে ভেস্তে দিয়ে, গুলিয়ে দিয়ে, ঘটনার বা পরিবর্ত্তনের দৌরাত্ম্য থেকে আত্মরক্ষা করি। দেখুন এই কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণের দিকে চেয়ে; ছাইমাখা সন্ন্যাসী দেখলেই তারা ঢিপ্ ক'রে গড় করে, পরমুহূর্ত্তে যায় আবগারীর দোকানে নেশার জিনিস সঞ্চয় করতে, ঝগড়া হচ্ছে দেখলে অজান্তে মালকোঁচা বাঁধে, আবার পুলিস দেখলেই ঘরে ঢুকে খিল দেয়, সারাজীবন বাড়ির লোকের সঙ্গে অতি তুচ্ছ ব্যাপারে ইতর ঝগড়া করতে করতে যেই কেউ ম'রে যায় অমনই বুক চাপড়ে গলা-ফাটা চীৎকারে পাড়ার লোককে সারারাত জাগিয়ে রাখে।

আবার কখনও বা আমরা হতে চাই স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, ভাবতে চাই যে, আমাদের একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যার বলে আমরা সাধারণের চেয়ে উঁচু। কিন্তু চেয়ে দেখুন আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকদের দিকে। স্বাতন্ত্র্যের নামে তারা শুধু নিজের মধ্যে, নিজেকে চাবি দিয়ে রেখেছে। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা বুদ্ধির ভেতর-মহলে কতকগুলো গলিঘুঁজির পথ খুলে দেয়, বাইরে ভেতরের মানুষটিকে টেনে আনে না। আমাদের রাজনীতি, ব্যবসায়, বৃত্তি—প্রত্যেকটি দীক্ষা দেয় এক এক রকমের অস্ত্রসাধনার। অপর মানুষকে হঠিয়ে হারিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার এই

সাধনা ; এই সাধনার ইংরেজী নাম struggle for existence, এর মন্ত্র হ'ল—survival of the fittest. অবাক হয়ে ভাবি, এই আদর্শই যখন মানুষ মেনে নিচ্ছে, তখন সেইটে স্পষ্ট ক'রে বলতে ভয় পাচ্ছে কেন, কেন স্কুলে কলেজে 'রেষারেষি' শিল্প-হিসাবে শেখানো হচ্ছে না (ভোটের সময় তা হ'লে কত সুবিধে হয়!), কেন নবযুগের দ্রোণাচার্য্য কুমারদের শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে মারণ, উচাটন, প্রবঞ্চন প্রভৃতি সূক্ষ্ম মানস-অস্ত্র শিক্ষা দেবার ভার নিচ্ছেন না!

আমাদের শিক্ষিতদের ভয়, কখন তাদের মান নষ্ট হয়, কিংবা, কে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়! কাজেই গাম্ভীর্য্যের উচ্চ চূড়ায় তারা আসীন। সেই তাদের স্বাতন্ত্র্য। আবার তাদের মধ্যে যারা 'হৃদয়' নামক বালাইটিকে বাদ দিতে শিখেছে, যারা অবলীলাক্রমে যখন তখন উচ্চ হাসে, অপরিচিত লোকের পিঠে হঠাৎ বন্ধুত্বের থাপ্পড় মারে, চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না, মেসে হোক, ট্রেনে হোক, পরের জিনিসকে আপনার ব'লে ভেবে নিতে শেখে, জোর ক'রে নেমন্তন্ন নেয়, অনিচ্ছুক গৃহস্থের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এবং অবশেষে তাকে একটি ইন্সিওরেন্সের পলিসি গছায়, তারা হ'ল আমাদের দেশের আত্মরূপ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা অনেক সময়ে সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় না দেখতে পেয়ে অবশেষে হতভাগ্য বেকার যুবকদেরই দোষী করতে আরম্ভ করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো খুব উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান, কেউ কেউ হয়তো চাকরি দেওয়ার মালিকদের চেয়েও সর্ব্বাংশে অনেক বেশি গুণশালী, কিন্তু তবু তাদের গঞ্জনা শুনতে হয়—তোমাদের adaptability নেই। যাঁরা এই উপদেশ দেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান, বৃত্তিমধুচক্রের এক-একটা বড় খোপ তাঁরা অধিকার ক'রে ব'সে আছেন। এই adaptability বলতে তাঁরা কি বোঝেন, তা তাঁদের নিজেদের কাছেই স্পষ্ট নয়। কিসের সঙ্গে কি মানিয়ে নিতে হবে? হয়তো কেউ উত্তর দেবেন, কেন, ঘটনার সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে। কিন্তু সেই মানানোটা আসলে কি? ঠিক কি করতে হবে?

উপদেষ্টারা এর উত্তর দিতে পারবেন না, বা দিতে লজ্জাবোধ করবেন। কিন্তু তাঁদের মনের ভাবটা এই, তুমি কি করবে তার আমি কি জানি? মানুষের কর্ত্তব্য সফল হওয়া, তা সে যে উপায়েই হোক। সফল না হতে পারলেই বলব, তার আত্মরূপ্য নেই।

সাফল্যের এই যে একটি সেরা উপায় আছে, এরই নাম ছলে বলে কৌশলে। এই উপায় আত্মরূপ্য নয়, আত্মরূপ্যের ব্যঙ্গানুকৃতি। এর জন্যে কোন গুণের দরকার নেই, কোন শিক্ষার দরকার নেই, শুধু দরকার নিজেকে কমিয়ে খাটো ক'রে আনা। সত্যিকার কৃতিত্বের তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে গুণী; কিন্তু সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার

আরও অনেক ছিদ্রপথ আছে, যেমন ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে গ্যালারির তলা দিয়েও লোক ঢোকে। সেই ছিদ্রপথে পুরো মানুষটা গলে না, যদি না কিছু মনুষ্যত্ব বার ক'রে তাকে চুপসে নেওয়া হয়। এইভাবে অনেক মানুষ, অনেক জাতি চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে ওঠে; তাদের প্রধান গৌরব যে, তাদের আর কোথাও বাধছে না, না বিবেকে, না হৃদয়ে; তার ফলে মুখচোরাদের, দুর্বলদের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে ক্রমেই স্ফীত হয়ে ওঠে তাদের সাফল্য; তখন তাদের ধর্ম রাজনীতির দাসত্ব করে, তাদের বিজ্ঞান যুদ্ধের মজুরি খাটে, আর তাদের সাহিত্য অবলম্বন করে গণিকাবৃত্তি।

পৃথিবীর মানচিত্র আজ আর স্থির থাকতে চাইছে না, চলচ্চিত্র হয়ে উঠছে। সকল জাতিদের দুর্ব্বলতর ধরা প'ড়ে গিয়েছে। এমন কি সবচেয়ে সুবিধাবাদী জাতিরাও আজ টের পেয়েছে, জাতীয় চরিত্র গঠন না করলে আর টিকে থাকা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন্ আদর্শের অনুরূপ ক'রে গড়া হবে জাতীয় চরিত্র? যুদ্ধের আদর্শ, না শান্তির আদর্শ? সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানের আদর্শ, না ধ্বংসশীল? বন্ধুত্বের আদর্শ, না জাত্যভিমানের? পরস্পরকে বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত ক'রে বড় হবার আদর্শ, না পরস্পরকে সাহায্য ও সেবা ক'রে সমান সুখী হবার আদর্শ?

ভারতবর্ষকে আজ এই সঙ্কল্প করতে হবে—

বিদেশীর শক্তি, রুচি, শিক্ষার কাছে আর আমরা কাদার পিণ্ডের মত হয়ে থাকব না। আমাদের জাতীয় চরিত্র আমাদের নিজেদের গঠন করতে হবে।

তাই ব'লে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে, ঘটনার স্রোত থেকে পালিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যের কারাগারে নিজেকে বন্দী ক'রে রাখব না।

ব্যক্তিগত জীবনেই হোক আর জাতীয় জীবনেই হোক, নূতনের জন্যে দোর খোলা রাখব। কিন্তু রীতিমত পরীক্ষা না ক'রে কোন নূতনকেই শুধু নতুন ব'লেই ঘরে স্থান দেব না।

বাঞ্ছিত নতুনের সঙ্গে যে আনুরূপ্য, সে শুধু পুরনো চরিত্রের ওপর জোড়াতালি দিয়ে মেরামতের কাজ নয়, সে হ'ল নতুন ব্যক্তিত্বের মধ্যে পুনর্জন্ম। অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ, অনেক ভাবনা, অনেক বিরোধের মধ্যে দিয়ে সেই পুনর্জন্মে পৌঁছতে হয়; তবু আমরা আলস্য করব না, দ্বিধা করব না, দৃঢ়পদে এগিয়ে যাব আমাদের পরিণতির দিকে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

সংবাদ-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কড়ি ও কোমলে'র "তনু" কবিতাটির শেষ পংক্তি "ত্রয়োদশ বসন্তের একগাছি মালা"র ত্রয়োদশকে যথাক্রমে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ করিয়া যে ভাবে যুগের সহিত তাল রাখিতে চাহিয়াছিলেন, প্রতি বর্ষের শেষে নিরুপায় আমরাও ঠিক তাহাই করিয়া চলিয়াছি। গত বৎসর পঞ্চদশী ষোড়শী হইয়াছিল, এবারে ষোড়শী 'শনিবারের চিঠি' সপ্তদশী হইল। এই ক্রমিক আঙ্কিক পরিবর্তন ছাড়া প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সাধ আমাদের থাকিলেও নানা কারণে তাহা সাধ্য নয়। যুদ্ধের ওজুহাতে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদের মত পরাধীনতার ওজুহাতে আমাদের সমাজে শিল্পে সাহিত্যে ও শিক্ষায় মারাত্মক গতানুগতিকতা ও নিষ্ক্রিয়তা অচল অটল আসন লইয়া আছে। মারাত্মক বলিলাম এই কারণে যে, এখন পর্যন্ত আমাদের প্রভুদের দৃষ্টান্ত ও আদর্শ মারিয়াই এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের কারবার চলিতেছে। নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছার বলে আমাদের কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। আমরা কি লিখিব, কি বলিব—কতখানি লিখিব, কতখানি বলিব, প্রভুরাই তাহা নির্ধারণ করিয়া দিতেছেন। যে দৈনিক সংবাদপত্র দেশের জনমত গঠন করে, তাহাদের পূর্বাপর ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। ঝড়ের মুখে কুটার মত লোভ বা ভয়ের মুখে ইহাদের ধর্ম ও জাতীয়তা মুহুর্মুহু শূন্যে বিলীন হইতেছে; যে অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধকল্পে ইহাদের জন্ম, শক্তিমানদের চক্রান্তে ইহারা তাহারই সমর্থক হইয়া দাঁড়াইয়া দেশের দুর্দশা-বৃদ্ধির কারণ হইতেছে। ফলে ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনা জড়তাগ্রস্ত হইয়া আমাদের সকলকেই প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে আমাদের স্বাধীনতা-অপহারী রাজশক্তিরই সহায়ক করিয়া তুলিতেছে। দেশের মসীজীবীরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে আমাদের মূল লক্ষ্যটাই দূরে চলিয়া যাইতেছে, নানা অনাবশ্যক আনুষঙ্গিক ব্যাপার লইয়া আমরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া কৌশলী কর্তাদের আত্মপ্রসাদের কারণ ঘটাইতেছি।

* * *

সপ্তদশ বর্ষের প্রাক্কালে এই অস্বস্তিকর চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলাম, হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, কর্মীর অভাবে ছাপাখানা অচল হইতে বসিয়াছে। কলিকাতার বেলেঘাটা-নারিকেলডাঙা প্রভৃতি যে অঞ্চলে আমাদের যন্ত্রচালকদের বাস, কঠিন ম্যালেরিয়া-রোগে সে অঞ্চল বিধ্বস্ত হইতেছে, বহু বাড়িতে মুখে জল দিবার উপযুক্ত কোনও সুস্থ লোক নাই। উত্তর-বিহারে কলেরা এবং সারা বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার নিদারুণ প্রকোপের সংবাদ আমাদের কাছে সংবাদপত্রগত তথ্য মাত্র ছিল, সহসা অনুভব হইল, তাহা ভয়াবহ সত্যের আকার লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। রাষ্ট্রিক যে অব্যবস্থার ফলে গত বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া বাংলা দেশকে শ্মশান করিয়া গিয়াছে, এ বৎসর তাহার জের মহামারীর মধ্য দিয়া সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, অনাহার ও অর্ধাহারজনিত দৈহিক দুর্বলতা

মহামারীতে পরিবর্তিত হইয়া বাঙালী জাতটাকে মুমূর্ষু ও পঙ্গু করিয়া ছাড়িতেছে। মাঠে ধান কাটিবার, নদীতে মাছ ধরিবার লোক নাই—অন্যান্য যে সকল জাতি বা সম্প্রদায় সমাজকে নানাভাবে সেবা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে, ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সংখ্যা তো হ্রাস হইয়া আসিয়াছেই। ব্যাপকভাবে প্রতিষেধক বণ্টন করিয়া একমাত্র গবর্মেণ্টই এই ক্ষয় নিবারণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাহা না করিয়া অতিরিক্ত লাভের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে অন্যত্র নিয়োগ করিয়া সমাজে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরও কঠিন এবং অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন। এরূপ অবস্থার সহিত আমরা আমাদের উপকরণ ও শক্তি লইয়া যথাযথ লড়িতে পারিতেছি না বলিয়া 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। পূজাবকাশের পর বিলম্বিত প্রীতিসম্ভাষণ আমাদের অক্ষমতাবশতই কটু হইবার উপক্রম হইয়াছে—আমরা করজোড়ে মার্জনা চাহিতেছি।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর বাংলা দেশে যে তুমুল আলোড়ন হইয়াছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইংরেজের সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত হইবার যে আগ্রহ সর্বত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে স্থায়ী সুফল ফলিয়াছিল এই কারণে যে, বাংলা দেশের চিন্তাশীল স্রষ্টা সাহিত্যিক ও কবি-সমাজের চিত্তও পরাধীনতার বেদনায় গ্লানিবোধ করিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই নিগূঢ় ও নিবিড় বেদনাকে তাঁহারা রূপ দিয়াছিলেন তাঁহাদের কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে। তখনকার কর্মীরা আশ্বস্ত ও ভরসাগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিরলস কর্মের পশ্চাতে দেশের শ্রেষ্ঠ ভাব ও চিন্তার সমর্থন ছিল জানিয়া। সে যুগের ভাবুক এবং কর্মী উভয় সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই কয়েকটা সাময়িক বিপ্লবাত্মক উচ্ছ্বাসেই বাঙালীর নবজাগরণ পর্যবসিত হয় নাই। ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে স্থাপত্যে-শিল্পে মিলে-কলে সর্বত্রই সেই আন্দোলন একটা স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে। শুধু সাহিত্যিকদের সমর্থন ছিল বলিয়াই সেদিনের বিপ্লব কেবলমাত্র সমতলস্পর্শীই হয় নাই, সমগ্র জাতির জীবনের গহনগভীরেও তাহা শিকড় বিস্তার করিয়াছিল।

"আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ সমাগতপ্রায়। মাঝখানে বৃহত্তর পটভূমিকায় যে কয়েকটি বৃহত্তর আন্দোলন হইয়া গেল, তাহাতে বাঙালীর চিত্ত বিত্ত ও রক্তপাত পরিমাণে কিছু কম হয় নাই, বাঙালী কর্মী ও যুবকদের সর্ববিধ ত্যাগস্বীকার ও কৃচ্ছ্রসাধন সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়াছে, অথচ নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, সমগ্র বাঙালী-জাতির জীবনচেতনায় এই সকল আন্দোলন সার্থক আলোড়নের সৃষ্টি করে নাই। অনুসন্ধান করিলে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই লক্ষিত হইবে যে, কবি সাহিত্যিক ও শিল্পী-সম্প্রদায় তাঁহাদের সৃষ্টি ও রচনায়

মাঝখানের এই ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনাকে মহিমান্বিত করেন নাই। যে কারণেই হউক, তাঁহারা সন্দেহ করিয়াছেন, দূরে দূরে থাকিয়াছেন, পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন অথবা সহানুভূতির অভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। সত্য বটে, তাঁহাদের মন সেদিনও পর্যন্ত ১৯০৫ সালের বিপ্লব-যজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে, অতীতকে বড় করিয়া দেখিয়া বর্তমানের সত্যকার মহিমাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ শুধু তাঁহাদের অতীত-প্রীতিই নয়, নূতন যজ্ঞের হোতারাও সমগ্র ভারতের পটভূমিকার সুবৃহৎ গৌরবে তাঁহাদিগকে আত্মীয়তায় উদ্বুদ্ধ না করিয়া অনাদরে তুচ্ছ করিয়াছেন। তাই এ যুগের কবিরাও কাব্যে অসহযোগ আন্দোলনের মহিমাকীর্তন না করিয়া সেই পুরাতন বিপ্লবীদেরই বন্দনা গাহিয়াছেন—

যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি বিক্ষুব্ধ ধূলায়,
উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায় জননীর করিল তর্পণ—
মানবের মহালোভ, বাঁচিবার লোভ যারা ত্যজিল হেলায়,
নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জ্জন ;
স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহুলক্ষ ভাষাহীন আশাহীন জনে,
ঘর ছাড়ি পথে পথে নিরাশ্বাস নিরুদ্বেগে ফিরি দীর্ঘ দিন
কলঙ্ক বরিল কেহ, কেহ মৃত্যু—মহোল্লাসে প্রেম-আলিঙ্গনে ;
জীবনের সর্ব আশা স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে করিল বিলীন ;
ক্লেদ-পঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোক-বার্তাবহ,
তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার,
ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদেরে স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ,
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার !

তাদের বুদ্ধিরে ল'য়ে শুনিয়াছি পণ্ডিতেরা করে আলোচনা,
কেহ কহে মূর্খ তারা, দম্ভসার, চলেছিল ভুল পথ ধরি,
জীবনের রাজপথে চলিতে অক্ষম তারা, কৈল আনাগোনা-
অলক্ষ্য অরণ্যপথে অন্ধকারে ত্রস্তপদে দিবা-বিভাবরী—
মানব-কল্যাণ লাগি গূঢ়গুহাশায়ী হয়ে অলক্ষিত লোকে
অমৃত-সন্ধানী তারা চিরমৃত্যু-আশঙ্কায় যাপিল জীবন—
মানি না তাদের কথা, আমি জানি অনির্বাণ প্রাণের আলোকে
উদ্ভাসিত ভাল যার, মৃত্যুভীত কাপুরুষ নহে সেই জন।
লক্ষ লক্ষ অক্ষমের অপমানে আপনার অপমান মানি
সুকঠোর দৃঢ় হস্তে যে খুঁজিল প্রতিদিন তার প্রতীকার—

কাপুরুষ-অপবাদ নহে তার, ক্ষুদ্র নহে, ইহা সত্য জানি,
নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার!

হয়তো করেছে ভুল, হয়তো বা অকস্মাৎ বিনা প্রয়োজনে
করেছে মৃত্যুর পূজা, সুনির্মম, চাহে নাই প্রিয়জন পানে—
জননীর আঁখিজল শুকাইল ঝরি ঝরি বিনিদ্র নয়নে,
প্রিয়ার পাণ্ডুর ওষ্ঠ আজো কাঁপে রহি রহি রূঢ় প্রত্যাখ্যানে।
সুকোমল গৃহশয্যা ডাক দিল আজো তবু রয়েছে অম্লান,
মহামৃত্যু-সাধনায় মিটিয়াছে সন্ন্যাসীর অতৃপ্ত পিয়াস,
স্তব্ধ হ'ল আঁখিতারা, যা খুঁজেছে বুঝি তার মিলেছে সন্ধান;
মহাকাল ঊর্ধ্বে থাকি নেয় বলি, তবু যেন করে উপহাস।
আমরা কাঁপিয়া উঠি অকস্মাৎ বিলম্বিত আরাম-শয্যায়,
আকাশে খসিল তারা, লাভ-ক্ষতি কে গনিবে ধূলির ধরায়?
তাদেরে দিও না গালি, হে শঙ্কিত, ঢাকিবারে আপন লজ্জায়,
মৃত্যু বরিয়াছে যারা মৃত্যুভয়ে, তাহাদেরে কর নমস্কার।

* * *

কিন্তু সমগ্র ভারতের পরাধীনতা-মুক্তির জন্য যে মহত্তর সাধনা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের মাটিতেই আরব্ধ হইয়াছিল, এবং যে মুক্তির আহ্বানে হাজার হাজার বাঙালী-যুবকের চিত্ত সাড়া দিয়াছিল, তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া বাংলা সাহিত্য আজও পর্যন্ত ধন্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য যে সাময়িক আন্দোলন ঘটিয়াছিল তাহার ফলেই বাংলা সাহিত্য স্থায়ীভাবে পুষ্ট হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে-কবিতায় প্রবন্ধে-গল্পে-উপন্যাসে, প্রভাতকুমারের গল্পে, রজনীকান্ত সেনের গানে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাংবাদিকতায়, বিপিনচন্দ্র পালের বজ্রনির্ঘোষে, সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাংলার ব্রতকথায়। সেদিনের শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করও সেই বহ্নি-বিপ্লবের স্মরণেই 'পথের দাবী', 'ধাত্রী দেবতা' রচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার-অধ্যায়'ও সেই বিপ্লবেরই ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র। সেই বিপ্লবে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল তাঁহাদের স্মৃতি-কথাও কিছু কম চিত্তাকর্ষক হয় নাই, বৈদেশিক ভাষায় অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথের সাধনার কথা নাই বলিলাম। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের যে মুক্তিযজ্ঞ সারা ভারতের মাটিতেই গত দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহার পশ্চাতে আরও দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের গৌরবময় ইতিহাস রহিয়াছে, সেই যজ্ঞে বহু বাঙালীর যৌবন ও জীবন, দেহ ও প্রাণ আহুতি দেওয়া সত্ত্বেও বাংলার

সাহিত্যক্ষেত্রে এই মহাযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সামান্য অঙ্কুরোদ্গম কেন হয় নাই, তাহার জবাবদিহি কি আজ শুধু বাঙালী সাহিত্যিকেরাই করিবে?

* *

কারণ যাহাই হউক, দুর্ঘটনা যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে। বাঙালী সাধক ও কবিদের এই পরস্পর-অপরিচয়ের ফাটল দিয়া অবাঞ্ছিত বৈদেশিক বহু ভাববাদ বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়া বাংলা দেশের তরুণ মনকে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত করিয়া আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে যে পিছাইয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পথে রামমোহন, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ মহাভারতের মুক্তিসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, সেই পথেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া আমাদের জাতীয় চেতনার পরিধি তথাকথিত উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণী এবং শিক্ষিত-সমাজ হইতে অশিক্ষিত-সমাজের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কাজ যে নিষ্ফল ও বাতিল হইয়া গিয়াছে, এমন কথা আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরাও বলিবেন না। তথাপি বহু ক্ষেত্রে এই কংগ্রেসকে ছোট করিবার, বর্জ্জন করিবার প্রয়াসের অন্ত দেখি না। যে ডালে মানুষ উপবেশন করিয়া থাকে, সেই ডাল কাটিবার মত বাতুলও তাহাদের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে সজ্ঞানে আনিবার জন্য যে শাসন দরকার, সুস্থ মানুষেরা তাহার প্রয়োগে ইতস্তত করিলে সকলের সমূহ অমঙ্গল। সেই অমঙ্গল নিবারণের সময় আসিয়াছে। এই ব্যাপারে বাঙালী সাহিত্যিকদেরও বিপুল কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সত্যকার কর্ম্মীদের উৎসাহিত করিবার, সুস্থ করিবার, স্বস্থ করিবার সাময়িক দায়িত্ব তো তাঁহাদের আছেই, ভবিষ্যৎ-কর্ম্মীদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির মারফৎ পথনির্দ্দেশ তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে। যে যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে, এক-আধ পুরুষেই তাহা শেষ হইবার নহে, মন্ত্রবলে আমাদের কাম্য স্বাধীনতা-ফলও আমরা অকস্মাৎ হাতে পাইব না; মৃত্যুর মধ্যে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে, অনাহারের মধ্যে, পীড়ন-অত্যাচারের মধ্যে, কারাগার-নির্বাসনের মধ্যে যুগে যুগে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভের অধিকার আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। কর্ম্মীরা সংহত অথবা বিক্ষিপ্তভাবে তাঁহাদের কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের যাত্রাপথের সঙ্গীত যে সকল শিল্পী কবি ও সাহিত্যিক রচনা করিবেন, তাঁহাদিগকেও স্ব স্ব কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। ডাক দিয়া শ্মশান-বন্ধু সংগ্রহ করার কাজও কাজ।

আমাদের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনেকে দাবি করিতেছেন, বাংলা সাহিত্যে নূতনের অভ্যাগম হইয়াছে—যে নূতন পুরাতনকে নিষ্প্রভ করিতে বসিয়াছে। এই নূতন সাহিত্য নাকি বিশিষ্ট মতবাদের সাহিত্য। কিন্তু নবজন্মের বেদনা-বিক্ষোভ এই কালের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। নূতনের প্রকাশ আমরা যতটুকু দেখিতেছি, তাহাতে নাক-মুখ-চোখ-কানের কোনও বালাই নাই—স্থূল মাংসপিণ্ডের ইঙ্গিত-বিক্ষেপকে অক্ষমের

আর্তনাদ অথবা সক্ষমের ইয়ার্কি বলিয়াই ভ্রম হইয়াছে। এই দুইয়েরই বিরুদ্ধে আমরা নালিশ জানাইয়াছি। পাষাণ-প্রাচীরবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে যদি সত্য সত্যই নূতনের জন্ম হইয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার বেদনা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতাম। যদুবংশীয় অপোগণ্ডদের বেদনা-বিরহিত মুষল প্রসবে ধ্বংসই সূচিত হইয়াছিল। যদি সত্যকার কিছু সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষ করিতাম, তাহা হইলে এই নূতন মতবাদকেও আমরা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতাম, কারণ আমরা সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রেষ্ঠতম মনীষীর মুখ হইতেই শুনিয়াছি—"The development of art is the highest test of the vitality and significance of each movement." আধখানা চাঁদ ও সিকিখানা কাস্তে দেখিয়া বিগলিত হইবার মত আদেখলেপনা আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই, বঞ্চিতের লাল রবিবারকে ধনিকের লাল শনিবারেরই রকমফের বলিয়া বোধ হইয়াছে, নীপারের বাঁকে আমরা ভিন্নতর শৃঙ্খলেরই আভাস দেখিয়াছি, জবানবন্দী নূতনের জবানবন্দী নয়, নবান্নে পুরাতন অন্নই পরিবেশিত হইতেছে মাত্র।

* * *

হইবে না কেন? সত্যকার শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টি এত সহজ ব্যাপার নয়, এখানে অশিক্ষিত মজুর-প্রধানদের মাতব্বরি কোন কালেই স্বীকৃত হইবে না, এ রাজ্যে অবকাশ ও প্রাচুর্যের চিরদিন প্রয়োজন থাকিবে, মজুরদের সাইরেন-শাসিত কর্মব্যস্ততা ইহার পরিপোষক নয়। ইউ. এস. এস. আর.-এর স্রষ্টা একজন বলিতেছেন—

Culture feeds on the sap of economics, and a material surplus is necessary, so that culture may grow, develop and become subtle. Our bourgeoisie laid its hand on literature, and did this very quickly at the time when it was growing rich. The proletariat will be able to prepare the formation of a new, that is, a Socialist culture and literature, not by the laboratory method on the basis of our present-day poverty, want and illiteracy, but by large social, economic and cultural means. Art needs comfort, even abundance. Furnaces have to be hotter, wheels have to move faster, looms have to turn quickly, schools have to work better.

* * *

ঈদ এবং দুর্গাপূজা উভয় বাজারেরই শিকারী একদল নব্যপন্থীর সাহিত্য-সভায় নাকি একজন সাহিত্যিক এখনও ঈশ্বর মানেন বলিয়া নস্যাৎ হইয়া গিয়াছেন। শোনা কথা। সত্য হইলে বেচারা রবীন্দ্রনাথ তো ইহাদের সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের বেদ-কোরান যাঁহারা বানাইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কথা যদিচ বলেন নাই, তবুও স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

If nature, love or friendship had no connection with the social spirit of an epoch, lyric poetry would long ago have ceased to exist.

যাক, ইহারা ঈশ্বর না মানিলেও যে পুরাদস্তুর মাণিকপীরের উপাসনা করিতেছেন, তাহাতেই আমরা খুশি আছি।

বর্ত্তমান সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৫১) 'কবিতা'য় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৪ অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অমিয়-বাবু সম্ভবত তখন "টিনে" (in his teens) ছিলেন—অবশ্য আজও তিনি টিনেই আছেন ! রবীন্দ্রনাথ এই অকাল-বিশ্ববখাটে বালককে তখনই লিখিয়াছিলেন—

"মনকে হৃদয়কে নিজের মধ্যে সংহরণ করে রেখো না, তাকে বিকীর্ণ করে দাও—তুমি যে আপনার ভারে আপনি পীড়িত সেই ভারটা কেটে যাক।"

আজ আমরা সকলেই জানি ভক্ত শিষ্য এই অনবধানতাপ্রদত্ত গুরু-উপদেশের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন ; মনকে হৃদয়কে নিজের মধ্যে সংহরণ করিয়া অমিয়বাবু কখনই রাখেন নাই, শুধু বিকীর্ণ করা নয়, চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গম্য অগম্য সকল স্থানেই ছড়াইয়া দিয়াছেন। আপনার ভারে আপনি পীড়িতও কখনও থাকেন নাই তিনি, সুকৌশলে অপরের স্কন্ধে ভার কাটাইয়া আসিয়াছেন। ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথ শেষ দিন পর্যন্ত "জীতা রহো বাচ্চা" বলিয়া মনে মনে শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন।

* * *

কিন্তু আমাদের আসল বক্তব্য ইহা নয়। আজ আমরা এতদিন পরে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি (ভাগ্যে চিঠিটি প্রকাশিত হইয়াছে !) যে, অমিয়বাবু সেই শ্রেণীর হনুমান-ভক্ত যাহারা ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে, বিশল্যকরণী চাহিলে গন্ধমাদন আনিয়া হাজির করিয়া দেন। বেচারা রবীন্দ্রনাথ মন বলিতে সাদাসিধা মনই বুঝিয়া-ছিলেন, কিন্তু অমিয়বাবু তাহার অর্থটা অবচেতন মন পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া যত গোল বাধাইতেছেন। তিনি কিছুদিন হইতে যে ভাবে অবিরত তাঁহার অবচেতন মনকে সর্বত্র বিকীর্ণ করিয়া চলিয়াছেন, আমাদের তো ভয়ই হইতেছে ! এই সেদিনও ১৩৫১-র 'বৈশাখী'তে তাঁহার "রাঙা আগুন" শীর্ষক অবচেতন মন আমাদের যাবতীয় বোধশক্তিকে খাক করিয়া দিয়াছে। আমাদের পাঠকদেরও নিষ্কৃতি দিব না, বুঝুন তাঁহারা—

"বাসনার ফুল জ্বলে দাউ দাউ
রক্তিম দাহে মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে—
সে-আগুনে সারা সূর্যের শিখা ছায়া ক'রে দেয় ;
পাণ্ডুর সংসার।
এনেছ এ কী এ ভস্মের আয়ু,
ছাই করবার জ্বালা ;
ও মশাল নিয়ে দূরে যাও তুমি,
মারীর পথিক, সন্ধ্যা রক্তপথে।
তবু শোনো, তবু শোনো,
চেয়ে দেখো ঐ পথের দুধারে শান্ত আকাশে অন্যমনা

রাঙা গোলাপের স্নিগ্ধ আগুন কেন্দ্রিক স্থির ;
আজো ফুটে আছে প্রথম প্রেমের ব্যথা।
পুষ্পিত ওর লাল উচ্ছ্বাসে
জানো কি তোমারি ভোরের কামনা তৃষ্ণাহরা।
আমার টেবিলে মাটির পাত্র
হাতে চিত্রিত,
সবুজ পাতার মধ্যে উঠেছে দুটো রাঙা জবা ;
তারি দিকে চোখ পড়ে।
লিখি আর নানা ভাবনায়
সুন্দর তার তীব্র শোণিমা ছড়ায় প্রান্তে প্রান্তে।
বাসনার ফুল বনে বনে দেখ ফোটে নির্দাহ,
সৌরসকালবেলার আলোক ঢেলে দেয় আজো শেষ সায়াহ্নে।"

* * * *

ব্যাপারটা আমাদের এক ডাক্তার সাহিত্যিক বন্ধুর কর্ণগোচরে আনাতে তিনি চটিয়া হারমোনিয়াম-জাতীয় কি একটা ব্যবস্থা দিলেন, আমরা তাঁহাকে বেশি ঘাঁটাইতে সাহস করিলাম না। তিনি নাকি ওই ১৩২৫এর দিকেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন!

—

পূজা-সংখ্যা 'দীপালী'তে "মিনতি" কবিতায় কবি শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"এই রজনীতে দেয়া আর নেয়া অবসান :
তমুতটে তমু হারাক আপন সীমানা।
ঘিরে থাক মোরে বেদনাবিধুর তব গান
তোমার আমার এক হয়ে যেতে কী মানা।"

লেনাদেনা যখন চুকিয়া গিয়াছে, তখন কাহারও মানা থাকিবার কথা নয় ; তথাপি আমরা সাক্ষী থাকিতে প্রস্তুত নই। সীমানার ব্যাপারে অনেক হাঙ্গামাতেই পড়িয়াছি কিনা!

—

স্থানাভাবে পুস্তক-পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল না।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি

১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিবেকানন্দের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। যদিও সকল উক্তির মূলে এক কথাই আছে, তথাপি সেই একটি কথা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমি আরও কয়েকটি নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম।—

It is better not to believe than not to have felt.

*　　*

Unity is the test of truth. Love is truth and hatred is false, because hatred makes for multiplicity.

*　　*　　*

Man has never lost his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free, and you will be!

*　　*　　*

The East worships simplicity and herein lies one of the main reasons why vulgarity is impossible to any Eastern people.

*　　*

As soon as you say, you are a little mortal being, you are hypnotising yourself into something vile and weak and wretched.

*　　*　　*

Religion is neither word nor doctrine. It is to be and become, not to hear and accept. It is the whole soul changed into that which it believes.

*　　*　　*

Be like an arrow that darts from the bow. Be like the hammer that falls on the anvil. The arrow does not murmur if it misses the target. The hammer does not fret if it falls in the wrong place. The sword does not lament if it breaks in the hands of the weilder. Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside.

৬

"Man has never lost his empire. The soul has never been bound"—ইহাই সেই বৈদান্তিক আত্ম-তত্ত্ব; তথাপি ইহা যে কেবল তত্ত্বমাত্র নয়—জগৎ ও জীবনের সহিত অসঙ্গতা রক্ষা করিয়া, যোগাসনে বসিয়া সেই তত্ত্বকে আত্মগত করাই যে পরমপুরুষার্থ নয়, বিবেকানন্দ তাহাই প্রচার করিয়াছেন; সেই তত্ত্বের বিদ্যুৎকে ধরিয়া মনুষ্যজীবন-রূপ শক্তিযন্ত্রে তাহাকে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এ

ব্যাপারে বিশ্বাস—আত্ম-বিশ্বাসই—সর্ব্বশক্তির মূল; জগৎ হইতে এ ধরনের বিশ্বাস প্রায় লোপ পাইয়াছে; অথচ এই বিশ্বাস যে কত বড় শক্তি তাহা আমাদের এযুগের কবিও একবার ভাব-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

—'যখনি জাগিবে তুমি'—এই জাগাটাই যে সব! ইহার জন্য চাই বিশ্বাস, তাই কবিও সেই বিশ্বাসকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন—

এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

বিবেকানন্দ এই সত্যকেই একেবারে বাস্তব জীবনের সাধনমন্ত্ররূপে, তাঁহার নিজেরই চরিত্র ও জীবনের দ্বারা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভবিষ্যৎ-বাণী অতিশয় মূল্যবান বলিয়া মঃ রোলাঁ উদ্ধৃত করিয়াছেন—আমিও ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি—তাহাও এখানে স্মরণীয়,—

His strong faith in himself will be an instrument to reestablish in discouraged souls the confidence and faith they have lost.

বিবেকানন্দও ইহাকেই উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, religion বা ধর্ম্মসাধনা বলিতে তিনি ইহাই বুঝিতেন,—"It is the whole soul changed into what it believes"। মনুষ্য-সাধারণ একই কালে একসঙ্গে এই পথে উঠিতে পারে না—এ পর্য্যন্ত কোন লোকশিক্ষক বা জগৎ-গুরু তেমন আশা করেন নাই। কিন্তু একজন পুরুষের মধ্যেও যদি সেই সত্য দিব্যদীপ্তিমান্ হইয়া উঠে তবে আরও দশজন সেই জ্যোতির সান্নিধ্যে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিবে; এবং—"The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves"। ইহাই ছিল বিবেকানন্দের ভরসা ও বিশ্বাস। যে আপনাকে এতখানি বিশ্বাস করে সে মানুষকে বিশ্বাস না করিয়া পারে না; তেমনই, এত বড় আত্মবিশ্বাসীকে দেখিয়া মানুষও আপনাকে বিশ্বাস করিতে শেখে। বিবেকানন্দের বাণীর পশ্চাতে ছিল তাঁহার সেই শক্তি-ঘন পুরুষ-সত্তা—dynamic personality; সে যেন জড়ত্বকে প্রবলভাবে আঘাত করিবার এক মূর্ত্তিমান ঘনীভূত চৈতন্য! নহিলে এ বাণীর কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকিত না। ঠিক এই প্রসঙ্গে সাময়িক-পত্রে উদ্ধৃত, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের একটি মন্তব্য চোখে পড়িল, তাহা এই,—

The emergence of spirit from the bondage of nature is the desideratum in life's movement. But this emergence is a slow process; the advent of a

great soul by its spiritual influence can hasten the emergence, but a too swift process becomes fruitful in producing confusion and chaos.

—পড়িয়া মনে হয়, সরকার মহাশয় তত্ত্বহিসাবে যাহাকে স্বীকার করেন, তথ্য হিসাবে সে বিষয়ে তাঁহার কিছু সন্দেহ আছে। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, আমাদেরও হয়, তাই এত কথা লিখিতে হইতেছে। দার্শনিকের অপরোক্ষ-দর্শন নাই, তাই বিশ্বাসও নাই,—চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুজাল সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেই তিনি নিপুণ; 'মায়া'র বিচিত্র বসনখানির মূল্য যাচাই করিয়াই তিনি কৃতার্থ বোধ করেন, তাহাকে কিনিয়া পরিবার বা টানিয়া ছিঁড়িবার—জীবন-রহস্য-সাগরে অবগাহন ও সন্তরণ-শেষে তাহার তলে পৌঁছিবার—শক্তিও তাঁহার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। কিন্তু এইরূপ দার্শনিক চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন আছে,—জীবনের অকূল অগাধ বারিরাশিতে ঝাঁপ দিয়া তাহারই তরঙ্গচ্ছন্দের সহিত নিজের প্রাণস্পন্দন মিলাইয়া সত্যের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা না থাকিলেও, চিন্তার সাহায্যে তাহার যে একটা পরোক্ষ পরিচয় আমরা তাঁহার নিকটে পাইয়া থাকি—আমাদের মত মানুষের তাহাই একমাত্র সম্বল। তাই সরকার মহাশয়ের উক্তির একাংশ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট; বাকিটা সত্য কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। আমার মনে হয়, সরকার মহাশয়ের ঐ আশঙ্কার মূলে কোনরূপ ভূত-দর্শন বা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আছে; তাহা বিবেকানন্দের সেই 'spiritual influence'-এর সদ্য ফলাফল-ঘটিত কি না জানি না; আমি নিজে এতখানি ভয় পাইবার মত ভূত-দর্শন করি নাই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা আছে; আধুনিক যুগের সহিত যুক্ত করিলেও, আমি বিবেকানন্দকে আসন্ন ও অনাগত বৃহত্তর কালের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছি।

বিবেকানন্দ 'চরিত্র'কেই মানব-ধর্ম্ম-সাধনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, 'মানুষ-গড়া'-(man-making)-ই ছিল তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। এই 'মানুষে'র সবচেয়ে বড় লক্ষণ—'manliness' বা পৌরুষ। অসীম আত্ম-প্রত্যয়, অদম্য কর্ম্মশক্তি এবং তাহার সহিত 'ত্যাগ' বা পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন—ইহাই বিবেকানন্দের ধর্ম্মশাস্ত্র। তত্ত্ব হিসাবে ইহা হিন্দুর চিন্তায় নূতন নয়, পুরাতনই বটে; কিন্তু সাধনমন্ত্র হিসাবে ইহা যে কত নূতন, তাহা আশা করি, এত কথার পর আর বুঝাইতে হইবে না। বিবেকানন্দ যখন বলেন—"Fight always, fight and fight on, though always in defeat—that's the ideal", তখনি বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ইহাও সেই গীতার বাণী; তথাপি ইহার ভাষা ও ভাব দুই-ই যে নূতন, তাহাতে সন্দেহ কি? গীতায় আছে ভগবানে আত্মসমর্পণ—এখানে শক্তিও আমার শক্তি, কর্ত্তৃত্বও আমার। আবার বিবেকানন্দ যখন বলেন—

Worship Death! All else is vain. That is the last lesson...Yet this is

not the coward's love of death, not the love of the weak or the suicide. It is the welcome of the strong man who has sounded everything to its depths, and *knows* there is no other alternative.

—তখনও তিনি চরম শক্তির আশ্বাসই দিতেছেন—অশক্তির নিরাশ্বাস নয়; ঐ চরম শূন্যতার মধ্যেই আত্মা যেন পূর্ণতায় টলমল করিতে থাকে! নিজের চরিত্রে ও জীবনে তিনি আত্মার এই যোদ্ধৃ-মনোভাব সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এ মনোভাব যে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়—বিবেকানন্দ 'চরিত্র' বলিতে যাহা বুঝিতেন, ইহা যে তাহারই লক্ষণ, তাহার প্রমাণ এক সৈনিক-কবির নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলিতে মিলিবে; এমন আশ্চর্য্য ভাবসাদৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই—

We have built a house that is not for Time's throwing,
We have gained a peace unshaken by pain for ever.
War knows no power. Safe shall be my going,
Secretly armed against all death's endeavour;
Safe though all safety's lost, safe where men fall;
And if these poor limbs die, safest of all.

ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের এই বীর-মনোভাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া শেষে বলিয়াছেন—"Both victory and defeat would come and go. He was their witness"; আবার সেই গীতা! বিবেকানন্দের সেই উক্তিটিও এখানে স্মরণীয়—"Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside"; উপরি উদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলির ভাবার্থ একই।

এইজন্য বিবেকানন্দের একমাত্র সাধন ছিল, 'Individuality',—মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বশক্তির উদ্বোধন। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ ব্যক্তির আত্মাভিমান নয়, পূর্ব্বে সে আলোচনা করিয়াছি। এই যে আত্মোপলব্ধি বা স্বাতন্ত্র্য-মহিমার দিব্যানুভূতি —যাহাদের ইহা হইয়াছে, তাহারাই ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তি-স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়াছে। কিন্তু সেই অসীম আত্মস্ফূর্ত্তির এমনই গুণ যে, সে অবস্থায় আত্মা স্ববশেই বিশ্ব-যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া থাকে। বিবেকানন্দ আত্মার সেই পূর্ণতাপ্রাপ্তিকেই তাহার প্রকৃত 'individuality' বা স্বরূপ-মহিমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তবু সেই এক প্রশ্নের উত্তর চাই—আত্মার এইরূপ জাগরণ কি সাধারণভাবে আদৌ সম্ভব? বিবেকানন্দ তাহাই বিশ্বাস করিতেন, কেন করিতেন তাহাও বলিয়াছি,—সে বিশ্বাস তাঁহার নিজের আত্ম-বিশ্বাসের বিশ্বাস, কেবল জ্ঞান-বিচারের বিশ্বাস নয়। একজন মানুষের পক্ষেও যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে সকলের পক্ষেও অন্তত অসম্ভব নয়। পদার্থমাত্রেই যে অগ্নি বা বৈদ্যুত প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাকে প্রকট করিবার উপায় চাই। ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে, সেই প্রেরণা সঞ্চার করা সাধ্য ও সম্ভব, আত্মার

অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে ! ব্যক্তির জীবনে বা জাতির জীবনে যাহা দৈবাৎ নৈমিত্তিকভাবে ঘটিয়া থাকে তাহাকে নিত্য করিয়া তুলিবার পন্থাও আছে—বিবেকানন্দ সেই পন্থার প্রদর্শক। ব্যক্তির পক্ষে এমন জাগরণ যে সম্ভব তাহা আমরা দেখিয়াছি; কলিকাতার রাজপথে ড্রেনের গহ্বরে নফর কুণ্ডুর সেই আত্ম-বিসর্জ্জনের ঘটনা এখনও ভুলি নাই; একজন অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মার সেই দিব্যপ্রকাশ নিবিড় অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে, জাতিগতভাবে, তাহারই আর এক প্রকাশ আর এক রূপে দেখিলাম; সেই অতি-প্রবুদ্ধ আত্মাই ষ্টালিনগ্রাডের গগনস্পর্শী জ্যোতিঃশিখায় সারা ইউরোপ আলোকিত করিয়াছে; সেই শক্তি, সেই বীর্য্যও কম আধ্যাত্মিক নয়,—অনাত্মবাদী নাস্তিকেরা তাহার যে অর্থই করুক; সে দৃশ্য দেখিলে বিবেকানন্দও আনন্দে আত্মহারা হইতেন। অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসীর এই বাণী, শুধুই জীবনের ঘটনায় নয়—সাহিত্যিক কবি-সাধকের ধ্যানেও ধরা দিয়াছে—সে প্রমাণও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি চিন্তা-বিষ-জর্জ্জর ম্যাথু আর্নল্ড ইহাকেই আত্মার একমাত্র মুক্তিপন্থা বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া একজন মনীষী সমালোচক বলিতেছেন—

To be oneself, to possess one's own soul,—this, Arnold knew, was the necessity; if this could be achieved, belief could be achieved and an end of perturbation.

> "Resolve to be thyself; and know that he
> Who finds himself loses his misery."

রুশ সাহিত্যিক চেহভের এই কথাগুলিও বিবেকানন্দের সেই বাণীমন্ত্রের অনুরূপ—

I believe I see salvation in individual personalities scattered here and there all over Russia—whether they belong to the intelligentsia or to the peasants.

ইহার পরেই বলিতেছেন—

This feeling of personal freedom is the mark of the true and completed individuality. Such individuals are the pioneers of humanity, and on them the future of true civilisation does indeed depend.

এ যেন বিবেকানন্দের ভাবায় বিবেকানন্দেরই বাণী! রুশীয় মনীষী যাহাকে তথ্যরূপে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ভারতীয় দৃষ্টিতে তাহার গভীরতর তত্ত্বও উদ্ঘাটিত হইয়াছে; চেহভ যাহা অনুমান করিয়াছেন, বিবেকানন্দ মন্ত্রদ্রষ্টার মত তাহাকে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার হইয়াছে বা হইবে, সে প্রশ্ন এখন মুলতুবি থাকাই উচিত; বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর, এই পঞ্চাশ বৎসরে, জগৎময় মানুষের ব্যাধি যে আকার ধারণ করিয়াছে—যে আগুন তাহার মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিয়াছে, এবং যাহার ফলে মনুষ্যত্বের চেতনাই একণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, সেই আগুন প্রশমিত হইবার পূর্ব্বে কোন সত্যই স্থিতিলাভ করিবে না; অতএব এখন সকল প্রশ্নই বৃথা।

৭

কিন্তু বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবযুগের সহিত বিবেকানন্দের বাণী নিঃসম্পর্কিত নয়। সে যুগের ভাবধারার যে গতি ও প্রবৃত্তির আলোচনা এ যাবৎ করিয়া আসিতেছি, তাহা বিবেকানন্দে আসিয়াই একরূপ শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে; তাঁহার বাণী সেই যুগকে যতই অতিক্রম করুক, ধারা সেই একই—কেবল কূল ছাপাইয়াছে মাত্র। সে যুগের সমস্যা ছিল মুখ্যত বাংলার, এবং গৌণত ভারতের; বাঙালীর প্রতিভাই সেই যুগকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া, জীবনের একটা নূতন অর্থ—একটা নূতন পথ ও পাথেয়-সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সমস্যা কি তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহার সমাধানে কল্পনা, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় বঙ্কিমের প্রতিভাকে সৃষ্টি-সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছিল, এবং তাহাতে সেই যুগ যে তাহার সকল প্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি সুসম্পূর্ণ মূর্ত্তি লইয়া বাঙালীর চিত্তে, তথা সাহিত্যে, প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জাতি-হিসাবে বাঙালীর যে নব-জাগরণ সে যুগের সাধনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ ফল তাহার নিদর্শন—বঙ্কিম-সাহিত্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলেই বিবেকানন্দের সহিত সে যুগের সম্পর্ক কতটুকু ও কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দুইটি বিষয়ে উভয়ের মিল খুব স্পষ্ট,—প্রথম, প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্য সংস্কৃতির সমন্বয় বা যোগস্থাপন; দ্বিতীয়, স্বজাতি-সমাজের চৈতন্য-সম্পাদন। প্রথমটির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রয়াস তাহাতে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি—ভারতীয় জ্ঞানগরিমা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার মূলে ছিল—ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব; তিনি ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহাকে যাচাই করিয়া। এজন্য, তিনি যে নবমানব-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার আধ্যাত্মিকতাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, তিনি পারমার্থিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকটাই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন—যুগের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে মানিয়া লইয়াছিলেন; যুগ ও জাতির সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি ছিল বাস্তব। হাতের কাছেই যে উপাদান আছে তাহা দ্বারা প্রয়োজন-অনুযায়ী একটা কিছু গড়িয়া লইতে হইবে, কবি ও মনীষী বঙ্কিম ইহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অথচ বঙ্কিম যে কতবড় আদর্শবাদী ছিলেন তাহাও আমরা জানি; সেই আদর্শকেই বাস্তবের অধীন করিবার যে শক্তি, তাহাই বঙ্কিমের সৃষ্টি-শক্তি; এই সৃষ্টিশক্তি তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনায়—কবিকর্ম্মে যেমন, জ্ঞান-গবেষণার কর্ম্মেও তেমনই—পরিস্ফুট হইয়া আছে। উপকরণ যত সামান্য হউক—আদর্শ যতই দুরধিগম্য হউক—বাস্তবে ও কল্পনায় যতই বিরোধ থাকুক, তথাপি তাহারই সাহায্যে একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না। তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরোধ-মীমাংসায় তিনি আশ্চর্য্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন; একের গৌরব-উদ্ধারেও অপরের মূল্যও স্বীকার

করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের মনোভাব কিছু স্বতন্ত্র; তিনি য়ুরোপীয় জাতি-সকলের সাধনার বৈশিষ্ট্য ও মূল্য স্বীকার করিলেও, ভারতের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন, এবং উভয়কে পৃথক রাখিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনিও অবজ্ঞা করেন নাই এবং বঙ্কিমের মতই তাহার অনুশীলন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন —বুদ্ধিকে জাগ্রত এবং জ্ঞানকে সপ্রতিভ রাখিবার জন্য তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত তত্ত্বকে ভারতীয় সাধনার অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি 'এভল্যুশন'-বাদ মানিতেন না—বঙ্কিম প্রায় পুরাপুরি মানিতেন। তিনি আত্ম-তত্ত্বকেই সকল তত্ত্বের উপরে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া, যে 'progress' বা 'প্রগতি'র সংস্কার য়ুরোপীয় চিন্তায় বদ্ধমূল, তাহাতেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না; একবার ভগিনী নিবেদিতার একটি অভিযোগের উত্তরে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"That's because you cannot overcome the idea of progress, but things do not grow better. They remain as they are, and *we* grow better by the changes we make in them."—ইহা সত্যই বড় ভয়ানক কথা!

এ সম্বন্ধে আমি খাঁটি হিন্দু মনোভাবের আর একটু পরিচয় এখানে দিব—পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা আরও ভয়ানক। মনুষ্যসমাজের উন্নতি-সাধন নয়—হিত-সাধনই হিন্দু চিন্তার অনুমোদিত। ওই উন্নতির একটা মাপকাঠি অনুসারে, জাতি বা ব্যক্তিসকলের উচ্চ-নীচ-ভেদ হিন্দুর তত্ত্ব-জ্ঞানের বিরোধী। নব-প্রকাশিত একখানি অভিনব ও উপাদেয় বাংলা পুস্তক হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিব—প্রত্যেক সত্যপিপাসু ও আত্মজিজ্ঞাসু শিক্ষিত বাঙালীকে আমি এই পুস্তক পাঠ করিতে বলি—বর্ত্তমান যুগে এই ধরনের পুস্তক 'টনিকে'র মতই স্বাস্থ্যকর। পুস্তকখানির নাম—'তন্দ্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ', গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তকের এক স্থানে এক অঘোরী তান্ত্রিকের মুখে যে কথাগুলি বাহির হইয়াছে, আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে—আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐ উন্নতিবাদ ভারতীয় সাধনার একটা মূলতত্ত্বের কত বিরোধী। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাহা হইলে, তিনি, কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে জ্ঞানমার্গী উদাসীন হইয়া শ্মশানে বা গিরিগুহায় বাস করিতেন।

> "তোদের কেবল উন্নতি আর উন্নতি; উন্নতি কি সকলের এক ভাবেই হয়? এর মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাঁরা এখানে কোন উন্নতি অবনতির উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি, কেবল কর্ম্মক্ষয় করতে এসেছে। আত্মার ক্ষুধা যার যেমন তার সেই রকম ভোগ আর কর্ম্ম এখানে চলবে ত?...লোকচক্ষে—অন্ততঃ তোদের মত লেখাপড়া জানা বাবুলোকদের চক্ষে, হয়ত তা খারাপ ঠেকবে, কিন্তু তাদের হিসেবে তারা ঠিক আছে।...

একটা কথা মনে রাখবি, কখনো ভুলিস নি;—কারও উন্নতি বা অধঃপতন নিয়ে বিচার করতে বসিস্ নি, আর প্রচারও করিস নি কখনো,—তাতে তোর ক্ষতি হবে, নিজের কিছুই সুবিধা হবে না। এখানে যা কিছু দেখবি বা শুনবি তার থেকে একটা মনগড়া সহজ সিদ্ধান্ত করে নিয়ে কারো কাছে কিছু বলিস নি, ঠকে যাবি। যত জীব দেখছিস—যারা জীবনের ধারা পেয়ে গেছে—তাদের সকলের মধ্যেই একটা করে পৃথিবী আছে। জ্ঞানী মহৎ ব'লে তুই যাদের কর্ম্মের কতকটা দেখেছিস তাদেরও যে রকম—অজ্ঞান, হীনবুদ্ধি, মূর্খ, কুক্রিয়াসক্ত ব'লে যাদের দেখছিস, তাদেরও সেই রকম—সকলকারই একটা একটা আলাদা পথ আছে, যার মধ্যে দিয়ে সে খেলা করছে—আপনাকে প্রকাশ করছে।" (পৃঃ ২২২)

অতএব মূল তত্ত্বের দিক দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোন সত্যকার রফা হইতে পারে না, ইহা বিবেকানন্দ বুঝিতেন। তথাপি য়ুরোপের বিশিষ্ট সাধনাকে শ্রদ্ধা করিতেও কোন বাধা ছিল না; প্রত্যেকের পথ পৃথক হওয়াই তো স্বাভাবিক; যাহার যে পথ সে সেই পথেই অগ্রসর হউক—শেষে সেই এক তীর্থেই পৌছিবে। তথাপি বিবেকানন্দের এ অভিমান ছিল যে, সে তীর্থ ভারতেই আছে, শেষে সকলকে সেখানেই পৌছিতে হইবে। এরূপ অভিমান বঙ্কিমেরও ছিল; কিন্তু তিনি উপস্থিত একটা রফা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি বিবেকানন্দের মত এত বড় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না,—কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে পারেন নাই বলিয়া একটু পাটোয়ারী বুদ্ধি রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের উপরে বহুকাল ধরিয়া যে আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তাহা কাটিয়া দূর করিবার একমাত্র অস্ত্র—য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান; তাহা ছাড়া, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে মতি-গতি হইয়াছে তাহাকেও যথাসম্ভব অনুকূল রাখাই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের কোন দ্বিধা-সংশয় ছিল না; ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

To his mind Hinduism was not to remain a stationary system, but to prove herself capable of embracing and welcoming the whole modern development...Above all, she was the holder of a definite vision, the preacher of a definite mission among nations.

—অর্থাৎ, এমন কোন নূতন তত্ত্ব বা মতবাদ নাই যাহার সহিত হিন্দু-চিন্তার রফা করিতে হয়; তাহা এমনই সর্ব্বাশ্রয়ী যে, কিছুরই সহিত তাহার বিরোধ হইতে পারে না, তাহার মত করিয়া সে সকলকে হজম করিয়া লইবে; এবং তাহার যে নিজস্ব সত্য-সম্পদ—যে বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টি আছে—তাহাই জগৎকে দান করিবে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সহিত বঙ্কিমের মত-ভেদ ছিল না বটে, কিন্তু চিন্তাপদ্ধতি ও সাধন-রীতিতে বিশ্বাস-ঘটিত তারতম্য ছিল।

দ্বিতীয় বিষয়—স্বজাতির উদ্ধার-সাধন। এখানেও উভয়ের বাসনা এক হইলেও, আদর্শ এক ছিল না। এই উদ্ধার-সাধন বিবেকানন্দের নিকটে কোন পৃথক সমস্যার মত ছিল না; তাহার জন্যও তিনি সেই একমন্ত্র—আত্মার মুক্তি-মন্ত্র ছাড়া, আর কোন উপায় চিন্তা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বাজাত্য-সাধনাকেই জাতির মুক্তিলাভের অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়া—ভারতবর্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন—সেই জাতীয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শ তদপেক্ষা উন্নত ও উদারতর, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি, বিবেকানন্দের সেই আধ্যাত্মিক শক্তিসাধনা এবং এই সাধারণ মানব-ধর্ম্ম সাধনার একত্র বিচার করিয়া মঃ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

This message of energy (বিবেকানন্দের) had a double meaning; a national and a universal. Although for the great monk of the Advaita, it was the universal meaning that predominated, it was the other that revived the sinews of India. (ইহা আমরাও জানি; অন্তত বাংলা দেশে—জাতীয়-জাগরণের এই আদি অরুণোদয়ের দেশে—বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী বিবেকানন্দের মন্ত্রে অধিকতর শক্তি লাভ করিয়াছিল)। There was ground for fearing that its high spirituality would be twisted to the profit of a purely animal pride in race or nation, with all its stupid ferocities.

কিন্তু তার পরেই বলিতেছেন—

> But how else was it possible to bring about within the disorganised Indian masses a sense of human unity, without first making them feel such unity within the bounds of their own nation?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ইহাই ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্'-গানের উদ্দিষ্ট দেবতা যে ভারতভূমি নয়—বঙ্গভূমি, ইহাতেও তাঁহার বাস্তব-দৃষ্টি, মানব-চরিত্র ও ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে! প্রেমের প্রথম উদ্দীপন, বাস্তবের ক্ষেত্রে, অতিশয় নিকট বস্তুতেই হইয়া থাকে; স্ব-সমাজ ও স্বজাতি আগে, বৃহত্তর সমাজ পরে, এ তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ভাল-রূপই জানিতেন। বিবেকানন্দের প্রেম কত বড় ও গভীর ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার মূলে ছিল ভারতীয় সাধনার প্রতিই ঐকান্তিক অনুরাগ, তাই ভারতীয় জনগণের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া তিনি সমগ্র ভারতের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। অতএব এই দুই জনের ব্রত যে দুইরূপ—তাহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক; কারণ, একজন ছিলেন সন্ন্যাসী, আর একজন সমাজধর্ম্মী গৃহস্থ। এই দুই ধর্ম্মই সত্য—এক অপরের পরিপূরক মাত্র। এ বিষয়ে সে-যুগের এক মনস্বী বাঙালী-লেখকের উক্তি বড়ই যথার্থ, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব—বিবেকানন্দের ভারতপ্রীতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি এই দুই-ই যে সমান সত্য ও সমান আবশ্যক, এই উক্তি যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে।—

"তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, undefined and indefinite units, অর্থাৎ, নির্দ্দেশশূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষ্টি লইয়া কখনও কোন সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একতা সম্ভবপর নহে। আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়-জন দ্রাবিড় হইবে না—দ্রাবিড়ের আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও; পরে গোটা ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি,—সন্ন্যাসীর সেই কথাটা! তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী ও যতি-সজ্জনে ভাবিবে; প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের মত মান্য করি।"

এ চিন্তা ও ভাবনা এ যুগে একেবারে 'out of date' হইয়াছে—বাঙালীর চিন্তাশক্তি আর নাই; তাহার কারণ, সত্যকার বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষাও আর নাই; নহিলে কংগ্রেসপন্থী বাঙালী ক্রমেই এত দুর্ব্বল ও মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িবে কেন?

৮

আরও কয়েকটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিবেকানন্দের তুলনা করা যাইতে পারে। দুই জনেই 'পলিটিক্স্' বা রাষ্ট্রনীতি-চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন, আজিকার দিনে ইহা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। একজনের মতে উহা ধর্ম্মই নহে, আর একজন উহাকে পরধর্ম্ম বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোনরূপ মন্তব্য করা শোভা পায় না; কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল আমরা ক্রমে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' বলিয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহা যে এখনও আমাদের ধাতুগত হয় নাই, বরং তাহার ফলে আমাদের শক্তি অপেক্ষা অশক্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপাত-দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝি—মহাপুরুষের দিব্য-দৃষ্টিতে তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ আছে। কেবল ইহাই লক্ষণীয় যে, এ বিষয়ে এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারার ঐক্য আছে। তারপর, এ যুগের যাহা প্রধান প্রবৃত্তি—যাহা এই যুগেরই নবধর্ম্ম—সেই Humanity বা মানব-পূজা বা মানবাত্মার মহত্ত্ব-বোধ এই উভয়কেই সমান অনুপ্রাণিত করিয়াছে; বঙ্কিমে যাহার প্রথম পূর্ণ ও সজ্ঞান উপলব্ধি, বিবেকানন্দে তাহা উচ্চতম অধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে। "We Indians are MAN-worshippers. Our God is man"—বিবেকানন্দের এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়,—বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' এই 'মানব-ভগবৎ'-বাদের একটি সুনিপুণ ভাষ্য মাত্র। কেবল একটা বিষয়ে দুইয়ের দৃষ্টিতে প্রভেদ

আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে, মানুষের প্রকৃতিসুলভ যে মনুষ্যত্ব—তাহার সেই দেহ-মন-প্রাণের ধর্ম্মকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং সেই জন্য পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভকে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা বা সর্ব্ববৃত্তির অনুশীলনসাপেক্ষ করা হইয়াছে। এইরূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম ব্যতিরেকেও, তথাকথিত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবেও, অন্য উপায়ে মানুষের আত্মা যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব তাহার যেন প্রতিবাদী। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের মত, আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় (বিবেকানন্দের 'individuality') বিশ্বাস করিতেন না; ছোট-বড় সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক শক্তি-বীজ নিহিত আছে, তাহার স্ফুরণ যে সর্ব্বাবস্থাতেই সম্ভব—সামাজিক অবস্থা বা মানসিক উৎকর্ষের উপরে তাহা নির্ভর করে না; চরিত্র-বলই যে চিত্তশুদ্ধির নিদান, এবং তাহা অশিক্ষিতের মধ্যেও সুলভ,—বঙ্কিমচন্দ্রের Doctrine of Culture তাহা গ্রাহ্য করে নাই। এজন্য তিনি একরূপ Intellectual aristocracy-র সমর্থন করিয়াছেন। বিবেকানন্দও কম aristocrat নহেন, কিন্তু তাঁহার aristocracy—আত্মার aristocracy, তাই তাহা ডেমোক্রেসিরও চূড়ান্ত।

উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র যদি সে যুগের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে বিবেকানন্দ সেই যুগকে অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র—তাহার সেই ধারাকে তটবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বিবেকানন্দও সেই যুগেরই সন্তান, তাঁহার ধাতুপ্রকৃতিতেও সেই যুগের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাঁহার বালক-বয়সের সেই বিদ্রোহী মনোভাব সেই যুগেরই লক্ষণ। কেবল, তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রে যে অসাধারণ পৌরুষ সুপ্ত ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের যাদু-স্পর্শে তাহা এমনই স্ফুরিত হইয়াছিল যে, তিনি অনায়াসে যুগকে অতিক্রম করিয়া, বৃহত্তর দেশে ও কালে আপনাকে প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন। সেকালে ইহা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না—বিবেকানন্দের পক্ষেও নয়; কারণ, ইহা ঐতিহাসিক কালধর্ম্মে—বা স্বভাবের নিয়মে ঘটে নাই। তথাপি, ইহাও সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ উভয়েই বাঙালী—উভয়ের প্রতিভা বাঙালী-প্রতিভা; উভয়ে একই যুগের একই জল-মাটির মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই জল-মাটির বটে (বাঙালী না হইলে এমন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের রস-রসিকতা সম্ভব হইত না), কিন্তু তিনি সকল যুগের। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ-চেতনা এই যুগাতীতের স্পর্শ লাভ করে নাই—বিবেকানন্দের করিয়াছিল। তাই উভয়ের মধ্যে বাঙালীর ধাতুগত সেই শাক্ত-সংস্কার জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও, একজনের সংস্কার খাঁটি, আর একজনের তেমন খাঁটি নয়—মিশ্র। বিবেকানন্দ বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে গুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গে—লীলায় নয়—সংগ্রামে অবতীর্ণ করিয়া, বন্ধন-ছেদনের আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্যই বন্ধনকে স্বীকার করিয়া—আত্মার

কর্তৃত্ব-শক্তির (dynamic energy) জয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, খাঁটি শাক্তের মত, প্রকৃতির উপাসনা করিয়া তাহারই পথে,' পশ্বাচার হইতে দিব্যাচারে আরোহণ করাকেই সহজ ও সাধ্য মনে করিয়াছিলেন। একজনের সাধন-পীঠ—আত্মা, আর একজনের—দেহ ; একজন মৃতকেও জাগাইবার জন্ম ডাক দেন—"Lazarus Come forth !", আর একজন মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার জন্ম তাহার দেহে বৈদ্যকশাস্ত্র অনুসারে তাপ সঞ্চারের চেষ্টা করেন ; একজনের মতে—"The soul is the cause of the body", আর] একজনের মতে—The body is the cause of the manifestation of the force we call the soul" ; যদিও ঐ 'soul' উভয়ের নিকটেই সমান সত্তা। তথাপি উভয়েই শাক্ত; বিবেকানন্দ তাঁহার ধর্ম্মকে 'dynamic religion' বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই dynamism-কে তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের ভিত্তি করিয়াছেন; প্রভেদ এই যে, একজন প্রকৃতিপন্থী হইলেও যুক্তিবাদী, অতিশয় নিয়মতান্ত্রিক, তাই 'morality'র উপরে উঠিতে পারেন নাই ; আর একজন অধ্যাত্মবাদী, তাই সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণু ; তাঁহার ধর্ম্মে, আত্মা আত্মা ছাড়া আর কিছুরই বশীভূত নয় ; morality প্রভৃতি 'custom' মাত্র—'character'ই সব। কিন্তু কেহই বিনাযুদ্ধে জয়লাভের কথা বলেন নাই ; পথ-চলার 'আনন্দ' নয়—পথ-চলার দারুণ বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-বিভীষিকাকে অপসারিত করিবার যে শক্তি তাহার সাধনাকেই একমাত্র সত্য-সাধনা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এই তত্ত্বের রস-রূপ ট্র্যাজেডির আকারে প্রকটিত করিয়াছেন। বিবেকানন্দও 'মায়া'কে নস্যাৎ করিতে পারেন নাই, বরং সেই মোহিনী তাঁহার বাঙালী-প্রাণকে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিয়াছিল, নতুবা, তিনি এত বড় প্রেমিক হইতে পারিতেন না। মঃ রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দের নূতনতর মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিবার ছলে লিখিয়াছেন—

Nothing in the world is to be denied, for, Maya, illusion, has its own reality. We are caught in the network of phenomena. Perhaps it would be a higher and a more radical wisdom to cut the net, like Buddha, by total negation, and to say : "They do not exist." But in the light of the poignant joys and tragic sorrows, without which life would be poor indeed, it is more human, more precious to say : They exist. They are a snare.

—বাঙালী কবি ও বাঙালী সন্ন্যাসী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই ; "They exist. They are a snare"—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিও এই আর্ত্ত-ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতএব, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য

তাহা মাত্রাগত; বিবেকানন্দ বঙ্কিম-যুগের প্রবৃত্তিকে বিপরীতগামী করেন নাই, তাহার সেই ধারাকেই সহসা এক গভীরতর খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বিবেকানন্দের কথা প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবল একটি কথা এখনও বাকি আছে। বিবেকানন্দের বাণীই যে পরবর্ত্তী মন্বন্তরের কোলাহলে ভারতের নিজস্ব সাধনাকে কিছু পরিমাণে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে সে বিষয়ে কিছু না বলিলেও চলিত; কিন্তু এই জাতি এতই সত্য-ভীরু ও পাপ-দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন সাধনার ক্ষেত্রেও গুরুশিষ্যের সম্পর্ক স্বীকার করে না। বাঙালী ডুবিয়াছে, তাই বঙ্কিমচন্দ্রও ডুবিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষ তো জাগিয়া উঠিতেছে; সেই জাগরণের অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী এখনও কার্য্যকরী হইয়া আছে। তথাপি বিবেকানন্দের প্রতিও সেই মনোভাবের কারণ কি? মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণ-উদ্বোধন-নীতির মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণীই যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবে কে? মহাত্মা গান্ধী যে কখনও বিবেকানন্দের নাম করেন নাই এমন নহে; তথাপি একজন বিদেশীকেও দুঃখ করিয়া বলিতে হইয়াছে—

It is regrettable that the name the example and the words of Vivekananda have not been invoked, as often as I could have wished, in the innumerable writings of Gandhi and his disciples.

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই,—বিবেকানন্দ যে বাঙালী! কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস হইতে বাঙালীর কীর্ত্তি মুছিয়া ফেলিবার এত আগ্রহ যাহাদের তাহারা সত্যাগ্রহী হইতে পারে, কিন্তু সত্যবাদী হয় কেমন করিয়া? আমার এই কথাগুলি অনেক বাঙালীরও ভাল লাগিবে না, তাহা জানি, কারণ, এ ধরনের কথা রাজনৈতিক-বুদ্ধিসঙ্গত নয়; সত্যকে গোপন করা, এবং মিথ্যাকে সহ্য করা—অকপট না হওয়াই রাজনৈতিক ধর্ম; এই জন্যই কি বিবেকানন্দ রাজনীতিকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন? কারণ, ইংরেজের মত ও-পাপ হজম করিয়া চরিত্র বজায় রাখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমি গান্ধীভক্ত ভারতীয়দের কথাই বলিতেছি, মহাত্মা গান্ধীর কথা বলিতেছি না। কথা উঠিতে পারে, ইদানীং বাংলাদেশেই বা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দের নাম কয় জন করিয়া থাকে? কথাটা সত্য, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র; বাংলার নবযুগের সেই ধারাই যে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—কাহার দ্বারা ও কেমন করিয়া তাহা হইয়াছে, এই আলোচনার পরিশিষ্টে তাহাই বলিব।

একদিকের কথা বলিলাম, আর একদিকে, অর্থাৎ সাধনার অপর ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় একই, বরং আরও বিচিত্র—কারণ, সেখানে এই বিস্মৃতি অ-বাঙালীর নয়, বাঙালীর। বিবেকানন্দের কর্ম্ম-মন্ত্র যেমন মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র হইয়াছে, তেমনই, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এ যুগের এক মহা শক্তিমান সাধকের সাধনার সহায় হইয়াছে,

—শ্রীঅরবিন্দ যে সেই সাধন-মন্ত্রেরই উত্তর-সাধক, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; তাঁহার নিজেরই রচনাবলীতে ইহার স্পষ্ট আভাস আছে। কিন্তু পরে, একটি সম্প্রদায়ের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সেই সাধন-ধারার পারম্পর্য্য আর স্বীকৃত হয় না, বরং ক্রমেই একটা বিরোধের ভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারের 'Eastern Lights' নামক উপাদেয় গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্ময় ও কৌতুক বোধ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের নব-দর্শনের নবত্ব ও মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহার একটিও শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের তত্ত্ব-দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। আমি এখানে সেই তত্ত্বের দার্শনিক গহনে প্রবেশ করিব না, কেবল নমুনাস্বরূপ একটি প্রধান তত্ত্বের উল্লেখ করিব। শ্রীঅরবিন্দের নব-দর্শন সম্বন্ধীয় সেই তত্ত্বটি সরকার মহাশয় এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"Energy and matter are the bi-polar expression of the divine Sakti"; যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-মূর্ত্তির ভিতরে দৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটে এ তত্ত্ব নূতন নহে। তাহা ছাড়া, Arthur Avalon-এর সহিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের তন্ত্র-সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই তত্ত্বের সন্ধান অনেকেই পাইয়া থাকিবেন। এমন কথা বলিলেও হয়তো অযথার্থ হইত না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যাহা বীজ বা অঙ্কুররূপে বিদ্যমান, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার প্রতিভাবলে তাহাকেই পূর্ণবিকশিত করিয়া, অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভঙ্গীতে তাহাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু বলিব না, কেবল উক্ত প্রবন্ধ হইতে আরও দুই-একটি এমন উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহা শ্রীঅরবিন্দ অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা বিবেকানন্দ সম্বন্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য। যথা—

"Shiva and Kali, Brahman and Sakti are one, and not two who are separable. Force inherent in existence may be at rest or in motion."

এ উক্তি যদি কোন অর্থে নূতন হয়, তবে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের। নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দুইটিও বিবেকানন্দের; প্রথমটির আলোচনা আমি ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে করিয়াছি—বিবেকানন্দ-প্রচারিত 'Individuality'র ব্যাখ্যায়, এবং আরও পূর্ব্বে, 'আত্মা'র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধিকার-বোধ এবং 'ব্যক্তি'র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাভিমানের পার্থক্য-বিচারে; ইহা যে বিবেকানন্দেরই বাণী, তাঁহার বক্তৃতাগুলির মধ্যে তাহার অজস্র প্রমাণ মিলিবে।—

"But the finer insight of Aurobinda has been able to distinguish will from desires, and to discern the cosmic and the transcendent movement of will from egoistic tendencies."

* * * *

"Aurobinda is equally alive to the play of the divine life in creatian and destruction. 'God is there not in the still small voice, bgt in the fire and the winds'."

এ তত্ত্ব ভারতবর্ষে আদৌ নূতন নহে, বিবেকানন্দের প্রের আরও পুরাতন। আরও আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, এই প্রবন্ধে, James, Bergson, Plato, Schopenhauer, বুদ্ধ, চৈতন্য, তন্ত্র, সাংখ্য, বেদান্ত—কিছুই বাদ যায় নাই, বাদ গিয়াছেন কেবল বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ!—যেন তাঁহাদের বাণীর মৌলিকতা বিচারযোগ্যই নয়। 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'—কিন্তু ইহা কি সত্যই মতিভ্রম? সত্যের উপরে ব্যক্তিকে স্থান দিলে ব্যক্তিরও যেমন মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনই, যুগের স্বরূপ ও তাহার ধারাটি ধরিবার পক্ষে বড়ই বিঘ্ন ঘটে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আখেরী

১৩৫০ সালের চৈত্রের শেষ, ইংরিজী ১৯৪৪এর এপ্রিল। পার্কের নিঃশেষে-পাতা-ঝ'রে-যাওয়া কৃষ্ণচূড়াগাছে ফুলের কুঁড়ির স্তবকগুলো পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে; মাথার দিকে লালচে আভা গাঢ় হয়ে এসেছে; কাঠমল্লিকা ফুটেছে অজস্র, আরও অনেক ফুল ফুটেছে; বসন্ত চ'লে গিয়েছে, গরম পড়েছে, ভোরের বাতাস স্নিগ্ধ, কিন্তু তার মধ্যে আর সে দখনে হাওয়ার মিষ্টতা নাই।

ভোরবেলা। ঝাড়ু পড়ছে রাস্তায়। জল দেওয়ার শ্রমিকেরা এসে হাঁকছে।— ফুটপাথে এখনও লোক শুয়ে আছে।

বাগবাজার-শ্যামবাজারের মোড়ে একটা ছোট চায়ের দোকান। পাশে একটা বিড়ির দোকান ত্রিশঙ্কুর মত অর্থাৎ কাঠের কুলুঙ্গীর উপর। বিড়িওয়ালা হুসেন, চায়ের দোকানের অমূল্য এখনও ঘুমুচ্ছে। ভোরের বাতাস এখনও ঠাণ্ডা, তাতে এখনও পেট্রোল-মোবিলের ধোঁয়া মেশে নি; বাস ছাড়তে শুরু করে নি। মিলিটারী লরী সবে চলতে আরম্ভ হয়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে এক দল লরী; হরেক রকম মাল এবং মানুষ অর্থাৎ সেপাই বোঝাই নিয়ে চলেছে, লালচে ধুলোয় একাকার হয়ে গিয়েছে।

চায়ের দোকানটার এ পাশে একটা মিষ্টির দোকান। এ দোকানটা এর মধ্যে চালু হয়েছে। উনোনে আঁচ গনগন করছে, কড়াইয়ে ঘি তেতে উঠেছে, মোটাসোটা কারিকরটি জিলিপি ছাড়ছে, একজন একটা ছোট ঝুড়িতে বাসী—মানে, অচল বাসী কচুরি মিষ্টি গুঁড়ো ক'রে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে কাক-ভোজনের জন্য; ট্রামের তার থেকে রাস্তার উপর নেমে এসেছে কাকের ঝাঁক। গোটা দশেক ভিখিরীর ছেলেও তাদের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওদিক থেকে আসছে যুদ্ধের কারখানায় শ্রমিকবাহী লরী। তারই মধ্যে আছে খাস-অ্যামেরিকানবাহী বাস। বিশ ত্রিশ হাত লম্বা রেলের থার্ড সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ির মত চেহারা, মাথায় পাঁচটা লাল আলো, পিছনে তিনটে, তার মধ্যে মাথার দুটো সর্ব্বদাই জলছে, নীচেরটা জ্ব'লে উঠছে গাড়িটা থামলেই, আবার চললেই

নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকের ফুটপাথে চলেছে গঙ্গাস্নানের যাত্রী। পুণ্যকামী মেয়েরা, স্বাস্থ্যকামী বাবুরা, গাজনে সন্ন্যাসব্রতধারী মেয়েপুরুষ। ঘারিক ঘোষের দোকানের পাশে পঞ্চাশের কঙ্কালের দল ফেলে-দেওয়া দইয়ের খুরি, এঁটো পাতা কুড়িয়ে চাটতে বসেছে। ক'জন রুগ্ন পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে ধুঁকছে। ঝুড়িতে বোঝাই তরকারি নিয়ে দেহাতি হাটুরেরা চলেছে বাজারে। খবরের কাগজওয়ালারা সাইকেল হাঁকিয়ে ছুটছে।

হঠাৎ যে লোকটা কাক-ভাজনের জন্য কচুরিগুঁড়ো ছড়াচ্ছিল, সে চীৎকার ক'রে উঠল, অ্যাই! জিলিপি ভাজছিল যে সে বলে উঠল, শালা!

একটা কাককে চাপা দিয়েছে একখানা লরী। যাক, ছোঁড়া তিনটে বেঁচেছে। যে জিলিপি ছাড়ছিল সে বললে, আর থাক। ছিটুস নি আর। তারপর আবার বললে, গুপের জন্যে রেখেছিস তো? সে বেটা এখনও এল না যে?

ওই যে! 'ওই যে অমূল্যকে খোঁচা মারছে।

হুঁ। বন থেকে বেরুল টিয়ে লাল গামছা মাথায় দিয়ে। বেটা আনারস রাত্রে থাকে কোথা বল্ দেখি! এই! এই গুপে!

দশ বারো বছরের বাচ্চা একটা। সতেজ আগাছার মত ছেলে। কাক চাপা পড়েছে দেখে নাচতে আরম্ভ করেছে। লে—খা—খা! খাঁয়ে যা কচুরি। কা! কা! কা!

জিলিপি-ভাজিয়ে কারিকর ধমক দিলে, মারব গিয়ে থাপ্পড়। কাক মরেছে তাতে নাচন কিসের?

চায়ের দোকানের অমূল্য উঠেছে. সে বললে, দেখ না। ভারী পাজী!

গুপে হি-হি ক'রে হাসছে। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল গুপের, সে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলে চেপ্টে-যাওয়া কাকটাকে। এঃ হে-হে রে। নির্দ্দম, একেবারে ছাতু ক'রে দিয়েছে। শালারা!

মাথার উপরে কাকের দল কলরব ক'রে উড়ছে। গুপের হাতে মরা কাকটাকে দেখে তারা তাকেই আক্রমণের লক্ষ্য করেছে। গুপে কিন্তু 'শালারা' ব'লে তাদের গাল দেয় নি। দিচ্ছিল লরীর ড্রাইভারকে।

কাকের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল। গুপে কাকটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এল চায়ের দোকানে। দোকানে তখন চায়ের খদ্দের এসে গিয়েছে জন চারেক। দুজন হাফপ্যান্টের সঙ্গে কলার দেওয়া গেঞ্জি পরেছে, পায়ে কাবলী স্যাণ্ডেল, ওরা সব যুদ্ধের কারখানায় কাজ করে; একজন বাস-ড্রাইভার শিখ; একজন সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক।

(১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সপ্তর্ষি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিঠিখানা পড়তে পড়তে ইন্দুর সুন্দর মুখখানাও অজ্ঞাতসারে যেন পাষাণের মত কঠোর হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হতে লাগল, তা আর যাই হোক আনন্দ নয়। নিজের ব্যর্থ ব্যথিত জীবনের অনতিক্রম্য অভিশাপ বহন ক'রে সংসারের সমস্ত আনন্দ-উৎসব থেকে সে নিজেকে যথাসাধ্য দূরেই সরিয়ে রেখেছে, তার কারণ পাছে তার দুর্ভাগ্যের উত্তাপে আর কারও সৌভাগ্যের ফুল শুকিয়ে যায়, তা ঠিক নয়। নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই নিজেকে অবলুপ্ত ক'রে দিতে চায় সে। যে মহাকালের নিদারুণ বিধানে তার সমাজ-জীবনের আশা-আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা একবার নয় দু-দুবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সে মহাকালকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু পরাজয়-গ্লানি-লাঞ্ছিত এই ভাগ্য নিয়ে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে সেই সমাজ-জীবনে আর সে ফিরে যেতে চায় না। যেখানে গৌরবের আসন দাবি করেছিল, সেখানে সসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে কিছুতেই। বড় বউদিদি কেন তাকে যেতে লিখেছেন, তিনি কি তাকে চেনেন না? তাকে এমন অপদস্থ করবার মানে কি?

হংস-শুভ্র আড়চোখে একবার কন্যার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন। হাঁটুর আন্দোলন আরও বেড়ে গেল। কিছু বললেন না। গড়গড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ রইল না খানিকক্ষণ। ইন্দু চিঠিখানা প'ড়ে সযত্নে সেখানা খামের মধ্যে পুরে তেপায়ার ওপরে রেখে চ'লে যাচ্ছিল, এমন সময় হংস-শুভ্র কথা কইলেন।

বড়বউ নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শশাঙ্কটাকে নানা রকম হুজুকে ক্রমাগত। এদিকে ঋণে তো জেরবার হয়ে পড়েছে শুনছি।

ঋণ শোধ হয়ে গেছে বোধ হয়। নতুন একটা মিল কিনেছেন, শুনলাম সেদিন তারাপদর কাছে।

খুব শান্ত কণ্ঠে কথাগুলি বললে ইন্দু-শুভ্রা। মিল কেনার কথা হংস-শুভ্রও শুনেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর মনে একটা জ্বালাও ছিল। অতর্কিতে উত্তপ্ত কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

হ্যাঁ, কিনেছে—বড়বউয়ের নামে।

ইন্দু চুপ ক'রে রইল। তারপর অতিশয় নিরীহভাবে প্রশ্ন করলে, আপনার কি কি কাপড় গুছিয়ে দেব? যাবেন তো, বড়বউদি অত ক'রে অনুরোধ করেছেন যখন?

খানিকক্ষণ গড়গড়া টেনে অগ্নিবর্ষী চক্ষুর দৃষ্টি ইন্দুর মুখের ওপর স্থাপন ক'রে বললেন, যাব কেন?

ইন্দু নতমুখে নতদৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্দুর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে থেকে হংস-শুভ্রের দৃষ্টির জ্বালা স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল—সবেদন স্নিগ্ধতায়। এই তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান—কনিষ্ঠ এবং প্রিয়তম। এর ওপরই বিধাতার যত আক্রোশ! আই. এ. পাস ক'রে নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছিল মহীতোষকে, ছ মাসের মধ্যে বিধবা হ'ল। বছর দুই পরে আবার বিয়ে দিলেন—বীরেনও বাঁচল না। ওর জন্যে আলাদা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন, আলাদা সম্পত্তি ক'রে দিয়েছেন। যথেচ্ছাচার জীবন যাপন করবার কোন সুযোগের অভাব নেই। এ যুগে সবাই ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, ওই বা দেবে না কেন—তিনি নিজেও তো কম কিছু করেন নি? পর পর কয়েকটা মুখ মানস-পটে ফুটে উঠল—জোহরা, স্বর্ণ, মিস এলিসন, মিসেস ঘোষ, মোক্ষদা, আরও কয়েকটা— কেউ তো একালে আত্ম-সম্বরণ ক'রে ব'সে নেই, পারুক না পারুক দু হাতে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বিস্তার করেছে সবাই। কুন্দর মুখখানা আবার মনে পড়ল—ইন্দুই বা কৃচ্ছ্রসাধন করবে কেন, এর মধ্যেই সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে যাবে কেন ওর? একটা ছেলে পর্য্যন্ত হ'ল না! কলকাতায় নিজের বাড়িতে গিয়ে বেশ জমজমাট হয়ে থাকুক না, কিন্তু না, তা থাকবে না ও, থান প'রে শুধু হাতে আমার চোখের সামনে হবিষ্যি ক'রে যাবে দিনের পর দিন। মাথার সিঁদুরটা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে। বাসন্তীর নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করবে ঠিক। হংস-শুভ্রের চোখের দৃষ্টি আবার প্রখর হয়ে উঠল।

আমি যাব কেন? আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক একটা ফরম্যুলা মাত্র, একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার শুধু। আমি প্রাগৈতিহাসিক। শ্বেতপাথরের বাসন দিয়ে আমার যুগের সঙ্গে এ যুগের সেতু বাঁধবার চেষ্টা দুশ্চেষ্টা তোমাদের।

তবু আপনাকে যেতেই হবে শেষ পর্য্যন্ত।

তুমি যদি জোর ক'রে নিয়ে যাও, তা হ'লে যেতেই হবে।

কন্যার মুখের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে মৃদু হাসলেন হংস-শুভ্র। যে

প্যাচটা কষেছেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়া ইন্দুর পক্ষেও অসম্ভব হবে ভেবে বেশ একটু পুলকিতই হলেন তিনি। ইন্দু তবু চেষ্টা করতে ছাড়লে না।

আমি ভাবছি—

তুমি কি ভাবছ, তা জানি। তুমি ভাবছ, বুড়োটা ওই হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মরুক, আমি দিব্যি এখানে নিরিবিলিতে থাকি। তোমরা সবাই স্বার্থপর।

ক্ষণকাল নীরব থেকে ইন্দু বললে, বেশ, যাব তা হ'লে।

ব'লেই চ'লে যাচ্ছিল, হংস-শুভ্র ডাকলেন।

আজ সোম আসবে একটু পরেই। মনে আছে তো?

কাকামণির ঘরটাই ঠিক করতে যাচ্ছি।

পালংশাক আনতে দেওয়া হয়েছে?

তারাপদকে স্বক্তোর সব জিনিসই আনতে দিয়েছি, কিন্তু এখনও তার পাত্তা নেই। তুমি ওকে বড্ড আশকারা দাও বাবা।

এ আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ পেল না, কারণ দ্বার-প্রান্তে ভট্টাচার্য্য মশাই দেখা দিলেন। এইবার মহাভারত-পাঠ শুরু হবে।

ইন্দু-শুভ্রা কাকামণির ঘর ঠিক করতে গেল।

খ

কাকামণির ঘর ঠিক ক'রে ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দু নিজের ঘরে এসে ঢুকল। তার সমস্ত মন জুড়ে কি যে একটা হচ্ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। ঠিক রাগ নয়, ঠিক বিরক্তিও নয়, কি যেন একটা কি! মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। দু-দুবার বিধবা হয়েছে ব'লে যে গ্লানি হওয়া স্বাভাবিক, সে গ্লানি একা ঘরে তার হয় না, সে গ্লানি সামাজিক। দুবার বিধবা হয়ে সমাজের কাছে সে যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, উপর্য্যুপরি দুবার ট্রেন মিস করলে আর পাঁচজনের কাছে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। মহীতোষ কিংবা বীরেনের সম্বন্ধে তার যে কিছুমাত্র মমত্ববোধ নেই—এ কথা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু সে মমত্ববোধটা তার সমস্ত সত্তাকে সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে থাকে না। দুটি যুবক তার জীবনে অতি অল্পদিনের জন্য এসেই চ'লে গেছে—এদের মধ্যে কেউ একজন বেঁচে থাকলে হয়তো তার জীবন ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠত, এই সব স্মৃতি-সম্ভাবনা নিয়ে সারা-জীবন হা-হুতাশ ক'রে কাটিয়ে

দেওয়ার মত নির্জীব মন তার নয়। তার পরনে থান, মাথায় সিঁদুর নেই, অঙ্গ নিরাভরণ, এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন ক'রে কম্বলে শুয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সে পালন করছে বটে, কিন্তু অন্তর তার নিরাসক্ত নয়, বৈরাগ্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে সে, মুক্তি তার কাম্য বটে, কিন্তু 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' সে মুক্তি। কিন্তু কোথায় সে সহস্র বন্ধন, যা তাকে মহানন্দময় মুক্তির সন্ধান দেবে? স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর যে বন্ধন, কোন এক বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার জন্যে যে সব সামাজিক বন্ধনে জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বাঁধা পড়ে, তা কি সব সময়ে আনন্দময়? তা তো নয়। বাড়ির কার সঙ্গেই বা তার মনের সুর মেলে? যাদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাদের সঙ্গেই বা মিলত কি না কে জানে! মহীতোষের প্রেমে প'ড়েই তাঁকে বিয়ে করেছিল সে, মনে হয়েছিল যে, মনের সুর মিলেছে, কিন্তু দু দিনেই ভুল ভেঙেছিল। যে মহীতোষকে সঙ্গী ক'রে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে এক আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে আশা করেছিল, সেই মহীতোষ যখন বিয়ের পর খাকি হাফপ্যাণ্ট প'রে পুলিসে চাকরি নেবার জন্যে স্থানে-অস্থানে সেলাম ক'রে বেড়াতে লাগল, তখন তার স্বপ্ন-কাব্যে প্রথম ছন্দঃপতন ঘটল। পুলিসমাত্রেই যে খারাপ তা নয়, খাকি হাফপ্যাণ্ট অনেক ভদ্রলোকেও পরে, তবু যে কেন বেসুরো বাজল তা ঠিক জানা নেই তার, কিন্তু বেজেছিল। হয়তো আবার সুর জমত এসব সত্ত্বেও, হয়তো জমত না, কিন্তু মহীতোষ বাঁচল না। তারপর এল বীরেন। বীরেনকে সে আগে চিনত না। বাবা সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিয়েতে মত দিয়েছিল মাত্র। অন্য কোন কারণে নয়, বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত— এই সুস্থ মতবাদকে সমর্থন করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। অপরে যা করতে ভয় পায় সে যে তা অকুতোভয়ে করতে পারে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মত দিয়েছিল। আবার বিয়ে করবার দিকে বিশেষ একটা লোলুপতা তার ছিল না। যৌন-সম্ভোগ-লালসা তার জীবনকে কোনদিনই নিয়ন্ত্রিত করে নি, অযৌন জীবন যাপন করলে যে নারী-জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবেই এই হাস্যকর উক্তিকে সে কোনদিনই যুক্তিযুক্ত মনে করে না, সে বিয়ে করেছিল বিধবা-বিবাহের প্রতি সমাজের অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ। বিধবা-বিবাহ সমাজে সুপ্রচলিত থাকলে হয়তো সে বিয়ে করত না।…বীরেনও বাঁচল না। দু-দুটো বন্ধন খুলে গেল। কিন্তু তাই ব'লে সে কি দাদা-বউদিদিদের সংসারে

ঢুকে সকলের অনুকম্পা-ভাজন হয়ে তাদের ছেলে-মেয়ে মানুষ ক'রে নারীজন্ম সার্থক করবে? যাদের সঙ্গে এতটুকু মতের মিল নেই, সারা-জীবন তাদের কথায় সায় দিয়ে দিয়ে গৃহলক্ষ্মী সেজে ব'সে থাকবে? পৃথিবীতে আর কাজ নেই? আর মানুষ নেই? আছে বইকি। অজস্র মানুষ আছে, সহস্র সহস্র মানুষ আছে, যাদের সে দেখে নি অথচ ভালবাসে, যাদের আদর্শকে সে শ্রদ্ধা করে, যাদের মনের সুরের সঙ্গে তার মনের সুর ঠিক ঠিক মিলে যায়, তারাই তার আত্মীয়। তাদের জন্যেই বাঁচতে হবে, তাদের জন্যেই বৈধব্যের এই ছদ্মবেশ। তাদের জন্যেই দরকার হ'লে বিলাসিনীর ভূমিকাতেও সে অবতীর্ণ হবে তার পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে, কিন্তু এখনও তার প্রয়োজন হয় নি, প্রয়োজন হ'লে সে সব করবে, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেবে, কিন্তু এখন নয়। এখন তাকে দমদমের বাড়িতেই থাকতে হবে কিছুকাল।

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। যে কথাটা এতক্ষণ অস্পষ্টভাবে তার মনকে আকুল ক'রে তুলছিল, সহসা সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথা নয়, বর্ণনা। মেদিনীপুরের একটা বর্ণনা। বর্ণনাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ বর্ণনার পেছনে যে ছবি প্রচ্ছন্ন আছে, তা ভয়ঙ্কর। সকালে যখন কাগজ পড়ছিল, সেই ছবিটা মুহূর্ত্তের জন্য ফুটে উঠেছিল তার মানস-পটে···তবু শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনে উৎসব করতে হবে, বউদিদির বাবা ঝুড়ি ঝুড়ি উপহার পাঠিয়েছেন—লজেন্‌জ, বিস্কুট, মেওয়া···হীরক জেলে—কম্‌রেড হীরক···হীরককে সে বুঝতে পারে না···নিজের দেশের চেয়ে রাশিয়া তার কাছে বড় হ'ল! বুঝতে পারে না ঠিক, কিন্তু হীরককেই সে এখনও শ্রদ্ধা করে বাড়ির মধ্যে। রজতকেও করত, কিন্তু রজত বিয়ে করেছে, আর কোন আশা নেই তার কাছে, সেতারের তারগুলো এবার ঢিলে হয়ে যাবে ক্রমশ, দীপক রাগিণী আর আলাপ করা চলবে না তাতে। নন-ভায়োলেণ্ট নন-কো-অপারেটার ছোটদার কথা মনে প'ড়েই হঠাৎ অনঙ্গকে মনে পড়ল তার। অনঙ্গের অঙ্গ নাকি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে রোজ জেলে চাবুকের চোটে··· অনঙ্গ জেলের আইন মেনে চলবে না কিছুতে···এ কি ছেলেমানুষি তার, বার বার মার খাবে, তবু মানবে না! হঠাৎ মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল ইন্দু, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা টেনে অনঙ্গের ফোটোখানা বার ক'রে নিনিমেষে চেয়ে রইল সেটার দিকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, শার্লমেন, তৈমুর, চেঙ্গিস, নাদির শা বেঁচে থাকবে;

ক্লাইবও থাকবে, কিন্তু অনঙ্গ থাকবে না, এই কচি কিশোর অনঙ্গ মহাকালের আবর্ত্তে কোথায় তলিয়ে যাবে, কেউ তাকে মনে রাখিবে না—যাদের জন্যে সে প্রাণ দিচ্ছে, তারাও না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে—জল নয়—বিদ্যুৎ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হতে লাগল যেন।

গ

বাইরের ঘরে তখনও মহাভারত-পাঠ চলছিল।

স্বর্গ থেকে পতনোন্মুখ যযাতিকে সম্বোধন ক'রে তাঁর মর্ত্ত্যবাসী দৌহিত্র অষ্টক প্রশ্ন করছিলেন, "উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে?" যযাতি উত্তর দিচ্ছিলেন, "যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রয়-বিবর্জ্জিত এবং কামাচার-পরাঙ্মুখ তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন এবং যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহিক সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র…"

এমন সময় সোম-শুভ্র এসে পৌছলেন।

সোম-শুভ্রের বয়স ছিয়াত্তরের কাছাকাছি হ'লেও তিনি মোটেই অসমর্থ হয়ে পড়েন নি। এখনও বেশ খাড়া আছেন। মুখে প্রাজ্ঞতার ছাপ পড়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যও ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে যে, দেখলে ভয় করে না, সম্ভ্রম হয়। মাথাটি যেন বড় একটি কদমফুল, ছোট-ক'রে-ছাঁটা ধপধপে সাদা চুলে ভরতি। এতটুকু টাক পড়ে নি। গোঁফ-দাড়ি কামানো নিটোল মুখে কোথাও জরার চিহ্ন নেই। চোখের দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। পরনে থান, সাদা লংক্লথের 'চায়না' কোট, পায়েও ধপধপে ক্যাম্বিসের ফিতাহীন জুতো। জুতোটির বিশেষত্ব আছে, ফরমাশ দিয়ে তৈরি করানো। সোম-শুভ্রকে দেখলেই মনে হয়, শুভ্রতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি যেন বিশেষ রকম সচেতন। মলিনতার সামান্যতম গ্লানিও যেন তিনি নিজের ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না। আপাদমস্তক সব ধপধপ করছে।

ঘরে ঢুকেই সোম-শুভ্র হেঁট হয়ে দাদার পদধূলি নিলেন। ভট্টাচার্য্য মশাইকে নমস্কার করলেন।

তুমি এসে পড়লে? নটা বেজে গেল নাকি?

পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে সোম-শুভ্র বললেন, নটা কুড়ি।

স্টেশনে কাউকে পাঠাতে পারি নি, নেপালী চাকরটা পালিয়েছে—

তারাপদ স্টেশনে ছিল।

ও, ছিল বুঝি! তাই বাজার থেকে ফিরতে এত দেরি তার।

সঙ্গে সঙ্গেই তারাপদ কাঁধে সোম-শুভ্রের বিছানার বাণ্ডিল ও হাতে বাজারের থলি নিয়ে ঢুকল। হংস-শুভ্রের কথার জবাবস্বরূপই বোধ হয় বললে, একা আর ক দিক সামলাই, বল। এবং প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখে ভেতরের দিকে চ'লে গেল হনহন ক'রে।

তারাপদ ও হংস-শুভ্র সমবয়সী। শুধু তাই নয়, সহপাঠীও। সেকালে শিব-শুভ্রের বাড়িতে ছোটখাট একটা পাঠশালা ছিল। শিব-শুভ্রের বাড়িতে খেয়ে এবং শিব-শুভ্রের নিকট বেতন নিয়ে একজন পণ্ডিত, শুধু হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রকেই নয়, পাড়ার সব ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াতেন। কাউকে কোন খরচ দিতে হ'ত না। সেই পাঠশালায় তারাপদ হংস-শুভ্র এবং সোম-শুভ্রের সঙ্গে কিছু দিন পড়েছিল। সদগোপের ছেলে তারাপদর পড়া অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হয় নি, কিন্তু এই সুবাদে সে হংস-শুভ্র ও সোম-শুভ্রকে 'তুমি' এবং পরিবারের বাকি সকলকে অসঙ্কোচে 'তুই' বলে। তখন থেকেই সে একাধারে হংস-শুভ্রের বন্ধু এবং ভৃত্য, পার্শ্বচর এবং অনুচর। হংস-শুভ্র তার সমস্ত খরচ বহন করেন, সমস্ত আবদার সহ্য করেন। তারাপদও কম সহ্য করে নি—তার স্ত্রী মোক্ষদার সঙ্গে হংস-শুভ্রের যে সম্পর্ক ঘটেছিল, তাও সে সহ্য করেছিল, কিছু বলে নি। হংস-শুভ্র অবশ্য আর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তারাপদর বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আজীবন তার পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন ক'রে এসেছেন, তবুও এতটা কে সহ্য করতে পারত? হংস-শুভ্রের এই ধরনের অত্যাচার, শুধু একটা নয়, তারাপদ অনেক সহ্য করেছে। সেই ছেলেবেলাতেই যখন পাঠশালায় পড়ত, একটা সুন্দর পেন্সিল কুড়িয়ে পেয়েছিল। হংসকেই দিতে হ'ল সেটা শেষ পর্য্যন্ত। না নিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না। তার বদলে পাঁচটা নতুন পেন্সিল কিনে দিলে অবশ্য, কিন্তু চ্যাপ্টা গোছের ওই পেন্সিলটা সে নিলে। কলকাতার বাজারে ওরকম পেন্সিল তখন পাওয়া যেত না, কোন সায়েবসুবোর পকেট থেকে প'ড়ে গিয়েছিল বোধ হয়। তারাপদ জানে, হংসের স্বভাবই ওই রকম, যখন যেটা ধরে সহজে ছাড়ে না, একেবার চূড়ান্ত ক'রে তবে ছাড়ে। এখন ধর্ম্ম নিয়ে পড়েছে। র‍্যাংকিনের বাড়ির স্যুট ছাড়া যে এককালে আর কোন কিছু পরত না, সে এখন নামাবলী আর পাটের কাপড় প'রে ব'সে আছে।

হয়তো কোনদিন কমণ্ডলু নিয়ে ছাই মেখে বলবে, চললাম সংসার ছেড়ে। কিছুই বিচিত্র নয়। তারাপদর ধারণা, ঝোঁক চেপে গেলে হংস না করতে পারে এমন জিনিস নেই।

ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে সোম-শুভ্র ভেতরে চ'লে গেলেন।

মহাভারত পাঠ-আবার শুরু হ'ল।

"রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? এবং আপনি কোথা হইতে—"

আগামী রবিবার দিনটা কেমন দেখুন তো, এই পাঁজি নিন।

মহাভারতের সম্ভবপর্ব্ব থেকে হঠাৎ গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় নীত হওয়াতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মানসিক অবস্থাটাও অনেকটা যযাতির মত হ'ল। তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

আজ্ঞে, কি বলছেন?

আগামী রবিবার দিনটা শুভদিন কি না দেখুন, সেদিন অন্নপ্রাশন দেওয়া চলতে পারে কি না!

মিনিট পাঁচেক দেখে ভট্টাচার্য্য অভিমত প্রকাশ করলেন, না, অত্যন্ত অশুভ দিন আগামী রবিবার।

হংস-শুভ্রের চোখ দুটো জ'লে উঠল। কিন্তু তিনি চুপ ক'রে রইলেন। ভট্টাচার্য্য আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে পঞ্জিকাটি সন্তর্পণে মুড়ে রেখে পুনরায় যযাতির-উপাখ্যান আরম্ভ করতে যাবেন, এমন সময় হংস-শুভ্র বললেন, আজ আর থাক।

আচ্ছা।

ভট্টাচার্য্য ধীরে ধীরে উঠে গেলেন।

অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের মত স্থির হয়ে ব'সে রইলেন হংস-শুভ্র।

ক্ষণকাল পরেই একটা সাদা প্লেট ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে তারাপদ প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, পণ্ডিত মশাই চ'লে যাচ্ছেন, ডাক তো। ভট্টাচার্য্য আবার ফিরে এলেন।

অন্নপ্রাশনের একটা ভাল দিন দেখে দিন তো পণ্ডিত মশাই।

ভট্টাচার্য্য আবার পঞ্জিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন। তারাপদ প্লেটটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সে হংস-শুভ্রের দিকে যে দৃষ্টিটা

নিক্ষেপ ক'রে গেল, তার অর্থ—আবার কি নিয়ে মাতলে তুমি? ছেলেটার অন্নপ্রাশনে বাগড়া লাগাচ্ছ নাকি?

খানিকক্ষণ পাতা উলটে ভট্টাচার্য্য বললেন, এর পরের বৃহস্পতিটা খুব ভাল দিন।

এর পরই হংস-শুভ্র যে প্রশ্নটি করলেন, তার জন্যে ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনি যজ্ঞ করতে পারবেন?

আজ্ঞে?

আমার নাতির ছেলের অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠান রীতিমত হিন্দু পদ্ধতিতে করতে চাই। তাতে যজ্ঞ হোম ঠিক বৈদিক নিয়ম অনুসারে করতে হবে। আপনি কি অধ্বর্য্যু কিংবা অন্য কোন ঋত্বিকের কাজ করতে পারবেন?

ইতিপূর্ব্বে কখনও করি নি। তবে সাধারণভাবে বৃদ্ধি-টৃদ্ধি—

না, সাধারণভাবে হবে না। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে করতে হবে। ভট্টাচার্য্য হংস-শুভ্রকে চিনতেন। চুপ ক'রে রইলেন।

কাশীতে খবর পাঠাতে হবে দেখছি। জিনিসপত্র যা যা লাগবে, তার একটা ফর্দ্দ কোথা পাই—

আজ্ঞে, তা আমি ক'রে দিতে পারব, বই আছে আমার কাছে।

বইটা আনুন তা হ'লে।

ব'লেই তিনি উঠে অন্দরের দিকে চ'লে গেলেন।

যাচ্ছিলেন সোম-শুভ্রের কাছে। যেতে যেতে হঠাৎ ছবি-ঘরের কপাটটা তাঁর চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলছে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

তারাপদ!

তারাপদ এল।

এ ঘরটা খোল।

প্রকাণ্ড চাবির গোছাটা এনে তালাটা খুলে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল তারাপদ, হংস-শুভ্র বললেন, পণ্ডিত মশাই একটা ফর্দ্দ দেবেন, সেটা তুমি টুকে নাও গিয়ে।

কিসের ফর্দ্দ?

যজ্ঞের।

হংস-শুভ্র ঘরের ভেতর ঢুকে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলেন। বন্ধ দ্বারের দিকে চেয়ে তারাপদ সবিস্ময়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর চ'লে গেল।

ছবি-ঘরে অনেক দিন ঢোকেন নি হংস-শুভ্র। একটা ঘরকে 'ছবি-ঘর' নাম দিয়ে সেটাকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দান তিনিই করেছিলেন একদিন, বহুকাল পূর্ব্বে। মৃত পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনদের ছবিই শুধু নয়, অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অনেক জিনিসও উত্তর দিকের এই ঘরখানিতে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন তিনি। তারাপদকে বলেছিলেন, দুবেলা যেন ধূপধুনা দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় ঘরটা। তারাপদ অক্ষরে অক্ষরে তাঁর আদেশ পালন ক'রে যাচ্ছে, তিনি নিজেই বহুদিন ঘরটাতে ঢোকেন নি। হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের মহাসমুদ্রে অবগাহন ক'রে তাঁর মনে কিছুকাল থেকে এই প্রতীতি জন্মেছিল যে, যারা আত্মার অমরতায় আস্থাবান, মায়া-পাশ ছিন্ন ক'রে অখণ্ড অব্যক্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও জীবের গত্যন্তর নেই ব'লে যাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবকেই জন্মজন্মান্তরের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়ে অবশেষে সেই একই মহাসত্তায় মিশতে হবে এই যারা সত্য ব'লে মনে করে, তাদের পক্ষে এই নশ্বর জীবনের দু-চারটে স্মৃতির টুকরোকে আঁকড়ে থাকার অর্থ—সেই বিরাট প্রবাহকে অস্বীকার করা, যার খরস্রোতে, তারা জানে যে, পর্ব্বত সমুদ্রে এবং সমুদ্র মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আজকের পর্ব্বতের প্রতিকৃতি নিয়ে কি হবে? ওটা তো ওর আসল রূপ নয়। নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল পরমাণুপুঞ্জের একটা বিশেষ মুহূর্ত্তের ছবি রেখে লাভ কি? নিত্য-চলমান বিশ্বজগতের পটভূমিকায় কল্পনানেত্রে দেখলে ওর স্বরূপ হয়তো দেখা যেতে পারে এবং তাই হয়তো সত্য দর্শন। বহুকাল তিনি ঢোকেন নি ঘরটাতে। আজ কিন্তু ওই বড় তালাটা চোখে পড়াতে তাঁর দার্শনিক মন হঠাৎ যেন ক্রীড়াপ্রবণ হয়ে উঠল। দর্শনের বিজ্ঞ অধ্যাপক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সঙ্গে খেলার মাঠে নেমে যেন হুড়োহুড়ি ক'রে খেলতে উৎসুক হলেন।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে শিব-শুভ্রের বিরাট অয়েল-পেন্টিং ছবিখানা। হঠাৎ দেখলে রামমোহন রায় ব'লে ভুল হয়। সেই চোগা চাপকান শামলা। হংস-শুভ্র পিতার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যদিও ছবি ছবিই, তবু হংস-শুভ্রের মত দার্শনিকও মনে মনে কোন একটা

প্রত্যাদেশের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন যেন ক্ষণকাল। বাচনিক কোন প্রত্যাদেশ এল না বটে, কিন্তু অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল মনে। তাঁর আর সোম-শুভ্রের উপনয়নের ছবি। ভট্টপল্লী থেকে গৌরীকান্ত শিরোমণি এসেছিলেন, কাশী থেকে এসেছিলেন পণ্ডিত গোপীনারায়ণ। তা ছাড়া পুরোহিত, পণ্ডিত, শাস্ত্রী আরও অনেকে ছিলেন। বৈদিক মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনিতে বিরাট মণ্ডপটা গমগম করছিল, এখনও তাঁর মনে আছে। বিরাট উৎসব হয়েছিল। সাত দিন সাত রকম। প্রথম দিন হিন্দু মতে—ব্রাহ্মণভোজন, যাত্রা, ভাগবত-পাঠ। দ্বিতীয় দিন মুসলমানী মতে—পোলাও-কাবাব-কোপ্তার খানা, বাইনাচ, মুশয়রা। তৃতীয় দিন সাহেবদের জন্য সাহেবী হোটেলে সাহেবী ফ্যাশানে ডিনার, ড্রিঙ্ক, ডান্স। চতুর্থ দিনে কাঙালী-ভোজন—লুচি, ভাত, ডাল, পোলাও, তরিতরকারি, মিষ্টান্ন—সব রকম, যে যত খেতে এবং নিয়ে যেতে পারে, অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্ত্তন হয়েছিল। পঞ্চম দিন কেবল মেয়েদের খাওয়ানো হয়েছিল, সেও ভূরি-ভোজন। পুরুষদের কোন সম্পর্কই ছিল না তার সঙ্গে। মেয়ে রাঁধুনী, মেয়ে পরিবেশনকারিণী, মেয়ে কীর্ত্তনিয়া, এমন কি মেয়ে-যাত্রা পর্য্যন্ত এসেছিল। ষষ্ঠ দিন কবির লড়াই, কবিদের সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল সেদিন। সপ্তম দিন হয়েছিল পালোয়ানদের কুস্তি, ওস্তাদদের গান, আর তাঁদের প্রত্যেকের ফরমাশ অনুযায়ী খাওয়ার ব্যবস্থা। কেউ খেলেন বাদামের হালুয়া, কেউ মহিষের কাঁচা দুধ, কেউ স্বপাক আলোচাল গাওয়া-ঘি, কেউ সিদ্ধির সন্দেশ, কেউ মধু আর ফলাহার করলেন কেবল, কেউ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে নিলেন নিজের হাতে।...হঠাৎ চাবুকটা নজরে পড়ল হংস-শুভ্রের। চামড়ার ওই হাণ্টারটা দিয়ে সিতাংশুকে খুব মেরেছিলেন তিনি একদিন অবাধ্যতার জন্য। হংস-শুভ্র ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ছবির ভিড়ের মধ্যে সিতাংশুর ছবিখানা খুঁজতে লাগলেন। ওই যে, হাসিমুখে চেয়ে আছে। ব্যারিস্টারের গাউনে কি সুন্দর মানাত ওকে! হিমাংশু সুধাংশুর ছবিও পাশাপাশি টাঙানো রয়েছে, কিন্তু সিতাংশুর দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তিনি। ছেলেটা দুষ্ট ছিল ব'লেই বোধ হয় বেশি ভালবাসতেন তাকে। যা ধরত, তা করত। তাঁর মতের বিরুদ্ধেই ব্যারিস্টারি পড়েছিল, কিছুতেই আই. সি. এস. পরীক্ষাটা দিলে না। কিছুতেই সামলানো যেত না, একটা ঝড় যেন। ঝড় থেমে গেছে। হংস-শুভ্র এগিয়ে গিয়ে আর একটা অয়েল-পেন্টিংয়ের সামনে দাঁড়ালেন। দূরসম্পর্কের পিসীমা ভুবনমোহিনী

দেবী। রক্তের দিক দিয়ে সম্পর্কটা দূর বটে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে এই ভুবনমোহিনী একদিন হংস-শুভ্রের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বহু-বিবাহের যুগে বহুপত্নীবান যে কুলীনের গলায় মালা দিয়ে ভুবনমোহিনী সীমন্তে সিঁদুর পরবার অধিকার পেয়েছিলেন, তাঁর গৃহেই সেই ন বছর বয়স থেকেই বহু সপত্নী সমভিব্যাহারে তিনি এমন নিখুঁত রকম সুন্দর অনাড়ম্বর আত্মমর্য্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন ক'রে গেছেন যে, সে কথা ভাবলে হংস-শুভ্রের শির এখনও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে হংস-শুভ্রের বাড়িতে আসতেন তিনি। প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। হংস-শুভ্র অবাক হয়ে যেতেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর অনবদ্য রূপরাশি দেখে, প্রস্ফুটিত শতদল যেন। বেশি দিন বাঁচেন নি, ভরা-যৌবনেই মারা গেছেন। ইংরেজী-কেতায়-মানুষ হংস-শুভ্র তাঁর একগোছা চুল স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কেটে রাখতে চেয়েছিলেন, ভুবনমোহিনী দেন নি। ভাগ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে একটা ফোটো তুলে রেখেছিলেন, তাই এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। অনেক খরচ ক'রে সেই ফোটো থেকে এই ছবিখানা করিয়ে রেখেছেন তিনি। হংস-শুভ্র যখনই এ ছবিখানার কাছে এসেছেন মনে মনে প্রণাম করেছেন, আজও করলেন। হংস-শুভ্র এগিয়ে গেলেন। ছবির পর ছবি...কত ছবি! দামী গ্লাস-কেসে একখানা শাল রাখা ছিল, কাঞ্চনমালার শাল। সেখানার সম্মুখে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ। পাশেই কুন্দর গয়নার বাক্সটা রয়েছে, যাবার সময় কুন্দ গায়ের সমস্ত গহনা খুলে রেখে গিয়েছিল। তারপরই ভায়রাভাই রুদ্রবিলাস। এককালে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল লোকটার সঙ্গে, চমৎকার শেক্স্‌পিয়র আবৃত্তি করত। কবে ম'রে গেছে। শেক্স্‌পিয়রের নামটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের আরও কতকগুলো প্রিয় নাম মনে প'ড়ে গেল—মিল্টন, বেকন, লক, হিউম, অ্যাডাম স্মিথ, গিবন, রলিন্স...স্বপ্নের মত মনে হ'ল, বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মত। এদের কারও সঙ্গেই আর জীবন্ত সম্পর্ক নেই, সমস্তই স্মৃতি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

প্রথম অঙ্ক

ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো : ড্রয়িং-রুম

ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, পুলিস-সুপার, সিভিল, সার্জন, হেডমাষ্টার, দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা প্রভৃতি

ম্যাজিস্ট্রেট। একটা দুঃসংবাদ দেবার জন্তে আজ আপনাদের এখানে ডেকেছি। শিগগিরই একজন ইন্সপেক্টর আসছে।

জজ। ইন্সপেক্টর ?

দাতব্য-কর্ত্তা। ইন্সপেক্টর ?

ম্যাজিস্ট্রেট। হ্যাঁ, একজন গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর—কলকাতা থেকে, ছদ্মবেশে, সিক্রেট অর্ডার নিয়ে।

জজ। কি দুঃসংবাদ !

দাতব্য-কর্ত্তা। দুঃসংবাদ ব'লে দুঃসংবাদ। এমনিতেই আমাদের বিপদ-আপদের যেন অভাব আছে ? তার ওপরে আবার—

হেডমাস্টার। তার ওপরে আবার 'সিক্রেট-অর্ডার' ! কি সর্ব্বনাশ !

ম্যাজিস্ট্রেট। একটা যে কিছু বিপদ আসছে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কাল সারারাত আমি ইঁদুরের স্বপ্ন দেখেছি—প্রকাণ্ড দুটো কালো ইঁদুর, আমার কাছে এসে গা শুঁকে চ'লে গেল। তখনই মনে হ'ল, একটা বিপদ আসছে। আর ভোরবেলা উঠেই এই সংবাদ।...যাক, চিঠিখানা আপনাদের প'ড়ে শুনিয়ে দিই। আমার বন্ধু বীরনগরের রায় সাহেবকে তো আপনি জানেন [দাতব্য-কর্ত্তার প্রতি]। রায় সাহেব লিখছেন, 'প্রিয় রায় বাহাদুর' [চিঠিখানার বিশেষ বিশেষ অংশ পড়িতে লাগিলেন] কোথায় গেল—এই যে, "অন্যান্য সংবাদের মধ্যে একটা বিশেষ খবর-এই যে, এই বিভাগ—তার মধ্যে আবার আমাদের জেলা পরিদর্শনের জন্য একজন ইন্সপেক্টর ছদ্মবেশে আসিয়া পৌছিয়াছেন ; তিনি ইন্সপেক্টর বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না, সাধারণ লোক হিসাবে চলাচল করিতেছেন। এই খবর একান্ত বিশ্বাসজনক সূত্রে প্রাপ্ত। আমি তো জানি যে, সাধারণ মানুষ-সুলভ দুর্ব্বলতা আপনার আছে, কারণ কোন বিচক্ষণ মানুষই সুযোগ আসিলে ছাড়িয়া দেয় না।" [একটু থামিয়া, কাসিয়া] এখানে তো সকলেই আমরা বন্ধু, কাজেই...[পুনরায় পড়িতে লাগিলেন] "আমি পূর্ব্বাহ্ণেই

আপনাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি যে, যে কোন মুহূর্ত্তে এই ইন্সপেক্টর আপনাদের মধ্যে গিয়া পৌছিতে পারেন, যদি তিনি ইতিমধ্যেই ছদ্মবেশে গিয়া না পৌছিয়া থাকেন। হয়তো তিনি এখনই আপনাদের মধ্যে বসবাস করিতেছেন, আপনারা জানিতেও পারিতেছেন না। গতকল্য আমি"··· যাক, এবার তাঁর পারিবারিক সংবাদ আরম্ভ হ'ল, "গতকল্য আমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি রতনবাবু আসিয়া পৌছিয়াছেন। রতনবাবু আরও মোটা হইয়াছেন এবং অবসর পাইলেই বসিয়া বসিয়া বাঁশী বাজান।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। যাকগে। তা হ'লে ব্যাপার হ'ল এই—

জজ। দুঃসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এমন হ'ল? নিশ্চয় কোন জরুরি কারণ আছে।

হেডমাস্টার। সত্যি রায় বাহাদুর, কেন এমন ঘটল? ইন্সপেক্টর কেন আসতে যাবে? আপনার কি মনে হয়?

ম্যাজিস্ট্রেট। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] কেন আর কি? ভবিতব্য! ভবিতব্য! এতদিন অন্যান্য জেলায় গিয়েছে, এবার আমাদের পালা।

জজ। অত সহজ নয় রায় বাহাদুর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খুব জরুরি আর গোপনীয় কারণ আছে। ব্যাপারটা রাজনৈতিক। [নীচু স্বরে] শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে, তাই খবর নেবার জন্যে ইন্সপেক্টর বেরিয়েছে, কোথাও কোন বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা আছে কি না!

ম্যাজিস্টেট। আপনি এমন বিচক্ষণ লোক, আর এসব কথা বলছেন! বিশ্বাসঘাতকতা এই দিনাজসাহী শহরে! তবু যদি বা সীমান্তের ধারে কাছে হ'ত! এক মাস হাঁটলেও সীমান্তে গিয়ে পৌছনো যায় না এমন শহর এই দিনাজসাহী।

জজ। আমার মনে হয়, আপনি ভুল করছেন। রাজধানীতে যারা থাকে, তাদের বুদ্ধিই অন্য রকম। ক্ষতির কারণ না থাকলেও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেওয়া সেই বুদ্ধির একটা লক্ষণ।

ম্যাজিস্ট্রেট। কারণ যাই হোক, আগে থেকে আপনাদের সতর্ক ক'রে দিলাম। আমার ডিপার্টমেণ্ট আমি ইতিমধ্যে গুছিয়ে নেব। আপনাদেরও তাই করা উচিত। [দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তার প্রতি] রসময়বাবু, ইন্সপেক্টর যে আপনার দাতব্য-হাসপাতাল দেখতে যাবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। রুগীগুলোকে যেন ভিখিরীর মত না দেখায়। হঠাৎ

ওদের ভিখিরী ব'লেই মনে হয়। বিছানাগুলো একটু ফিটফাট যেন থাকে।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ আর এমন বেশি কি! বিছানাগুলো একটু পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। হ্যাঁ, বিছানাগুলো দেখলে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা ব'লে মনে হয়।

আর এক কাজ করতে হবে প্রত্যেকখানা তক্তাপোশের পাশে, প্রত্যেক রুগীর মাথার কাছে ইংরিজীতে উচ্চাঙ্গের একটা নীতিবাক্য লিখে রাখা উচিত; প্রত্যেক রুগীর পায়ের কাছে একখানা কাগজে রুগীর নাম, রোগের নাম, বয়স, কতদিন ভুগছে, সব লেখা থাকা দরকার।

সত্যি, আপনার রুগীরা এমন কড়া তামাক খায় যে, কাছে গেলেই হাঁচি পায়। আর রুগীর সংখ্যা কম হ'লেই ভাল ছিল, নতুবা ইন্সপেক্টর মনে করতে পারেন যে, স্বাস্থ্য-বিভাগ যথেষ্ট মনোযোগী নয়, কিংবা সিভিল-সার্জন কিছু জানেন না।

দাতব্য-কর্ত্তা। চিকিৎসার বিষয়ে যদি বলেন, তবে আমি আর সিভিল-সার্জন অনেক দিন হ'ল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়াই চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য, সেইজন্যে দামী ওষুধ আমরা ব্যবহার করি না। আমার রুগীরা গরিব লোক, যদি মরে নিতান্ত সাদাসিধেভাবে মরবে। আর যদি বেঁচেই ওঠে, তাও সাদাসিধেভাবেই উঠবে। বাঁচা মরা যেমনই হোক, সিভিল-সার্জনের পক্ষে ওদের চিকিৎসা করাই সম্ভব নয়, কারণ ডাক্তার পিলাই এক অক্ষরও বাংলা বুঝতে পারেন না।

সিভিল-সার্জন। [অস্পষ্ট নাসিকা-গর্জ্জন দ্বারা আপত্তি প্রকাশ করিল।]

ম্যাজিস্ট্রেট। [জজের প্রতি] মিঃ সিন্‌হা, আপনিও একটু দৃষ্টি রাখবেন আদালত-বাড়িটার দিকে। এজলাস ঘরের মধ্যেই আপনার চাপরাসীরা মুরগী পালতে শুরু করেছে। ওঃ; সেদিন দেখি, একপাল হাঁস মুরগী সে কি ডাক শুরু করেছে! উকিলবাবুদের সওয়ালের সঙ্গে হাঁসের ডাক মিলে সে কি জটিল ঐক্যতান! অবশ্য পক্ষীপালন খুব উপকারী, বিশেষ এই দুর্দ্দিনে। কিন্তু একেবারে প্রকাশ্য আদালতে ব্যাপারটা বোধ করি বাঞ্ছনীয় নয়। আমি অনেকবার আপনাকে মনে করিয়ে দেব ভেবেছি, কিন্তু কাজের চাপে কিছুতেই মনে রাখতে পারি নি।

জজ। আজকেই আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি, সব যেন আমার বাবুর্চ্চিখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আসুন না আজ রাত্রে ডিনারে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আরও একটা কথা। আদালত-ঘরের দেয়ালে ঘুঁটে দিয়ে দিয়ে বসন্তের রুগীর গায়ের মত হয়ে গিয়েছে। আর রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা শুকোতে দেখা যায়। আর সেরেস্তার আলমারির গায়ে একখানা শঙ্কর মাছের চাবুক ঝুলতে দেখেছি। এতে ক'রে প্রমাণ করে, শিকারে আপনার খুব শখ। কিন্তু কয়েক দিনের জন্যে ওটা সরিয়ে নেওয়া দরকার। তারপরে ইন্সপেক্টর চ'লে গেলে আবার ওটা স্বস্থানে রাখা যেতে পারে।

আর আপনার পেশকার। তার কথা আর কি বলব। তার গায়ে এমন বিকট গন্ধ, যেন এখনই তাড়িখানা থেকে বেরিয়ে এল। আপনাকে অনেকবার মনে করিয়ে দেব ভেবেছি, কিন্তু আমি এমনই ব্যস্ত থাকি যে, আদৌ সময় পেয়ে উঠি না। অবশ্য লোকটা যদি বলে যে, ওটাই তার স্বাভাবিক গন্ধ, তা হ'লে আপত্তি করা চলে না। কিন্তু খুব ক'ষে পেঁয়াজ-রসুন খাইয়ে ওটা চাপা দেওয়া যায় না? আচ্ছা, ডাক্তার পিলাই, আপনি একটু ওষুধ দিয়ে ওটা চেপে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারেন না?

সিভিল-সার্জন। [নাসিকা-তর্জ্জনে কি যেন জানাইল।]

জজ। না না, ও গন্ধ দূর করবার উপায় নেই। লোকটা বলে যে, ওর নার্স শৈশবে ওকে মদের মধ্যে একবার ফেলে দিয়েছিল, সেই থেকে তাড়ির গন্ধ ওর স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। যাই হোক, একবার তবু মনে করিয়ে দিলাম। কিন্তু যে ভাবে আদালতে বিচার হয়, আমার বন্ধু চিঠিতে যাকে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বলেছেন, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। আর বলবার আছেই বা কি? দুর্ব্বলতা-মুক্ত মানুষ আর কোথায়? এ তো বিধাতার বিধান।

জজ। দুর্ব্বলতা কাকে বলছেন রায় বাহাদুর? সব দুর্ব্বলতা কি সমান? আমি প্রকাশ্যে ব'লে থাকি যে, আমি ঘুষ নিয়ে থাকি। কিন্তু কি? টাকাকড়ি নয়—বিলিতী কুকুরের বাচ্চা। ওকে ঘুষ বলা চলে না।

ম্যাজিস্ট্রেট। বিলিতী কুকুরের বাচ্চাই হোক আর যাই হোক, ওকে ঘুষ ছাড়া আর কি বলে?

জজ। না রায় বাহাদুর, এ কথা ঠিক হ'ল না। ধরুন, একজন যদি স্ত্রীর জন্যে পাঁচশো টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ি নেয়, কিংবা—

ম্যাজিস্ট্রেট। স্বীকার করলাম, ঘুষ হিসাবে আপনি শুধু বিলিতী কুকুরের বাচ্চাই নেন, কিন্তু তাতেই বা কি? আসল কথা, আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না, কোনদিন পূজা-অর্চ্চনা করেন না। ভগবানে আমার অটল বিশ্বাস। তিন বেলা সন্ধ্যাহ্নিক না ক'রে আমি জলগ্রহণ করি নে।

জজ। দেখুন, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ যদি তুললেন তবে স্পষ্ট বলি, আমি শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, এসব বিষয়ে আমি কারও সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। কোন কোন বিষয়ে অতি-চিন্তা চিন্তাহীনতার চেয়ে নিন্দনীয়। কিন্তু সে যাই হোক, জজের আদলতে যে ইন্সপেক্টর যাবেন, তা মনে হয় না—ও জায়গা একেবারে বিধাতার খাস জমিদারির অধীন। এ বিষয়ে আপনার সৌভাগ্য ঈর্ষ্যার যোগ্য।

কিন্তু হেডমাস্টার মশায়, আপনি সাবধান হবেন—বিশেষ ক'রে আপনার শিক্ষকদের সম্বন্ধে। অবশ্য তাঁরা সবাই শিক্ষিত লোক। ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপে ধাপে আরোহণ ক'রে জ্ঞানের চিলেকোঠায় গিয়ে ওঁরা পৌঁছেছেন, কিন্তু ওঁদের অনেকের বড় বিচিত্র রকমের অভ্যাস আছে, বোধ করি, জ্ঞানের থেকে সেসব অবিভাজ্য। যেমন ধরুন না কেন, সেই যে মোটা চেহারার ভদ্রলোকটি, নামটা কিছুতেই মনে থাকে না, চেয়ারে গিয়ে বসলেই এমন বিকট মুখভঙ্গী করে [মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইলেন] আর ক্রমাগত দাড়িতে হাত বুলোতে থাকে; যতক্ষণ সে ছেলেদের প্রতি মুখভঙ্গী করে কিছু আসে যায় না, হয়তো অধ্যাপনার ওটা একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, আমার পক্ষে নিশ্চিত ক'রে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে করুন তো, ওই রকমটি যদি কোন দর্শকের প্রতি করে, তবে কি বিপদ ঘটবে! ইন্সপেক্টর ভাবতে পারেন, ওতে তাঁকে ব্যঙ্গ করা হ'ল। তখন ওই ঘটনা কত দূর গড়াবে বলুন তো?

হেডমাস্টার। আমি কি করব বলুন? আমি বারংবার তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি। সেদিন মহামান্য লাটপত্নী ইস্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। আর কি বলব! এমন মুখভঙ্গী ক'রে উঠলেন, না না, তেমনটি আপনি কখনও দেখেন নি। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য খুব সাধু। কিন্তু এজন্য এডিকং-এর কাছে আমাকে কথা শুনতে হ'ল।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর আপনার ইতিহাসের শিক্ষকের বিষয়ে একটা কথা বলতে

চাই। লোকটি খুব পণ্ডিত সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্লাসে এমন অত্যুৎসাহে বক্তৃতা করেন যে, প্রায় আত্মবিস্মৃত অবস্থা। একবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। যতক্ষণ অ্যাসিরিয়ান আর ব্যাবিলোনিয়ানদের বিষয়ে বলছিলেন আত্মসম্বিৎ একেবারে হারান নি, কিন্তু যখন আলেক্‌সাণ্ডার দি গ্রেটে এসে পৌছলেন, অবস্থা চরমে গিয়ে পৌছল। মনে হ'ল, ঘরে যেন আগুন লেগেছে, সত্যি তাই মনে হ'ল। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে প'ড়ে মেঝের ওপরে দড়াম ক'রে একখানা চেয়ার ফেললেন। আলেক্‌সাণ্ডার দি গ্রেট অবশ্য মস্ত বীর ছিলেন, কিন্তু সেজন্য চেয়ার ভাঙা কেন? ওগুলো যে গভর্মেণ্টের সম্পত্তি।

হেডমাস্টার। ঠিক বলেছেন, লোকটা অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমি অনেক বার তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি। কিন্তু তিনি কি বলেন জানেন, 'আপনি যাই বলুন, জ্ঞানবিস্তারের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।'

ম্যাজিস্ট্রেট। বিধাতার কি লীলা! বুদ্ধিমান লোকেরা হয় মাতাল, নয় এমন বিচিত্র মুখভঙ্গী করে যে, ভয় পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়।

হেডমাস্টার। কি আর বলব! আমার শত্রুও যেন শিক্ষাবিভাগে কাজ করতে না আসে। এখানে সকলকেই ভয় ক'রে চলতে হয়; কে যে কর্ত্তা নয় তা বুঝতে পারি না, প্রত্যেকেই এসে দুটো উপদেশ দিয়ে যায়; প্রত্যেকেই প্রমাণ করতে বসে যে, আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান; যত দেউলে ব্যবসায়ী, পশারহীন উকিল, আকাট বৈজ্ঞানিক, বড় সাহেবের জামাইয়ের জামাই—আমাদের কর্ত্তা। আর বেতনের কথা সে আর কি বলব! নিজের স্ত্রীর কাছে উল্লেখ করতেও লজ্জা বোধ হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিছুতেই কিছু যায় আসে না, কিন্তু বেশটা যে ছদ্ম, বুঝতে পারবার আগেই ব'লে উঠবে—এই যে সোনার চাঁদেরা, তোমরা সব এখানে! দেখলাম তোমাদের সব কীর্ত্তি। জজ কে? জগদ্ধাত্রী সিংহ? গ্রেপ্তার। দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা কে? রসময় কটক? গ্রেপ্তার। এ যে অসহ্য অবস্থা!

(পোষ্টমাষ্টারের প্রবেশ)

পোস্টমাস্টার। কি ব্যাপার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব? ইন্সপেক্টর আবার কে আসছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন, আপনি কি শোনেন নি কিছু ?

পোস্টমাস্টার। আমি বলরামবাবুর কাছে এইমাত্র শুনলাম। তিনি ডাকঘরে গিয়েছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার কি মনে হয় ? কেন ইন্সপেক্টর আসছে ?

পোস্টমাস্টার। কেন আবার ? শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে।

জজ। দেখুন। আমিও ঠিক এই কথাই বলেছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনারা কিছুই বুঝতে পারেন নি।...তারপরে নিরাপদবাবু, পোস্ট-অফিসের সব খবর ভাল তো ? ইন্সপেক্টর ডাকঘর পরিদর্শন করতে নিশ্চয় একবার যাবেন।

পোস্টমাস্টার। আমি সর্ব্বদা ঘর সামলিয়ে চলি। আপনার খবর সব মঙ্গল তো ?

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি ? আমি ভয় পাব কেন ? কেবল একটু, মানে ব্যবসায়ীরা আর শহরের লোক আমাকে জ্বালাতন ক'রে মারলে। আমি নাকি তাদের সর্ব্বনাশ করছি ! হ্যাঁ, কখনও যে অল্পস্বল্প না নিয়ে থাকি এমন নয়, কিন্তু ভগবান জানেন, তার উদ্দেশ্য সাধু। দেখুন মুস্তফী মশায় [পোস্ট-মাস্টারকে একান্তে লইয়া গিয়া নীচু স্বরে] এক কাজ করতে পারেন না, তাতে আমাদের সকলেরই উপকার হবে, এই, মানে—কিনা ডাকঘরে যত চিঠি আসে আর যায়, সবগুলো খুলে একবার দেখতে পারেন না ? আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে কি না ? না থাকে তো কোন বালাই নেই, আবার বন্ধ ক'রে দিলেই চলবে। না হয় খোলাই থাকবে। নিশ্চয় কোন অভিযোগ যাচ্ছে, নইলে ইন্সপেক্টর আসতে যাবে কেন ?

পোস্টমাস্টার। এসব বুদ্ধি আর আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না। রোজ ভোরবেলা উঠে ওই তো আমার প্রথম কাজ। চা খেতে খেতে হাঁক দিই—শশী পিওন, আমায় খবরের কাগজ। শশী এক তাড়া খামের চিঠি এনে দেয়। বলব কি মশায়, এক-একখানা চিঠি এমন সুন্দর ! যেমন বর্ণনা, তেমনই ভাষা, আর শিক্ষণীয় বিষয়ও তেমনই থাকে। কোথায় লাগে আপনাদের আনন্দবাজার, যুগান্তর !

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, তার মধ্যে কি কলকাতা থেকে ইন্সপেক্টর আসবার কথা দেখেন নি ?

পোস্টমাস্টার। কই, না।...কিন্তু যাই বলেন, এক-একখানা চিঠি এমন

আবেগের সঙ্গে লিখিত! দুঃখ হয় যে, এমন সব চিঠি আপনারা পড়তে পান না। একজন কর্নেল তাঁর এক বন্ধুকে লিখছে—'প্রিয় বন্ধু, আমরা এখন নন্দনকাননে বাস করছি; চারদিকে অগণিত তরুণী; নিশান উড়ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, পানাহারের অপরিমিত আয়োজন।' আমি রেখে দিয়েছি—দেখবেন নাকি? সে কি জ্বালাময়ী ভাষা!

ম্যাজিস্ট্রেট। আর এক সময়ে হবে, এখন ভাল লাগছে না। নিরাপদবাবু, যদি কখনও আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আপনার হাতে এসে পড়ে, আপনি রেখে দেবেন।

পোস্টমাস্টার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

জজ। ডাকবাবু, এই রকম করতে করতে একদিন আপনি বিপদে প'ড়ে যাবেন।

পোস্টমাস্টার। আমি পড়ব বিপদে!

ম্যাজিস্ট্রেট। কথ্খনও নয়। চিঠিগুলোর তো আর প্রকাশ্য ব্যবহার হচ্ছে না; গোপনীয় বস্তু গোপনেই রাখছেন। এতে আবার বিপদ কি?

জজ। কখন্ কোন্ বিপদ ঘটে, তার নিশ্চয় কি? সে যাক্‌গে, রায় বাহাদুর, আপনাকে আমি একটা বিলিতী কুকুরের বাচ্চা উপহার দেবার জন্যে এনেছিলাম। কোতনগরের দুই জমিদারে মামলা বেধে উঠেছে। দুই শরিকের কাছ থেকেই বিলিতী কুকুরের বাচ্চা উপহার নিচ্ছি, তারই একটা—

ম্যাজিস্ট্রেট। প'ড়ে মরুক আপনার বিলিতী কুকুরের বাচ্চা। আমি কিছুতেই সেই ছদ্মবেশী ইন্সপেক্টরের কথা ভুলতে পারছি না। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে, কখন্ বা দরজা খুলে যাবে—আর এসে ঢুকবেন সেই—

(দরজা খুলিয়া গেল আর ঘনরামবাবু ও বলরামবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ করিল)

বলরামবাবু। অদ্ভুত সংবাদ!

ঘনরামবাবু। আশ্চর্য্য ঘটনা!

সকলে। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

ঘনরামবাবু। অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! আমরা কানাইবাবুর হোটেলে গিয়েছিলাম—

বলরামবাবু। [বাধা দিয়া] ঘনরামবাবু আর আমি হোটেলে গিয়েছিলাম—

নরামবাবু। [বাধা দিয়া] আমাকে বলিতে দাও বলরামবাবু। আমি বলব।

লরামবাবু। না না, আমাকে বলতে দাও, আমাকে বলতে দাও। তুমি ভাষা খুঁজে পাবে না।

নরামবাবু। তুমি বলতে গিয়ে সব মাটি ক'রে ফেলবে। এমন ঘটনা সব তোমার দোষে মাটি হয়ে গেল দেখছি।

লরামবাবু। দেখ না, আমি কেমন ক'রে বর্ণনা করি? তুমি কেবল একটু চুপ কর তো। আহা, বাধা দিও না আমাকে। আপনারা দয়া ক'রে ঘনরামবাবুকে থামতে বলুন তো।

্যাজিস্ট্রেট। যে হয় আপনারা একজন বলুন। বসুন তো, এই নিন চেয়ার। আমাদের নাভিশ্বাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

(ঘনরাম ও বলরাম বসিল; সকলে তাহাদের ঘিরিয়া বসিল)

কলে। এইবার বলুন, ব্যাপার কি?

লরামবাবু। আমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করব। আপনাদের এখান থেকে বেরিয়ে—আপনারা তখন তো চিঠি প'ড়ে কাঁপতে শুরু ক'রে দিয়েছেন—আমি ছুটে চললাম। আমার সব মনে আছে—আমাকে বাধা দিয়ো না ঘনরাম। আমি প্রথমে গেলাম কমলবাবুর বাড়িতে, সেখানে তাঁকে না পেয়ে গেলাম রোহিণীবাবুর বাড়িতে, তাঁকেও পেলাম না। তখন আপনার কাছে গেলাম পোস্টমাস্টারবাবু, গিয়ে আপনাকে খবরটা দিয়ে যেমনই বেরিয়েছি, অমনই দেখা হ'ল ঘনরামের সঙ্গে—

নরাম। [বাধা দিয়া] ঠিক কুন্দনলালের পানের দোকানের সমানে—

লরাম। [তাহাকে থামাইয়া দিয়া] কুন্দনলালের পানের দোকানের সামনে। আমি তাকে দেখেই বললাম, ঘনরাম, রায় বাহাদুর যে গোপন খবর পেয়েছেন, তা শুনেছ কি? আপনার বাড়ির চাকর ফণিবাবুর বাড়িতে যেন কি কাজে যাচ্ছিল, তার কাছে ঘনরাম সে খবর শুনতে পেয়েছে—

নরাম। [বাধা দিয়া] ফণিবাবুর বাড়ি যাচ্ছিল তালমিছরি আনতে।

লরাম। [তাহাকে বাধা দিয়া] তালমিছরি আনতেই বটে। তখন আমরা দুজনে পরেশবাবুর বাড়ির দিকে চললাম।...ঘনরাম, এ রকম

ক'রে বাধা দিলে—আপনারা দয়া ক'রে ওকে একটু থামান না।··· এ তোমার ভারি অন্যায়। পরেশবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময়ে ঘনরাম বললে—চল না হে, একবার কানাইবাবুর হোটেলে যাওয়া যাক। সকাল থেকে কিছু খাই নি। ভোরবেলা দেখলাম কানাইবাবু পাঁঠার মাংস কিনে নিয়ে গেলেন। খান দুই ক'রে চপ হ'লে মন্দ কি? আমি বললাম—চল না, মন্দ কি! যেমনই আমরা হোটেলে ঢুকেছি, অমনই দেখলাম একজন যুবক—

ঘনরাম। [বাধা দিয়া] সুপুরুষ, কিন্তু গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, কোট-প্যাণ্টলুন নয়।

বলরাম। সুপুরুষ, সুদর্শন যুবক গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, ঘরের মধ্যে এই ভাবে হাঁটছেন। [দেখাইল] মুখে সে কি বুদ্ধির ছাপ! হাবভাব চেহারায় মনে হয়, যেন গভর্মেণ্টের অদৃশ্য ছাপ-মোহর মারা। আর মাথাটা দেখলেই মনে হয়, বুদ্ধিতে ঠাসা। দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। তখ্‌খুনি বুঝতে পারলাম লোকটি যে-সে নয়। ঘনরামকে বললাম—ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারছ? ঘনরাম আগেই সন্দেহ করেছিল। সে কানাইবাবুকে জিজ্ঞেস করলে—লোকটি কে হে? কানাইবাবুর আবার মাস খানেক হ'ল একটি ছেলে হয়েছে। বেশ ছেলেটি। দেখেই বুঝলাম, ছেলেটা বাপের ব্যবসা রেখে চলতে পারবে। ঘনরাম জিজ্ঞেস করলে—লোকটা কে হে? কানাইবাবু বললে—ওই লোকটা?—আচ্ছা, ঘনরাম, এ রকম ক'রে বাধা দিলে···আপনারা ওকে একটু থামতে বলুন না।···তুমি নিজেও বলতে পারবে না, আমাকেও বলতে দেবে না। পারবে না কেন? ফোকলা দাঁতের গর্ত্ত দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায়, বলবে কি ক'রে? কানাইবাবু বললে—ভদ্রলোক একজন অফিসার, কলকাতা থেকে আসছেন, নাম মিঃ আনন্দমোহন রায়, যাচ্ছেন শিলিগুড়ি। লোকটির আচারব্যবহার অদ্ভুত। আজ প্রায় পনরো দিন ধ'রে এখানে আছেন; এক পয়সাও এ পর্য্যন্ত দেন নি, সবই ধারে চালাচ্ছেন। এই না শুনেই আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল, আমি বললাম—বটে!

ঘনরাম। না, বলরাম, আমি বলেছিলাম—বটে!

বলরাম। হ্যাঁ, তুমি প্রথম বলেছিলে, তারপরে আমি বলেছিলাম। তখন আমরা দুজনে মিলে ব'লে উঠলাম—বটে! লোকটা যদি শিলিগুড়িই

যাবে, তবে এখানে থাকবার কারণ কি? এই লোকটাই তবে নিশ্চয় সেই অফিসার!

ম্যাজিস্ট্রেট। কে? কোন্ অফিসার?

বলরাম। যে অফিসারের আসবার সংবাদ আপনারা পেয়েছেন, সেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! কি বলছেন আপনারা? এ কখনই হতে পারে না।

ঘনরাম। নিশ্চয়ই এ সেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর। লোকটা টাকাও দেয় না, আবার হোটেল ছেড়ে চ'লেও যায় না! আর তার যাবার কথা শিলিগুড়ি! এ যদি গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর না হয় তো কি বলেছি!

বলরাম। এ নিশ্চয় সেই লোক! সব দিকে তার দৃষ্টি। ঘনরাম আর আমি চপ খাচ্ছিলাম, আর লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল। যেন চোখ দিয়ে চপ দুখানা সে কেড়ে নেবে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মাথা ঘুরে উঠল।

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান, রক্ষা কর। কত নম্বর ঘরে আছে?

ঘনরাম। পাঁচ নম্বর ঘর; ঠিক সিঁড়ির নীচেই।

বলরাম। এক বছর আগে দুজন অফিসার যে ঘরটায় ঘুষোঘুষি করেছিল, ঠিক সেই ঘরটাতে।

ম্যাজিস্ট্রেট। কতদিন ধ'রে আছে?

ঘনরাম? পনরো দিনের ওপর।

ম্যাজিস্ট্রেট। পনরো দিনের ওপরে? ভগবান, রক্ষা কর। এই পনরো দিনের মধ্যেই যে কসাই-বুড়ীকে বেত মারা হয়েছে; কয়েদীদের রেশন দেওয়া হয় নি। রাস্তাঘাটে একদিনও ঝাড়ু পড়ে নি। আবর্জ্জনা! দুর্গন্ধ! হায় হায়, সব গেল। [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

দাতব্য-কর্ত্তা। রায় বাহাদুর, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? চলুন, আমরা সবাই মিলে কানাইবাবুর হোটেলে যাই।

জজ। না না, আগে ব্যবসায়ীদের পাঠিয়ে দেওয়া যাক। আগে যাওয়া কিছু নয়, কারণ শাস্ত্রেই আছে—'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমম্ ফলম্।'

ম্যাজিস্ট্রেট। আমাকে কর্ত্তব্য স্থির করতে দিন। এর আগেও আমার এ

রকম বিপদ এসেছে, আবার তো কেটেও গিয়েছে। এবারেও দয়াময় অন্যান্য বারের মত বিপদুদ্ধার ক'রে দেবেন। [বলরামকে] বলরাম-বাবু, লোকটি তো যুবক ?

বলরাম। যুবক বইকি ! খুব বেশি হয় তো তেইশ-চব্বিশ।

ম্যাজিস্ট্রেট। মন্দর ভাল। অল্প বয়সের ছোকরাকে খুশি করা সহজ। বুড়ো শয়তানের মনে যে কি আছে, তা ভগবানও বুঝতে হার মানেন। আপনারা সব যান, নিজের নিজের আফিসগুলো গুছিয়ে নিন গিয়ে। আমি ছোট রায় সাহেবের সঙ্গে [বলরামকে লক্ষ্য করিয়া] শহরটা ঘুরে দেখে আসি, সব ঠিক আছে কি না। চন্দন সিং !

চন্দন সিং। হুজুর !

ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম দাও। না না, তোমাকে দরকার আছে। তুমি কাউকে বল, পুলিস সাহেবকে যেন এখনই একবার আসতে বলে। আর তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস।

চন্দন সিংএর দ্রুত প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তা। জজ সাহেব, চলুন, শিগগির যাওয়া যাক। না জানি কি বিপদ ঘটবে !

জজ। আপনার আবার বিপদ কি ? রুগীগুলোর বিছানাপত্তর একটু ফিটফাট ক'রে রাখবেন, তা হ'লেই চলবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। বিছানাপত্তর ! কি যে বলছেন ! সমস্ত বাড়িটায় এমন দুর্গন্ধ যে, নাকে কাপড় না দিয়ে ঢোকা যায় না।

জজ। আমি দিব্যি নিশ্চিন্ত আছি। আজ পনরো বছর এখানে জজিয়তি করছি, এই পনরো বছরে সেরেস্তা এমনই দুরস্ত ক'রে রেখে দিয়েছি—

দাতব্য-কর্ত্তা। যদি কোন নথি দেখতে চায় ?

জজ। দেখতে চাইলেই হ'ল ! খুঁজেই পাবে না। আরও পনরো বছর লাগবে নথি খুঁজে বের করতে। তা স্বয়ং বেদব্যাসের অসাধ্য।

(জজ, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাষ্টার, পোষ্টমাষ্টারের প্রস্থান ; চন্দন সিংএর প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার গাড়ি তৈরি ?

চন্দন সিং। হাঁ হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, চল ; না, দাঁড়াও। আর সকলে কোথায় ? পুরন্দর সিং ? পুরন্দর সিংকে আনতে ব'লে দিলাম।

চন্দন সিং। পুরন্দর সিং, পুলিস-ফাঁড়িতে। কিন্তু হুজুর, তাকে দিয়ে কাজ হবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন?

চন্দন সিং। হুজুর, সে দারু পিয়ে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে আছে। দু বালতি জল তার মাথায় ঢালা হয়েছে, তবু হুঁশ হয় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! ভগবান, রক্ষা কর। তুমি শিগগির ফাঁড়িতে যাও। না না, আগে ঘরের মধ্যে থেকে আমার নতুন টুপিটা নিয়ে এস। বলরামবাবু, চলুন, যাওয়া যাক।

ঘনরাম। চলুন, আমিও যাচ্ছি, রায় বাহাদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, এত লোক গেলে সবাই সন্দেহ করবে, আর গাড়িতেও জায়গা নেই।

ঘনরাম। কিছু ভাববেন না, জায়গা এক রকম ক'রে হয়ে যাবে। না হয় গাড়ির পেছন পেছন ছুটে যাব। মোট কথা, ওখানে কি রকম কি হয় দেখতেই হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [চন্দন সিংকে] শিগগির যাও। পাহারাওয়ালারা কোথায়? পাহারাওয়ালারা প্রত্যেকে একখানা ক'রে রাস্তা নিয়ে ঝাঁটাগুলো সব সাফ ক'রে ফেলুক, মানে ঝাঁটা নিয়ে, পথগুলো সব সাফ করতে শুরু ক'রে ফেলুক। বিশেষ ক'রে কানাইবাবুর হোটেলের দিকটা। আর চন্দন সিং, দেখ, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আমার চোখ সব দিকে আছে। যা সয় সয়, তাই নিও। তুমি জমাদার, কিন্তু ঘুষ নেবার বেলায় যেন দারোগা। অতটা ভাল নয়। শিগগির যাও।

(পুলিস সাহেবের প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। এই যে পুলিস সাহেব, অন্তর্দ্ধান করেছিলেন কোথায়? এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

পুলিস সুপার। কি ব্যাপার সার্?

ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতা থেকে সেই অফিসার এসে পৌঁছেছেন। এদিকের কি ব্যবস্থা করেছেন?

পুলিস সুপার। আপনার হুকুমমাফিক পঞ্চুলাল পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পথ ঝাড়ু দিতে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। দুলবাজ খাঁ কোথায়?

পুলিস স্থপার। সে গিয়েছে আগুন নেবাবার বালতিগুলো নিয়ে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর পুরন্দর সিং মদ খেয়ে প'ড়ে আছে?

পুলিস স্থপার। হ্যাঁ সার্।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন এমন হয়?

পুলিস স্থপার। ভগবান জানেন। নতুন পাড়ায় দাঙ্গার খবর পেয়ে তাকে পাঠাই, যখন তাকে ফিরিয়ে আনা হ'ল, একদম বেহুঁশ।

ম্যাজিস্ট্রেট। এক কাজ করুন। পঞ্চুলাল খুব লম্বা-চওড়া আছে, ওকে একটা নতুন পোশাক পরিয়ে চৌমাথার ওপরে দাঁড় করিয়ে দিন। চমৎকার দেখাবে। হ্যাঁ, দেখুন, বাজারের মধ্যেকার ওই পুরনো পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ওখানে গোটা কয়েক ঝাঁটা-বাধা বাঁশ খাড়া ক'রে দিন, মনে হবে, যেন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। চারদিকে যত ভাঙাচোরা দেখা যাবে, শহরের অথরিটিদের তত বেশি অ্যাকটিভ মনে হবে। বুঝলেন? কিন্তু সর্ব্বনাশ, ওই পাঁচিলটা ভাঙলেই যে এদিক থেকে আবার আবর্জ্জনার গাদা দেখা যাবে! ও গাদা সরানো তো একদিনের কর্ম্ম নয়। সত্যি, শহরটাতে কি দুর্গন্ধ! আর লোকেরই বা কি অভ্যাস! শহরের মধ্যে কোথাও একটুখানি 'পার্ক' করা হয়েছে কি সবাই সেখানে আবর্জ্জনা ফেলতে আরম্ভ করে। একটা মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে কি দেখতে দেখতে তার গলা অবধি আবর্জ্জনায় ডুবে যায়। আমরা সকলে আস্ত থাকতে এত আবর্জ্জনাই বা পায় কোথায়?

আর দেখুন, অফিসার যদি কোন পুলিসকে জিজ্ঞেস করে, সে খুশি কি না? অমনই যেন বলে, খুব খুশি হুজুর। কেউ যদি সত্যিই খুশি না থাকে, তবে পরে তাকে খুশি ক'রে দেব।

(টুপি ভাবিয়া টুপির বাক্সটি তুলিয়া লইল)

এখন ভগবানের ইচ্ছেয় সব ভালয় ভালয় চুকে গেলে হয়। দোহাই মা কালী, জোড়া পাঁঠা দেব। তারপরে বেটা দোকানদারদের কাছ থেকে দশ জোড়া পাঁঠার দাম আদায় ক'রে নেব। একবার অফিসার চ'লে যাক, তারপর দেখা যাবে। চলুন বলরামবাবু।

(টুপির বদলে টুপির বাক্সটি মাথায় পরিবার চেষ্টা)

পুলিস স্থপার। ওটা টুপির বাক্স, টুপি নয়।

ম্যাজিস্টেট। [বাক্স ফেলিয়া দিয়া] টুপি নয় তো নয়, গোল্লায় যাক।

দেখুন, অফিসার যদি জিজ্ঞাসা করেন, নতুন হাসপাতাল কেন গড়া হয় নি, পাঁচ বছর আগে টাকা দেওয়া হয়েছে, বলবেন যে, গড়া হয়েছিল, হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে। আমি সেই রকম রিপোর্ট পাঠিয়েছি। কেউ যেন ব'লে না ফেলে যে, বাড়িটা তৈরিই হয় নি। হ্যাঁ, আর দেখুন, ভুলবাজ খাঁকে বলবেন [ঘুষি দেখাইয়া] ওটা যেন বেশি না চালায়। যত লোক ফাঁড়ি থেকে বেরোয়, সকলের মুখে কালশিরে। অফিসারের চোখে না পড়লে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। চলুন ঘনরামবাবু। [ফিরিয়া আসিয়া] আর দেখুন, কনস্টেবলরা যেন পোশাক প'রে তবে বেরোয়। কারও খালি পা, কারও পায়ে পট্টি নেই! ভগবান, কি যে তোমার মনে আছে, কে জানে!

সকলের প্রস্থান

(ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী বনমালার প্রবেশ, সঙ্গে তাহার কন্যা কমলা)

বনমালা। কোথায় গেল সব? মাগো, আর তো পারি নে। কেউ নেই এখানে! [কমলার প্রতি] তোমার জন্যেই এই বিপদটা হ'ল। যত বলি তাড়াতাড়ি এস, ওরা সব গেল। না, 'মা, ব্রোচটা লাগিয়ে নিই, মুখে একটুখানি পাউডার—'! নাও, এখন সব গেল।

কমলা। আমার কোন দোষ নেই মা। দিদির জন্যেই তো দেরি হ'ল।

বনমালা। একবার দেখব সেই মা-মরা ডাইনি ছুঁড়ীকে। পাউডার, স্নো, পমেটম। যেন তার বর এসেছে। ওই তো দাঁড়কাকের মত চেহারা। [জানালায় উঁকি দিয়া] ওগো, শুনছ? কোথায় চললে তুমি? এসেছে নাকি? গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর? গোঁফ আছে তো? কত বড় গোঁফ?

ম্যাজিস্ট্রেটের স্বর। শিগগিরই ফিরে আসছি। তোমরা থাক।

বনমালা। শিগগির ফিরে আসছি ব'লে আমাকে ভোলানো চলবে না। বলা নেই, কওয়া নেই, অমনই চলল! গোঁফ আছে কি না ব'লে গেলেও তো হ'ত! এসব তোমার দোষ। মা, এক মিনিট সবুর কর পিনটা গুঁজে নিই!

কমলা। আমি বলতে যাব কেন? দিদি তো বললে।

(রমলার প্রবেশ)

রমলা। এসেছে নাকি?

বনমালা। হ্যাঁ; তোমার বর এসেছে। হয়েছে তোমার পিন-গোঁজা আর

স্নো-মাখা? পোস্টমাস্টারকে দেখলেই তোমার সাজ করবার কথা মনে পড়ে যায়! তোমাকে দেখলে যে সে মুখ ভেঙচায় তা কি চোখে পড়ে! তবু হ'ত যদি কমলা।—আর ওদিকে উনি হটহট ক'রে চলে গেলেন! গোঁফ আছে কি না ব'লে গেলেও কতকটা হ'ত।

কমলা। দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই সব জানতে পারা যাবে মা।

বনমালা। চমৎকার! কি বুদ্ধি! দু-এক ঘণ্টা! তবু ভাল যে, বল নি দু-এক মাসের মধ্যে। [জানালায় উঁকি মারিয়া] ঝিটা গেল কোথায়? ওই যে! ও মিছরি, মিছরি, শহরে কেউ এসেছে খবর পেয়েছিস? পাস নি? তা জানবি কি ক'রে? কেবল ছোঁড়াগুলোর পেছনে পেছনে ঘোরা, কাজের কথা জানবার কি আর সময় আছে? যা না, ওদের পেছনে পেছনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছুটে যা। সব জেনে আসতে হবে কিন্তু। দরজার ফাঁক দিয়ে সব শুনবি। কি রকম দেখতে? চোখের রং কটা, না কালো? আর সবচেয়ে লক্ষ্য করিস, গোঁফ আছে কি না। ছোট ছোট, দৌড়ে যা, লক্ষ্মী!

(চীৎকার করিতে লাগিল)*

ক্রমশ

প্র. না. বি.

বলিদান

আমি যেন ভাই হই শেষ-বলিদান,
আমারই রক্তে ব্যথিতা ধরার হউক মুক্তিস্নান।
শৃঙ্খল-বাঁধা পীড়িত মানুষ ক্ষমাহীন দিনে রাতে,
নিরুপায় যারা জাগে ভাই যত অপমান নিয়ে মাথে,
দুঃখ-রাতের বর্ষা-ধারায় যার আঁখিজল মেশে,
আমি নেব ভাই হেসে,
তাহাদের যত চিন্তার বোঝা আমার স্কন্ধে তুলি
সকল দুঃখ, সকল যাতনা ভুলি ;—
আমার আত্মদান,
পীড়িত ব্যথিত মানবাত্মার ক্ষোভের করুক ত্রাণ।

---

* বিখ্যাত রুশ-লেখক Gogol-এর উক্ত নামধেয় নাটকের অনুবাদ।

জেনেছি; জেনেছি, মৃত্যুরে ভয় নাই—
মৃত্যু-তিমিরে জীবনের আলো লুকায়ে রয়েছে ভাই।
তাই তো দিনের শেষে,
অরুণ তপন ডোবে আঁধারের দেশে,
সঞ্চয় করে বিত্ত সেথায় সুদীর্ঘ শর্বরী,
শেষে নবরূপ ধরি—
সোনার কিরণে পূর্ব গগন প্রভাতে দেয় সে ভরি।
একটি জীবন-সমাধি রচিয়া জানি,
বাঁচায়ে রাখিব নানা জীবনের বহু পরাণের বাণী ;—
দুর্যোগ যদি ঘিরে ধরে কভু, তুমি থেকো ভাই ধীর,
আমি আছি, দিব বাড়ায়ে আমার অখ্যাতনামা শির।
যদি কেহ মোর তরে
প্রথম প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া ধরে,
যদি কেউ ভাই মালা গেঁথে রাখে আমার মিলন-আশে,
ভুল ক'রে কেউ যদি মোরে ভালবাসে ;
আমার মরণে নয়ন তাহার যদি ভ'রে ওঠে জলে ;
হৃদয়ের বনতলে,
পাতায় পাতায় বিচ্ছেদ-গান মর্মরি যায় চ'লে;—
—সে কালো-আঁখিরে ব'লো ভাই শুধু ব'লো,
এ বিদায়ে শুধু আরো মহীয়ান মিলন-সূচনা হ'ল।
সেথায় বাতাস আরো মন্থর শস্যের সৌরভে,
প্রাণ-জয়-গৌরবে,
সেখানে আমি তো একটি হৃদয়ে নই,
শত-হৃদয়ের ছায়ায় ছায়ায় আমি বহু হয়ে রই।
আজি বসন্ত রাত্রে প্রিয়ার চুম্বন যদি বৃথা,
অন্তরে জ্বলে ব্যর্থ-প্রেমের চিতা,—
যদি কাঁদে শুকতারা,
আমার সহসা-বিদায়ে তাহার নামে অশ্রুর ধারা,—
ব'ল তারে ভাই, আমি হই নাই মিছে,
অজানা-দেশের পাখীর কণ্ঠ মোর গানে মুখরিছে ;
রুদ্ধ জীবন-স্রোতের আমি যে খুলে দিয়ে যাই বাঁধ,
আগত-প্রাতের ভৈরবী গাই—আমি রাত-জাগা চাঁদ।

শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার

হিন্দী সাহিত্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা একটু সন্ধান রাখেন, তাঁরা এ কথা স্বীকার করবেন যে, বর্ত্তমান যুগে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য একমাত্র বাংলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষা অধিক উন্নত ও প্রগতিশীল। বাংলা-সাহিত্যকে এইজন্যে শ্রেষ্ঠতর আসন দিলাম যে, আমার মতে, এ পর্য্যন্ত হিন্দী-সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-মহারথী অবতীর্ণ হন নি। কিন্তু তাই ব'লে ভবিষ্যতে যে অবতীর্ণ হতে পারেন না, তা বলা যায় না, কারণ সমগ্র ভারতব্যাপী বিশাল ক্ষেত্রে যে কোনদিন তা সম্ভবপর হতে পারে।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ও বিস্তার এত দ্রুত ও এমন আকস্মিক যে, তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিকতম যুগ পর্য্যন্ত এর আলোচনা করা সম্ভব হবে না এবং তা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলব।

হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হয়েছে ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই সময় থেকেই গদ্যযুগ আরম্ভ হয়, তাহার আগে পদ্য-রচনারই যুগ ছিল। যদিও রাজা লক্ষ্মণ সিংহের সময় থেকেই হিন্দী গদ্যের ভবিষ্যৎ রূপরেখার একটি আভাস পাওয়া যায়, তবুও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকেই বর্ত্তমান গদ্যযুগের প্রবর্ত্তক ব'লে ধরতে হবে। কারণ তাঁর পূর্ব্বে ব্রজভাষার কবিতার যুগই চ'লে আসছিল। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এক দিকে যেমন গদ্যের ভাষাকে মার্জ্জিত করতে থাকেন, অপর দিকে তেমনই হিন্দী সাহিত্যকে নতুন পথও দেখিয়ে দেন। তাঁর এই ভাষা-সংস্কারের প্রভাবে হিন্দী সাহিত্যে এক নূতন ধারা প্রবাহিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশী থেকে জগন্নাথ-পুরীর পথে বাংলা দেশে উপস্থিত হন, সেই সময় বাংলা ভাষায় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক-উপন্যাসাদি দেখে হিন্দী সাহিত্যে তার অভাব অনুভব করেন। এর তিন বছর পরেই তিনি বিদ্যাসুন্দর নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদে তিনি হিন্দী ভাষার একটি সুন্দর ও নূতন রূপের আভাস দেন। এই বছরেই তিনি কবিবচনসুধা ও চন্দ্রিকা নামে দুখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সেই সূত্রে একদল নূতন কবি ও লেখক সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। হিন্দী গদ্যসাহিত্যের এই আরম্ভকালে সেই সময় যে কজন অল্প-সংখ্যক সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, তাঁরা সকলেই সজীব ও মৌলিক ভাবাপন্ন। হরিশ্চন্দ্রের জীবনকালেই লেখক ও কবিদের একটি প্রবল দল গঠিত হয়ে ওঠে, এবং তাঁরা সকলে মিলে হিন্দী সাহিত্যের এই নতুন অভিযানে যাত্রা করেন।

এর পরই আধুনিক পদ্ধতিতে নাটক-উপন্যাসাদি রচনা আরম্ভ হয়। স্বয়ং ভারতেন্দু তকগুলি নাটক-নাটিকা রচনা করেন ও লালা শ্রীনিবাস দাস পরীক্ষাগুরু নামক উপন্যাস চনা করেন। তারপর, বঙ্গবিজেতা, দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, ইন্দিরা প্রভৃতি উপন্যাস হন্দীতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়।

এই রকমে ভারতেন্দুর সময় থেকেই হিন্দীর সাহিত্য-নির্ম্মাণকার্য্য চলতে থাকে, কিন্তু তখন প্রচার ও প্রসারে অনেক বাধা ছিল ব'লে তার স্রোত তেমন দ্রুত গতি লাভ করতে পারে নি। আদালতে তখন হিন্দীর কোন স্থান ছিল না এবং সাধারণ কাজেও লোকে হিন্দী লিখতে লজ্জাবোধ করত। ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ নিজের মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দেখাতেন এবং যাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করতেন, তাঁদের উপহাস করতেন। তখন বিদ্যালয়ে হিন্দীর নামগন্ধ মাত্রও ছিল না; এমন কি পাঠশালাকে মদরসা বলা হ'ত। কাজেই তখন হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য খুব বেশি প্রসার-লাভ করে নি।

এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ ক'রে, হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা প্রাচীন অজ্ঞাত কবিদের লেখা সংগ্রহ ক'রে, তাঁদের জীবনী সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। হিন্দী-শব্দসাগর নামক সুবৃহৎ অভিধান প্রকাশ করেন। এইরূপ নানা উপায়ে এই সভা হিন্দী ভাষার সেবা ক'রে হিন্দী সাহিত্যকে লোকচক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এর পরে হিন্দী সাহিত্যের উত্থানের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার 'প্রবাসী' পত্রিকা তখন এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। ওই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরণায় ইণ্ডিয়ান প্রেসের সত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ আচার্য্য পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের সম্পাদনায় সরস্বতী নামক হিন্দী মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এই বাঙালী-পরিচালিত ইণ্ডিয়ান প্রেসের নিকট হিন্দী সাহিত্য চিরকাল ঋণী থাকবে।

এই সময় হিন্দী ব্যাকরণের ব্যতিক্রম ও ভাষার অস্থিরতা নিয়ে অনেক বাদপ্রতিবাদ চলতে থাকে এবং পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীই তার নিষ্পত্তি ক'রে দেন। দ্বিবেদীজী সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ন্যায় নানা বইয়ের সমালোচনা ক'রে নানা দোষত্রুটি দেখান। এই সময় থেকেই হিন্দীতে উচ্চ সাহিত্যের সৃষ্টি হতে থাকে। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে পুরাণকথা, কাব্য, সিদ্ধান্ত, নীতি, শিক্ষা বিষয়ক নানা গ্রন্থের সুন্দর ও সহজ রূপান্তর হিন্দীতে করেন। বর্ত্তমান হিন্দী গদ্য-নির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁর চমৎকার হাত ছিল এবং আজও তার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এক কথায়, তিনি হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের জন্য এমন কাজ নেই যা করেন নি।

তারপর অনুবাদ-যুগ আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রায় সমস্ত নাটক, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' 'চোখের বালি', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক কাব্য উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশী বিদেশী নানা ভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিন্দীতে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই রকমে হিন্দী সাহিত্য উন্নতি লাভ করে।

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী সাহিত্যের অতি-আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রেমচাঁদের উদয় হয়। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে লোকচরিত্র, গ্রাম্যচিত্র, সমাজচিত্র এমন ভাবে ফুটে ওঠে যে, পাঠকের মন সহসা জেগে উঠল আর সর্ব্বত্র তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করল। এক কথায়, বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমারের যে স্থান, তাই তিনি লাভ করলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর শেষ দান 'গোদান' উপন্যাস পাঠককে উপহার দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা এখন খুবই আশাপ্রদ ও প্রগতিশীল। চারদিক থেকে উৎসাহ দানেরও কোন ত্রুটি নেই। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন প্রতি বৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থনির্ম্মাণের জন্য বারো শো টাকার মঙ্গলাপ্রসাদ-পুরস্কার দিয়ে আসছেন। ওরছার মহারাজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাবগ্রন্থের জন্য দু হাজার টাকার পুরস্কার দিচ্ছেন। মহিলা লেখিকাদের জন্য পাঁচ শো টাকার সেকসেরিয়া-পুরস্কারও দেওয়া হচ্ছে। এ রকম পুরস্কারের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বাড়ছে। ফলে, প্রতি বৎসর বহু বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য গ'ড়ে উঠছে। সুতরাং, হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা যেমন আশাপ্রদ ও প্রগতিশীল, ভবিষ্যৎও তেমনই উজ্জ্বল।

সর্ব্বশেষে, যে কথাটি বলার লোভ আমি সামলাতে পারছি না তা এই যে, বাংলা সাহিত্যে বাইরের মধ্যে কেবল বিদেশী সাহিত্যেরই প্রভাব পড়েছে, কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে বিদেশী ছাড়াও, বাংলা, গুজরাতী, উর্দ্দু, মারাঠী, তেলেগু প্রভৃতি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার সাহিত্য থেকে আবশ্যক ও সারযুক্ত কিছু-না-কিছু নিয়ে আপনাকে স্বাস্থ্যবান ও বলবান ক'রে নিতে সমর্থ হয়েছে। বাংলা সাহিত্য যেন ভাদ্র মাসের ভরা গাঙ, হিমালয় থেকে নেমে সমান বেগে গভীর হয়ে চলেছে, আর, হিন্দী সাহিত্য যেন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাকে আপনার দিকে টেনে এনে নিজেকে সমুদ্র করবার স্বপ্ন দেখছে।

শ্রীধন্যকুমার জৈন

মৃত্যু

হে অব্যক্ত, ব্যক্তে তুমি ধরিতে চাহিছ অবিরাম,
চলে ধরাধরি খেলা, মৃত্যু মাত্র তার পরিণাম।

আখেরী

(৭২ পৃষ্ঠার পর)

অমূল্য বললে, খবরদার! মরা কাক ছুঁয়ে এলি, কিছু নাড়বি না তুই। বেরো বলছি, বেরো।

ওপারের ময়রার দোকানের কারিকর বললে, জাত গেল তোর। গঙ্গাচান ক'রে আয় গিয়ে।

ভদ্রলোক খদ্দেরটি হেসে বললে, কলে হাত ধুয়ে ফেল্ ভাল ক'রে।

দোকানের সামনেই জলের কল, গুপে সেইখানে কলের হাতলটা টিপে ধ'রে চান করতে ব'সে গেল। স্নান ক'রে ভিজে গায়ে ভিজে কাপড়েই এসে অমূল্যকে বললে, লে। হ'ল তো ইবার?

অমূল্য বললে, এই এই! কাপড় নিংড়ে ফেল্। এই এই!

গুপের সেদিকে গ্রাহ্য নাই, সে বললে, দে, দোকানীদের চা দিয়ে আসি। দেরি হয়ে যেছে।

ভদ্রলোকটি বললে, মুছে ফেল্ রে গা-হাত, অসুখ করবে।

উঁহু! ব'লেই সে অমূল্যকে ধমক দিয়ে বললে, দে না দোকানীদের চা।

অমূল্য একখানা ট্রের উপর চারটে কাপে চা ঢালছিল, দুধ চিনি মিশিয়ে দেবার জন্য চামচে দিয়ে নেড়ে, ট্রেটা হাতে দিয়ে বললে, তুমি মর বাচ তাতে কিছু যায় আসে না, দোকানে যে কাদা হয়ে গেল কাপড়ের জলে।

মুছে দিব। গুপে চায়ের ট্রে হাতে চ'লে গেল ময়রার দোকানে।

ওই ব'য়ে দেওয়ার জন্য সে দোকানীর কাছে কাক-ভোজনের অচল বাসী খাবারের একটা ভাগ পায়। চায়ের ট্রেটা নামিয়ে দিয়ে গুপে বললে, দাও।

হুঁ, দেব! বেটা শয়তান কোথাকার, নিজে তো ঘিয়ের খাবার খাস না, কাকে দিবি তাই বল্? নইলে দেব না।

সি একজনা আছে—দিব একজনাকে।

কাকে?

দিব। সি একজনা বটে।

অমূল্য হাঁকলে, কাজলামি করিস নি ওখানে। খদ্দের আসছে। গুপে!

বাসী খাবারের ঠোঙা হাতে ক'রে গুপে এক ছুটে এসে দোকানে ঢুকল, এক কোণে রেখে দিলে ঠোঙাটা।

অমূল্য সেই ভদ্রলোকটিকে বলছিল, উ মরবে! আজ্ঞে না। কিছু হবে নি ওর। গেল সালের ঝড়ে ওর মা মরেছে দেওয়াল চাপা। দুর্ভিক্ষে বাপ মরেছে। নিজে—

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললে, মা বাপ নাই ওর?

উত্তর দিলে গুপে, ভদ্রলোকের পাশের লোকটির সামনে চায়ের কাপ কেকের ডিশ নামিয়ে দিয়ে বার দু-তিন ক্ষিপ্রভাবে ঘাড় নেড়ে দিলে।

কোথায় বাড়ি তোর ?

উচ্ছিষ্ট কাপ-ডিশগুলো গুছিয়ে তুলছিল গুপে, বললে, হুই, সেই মেদিনীপুর জিলা। সেই বহুলিয়া গাঁ আছে !

বহুলিয়া ?

হুঁ। দেবপাল পোষ্টাপিস বটে।

হুঁ। ঝড়ে তোর মা মারা গেছে ?

কাপ-ডিশগুলো নিয়ে ততক্ষণে গুপে জলের ট্যাপের নীচে রেখে কল খুলে ধুতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। হাতের কাপের বিরাম দেয় না। কাজ করে আর কথা বলে। এবার কিন্তু তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সবিস্ময়ে সে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কি বলছেন ?

বললে অমূল্য, ঝড়ে তোদের ঘর উড়ে—

উঁহু। ঝড় নয়, হাওয়াতে বটে।

হো-হো ক'রে হেসে উঠল খদ্দেরের দল। গুপে সবিস্ময়ে শুধু একবার তাকিয়ে দেখলে, বুঝবার চেষ্টা করলে, হাসির কারণটা কোথায়। তারপর কাপ-ডিশের গোছা নিয়ে এসে নামিয়ে দিলে অমূল্যর টেবিলের উপর। বললে, হাসিস না ফ্যাকফ্যাক ক'রে। কাজ কর্। ব'লেই সে ন্যাতা নিয়ে ভিজে মেঝেটা মুছে ফেলে, হাত ধুয়ে ফেলে, বইতে আরম্ভ করলে চা-ভর্ত্তি কাপগুলো, যেগুলো ইতিমধ্যে অমূল্য তৈরি ক'রে ফেলেছিল।

ভদ্রলোকটির বোধ হয় কৌতূহল হয়েছিল, এবং ভদ্রলোক হয় বেকার, নয় পয়সা আছে, সে আবার টেনে নিলে নতুন এক কাপ চা। খপ ক'রে গুপের হাতখানা ধ'রে বললে, হাওয়াতে তোদের ঘর উয়ে গেল, তোর মা চাপা পড়ল, তুই বাঁচলি কি ক'রে ?

অত্যন্ত সহজভাবে গুপে বললে, কেনে, হাওয়াতে চালটো উড়ে গেল, উঠানে একটো গাছ ছিল, সিটাতে ঠেকা খায়ে পড়ল মাটিতে, আমি ছুটে গিয়ে ঢুকলম সিটার ভিতরে, আমার পাছু পাছু বাবা এল, মা আসবার মুখে ঘরের ভাল ভেঙে পড়ল।

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সে এঁটো কাপ গুছতে আরম্ভ করলে। অমূল্য বললে, জল আন্। গুপে !

গুপে ছুটল বালতি নিয়ে। কলের নীচে বালতি পেতে কল টিপে ধ'রে তাকিয়ে দেখছিল সামনের পানের দোকানের আয়নাটার দিকে। হাসছিল আপনার মনে। মধ্যে মধ্যে খালি হাতখানা বুলোচ্ছিল আপনার মুখে কতকগুসা বসন্তের ক্ষতচিহ্নের উপর।

জলের বালতিটা নামিয়ে নিয়েই সে আবার এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। পকেট থেকে একটা ভাঙা চিরুনি বার ক'রে অত্যন্ত দ্রুত টেরি কেটে নিল।

অমূল্য হাঁকছে ভিতর থেকে, গুপে! এই গুপে!

হুঁ, যাচ্ছি।

গেলি কোথায়?

যাচ্ছি।

তোমার পেটে লাথি মারব আমি। দত্তশীলের দোকানে চা দিতে হবে না?

গুপে ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল ফুটপাথের উপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গিয়ে দাঁড়াল অমূল্যর কাছে।

দত্তশীলের দোকান কয়েকখানা দোকানের পরেই। গুপে বেরুচ্ছিল সেখান থেকে। সেই ভদ্রলোক তাকে বললে, দাঁড়া।

উঁহু, কাজ আছে। অমূল্য শালা বকবে।

তোর বাবা দুর্ভিক্ষে ম'রে গেছে?

উঁহু। আকালে মরেছে বাবা। চাল ছিল নি, কিছুই খেতে দিত নি। যা পেত বাবা আমাকে খাওয়াত, নিজে খেত নি। তাথেই ম'রে গেল।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেল। একটু অবিশ্বাসও হ'ল। ছেলেটা কথাগুলো বলছে যেন উপকথা বলছে; "আমার কথাটি ফুরুলো নটে গাছটি মুড়লো।"

গুপেই বললে, একদিন রাখালকাকার বাড়ি গিয়েছিলম খাবার তরে। অ্যানেকক্ষণ পরে খেতে দিলে। ফিরে এসে দেখলম, বাবা ম'রে প'ড়ে আছে। রা কাড়ে না, কাঠের পারা শক্ত হয়ে গিয়েছে।

তারপর?

তারপরে? তারপরে চ'লে এলম কলকাতাকে।

কার সঙ্গে এলি?

কত লোক এল। তাদের সঙ্গে এলম। আঠারো কোশ হাঁটলম। পা দুটো এই ফুলে গেল। জর হ'ল, গুটি বেরুলো। সেই একটো গাঁয়ে প'ড়ে থাকলম। তারপর আবার হাঁটলম। শেষে রেলগাড়িতে চড়লম। চ'লে এলম কলকাতা।

ছুটে চ'লে যাচ্ছিল গুপে। ভদ্রলোক ডাকলে, শোন্ শোন্। এই নে দু আনা পয়সা নে।

গুপীনাথ মহা খুশি। পয়সা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বললে, কি বলছেন বলেন?

কে আছে দেশে তোর

একটু ভেবে গুপে বললে, ভাঙা ঘরটো আছে, দুটো গাছ আছে উঠানে, তিন বিঘা জমি আছে।

আপনার লোক কে আছে ?

সি রাখালকাকা আছে। তা সি কাকা বটে, আপনার নোক লয়।

গুপে! গুপে! ওরে শূয়ার! সয়তান কোথাকার! গুপে কিন্তু চঞ্চল হ'ল না, হেসে বললে, অমূল্যা হাঁকাড়ছে, আমি যাই।

ভদ্রলোকটি চেয়ে দেখলে, অমূল্য দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকছে। গুপী যেতেই সে তার মাথায় বসিয়ে দিলে একটা চাঁটি। গুপে চীৎকার ক'রে উঠল, মারিস না, হাতের কাপ-ডিশ প'ড়ে যাবে, ভেঙে যাবে।

চায়ের দোকান সরগরম হয়ে উঠেছে গল্প-গুজবে—খবরের কাগজ যুদ্ধ, ইংল্যাণ্ড, অ্যামেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীনতা, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী, দুর্ভিক্ষ মড়ক।

গুপে কাজ ক'রে যায়। কাজ করার ক্ষমতা ওর অদ্ভুত। যে কাজগুলো বাকি পড়েছিল, সেগুলো ক্ষিপ্র হাতে নিপুণতার সঙ্গে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সেরে ফেললে। ওদিকে মড়ক থেকে বোমা এসেছে আসরে। একজন উত্তেজিত হয়ে বললে, এর চেয়ে বোমায় মৃত্যু ভাল। একবারে একমুহূর্তে মরে মানুষ।

গুপী এগিয়ে এসে লম্বা টেবিলের ধারে দাঁড়ায়, ঘাড় নাড়ে, না—না—না।

সকলে অবাক হয়ে যায়। ছোঁড়াটা বলে কি ? গুপে বলে, আমি দেখেছি আজ্ঞা। উ রে বাবা রে!

দেখেছিস ?

গুপীর চোখ বড় হয়ে উঠে, সে আকাশের দিকে চায়, বলে, সেই দিনে, খিদিরপুরে, হুই জাহাজ-ঘাটায়, উঃ বাবা রে! ছেতরে গেল মানুষগুলান, এমন কুটিকুটি ক'রে মাছ কুটে না মানুষ। কি আওয়াজ! উ রে বাবা রে! আগুন, ধুঁয়া, বাবা রে!

তুই ছিলি সেখানে ?

হাঁ, দেশ থেকে এসে হোথা গিয়েছলম। কাজ করতম। বারো আনা পেতম দিন। বাবা রে! মড়ার গাঁদি লেগে গেল! নরিতে ক'রে নিয়ে গেল। বাবা রে! পালিয়ে এলম। ছুটু ছুটু হুই সাদা ঝকঝকে, পাখীর-মতন ঝাঁক বেঁধে এল, বাবা রে!

লোকে অবাক হয়ে যায়। অমূল্য বলে, তুই মরলি না কেন ?

গুপী হাসতে আরম্ভ করে। বলে, ভেঁপু বাজতেই আমি পালায়েছিলম। খালের ভিতরে লুকালম, হেঁই গুটিসুটি মেরে চুপ ক'রে পড়েছিলম। তারপরে, আমি যেন হেথা আর উই—উইখানে পড়ল বোমা। বাস্‌, দাঁতি লেগে গেল আমার। তা বাদে উঠলম যখন, তখন এই মড়া ওই মড়া—হাত পা, কুটিকুটি, রক্ত, আগুন, ধুঁয়া।

সমস্ত ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে যায়। গুপী বলে, চৌপর দিন আমি কেঁদেছিলম, খেতে লেরেছিলম তিন দিন, ঘুমুতে নারতম। গুপী এর পর উদাস হয়ে যায়। চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

জলদি এক কাপ চা। ঘরে ঢুকল একজন শিখ বাস-কণ্ডাক্টার।

চমক ভাঙল অমূল্যর। সে উনান থেকে তুলে নিলে গরম জলের কেৎলি। শিখটি ব'লে উঠল, আরে গোপীয়া! তুম হিঁয়া আ গেয়া?

গুপী তার মুখের দিকে চেয়ে হাসলে, বললে, পাঁইজী! রাম-রাম রাম-রাম পাঁইজী! হিঁয়া কাম করতা হামি আজকাল।

বাসমে আওর কাম করবি না? শিখ বসল।

অমূল্য অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, বাসেও কাজ করেছিস নাকি?

গোপী হাসে। তাড়াতাড়ি সম্ভ্রম ক'রে চায়ের কাপ নিয়ে শিখের সামনে নামিয়ে দিয়ে অমূল্যকে বলে, হাঁ। শ্যামবাজার, কালিঘাট, মৌলালী, গোলতালাও, এসপ্ল্যানেড, আলিপুর, খিদিরপুর—তিন নম্বর—তিন নম্বর।

ভাগলি কেঁও রে তু? অ্যাঁ?

জ্বর হ'ল যি! তুমরা যি বললে, হাসপাতালে যা! পথের ধারে আমি শুয়েছিলম, আমাকে নিয়ে গেল লরিতে তুলে, কাঙালীদের হাসপাতালে।

কাঙালীদের হাসপাতালে! ডেষ্টিচুটদের মেডিকেল রিলিফ সেণ্টারে!

গুপী কথার সবটা বুঝতে পারে না। নিজের কথাই সে বুঝিয়ে বলে, সে পুলিসে লরিতে ক'রে ধ'রে নিয়ে যেছে। সেই কাঙালীদের হাসপাতালে! সেই সেথাকে।

হুঁ, হুঁ। তাতেও মর নাই তুমি? কথাটা শুনে সকলে মুচকে হাসে।

গুপী গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, না। চার দিন বাদে সেথা থেকে পালায়ে এলম। সনঝের সময়ে, চুপিচুপি। হঠাৎ সে থেমে যায়। কাজে মনোযোগী হয়ে উঠে।

শিখটি উঠে যাবার সময় গুপীকে ডেকে একটা আনি দিয়ে যায়। শিখের বদান্যতার ছোঁয়াচে আর দুজনে দেয় দুটো ডবল পয়সা। একজনে দিলে একটা সিকি।

দুপুরবেলা। চৈত্রের সূর্য্য প্রখর হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচ নরম হয়েছে, ভারী মোটরের চাকার টায়ারের দাগ বসছে। মধ্যে মধ্যে দমকা গরম হাওয়ায় কালো ধুলো উড়ছে। তার উপর ক্রুড অয়েলের ধোঁয়ায় দুপুরের রোদ কালচে হয়ে যাচ্ছে। পথ জনবিরল। বড় রাস্তায় বাস ট্রাম একটু দেরিতে দেরিতে চলছে। শুধু মিলিটারি লরির বিরাম নাই।

চায়ের দোকানের সামনে বিড়িওয়ালা পরম কৌতুকে হাসছে। মিষ্টির দোকানের কারিকর খুব বাহবা দিচ্ছে। কয়েকটা ভিখারী ছেলে ব্যগ্র কৌতূহলে অবাক হয়ে চেয়ে

দেখছে। অমূল্য এবং গুপীতে যুদ্ধ বেধেছে। অমূল্যর দাবি, গুপী যা বকশিশ পেয়েছে তার ভাগ নেবে। গুপী দেবে না। এ ঝগড়ার সূত্র অনেক দিন থেকেই হয়ে আসছে। কিন্তু এতদিন গুপীর পাওনা লোভনীয় হয়ে উঠে নাই। চার পয়সা, দু-আনা বড় জোর দশটা পয়সার বেশি সে পেত না। আজ কিন্তু তার পাওনা আট আনা ছাড়িয়ে গিয়েছে। অমূল্য বলে, দোকানে আমরা দুজনেই কাজ করি। যা বকশিশ হবে, তার ভাগ দিতে হবে। দোকানে কাজ করিস ব'লেই দিয়েছে। দোকানের খদ্দেরে দিয়েছে।

গুপী কিন্তু দেবে না। সে বলে, তু যি পনের টাকা মাইনা পাস, আমি যি মোটে পাঁচটি টাকা পাছি। তুর মাইনার ভাগ আমাকে দে। তবে দিব। দোকানের খদ্দেরে তুকে দিলে না কেনে? আমাকে দিলে কেনে?

কথা-কাটাকাটি থেকে মারামারি। গুপী বেরিয়ে পালিয়ে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু অমূল্য দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে উনানে বাতাস দেওয়া পাখাখানা। গুপী ধরেছে উনান-খোঁচানো লোহার শিকটা। কিন্তু অসুবিধে হয়েছে, শিকটাও ছোট, তার হাতখানাও ছোট।

লম্বা হাতে অপেক্ষাকৃত লম্বা পাখার ডাঁটটা দিয়ে অমূল্য পটাপট মার চালাচ্ছে। গুপী সরছে, কখনও গুঁড়ি হচ্ছে। কখনও চেষ্টা করছে শিকটা দিয়ে অমূল্যর হাতে আঘাত করতে। যুদ্ধ চলছে নিঃশব্দে।

ওপারের মিষ্টির দোকানের কারিকর মহা উৎসাহে বাহবা দিচ্ছে। তার ভুঁড়িটা নাচছে। বহুৎ আচ্ছা, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ ভাই!

অমূল্য এগিয়ে এসে পড়েছে। এইবার ধরবে। আর উপায় নাই। কারিকর হেঁকে উঠল, ধর্ বেটাকে, ধর্। হি-হি-হি-হি!

গুপে কিন্তু অদ্ভুত। ধাঁ ক'রে সে ব'সে প'ড়ে ঢুকে গেল মালিকের বসবার চেয়ারটার তলায়। মা থাটা আটকাল কাঠের বসবার জায়গায়, চারিপাশে চারটে পায়া তার চারিদিকে রক্ষাবেষ্টনী হয়ে গেল। অমূল্যর আঘাতগুলো কাঠের পায়ায় ব্যাহত হয়ে যেতে লাগল। গুপী হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে দিতে এগুতে আরম্ভ করলে।

রাস্তায় হাসির হল্লা উঠে গেল—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ রে ভাই!

গুপী ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল অমূল্যকে। না পিছিয়ে অমূল্যর উপায় ছিল না। সংকীর্ণ ঘর, তারই মধ্যে আবার লম্বা বেঞ্চ এবং চেয়ারে ঘরখানাকে সংকীর্ণতর ক'রে তুলেছে। আশেপাশে সরবার জো নাই।

ফুটপাথে এসেই চেয়ার মাথায় দিয়েই ছুটল গুপী; কিছুদূর গিয়ে ব'সে পড়ল। চেয়ারের তলা থেকে বেরিয়েই বললে, নিয়ে যা তোর চেয়ার। সে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল

মিষ্টির দোকানের ধারে। দোকানের উনানে দেবার জন্তে কয়েকখানা ইট থাকে, তাই একটা তুলে নিয়ে বললে, আয় ইবার। আয়।

সে একবার কোমরে হাত দিয়ে দেখে নিলে গামছায় বাঁধা বাসী কচুরি-মিষ্টির গুঁড়োগুলো ঠিক বাঁধা আছে কি না, তারপর বড় রাস্তাটার এপাশ ওপাশ চকিতে দেখে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ছুটল। ব'লে গেল, করব নি আর কাজ। আর আসব নি আমি।

রাত্রি দশটা।

চায়ের দোকান বন্ধ হয়েছে। মিষ্টির দোকান বন্ধ হচ্ছে। বিড়িওয়ালার কাঠের কুলঙ্গি তালা বন্ধ। অমূল্য আর বিড়িওয়ালা চলেছে সিগারেট টানতে টানতে। গঙ্গামুখে চ'লে গেছে যে রাস্তাটা সেই রাস্তায় চলেছিল তারা। সমস্ত দিনের পর তারা চলেছে বিকৃত আনন্দের সন্ধানে। ব্ল্যাক আউটের পথ অন্ধকার।

অমূল্য হঠাৎ বললে, এই! দাঁড়া!

কি?

গুপে। ওই দেখ্। অন্ধকারের মধ্যে কালো শিলুয়েট ছবির মত ছোট একটা ছেলে কলের মুখ থেকে একটা কলসীতে জল ভ'রে নিচ্ছে। রাত্রি দশটায় জল আসে কলে। বিড়িওয়ালাও চিনলে, হ্যাঁ, গোপীই বটে।

চল্, দেখি ও কোথা যায়।

রাস্তা পার হয়ে একটা খোলা জায়গা। কর্পোরেশনের জিনিসপত্র থাকে। এখন স্লিটট্রেঞ্চ আর পাকা খিলেন শেল্টারে ভর্তি। গোপী চলেছে।

এই গুপে! চমকে উঠল গোপী। কে? অমূল্য?

বিড়িওয়ালা বললে, কি করছিস ইখানে?

অমূল্য বললে, এইবার কি হয়?

গোপী বললে, দাঁড়া, দাঁড়া। অমূল্যা ভাই, দাঁড়া। সে ঢুকে গেল একটা খিলেন করা শেল্টারের মধ্যে। পিছন পিছন ঢুকল অমূল্য আর বিড়িওয়ালা। ছোট একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। স্বল্প আলোর মধ্যে তারা দেখলে, গোপী কলসী থেকে জল নিয়ে কাকে দিচ্ছে, কিছু করছে। তারা এগিয়ে গেল।

বিড়িওয়ালা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, পিছনে হাত দিয়ে অমূল্যর অগ্রগতি রোধ করলে। অবাক হয়ে গেল তারা। আশ্চর্য্য সুন্দর সতরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে! পরনের কাপড় রক্তাক্ত, কোলের কাছে রক্তমাখা একটি সদ্যজাত শিশু। মেয়েটি নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে আছে। গোপী তার মুখে জল দিচ্ছে।

গোপী বললে, অমূল্যা, কি করব?

ও কে?

উ বুবি বটে। খোকা হইছে বুবির। কি করব?

বুবি? বুবি কে?

হুঁ। বুবি, বুবি বটে উঁ।

কে রে তোর?

কে আবার হবে! আমি সেই কাঙালীদের হাসপাতালে ছিলম, সেথা ছিল বুবি। কালা বটে, শুনতে পায় না, কথা বলতে লারে। উয়াকে লিয়ে হাসপাতালের নোকে যা তা বুলত। উ কাঁদথ। তাথেই উয়াকে লিয়ে সাঁঝবেলাতে পালায়ে এলম। এই-ঠেনে উকে নিয়ে থাকি।

ওরা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চায় বিচিত্র দৃষ্টিতে।

গোপী ব'লে যায়, বুবি বড় ভাল রে, ভারী ভাল। ভারী মায়া লাগে। তাথেই তুকে পয়সার ভাগ দিই না। উর লেগেই আনি আমি কচুরি মিষ্টি কেক। বুঝলি? বুবিকে লিয়ে খোকাকে লিয়ে ঘরকে যাব। ঘর করব। তিন বিঘা জমি আছে। চাষ করব। বড় হব। বিয়া করব। সে থামলে। তারপর প্রশ্ন করলে, আমি এখুন কি করব অমূল্য?

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল ওদের দুজনের মুখের উপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সে চট ক'রে চ'লে গেল শেল্টারের মধ্যে। অমূল্য বিড়িওয়ালা দুজনে এবার ফিসফিস ক'রে কথা বলে। হঠাৎ চমকে উঠে গোপীর রূঢ় কণ্ঠস্বরে।

খুন ক'রে ফেলাব।

চকিত হয়ে দুজনে চেয়ে দেখে, দৃঢ় দৃপ্ত ভঙ্গীতে গোপী দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা লম্বা শক্ত লাঠি। গোপী বললে, লাঠির মাথায় খোঁচা লাগানো আছে, বিঁধে ফেলাব যদি এগুবি তো, হাঁ।

অন্ধকারের মধ্যে ভয়াল মনে হচ্ছে গোপীকে। ওরা দুজনে কয়েক পা পিছু হ'টে এল।

গোপী হেসে বললে, তুদের মত অনেক দেখলম আমি। পালা। পালা।

বিড়িওয়ালা অমূল্যকে বললে, আয়। কাল দেখব। আজ সব নোংরা হয়ে আছে। আয়।

* * *

পরের দিন সন্ধ্যের পর নয়, দুপুরবেলাতেই অমূল্য এল। সে আর দেরি সইতে পারলে না। কোমরে একটা ছুরি নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু শেল্টার শূন্য। কেউ নেই। গোপী তার বুবিকে নিয়ে খোকাকে নিয়ে অন্যত্র চ'লে গেছে।

অমূল্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই তার মনে পড়ল, আজ সংক্রান্তি, কাল নতুন খাতা। মালিককে হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দিতে হবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

সাহিত্যিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলাম। লোটাস-ইটার্স অথবা মিউজিক-মেকার্স বলিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া পরিত্রাণ পাইবার উপায় অন্তত বর্তমান যুগে আর নাই। দেহতত্ত্ব কিংবা ভাটিয়ালি গান লিখিয়া জনসাধারণের মন ভুলাইবার শক্তি আমরা হারাইয়াছি; মহুয়া-মলুয়ার প্রেমের কাহিনীতেও আর সাধারণ মানুষের তৃপ্তি নাই। মুটে-মজুর-কামার-ছুতারের কবি বলিয়া নিজেদের উচ্চকণ্ঠে জাহির করিয়া তবে আসর জমাইতে হইতেছে, শ্রেণীসংগ্রামের ঠেলায় পড়িয়া কবি-গাল্পিকেরা গলদঘর্ম হইতেছেন, কলের বাঁশি শ্যামের পুরাতন আড়-বাঁশিটিকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিয়া আমাদের মনের সুখ হরণ করিয়াছে। মোটের উপর, আমরা মহা মুশকিলেই পড়িয়াছি। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ইতিহাস পূর্বাপর অনুধাবন করিয়া দেখিতেছি, প্রত্যেক কবির জীবনেই এই চিরদুঃস্থ মানুষের কল্যাণ করিবার, তাহাদের সুখদুঃখের কথা লিখিবার, নিদ্রিতকে জাগাইবার, পরাধীনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার সদিচ্ছা একবার না একবার জাগিয়া থাকে; তারপর, হয় তাঁহারা কর্মী বনিয়া কর্মের সাগরে গা ভাসাইয়া কাব্যের নিশ্চিন্ত তটভূমির আশ্রয় ছাড়িয়া যান, নয় পুনরায় মনকে কাব্যের আফিমে বুঁদ করিয়া দিয়া স্বপ্নের ঘোরে পদ্মের পাপড়ি চিবাইতে থাকেন। মহাকালের দরবারে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁহারাই টিঁকিয়া যান। যাঁহারা সময়ের বা কালের মহিমা স্মরণ করিয়া সেই খণ্ডকালকেই জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, বৃহত্তর কালের ঢেউ আসিয়া তাঁহাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়, খণ্ডকালের মত তাঁহাদের সাময়িক হৃদয়-বেদনাও হারাইয়া যায়! কাল এবং কালাতীতের দ্বন্দ্বের এই ট্র্যাজেডি সাহিত্যিকদের জীবনেই ঘটিয়া থাকে। শিল্পীমনের ঐকান্তিক নির্লিপ্ততা ও নির্মমতা যাঁহাদিগকে ক্ষুদ্রকালে সমসাময়িকদের নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে লইয়া যাইতে পারে তাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা বিরাট, কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দুর্ভাগ্য তাঁহাদিগকে বারংবার কাল এবং কালাতীতের মধ্যে দোল খাইতে খাইতে হয়রান হইয়া যাইতে হয় এবং অধিকাংশেই হারিয়া বিলুপ্ত হইয়া যান। রবীন্দ্রনাথের মত বৃহত্তমের মনেও যখন সংশয় জাগিয়া থাকে, তাঁহাকে বলিতে হয়—

বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে?

বলিতে হয়—

'এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়!

তখন অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু তাঁহার জীবনে ইহা ক্ষণিক সংশয় মাত্র। তিনি শেষ পর্যন্ত—

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।

শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
জানে না আপনা জানে না ধরণী
সংসারকোলাহল।

—সেই অনাদিধ্বনির অনুসরণে সংসার-কোলাহলের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন বলিয়া কালকেও অতিক্রম করেন—যদিও বর্তমানকালের শ্রেণী ও সমাজ সচেতন সমালোচক তাহা স্বীকার করেন না, অতীতের অন্ধকার গর্ভেই তাঁহাকে জোর করিয়া কবর দিয়া বর্তমান কালকে কালাতীতের উপরে জয়যুক্ত করেন। কিন্তু সকলেই রবীন্দ্রনাথ নন। সমসাময়িককালের ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত সাহিত্যিকের সংখ্যাই বেশি। তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহাদের কর্তব্য কি?

* * *

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারি সংস্কারের স্বপক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টারের পিটারলু ফিল্ডস-এ যে সভা হয়, অশ্বারোহী সৈন্যদলের আক্রমণে তাহা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই সংঘর্ষে ছয়জনের মৃত্যু ঘটে, বহু আহত হয়। ইংলণ্ডের কবি শেলী তখন ইটালী-প্রবাসে ছিলেন। সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে মিসেস শেলীর ভাষায়, "it roused in him, violent emotions of indignation and compassion." বহু যদি দৃঢ়চিত্ত হয় এবং তাহাদের চিত্ত যদি এক সুরে বাঁধা হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রভূত শক্তিশালী অস্ত্রকে বশে আনিতে পারে, পরবর্তী কয়েকদিনের ঘটনায় এই মহাসত্য অন্তরে অনুভব করিয়া কবি তাঁহার লাঞ্ছিত দেশবাসীকে প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ শিখাইতে মনস্থ করেন। সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত এই অনুভূতির ফলে কবির "দি মাস্ক অব অ্যানার্কি" নামক চিরন্তন কবিতাটি জন্মলাভ করে। শেলী এই কবিতায় যে পদ্ধতির কথা বলেন, তাহা আসলে অহিংস অসহযোগ। কবিতাটি এই—

Stand ye, calm and resolute,
Like a forest, close and mute,
With folded arms and looks that are
Weapons of unvanquished war....

And if then the tyrants dare,
Let them ride among you there,
Slash and stab, and maim and hew—
What they like, that let them do.

With folded arms and steady eyes,
And little fear, and less surprise,
Look upon them as they slay
Till their rage has passed away,

Then they will return with shame
To the place from which they came
And the blood thus shed will speak
In hot blushes on their cheek....

And that slaughter to the Nation
Shall steam up like inspiration,
Eloquent, oracular,
A volcano heard afar.

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number—
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you—
Ye are many—they are few.

তোমরা দাঁড়াও শান্ত ও দৃঢ় মনে
অরণ্যসম নিবিড়, বাক্যহীন,
বুকে বাঁধি বাহু, স্থির দিঠি আঁখিকোণে—
অজেয় জনের অস্ত্র যা চিরদিন।

অত্যাচারীরা পারে যদি, তারো পরে
তোমাদের মাঝে ছুটাইয়া দেয় ঘোড়া,
অসি-কষাঘাতে হত বা পঙ্গু করে—
যা খুশি ওদের, যা পারে করুক ওরা।

বদ্ধ বাহুতে, অপলক দুটি চোখে
থাকিবে না ভয়, জাগিবে না বিস্ময়,
দেখ—যারা রয় নরহত্যার ঝোঁকে,
যাবৎ তাদের ক্রোধ না শান্ত হয়।

লজ্জা মানিয়া সেথা ওরা ফিরে যাবে
যেথা হতে হেথা এসেছিল এককালে,
আজিকার এই নিঠুর রক্তস্রাবে
লজ্জার আভা ফুটিবে ওদের গালে।

জেনো নিশ্চয় এই হত্যার ফলে
এ মহাজাতির হবে নবজাগরণ;
মুখর হইবে মূকেরাই দলে দলে
অগ্নিগিরির শোনা যাবে গরজন।

ঘুম ভেঙে জেগে ওঠ সিংহের মত
কাতারে কাতারে জেগে ওঠ শত শত—
ঘুমের মাঝারে শিকলের ঝন্‌ঝনা
বেড়িয়াছে দেহ, যেন শিশিরের কণা
ঝেড়ে ফেলে দাও, ধর মুক্তির ব্রত;
তোমরা যে বহু—ওরা শুধু কয়জনা।"

ক্ষুদ্রকে দেখিয়া কবি তাঁহার মানসলোকে যে বৃহৎকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ঠিক শতবর্ষ পরে আমাদের কালে সেই বৃহত্তের মহনীয় রূপ আমরা আমাদেরই এই দেশে চক্ষুগোচর করিলাম; কিন্তু আমাদের লেখনীতে তেমন কাব্য জাগিল কই? নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে নিরস্ত্র মানুষের নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অবারিতবক্ষ মানুষের জয়যাত্রার বিপুল মহিমা আমাদের রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিল না বলিয়াই কি আমরা সকলেই বিমুখ হইলাম? এই দুর্যোগের দিনে ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে তেত্রিশকোটি

মানুষকে শঙ্কাহীন করিবার জন্ম ক্ষীণপ্রাণ খর্বকায় একটি মানুষের কণ্ঠে যে মাভৈঃ বাণী উচ্চারিত হইল, সমসাময়িক কবির কাব্যে তাহা চিরন্তন মহিমা লাভ করিল কই? দীর্ঘ শতাব্দীপাদ ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের বুকে অহিংস অসহযোগের যে শান্ত-ভীষণ মধুর-ভয়াল প্রকাশ আমরা দেখিলাম, আমাদের শিল্পস্রষ্টা ও কবিরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেশবাসীর কাছে তাহার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিচয় রাখিয়া গেলেন কি?

* * *

রাম নামধেয় ব্যক্তিটি বাস্তবজগতে কখনও বর্তমান ছিলেন কি না, অথবা থাকিলেও তাঁহার যথার্থ জীবন-ইতিহাস কি ছিল আজ আমাদের তাহা জানিবার আবশ্যক নাই, কবি বাল্মীকি যে রামকে ভাবীকালের দরবারে উপহার দিয়া গিয়াছেন তিনিই সমস্ত ভারতবর্ষের কাছে আজ চিত্ত ও নয়নাভিরাম হইয়া আছেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়তো আসলে একটা পারিবারিক দাঙ্গা মাত্র ছিল, কিন্তু মহাভারতের কবি সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় এই যুদ্ধকে স্থাপন করিয়া এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের ধর্মকর্মের আশা-আকাঙ্ক্ষার নীতি-আদর্শের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, সারা পৃথিবীতে তাহা আজিও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে। অর্থাৎ সমসাময়িক ঘটনা বা জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কবিরা চিরন্তন কাব্যের সৃষ্টি করিতে পারেন, যদি তাঁহাদের মনের তন্ত্রীতে আঘাত লাগে, যদি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, যদি তাঁহাদের শিল্পকর্মের সঙ্গে ধর্মবুদ্ধি সংযুক্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ বৎসর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের আশেপাশে এবং আমাদের জীবনে মহাকাব্যের বিষয়ের অপ্রতুলতা ঘটে নাই, কিন্তু আমাদের কবিপ্রাণ নানা পীড়নে, আঘাতে এবং ভাববিপর্যয়ে মুহ্যমান ছিল বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ বর্তমানকে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ করিয়া তুলিতে পারিলাম না। বীর এবং কবির, রাম এবং বাল্মীকির যথাযথ সংযোগ ঘটিল না।

* * *

কবি গ্যেটে তাঁহার *Faust* কাব্যে আদর্শ মানব বা Ideal Man হিসাবে ফাউষ্টকে খাড়া করিয়াছেন। পার্থিব ক্ষমতা ও গৌরবের, জাগতিক সৌন্দর্য ও আনন্দোপভোগের চরম করিয়া কালের দুর্নিবার গতিমুখে ছুটিতে ছুটিতে ফাউষ্টের মনে সহসা বৈরাগ্যোদয় হইল। সে অনুভব করিল, সব মিথ্যা, সব ঝুট্‌ হ্যায়। নিরুৎসাহ হইবার পাত্র সে নয়। শেষ পর্যন্ত বিকাররহিত আনন্দের কথা অবিরত ধ্যান করিতে করিতে একটা সন্ধান তাহার মিলিল—দৈবাদিষ্ট একটা পরিকল্পনা।

Let that high joy be mine for evermore
To shut the lordly ocean from the shore.
The watery waste to limit and to bar
And to push it back upon itself afar!
From step to step I settled how to fight it:
Such is my wish.

কারণ,

The Deed is everything, the Glory naught.

কি তাহার আয়োজন ?

Collect a crowd of men with vigour
Spur by indulgence, praise or rigour.

তাহার কাম্য কি ?

To many millions let me furnish soil
Though not secure, yet free to active toil ;...
And such a throng I fain would see,
Stand on free soil among a people free.

শতাধিক বর্ষ পরে কবি গ্যেটের মানসিক পরিকল্পনাকেই আমরা মূর্ত হইতে দেখিলাম আমাদেরই এই নির্যাতিত নিপীড়িত জাতির মধ্যে। মহিমান্বিত সাগরকে যিনি তট হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন, কর্মকেই যিনি প্রাধান্য দিলেন, যশকে নয়, জনতাকে যিনি আকৃষ্ট করিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাধীন মৃত্তিকার আশ্রয় দিবার জন্য বারংবার প্রাণ পর্যন্ত পণ করিলেন। এদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা আদর্শের বাস্তব রূপান্তর দেখিয়াও লেখনীমুখে বৃহৎ কিছু সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করিলেন না।

* * *

ভাবিতে ভাবিতে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ গোপালদার সশব্দ অভ্যাগমে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। গোপালদা হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, এবারকার সমস্যাটা কি ভায়া ? গোলআলুর গোলামি, না নবান্নের স্বাবা ?

গোলালদার হাসিটা সাময়িকভাবে বিশ্রী লাগিল, তবু শান্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, বর্তমান অবস্থায় সাহিত্যিকদের কর্তব্য কি, সে কথাই ভাবছিলাম।

গোপালদা চিন্তা মাত্র না করিয়া বলিলেন; আত্মরক্ষা, যেন তেন প্রকারেণ। বিজ্ঞাপন লিখে হোক, গান লিখে হোক, সিনেমা-সংলাপ লিখে হোক, জনযুদ্ধের প্রশস্তি গেয়েই হোক বাঁচতে হবে তাদের, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সত্য ও আদর্শ নিষ্ঠা দেখাবার সময় ঢের পাওয়া যাবে, মহাকাব্যের ক্ষণ কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না, তার আগে মহামৃত্যুটা তো রোধ করতে হবে।

বলিলাম, সেই মহামৃত্যুর কথাই তো আমি ভাবছি। দশদিন উঞ্ছবৃত্তি ক'রে আত্মার বিনিময়ে কোনও রকমে দেহ ধারণ করলে তো সেই মহামৃত্যুকে রোধ করা যাবে না। সাহিত্যিক বাঁচবে তার সাহিত্যের মধ্যে। কোন্ আদর্শে—

গোপালদা বাধা দিয়া বলিলেন, আত্মা আদর্শ প্রভৃতি ওসব বড় বড় কথা ব'লো না ভায়া। আমাদের জন্যে ভগবান সহজ সরল পথ নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। যুগধর্ম পালন কর, বাস্, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কি আপনার ভগবানের নির্দিষ্ট সেই যুগধর্ম ?

গোপালদা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। আসনপিঁড়ি হইয়া পূর্বেই বসিয়াছিলেন

ঘন ঘন দুলিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখে সহসা সেই দূরপ্রসারী মোহময় দৃষ্টি ঘনীভূত হইতে লাগিল, আমিও মোহাবিষ্ট ও বিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিলাম। গোপালদা বলিলেন, রঘুর দশম সর্গের দ্বাবিংশ শ্লোক মনে আছে তোমার ?—

চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগা।
চতুর্বর্ণময়ো লোকস্ত্বত্তঃ সর্বংচতুর্মুখাৎ।

অর্থাৎ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গপ্রদ জ্ঞান, সত্য-ত্রেতাদি চতুর্যুগ-পরিমিত কাল এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণময় এই সকল লোক চতুর্মুখ স্বরূপ আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যুগভেদে এই চতুর্বর্গের এক একটি বর্গ স্বয়ং ভগবান নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। ধর্মনিষ্ঠদের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে, অর্থনিষ্ঠদের কাল শেষ হয়ে এল ব'লে, এখন কামনিষ্ঠরা মাথা চাড়া দিচ্ছেন। ইংলণ্ড আমেরিকা ভারতবর্ষ প্রভৃতি সকল দেশেই অর্থনিষ্ঠগণ তাই শঙ্কিত হয়ে নানা সংঘবদ্ধ এবং কৌশলময় উপায়ে বিপুল অর্থের সহায়তায় আত্মরক্ষা করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কামনিষ্ঠদের কাল সমাগত।

বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিলাম, কামনিষ্ঠ ?

হ্যাঁ, কামনিষ্ঠ, এ আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। স্বদেশী বস্তুকেই তোমরা বিদেশের ধার করা জিনিস ভেবে আনন্দ পেতে অভ্যস্ত। সেই আনন্দই পাচ্ছ। অর্থনিষ্ঠরা চঞ্চল হ'লেও স্বভাবদোষে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছে, কর্মনিষ্ঠ কামনিষ্ঠেরা কাম চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজের লোক তাঁরা। এযুগে তাঁদের কাম জয়যুক্ত হবেই। যদি বাঁচতে চাও, সাহিত্যিক হিসেবেই হোক আর মানুষ হিসেবেই হোক, যুগধর্ম পালন কর, কামনিষ্ঠ হও।

দমিয়া গেলাম। গোপালদাকে আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না। তবু ছোট্ট একটি প্রশ্ন ছাড়িলাম, তা হ'লে মোক্ষ ?

গোপালদা দ্বিধাহীন তৎপরতার সহিত জবাব দিলেন, কামের রাজত্ব সমাপ্ত হ'লেই মোক্ষ তো সুনিশ্চিত। তবে মোক্ষনিষ্ঠদের দিন আসতে দেরি আছে। তৃতীয় বর্গের কথাই এখন কায়মনে চিন্তা কর ভায়া, মোক্ষ পাবেই। আজ তবে আসি।

গোপালদার চতুর্বর্গ শুনিয়া সাহিত্যিকদের কর্তব্যচিন্তা আমার রগে উঠিয়াছিল। গোপালদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে আর বাধা দিলাম না। একটু একলা থাকার প্রয়োজন অনুভব করিলাম।

—

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁহার 'দময়ন্তী' কাব্যের প্রথম কবিতায় "রে কন্যা আমার" বলিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়া থাকিলেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন, তবে "বদ্বীপ" বুঝিতে কিছু ভূগোল-জ্ঞান আবশ্যক বটে। কবি বলিতেছেন—

শোন্ তোরে বলি :
যে-ত্রিবলী
তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম
আজো তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।
যে মুহূর্তে বাসনাবিহ্বল নীবি
খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বঘ্ন তিমির তলে অলক্ষ্য বদ্বীপ,
অমনি থমকে কাল।

কথাটা কন্যাকে বলিবার মত বটে! না থমকিয়া কালের উদ্যত হইয়া উঠাই উচিত ছিল।

অতি-আধুনিক কবিদের যে জুয়াচুরির কথাটা আমরা বরাবরই প্রচার করিয়া আসিতেছি, দেখিতেছি তাহা একান্ত বাঙালী কবিদের নিজস্ব নয়। এই জুয়াচুরির বান পৃথিবীর সর্বত্র ডাকিতেছে। 'কবিতা'-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কাব্যবুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অমিতাভ সেন একবার কয়েকটি আজগুবি শব্দ ও বাক্যের সমষ্টিকে কবিতা হিসাবে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাগুলি পাঠে সম্পাদক মহাশয় ভাবগদগদ হইয়া কয়েকটিকে অচিরাৎ পত্রস্থ করিয়াছিলেন। এ সংবাদ আমাদের পাঠকেরা জানেন। অষ্ট্রেলিয়ায় সংঘটিত অনুরূপ একটি ঘটনা সংবাদপত্র হইতে নিয়ে প্রদত্ত হইল। বাংলা দেশের আধুনিক কবিকুল ইহাতে পুলকিত হইবেন।

ANGRY PENGUINS

Australians were chuckling last week over a literary hoax as fantastic as a duck-billed platypus. Editor Max Harris, of Adelaide's long-haired little review, *Angry Penguins*, had introduced the work of a new poet named Ern Malley with a 30-page rhapsody explaining, with deadly and Dadaistic earnestness, why Malley was "one of the two giants of contemporary Australian poetry."

Then Australian Army Lieut. James MacAuley (who fought in New Guinea) and Corporal Harold Stewart revealed that they were "Ern Malley." Forced to kill an afternoon's leave, they created Poet Malley by leafing through *The Oxford Dictionary of Quotations* and other inspirational works, and lifting whatever hit their fancy. Samples of Malley masterpieces :

There have been interpolations, false syndromes
Like a rivet through the hand
*Such deliberate suppressions of crisis as Footscray.**
There is a moment when the pelvis
Explodes like a grenade . . .
I have spit the infinitive,
Beyond is anything.

Hoaxers MacAuley and Stewart confessed that they culled the first three lines of *Culture as Exhibit* from a U. S. report on mosquito breeding grounds :

Swamps, marshes, barrowpits and other
Areas of stagnant water serve
As breeding grounds.

But Lieut, MacAuley and Corporal Stewart were out to kill more than an afternoon, As Ern Malley they wrote : "For some years we

have observed with distaste the gradual decay of meaning and craftsmanship in poetry. Harris and other *Angry Penguins* writers represent the Australian outcrop of a literary fashion prominent in England and America, a distinctive feature of which seemed to us to render its devotees insensible of its absurdity. . . . ."

Buzzed Surrealist Editor Harris: "If fifty million monkeys with fifty million typewriters tapped for fifty million years, one of them would produce a Shakespeare sonnet. I hope MacAuley and Stewart have not produced such a phenomenon. It is not their claims of exposure but time [that] tells the story. Time will explain that a myth is sometimes greater than its creators."—*Time*, July 17, 1944.

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

—

সব মেয়েই যে সমান ভ্রমণ-বিশারদ প্রবোধ সান্যাল তাঁহার একটি উপন্যাসে এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন—

"মেয়েরা একাকার হ'লে সকলের দামই সমান—সকলে একই পদার্থ। ...

ওই দেখো নৃত্যশিল্পী মলিনা যেন মিশে গেছে তিনকড়ি দাসীর সঙ্গে—ওটা বস্তির মেয়ে। আর ওই যে বসে রয়েছে রূপোর ঝুমকো দুলিয়ে, ও মেয়েটি হোলো ডক্টর মিসেস বনলতা মিত্রের বোনঝি—পারুল বোস। সম্প্রতি উনি হাত বদলে বেড়াচ্ছেন। তার পাশে নূরনগরের ছোট তরফের বউ—মেয়েটি বছর দুই আগে প্রেমোন্মাদিনী হয়ে এসে জানবাজারে ফ্লাট ভাড়া নেয়। ওর বাঁদিকে—ওই যে গেলাস ধ'রে আছে—ও-মেয়েটি কে জানো? রায় বাহাদুর অঘোর চৌধুরীর নাৎনী—নতুন এসে ঢুকেছে সিনেমায়—চেয়ে দেখো, কারো সঙ্গে কারো পার্থক্য নেই—একই সাজসজ্জার পারিপাট্য, একই দেহভঙ্গিমা, একই ফ্যাসনের পুতুল,—এবং দেখতেই পাচ্ছ, ইতরভদ্রের উদ্দেশ্যটাও একই।"...

"নতুন কয়েকজন এসে আসরে বসলো, এবং এই ফাঁকে আরও জুড়ি দুই তিন স্ত্রী-পুরুষ গেলাসগুলো হাতে নিয়েই তাদের বিশ্রামকক্ষের দিকে গা ঢাকা দিল। তাদের এই পলায়নের কারণ কারো কাছে, এমন কি সুধাংশুর কাছেও অস্পষ্ট রইল না।"

ইহা কি প্রবোধবাবুর দ্বিতীয় মহাপ্রস্থানের পথের রচনা? সঙ্গে কি আত্মীয়া-বান্ধবী কেহই ছিলেন না?

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ ঃ পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ

১

বাংলার নবযুগের যে পরিচয় দিয়াছি তাহাতে বুঝা যাইবে যে, ওই যুগ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই একরূপ সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা তাহার ধারাকে এ কাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া আজিকার এই প্লাবনকেও সেই এক গতিবেগের পরিণাম বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণাও এক অর্থে সত্য হইতে পারে, কারণ, কালের স্রোত অবিচ্ছেদেই বহিয়া থাকে, বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সম্পর্ক থাকেই। কিন্তু সেই সাধারণ কালধর্ম্মকে স্বীকার করিলেও, কালের এক একটা অংশ এমন বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, স্বতন্ত্র যুগ-বিভাগও আবশ্যক হইয়া পড়ে। বাংলার আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী তেমনই একটা বিশিষ্ট যুগ, সে যুগে সমাজ, ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতির সমস্যাই এমন আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সেই সমস্যাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ছিল একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কটের যুগ—সেই সঙ্কটে জাতির আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—শ্রেষ্ঠ প্রতিভারও বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর সে সমস্যাই যেন লোপ পাইল, বাঙালীর সকল বুদ্ধি—হৃদয়বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল; সে এক নিষ্ফল সাধনার সিদ্ধিলাভের আশায় মাতিয়া উঠিল। সে যেন একটা আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত:! তার পর হইতেই তাহার জীবনের মূল পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। কেন এমন হইল, এই ঘটনার মূলে কোন্ জটিলতর কারণজাল প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার বিচার এ যুগের ঐতিহাসিক করিবেন, এখানে সে প্রয়োজন নাই। বাংলার নবযুগ বলিতে আমি কালের যে ধারাকে একটি সুস্পষ্ট গতি ও পরিণতির আকারে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহার প্রধান প্রেরণা ও প্রবৃত্তি ছিল—বিধর্ম্মের সহিত স্বধর্ম্মের, মানবতার সহিত জাতীয়তার সমন্বয়-সাধন। বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন; বিবেকানন্দও সেই বিরোধকে একটা বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গীভূত করিয়া তাহার সমাধান-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বাস্তবের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনকে স্বীকার করিয়া তাহার উপরে জয়ী হইবার যে প্রয়াস, সেই সংগ্রামকে জীবন-ধর্ম্মরূপে বরণ করাই ছিল উভয়ের আদর্শ, এজন্য চিত্তশুদ্ধি ও পৌরুষের সাধনাকেই তাঁহারা আর সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফল কিছু ফলিতেও আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল, সেই সাধনা অতিশয় বিষময় হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দ

তাহাতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি-মন্ত্র যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষেত্র ছিল সমাজ; বঙ্কিমচন্দ্রের 'চিত্তশুদ্ধি' এবং বিবেকানন্দের 'পৌরুষ' এই দুইয়েরই সাধনা সমাজ-জীবনে হইতে পারিবে এবং তাহাই আবশ্যক, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন; তাহার কারণ, উভয়েই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, জাতির এই অধঃপতিত অবস্থায় প্রথমেই বাহিরের সহিত বিরোধ নয়, শক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বেই শত্রুজয়ের অভিযান নয়,—ভিতরে আত্মস্থ হওয়া—মানুষ হওয়াই মুখ্য, আর সকলই গৌণ। দুইটি কারণে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না, প্রথমটি—বাঙালীর জাতিগত ব্যাধি, তাহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা; দ্বিতীয়—নবযুগের সেই বাণীমন্ত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা, এবং সেই পথে দৃঢ়ভাবে চালিত করিবার মত শক্তিমান নায়কের অভাব।

প্রথমটির কথাই আগে বলিব। চরিত্রই মানুষের জীবনের নিয়ামক বা নিয়তি, জাতিরও তাহাই। বাঙালী জাতির চারিত্রিক দৃঢ়তা অপেক্ষা ভাবাবেগ বিহ্বলতাই অধিক; তাহার মেরুদণ্ড বড়ই দুর্ব্বল—মস্তিষ্কের ভাবগ্রাহিতা যেমন ক্ষিপ্র, হৃদয়ও তেমনই সদ্য-স্ফীতিপ্রবণ; তাই দীর্ঘকাল একাসনে কোন মন্ত্রের সাধনা তাহার পক্ষে বড়ই দুষ্কর। যাহার চরিত্র দুর্ব্বল তাহার আত্মপ্রত্যয় দ্বিধাযুক্ত হয়, অতএব এমন জাতি অবস্থার দাস হইতে বাধ্য। এইরূপ চরিত্রের কারণে বাঙালীর ইতিহাসও বিচিত্র বটে; ধর্ম্ম ও ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে সে অতিশয় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া, বৈষয়িক জগতে, সে কোন বড় কীর্ত্তির অধিকারী হয় নাই; নিজ বাস-পল্লীর ক্ষুদ্র সমাজ-জীবনে কর্ম্মকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া, ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত সাধনার সহায় করিয়া, এবং ভোগ-সুখকে যতদূর সম্ভব পরিমিত করিয়া, সে পারিবারিক জীবনকেই সুন্দর ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

তথাপি গত শতাব্দীতে এই জাতিই তাহার সেই দুর্ব্বল চরিত্রে একটা প্রবল ধাক্কা পাইয়া যেন নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার কারণ, তাহার সেই মেধা ও প্রতিভার বলে সে জগতের যুগান্তর-সমস্যাকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল, এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভাব-চিন্তার সংঘর্ষে আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল। সেই প্রথম তাহার নিজের প্রতি নিজের দৃষ্টি পড়িয়াছিল; সেই দৃষ্টির ফলে, সে আর একবার—সেই ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন—আত্ম-সংশোধনে ও আত্মরক্ষণে যত্নবান হইয়াছিল। এবার শুধুই বর্জ্জন নয়—গ্রহণও আবশ্যক; প্রাণপণে কেবল আত্মরক্ষাই নয়—পরকেও জয় করিতে হইবে, তাই কেবল শাস্ত্রশাসন নয়—চরিত্র-গঠনই হইল মুখ্য; কারণ, পথ্যাপথ্য-বিচার নয়—সর্ব্বপথ্য হজম করিবার শক্তিই তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। এই চিন্তা, এই ভাব, এই সংকল্প যখন তাহার জীবনে একটু মূলবদ্ধ হইতেছে ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দিক হইতে প্রবল ঝড় বহিতে শুরু করিল,—ভাব-প্রবণ বাঙালী

আর স্থির থাকিতে পারিল না, সেই ঝড়ের মুখে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এই ঝড়কে বশীভূত করিবার জন্ত যে বুদ্ধি ও যে শক্তির প্রয়োজন তাহা গণবুদ্ধি ও গণশক্তি—সে শিক্ষা ও সে সংস্কারই ভিন্ন, আধ্যাত্মিক বা চারিত্রিক আদর্শই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাই নবযুগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বেই, সহসা সাধনার এই ক্ষেত্র-পরিবর্ত্তনে একটা আদর্শ বিপর্য্যয় ঘটিল; বাঙালী আবার ভাসিয়া গেল; তারপর এখনও পর্য্যন্ত সে পায়ের নীচে মাটির সন্ধান পায় নাই। যে শক্তি-সাধনা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত ছিল তাহা এইরূপ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ও সুদুর্গম কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইল; পূর্ণশক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বেই, সেই স্বল্পসঞ্চিত শক্তির উন্মাদনায় বাঙালী যুবক, আত্মজয় নয়—আত্মনাশের আতশবাজিতে রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে চাহিল। বাঙালীর চরিত্রগুণে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বাণী সংহতিসাধক না হইয়া বিস্ফোরক হইয়া উঠিল। ইহাতেই বাংলার নবযুগের অবসান হইয়াছে। বাংলার যুব-জীবনে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহার কারণ, খাঁটি স্বাজাত্যচেতনার পরিবর্ত্তে, বিলাতী nationalism তাহাকে রিপুর মত গ্রাস করিয়াছিল; সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে আত্মস্থ হইবার—স্বজাতিকে চিনিবার ও তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ় করিবার পূর্ব্বেই, সে একটা সেন্টিমেণ্ট মাত্র সম্বল করিয়া পলিটিক্‌সের পথে দেশোদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছিল। এই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ক্রমে সে আদর্শভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, এবং নৈরাশ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পরধর্ম্ম (অ-বাঙালী বা অ-ভারতীয়) আশ্রয় করিতেও তাহার বাধে না। এখন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নেতৃত্ব করা দূরে থাক—নিজ সমাজে নেতৃত্ব করিবার জন্ত সে পরের শরণাপন্ন হয়।

অতএব, বাহিরের দিক দিয়া বাঙালীর এই দুরবস্থার কারণ যেমনই হউক, বা যতই জটিল হউক, তাহার চরিত্রই যে তাহার শত্রু, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই চরিত্রই গত যুগের সেই নবজাগরণের ফলে নূতন ছাঁচে পুনর্গঠিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্যশিক্ষা ও যুগপ্রভাবের সহিত বাঙালীর জাতিগত সংস্কৃতি ও প্রতিভার মিলনে, জীবনের এক নূতন আদর্শ—এক অভিনব মানব-ধর্ম্ম—বাঙালীর সুপ্তিভঙ্গ করিয়াছিল, সে সাড়া তাহার আত্মায় জাগিয়াছিল, নতুবা জ্ঞানে, কর্ম্মে, কল্পনায় ও ভাবুকতায় এমন প্রতিভার বিকাশ হইত না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বাঙালী সেই নবযুগকে এত সহজে বরণ করিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ, জগৎ ও জীবনের প্রতি তাহার মনোভাব ভারতীয় প্রকৃতি হইতে একটু স্বতন্ত্র, তাহার আধ্যাত্মিক সংস্কারও সন্ন্যাসের বিরোধী,—বৈষ্ণবই হউক, আর শাক্তই হউক, সে ভোগবাদী, রূপরসরসিক—তান্ত্রিক। তাই

জীবনকে আরও শক্ত করিয়া ধরিবার জন্য—পাশ্চাত্যের প্রকৃতিবাদকেও যেমন, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকেও তেমনই, তাহার সেই স্বভাব-ধর্ম্মের বা স্বধর্ম্মের দ্বারা শোধন করিয়া, সে এক নূতন শক্তিমন্ত্রের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত, তাহার চরিত্রে যে বস্তুর বিশেষ অভাব—সেই পৌরুষ ও কর্ম্মবীর্য্য, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সাধনা প্রধান পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাই সে যুগের শেষ শিক্ষা, এই মন্ত্রে দীক্ষালাভই যে সেই যুগ-সমস্যার শেষ সমাধান, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহাও জানি; এই জীবনবাদ, ও শক্তিসাধনার এই আদর্শ যে অতঃপর ভাসিয়া গেল কি কারণে, তাহা বলিয়াছি। বাঙালীর দুর্ব্বল ধাতুতে ওই শক্তিমন্ত্র সহ্য হইল না। কিন্তু ইহার পর তাহার সেই প্রাক্তন সংস্কার—ব্যক্তি ও সমাজের সেই পুরাতন বন্ধনও আর টিঁকিল না। সে যে আর টিঁকিবে না—একটা ভূকম্প যে আসন্ন, সেই আশঙ্কা করিয়াই, গতযুগের শেষভাগে, জাতিহিসাবে বাঁচিবার জন্য এত চেষ্টা হইয়াছিল, সেই চেষ্টাই উপস্থিত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, সেই ভাবধারাও রুদ্ধ হইয়াছে।

২

তথাপি ওই যুগের শেষভাগে, বিবেকানন্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আর এক মহা-প্রতিভার উদয় হইয়াছিল; পরবর্ত্তীকালে এই প্রতিভা বাঙালীর ভাব-জীবনে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—আমি বঙ্গভারতী ও ভারত-ভারতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথের উদয় ও অভ্যুদয়ের কাল উনবিংশ শতাব্দীর কিয়দংশ অধিকার করিলেও, তাঁহার প্রকৃত উদয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই হইয়াছিল, এবং তাঁহার সাধনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ওই শতাব্দীর বয়োবৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই সাধনাও ক্রমে যে মুখে অগ্রসর হইয়াছে তাহা এতই স্বতন্ত্র, এমন কি বিপরীত যে, তাঁহাকে নবযুগের সেই ধারার সহিত যুক্ত করিলে, সেই যুগ ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়কে বুঝিবার পক্ষে বাধা হইবারই সম্ভাবনা। এজন্য, আমি যাহাকে বাংলার নবযুগের সাধনা বলিয়াছি, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে পৃথক রাখাই কর্ত্তব্য মনে করি। তৎসত্ত্বেও, রবীন্দ্র-প্রতিভার এইরূপ বিকাশের মূলে বাংলার উনবিংশ শতাব্দীরই একটা গভীর ও প্রচ্ছন্ন প্রেরণা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে—প্রধান ধারার বহির্ভূত হইলেও, তাহা সে যুগের সহিত একেবারে নিঃসম্পর্কিত নয়। অতএব আমার এই আলোচনার পরিশিষ্ট হিসাবে, আমি প্রথমে সেই সম্পর্কের, এবং পরে সেই প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের কথাই বলিব।

বাংলার নবযুগের বঙ্কিম-পূর্ব্ব ভাগের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি সেই কালের একটি প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি—সেই প্রবৃত্তির নাম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহা। যে মানব-মহত্ত্ববোধ এই যুগের নব প্রবৃত্তির আদি লক্ষণ, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যস্পৃহাও তাহারই অন্তর্গত। সমাজের সহিত ব্যক্তির নূতন করিয়া বোঝাপড়া, শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে

বিচার বুদ্ধির জাগরণ, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে স্বকীয় আদর্শ ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তিতা—এ সকলই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের লক্ষণ। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-চেতনা ততখানি অন্তর্মুখ ছিল না, তিনি তৎকালীন সমাজকে সহ্য না করিলেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই; তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্যবোধে এইরূপ পৌরুষেরই দৃপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রামমোহনের বাণী ও তাঁহার কার্য্যকলাপ তাঁহার সেই আদর্শ স্থাপনের পক্ষে কার্য্যকরী হয় নাই; তাঁহার সেই আন্দোলন কেবল এক দিকেই নবযুগের সেই প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করিয়াছিল—সর্ব্ব বিষয়ে Reason বা বিচার-বুদ্ধির একাধিপত্য, এবং তজ্জনিত ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা। হৃদয়বৃত্তির উপরে বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রাধান্যের ফলে, সমগ্রভাবে সমাজ বা জাতির কল্যাণ-কামনা মুখ্য না হইয়া ব্যক্তির স্বতন্ত্র সাধনাই শ্রেয়স্কর হইয়া উঠিতেছিল; যে তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য, যে দূরদৃষ্টি ও প্রেম ব্যতিরেকে, এক অতি-প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী, অথচ অধুনা-মৃতবৎ অতিকায় সমাজ-দেহের উত্তোলন ও উজ্জীবন অসম্ভব, ব্যক্তির এই স্বাতন্ত্র্য-কামনা তাহার আদৌ অনুকূল নয়। এইরূপ মনোভাব সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও মধ্য স্তরে সংক্রামিত হইবার পক্ষে একটা বড় সহায় হইয়াছিল—সেকালের ইংরেজী শিক্ষা; সেই শিক্ষার অন্তর্গত Humanity বা মনুষ্যত্বের মহিমাবোধ এবং তাহারই সমর্থনে ইতিহাস-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য ও তৎ-প্রসূত যুক্তিবাদ, সেকালের অতি দুর্ব্বল হিন্দু-সংস্কারকে প্রবলভাবে আঘাত করিবারই কথা। রামমোহনের প্রতিভায় এই ভাব আপনা হইতেই স্ফুরিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না, তাই বোধ হয়, তাঁহার দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু পরে যাঁহারা রামমোহন হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি ঠিক রামমোহনের অনুগামী ছিল না; তখন সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ভিতরে ভিতরে জাতীয়-চেতনার মূল ক্ষয় করিতেছিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই, ইংরেজী শিক্ষার সারতত্ত্ব হজম হইয়া আসিলে পর, বাঙালীর মানস-দেহে সেই শিক্ষা বিষ-চিকিৎসার মতই সুফলপ্রদ হইল, তাহারই কারণে, সমাজ-চেতনারও অধিক—জাতীয় আত্ম-চেতনার সঞ্চার হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহার মস্তিষ্কের যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই চেতনা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিল, প্রাণে সাড়া জাগিল—প্রেম আসিয়া জ্ঞানের হাত ধরিল, বাঙালী নবযুগকে তাহার জীবনে বরণ করিয়া লইল। আমি ইহারই কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার উদয় ও সেই প্রতিভার উন্মেষের সহিত এই যুগের যে সম্পর্ক তাহা ওই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ঘটিত, অতএব, এই তত্ত্বটিকে ধরিয়া আর একটু ভিতরে যাইতে হইবে। সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই অন্ততঃ কতক পরিমাণে দেশ-কালের নিয়ম-

বহির্ভূত—কখন্ কোথায় যে তাহার আবির্ভাব হইবে পঞ্জিকার সাহায্যে তাহা গণনা করা যায় না; তাহার উপর, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই স্ব-তন্ত্র যে, অনেক সময়ে মনে হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের, তথা বাঙালী-জীবনের কোন সাক্ষাৎ-সম্পর্ক নাই—কেবল ইহাই সত্য যে, ওই জ্যোতিষ্কের উদয় আর কোথাও না হইয়া আমাদের এই নিম্নভূমির অতি-নিকট দিগ্বলয়ে হইয়াছিল; তাহার কোন কারণ না থাকিলেও, বিশ্ববিধানের দুর্জ্ঞেয় নিয়মে তাহার বারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ নামক যে প্রতিভা সূর্য্য আপন জ্যোতির্লীলা আপনারই স্বভাবে প্রকটিত করিয়া আপনিই অস্ত গিয়াছে, তাহার আলোকে আমাদের অন্ধকার গৃহকোণ আলোকিত হইয়াছে কি না, তাহার কিরণ-প্রাচুর্য্যে আমাদের ক্ষেত্রতলের শস্যরাশি পাকিয়াছে কি না, অথবা তাহার উত্তাপে আমাদের শীত-জড়িমা ঘুচিয়াছে কি না—এমন প্রশ্ন যেন নিতান্তই অবান্তর; যদি তাহা হইয়া থাকে, ভালই; যদি না হইয়া থাকে, সে অনুযোগ করা মূঢ়তা মাত্র। কিন্তু এ কথা পরে, এখন যাহা বলিতেছিলাম। এই যে প্রতিভা, ইহা যতই স্বয়ম্পূর্ণ বা দেশকাল-নিরপেক্ষ হউক, ইহারও একটা জন্মস্থান বা উদ্ভব-ক্ষেত্র আছে—সেই ক্ষেত্রই ইহার বিকাশের পক্ষে বাধা না হইয়া বড়ই অনুকূল হইয়াছিল। এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র ও সাধন-জীবনের প্রভাবে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই যুগের যে সম্পর্ক—রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জ্জীবনের সম্পর্ক গৌণভাবে তাহাই; অন্তর্জ্জীবন বলিলাম এই জন্য যে, কবিশিল্পী হিসাবে সেই যুগের সহিত তাঁহার যে সাহিত্যিক সম্পর্ক তাহা অন্যরূপ; সে সম্পর্কের কথা, এ প্রসঙ্গে যতটুকু আবশ্যক, পরে বলিব।

দেবেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে রামমোহনের শিষ্য হইলেও তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতিশয় বিলক্ষণ; ওই যুগের যে আধ্যাত্মিক সঙ্কটের কথা বলিয়াছি, সেই সঙ্কট দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই সর্ব্বপ্রথম গুরুতর হইয়া উঠে। রামমোহনের নিকটে তিনি একটা মন্ত্রের নির্দ্দেশ মাত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সংশয় আরও গভীর হইয়াছিল। তিনি, রামমোহনের মত, ধর্ম্মবিষয়ে কেবল জ্ঞানপন্থী ছিলেন না—ভাবপন্থীও ছিলেন, তাই বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতকে যুক্তিসিদ্ধ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া, এবং সেমিটিক ঈশবাদকেই তাহার দ্বারা উন্নত ও মার্জ্জিত করিয়া, কেবল 'পৌত্তলিকতা'র উচ্ছেদসাধনেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; তিনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদকেই নিজের আধ্যাত্মিক পিপাসার অনুরূপ একটি ভাব-সাধনার বস্তু করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন যে ধর্ম্মমতের স্থাপনা করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে একটি বিশিষ্ট সাধনা যুক্ত করিয়াছিলেন; কেবল 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্' নয়—তিনি ব্রহ্মের রস-রূপকেও জীবনে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ধর্ম্মমন্ত্র তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত সাধনার সহিত এমনই

জড়িত ছিল, তাঁহার সেই আদর্শের মধ্যে এমন একটা বন্ধন ছিল যে, মুক্তিপিপাসু নব্য সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিতে পারে নাই; রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সংস্কারপন্থীরা সেরূপ না বুঝিয়া তাঁহার সেই যুক্ত-ধর্ম্মের শাণিত অস্ত্রখানিকেই সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদনের উপযোগী বলিয়া সাগ্রহে বরণ করিয়াছিল।

নব্যপন্থী হইলেও দেবেন্দ্রনাথ যে বন্ধন মানিতেন, তাহা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাধনার আধ্যাত্মিক সংস্কার; তিনি আধুনিক জীবনেই সেই সনাতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যুগ-প্রবৃত্তির সহিত তিনি যেটুকু রফা করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাহা প্রকৃত রফা নয়—আসলে তাহার সেই আক্রমণকে নিবারণ করিয়া, সেই বিদ্রোহকেই ভিন্ন পথে ফিরাইয়া, একটা অতীত যুগ ও অতীত সমাজের ভাবস্বপ্নময় আদর্শকে সত্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অতিশয় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন—বংশগত সংস্কারেও তিনি ছিলেন পুরা অ্যারিষ্টোক্র্যাট (aristocrat)। তাহার উপর, তাঁহার চরিত্রেই এমন একটি উন্নত আদর্শনিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিল যে, তিনি সহজেই ভারতীয় সাধনার সেই অন্তর্মুখ ও আত্মতান্ত্রিক আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এ যেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের এক খণ্ড সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ নবযুগের সেই সমস্যাসঙ্কুল ভাববন্যার তরঙ্গাভিঘাত রোধ করিয়া, একটি সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে স্বকল্পিত সাধনমঞ্চ রচনা করিয়াছিলেন; সেই সাধনমঞ্চ যেমন বিবিক্ত, তেমনই তাঁহারই স্বহস্তরোপিত পুষ্পপাদপে সুশোভিত ছিল। বাহিরের হিন্দুসমাজের সহিত যে ব্যবধান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহাও সম্ভবতঃ এইরূপ মনোভাবের সহায়ক হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানের বিদ্রোহকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই—কিন্তু সমাজ-জীবনের মিথ্যা অপেক্ষা ব্যক্তি-জীবনের মিথ্যাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, এজন্য নিজ জীবনের সত্যোপলব্ধিকে সমাজের পক্ষেও সমান উপযোগী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সংস্কারকের গোঁড়ামি বা প্রচারকসুলভ অন্ধতা ছিল না—তাঁহার চরিত্রগত আভিজাত্য সে বিষয়ে একটি সুন্দর সংযম রক্ষা করিয়াছিল।

এই যে চরিত্র এবং এই যে বিশিষ্ট সাধনা ইহা যে সেই যুগের ভাবধারারই একটি তরঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই—ভাবের কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই আন্দোলনের গতি ও পরিণতি ওই শতাব্দীর শেষে কিরূপ হইয়াছিল সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; কেবল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও সাধনায় তাহার যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহাই বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে, কারণ, রবীন্দ্রনাথের মানস-জীবন-গঠনে তাহার প্রভাব অতি গভীর। দেবেন্দ্র-নাথের ধর্ম্মজীবনে উপনিষদের বাণী যেভাবে পুষ্পিত ও বিকশিত হইয়াছিল তেমন

আর সে যুগে কোথাও দেখা যায় না'। "এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন একজন স্রষ্টা-কবি। তিনি তাঁহার নিজ জীবনের ভাষায় যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার ছন্দ ও সুর রবীন্দ্রনাথের বাণী-মন্ত্রে বীজরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে অর্থে স্বকীয় বা নিজস্ব, সেই অর্থে এই পৈতৃক মন্ত্র-বীজ তাঁহার নিজস্ব নয়, এমন বলা যাইতে পারে; তথাপি, ইহারই প্রভাব তাঁহার কবিমানসকে প্রথম হইতেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; তাঁহার কবিপ্রতিভা ও কবিজীবন একটি বিশিষ্ট ভাব-তন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। কথাটা একটু বেশি সূক্ষ্ম হইয়া পড়িতেছে—বিস্তারিত ব্যাখ্যার অবকাশও নাই, তথাপি, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতিতে যে উদার রসপিপাসা ও সর্ব্বতোমুখী কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এমন সন্দেহ হয় যে, সেই স্বাধীন স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভা যদি এত বড় একটা প্রভাব ও অন্যান্য বেষ্টনী-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিত, যদি সেই একান্ত আত্মমুখী সাধনা তাঁহার পিতার মূর্ত্তিতে শরীরী হইয়া তাঁহার মানসে দৃঢ়-মুদ্রিত না হইত, তাহা হইলে হয়তো রবীন্দ্রনাথই অতিশয় শক্তিমান তান্ত্রিক সাধকরূপে বাংলার সেই নবযুগের Renaissanceকে চরম ও পরম পূর্ণতা দান করিতে পারিতেন। এইরূপ ভাবনা যে সূক্ষ্ম-বিচার-সঙ্গত নয় তাহাও বুঝি; কারণ এরূপ মহতী প্রতিভা আপনার নিয়মেই আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে, বাহিরের সকল প্রভাবকে সে আত্মসাৎ করিয়া লয়, তাহাকে কেহ আত্মসাৎ করিতে পারে না। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কোনরূপ বাধা পাওয়া দূরে থাক, তাঁহার পিতার ওই প্রভাবে একটা বিশেষ রঙে রঞ্জিত ও দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই—তাঁহার সেই Idealism ও আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা ওই সনাতন ভারতীয় আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যক্তির আত্মসাধনাই ইহাতে প্রবল; এইরূপ ভাব-সাধনার সহিত অত্যুৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা যুক্ত হইলে যাহা হয়—রবীন্দ্রনাথের সাধনায় তাহাই হইয়াছে। এক দিকে সেই এক ভাব-মন্ত্রের বন্ধন, এবং অপর দিকে কাব্যরস-সাধনার মুক্তি, এই উভয়ের লুকাচুরি—'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র সেই লীলা, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কবিমানসকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাহার মূলে আছে সেই খাঁটি ভারতীয় মনোভাব, তাহারই বশে রবীন্দ্রনাথ, এত কাল পরেও বাস্তবজীবনের সকল বিরূপতা ও আধুনিক যুগের বিষম কোলাহলের উপরে এক স্বাধীন আত্মার স্বকল্পিত ভাবজগৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিমানস ও সেই কাব্যজগতের বিস্তারিত পরিচয় এখানে অনাবশ্যক; তাহা যে সেই যুগের ভাবধারা হইতে স্বতন্ত্র—শুধুই সে যুগ কেন, কোন যুগেরই অধীন বা অনুগামী নয়, ইহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কি কারণে এত গভীর ও গূঢ় তাহা বলিয়াছি, সেই এই কারণে তিনি সেই যুগের প্রতিনিধি হইতে পারেন নাই। এই প্রতিভাই, বাংলার

ও ভারতের—কেবল পৌরাণিক ছাড়া, আর সকল যুগের—সকল ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার রসকল্পনাকে পুষ্ট করিয়াছে ; অতএব; এক হিসাবে ইহা যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি-কাননের যেন একটি কবি-মধুকর,—তেমনই কোন এক বিশেষ যুগের প্রতিনিধি নহে। এই অবাধ ভাবরসরসিকতার সহিত দুর্জ্জয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জ্জীবন ও বহির্জ্জীবনের দ্বন্দ্বও অতিশয় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সকল আসক্তির মধ্যেই তিনি নিরাসক্ত ; জনতার শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেও সারা পথ তিনি আত্মমনস্ক, তাঁহার জীবনে কর্ম্মানুষ্ঠানের যে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায় তাহাতেও বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা আত্মগত ভাবসত্যের প্রয়োজনই অধিক। যে পথ তাঁহাকে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া লয় তাহা আমাদের এই পথ নয় ;—তাঁহার সেই পথ ও ঘর একই, তাহার কারণ, সে পথে—যাত্রারম্ভ ও যাত্রাশেষ, এই দুইয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই—তাহাতে গন্তব্যের ভাবনা নাই, পথ চলাতেই আনন্দ, তাই পথবাসে ও গৃহবাসে প্রভেদ নাই। এইরূপ দেশকালহীন মানস-ভ্রমণ কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব, যে রবীন্দ্রনাথের মত একটি আত্মস্থির ভাবদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, যে নিজেরই মধ্যে সমস্ত জগৎকে গ্রাস করিয়া তাহাকে আপন রসকল্পনার অধীন করিয়াছে—গতি ও স্থিতির যুগ্ম-তালকে বিশ্বরাগিণীর সঙ্গীত-সুষমার সমীভূত করিতে পারিয়াছে। তখন কোথায় যুগ ! কোথায় বা তাহার সমস্যা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহার উদয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকালে যাহার অস্তগমন—সেই অন্বর্থনামা কবির রবিমণ্ডলে বসিয়া প্রাচীন ঋষিবংশবন্দিত সাবিত্রী-দেবতা সেই এক সুরের উদ্বোধন করিতেছে—সেই—'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্' !

অতএব, যে নূতন মানবধর্ম্ম—Humanityর যে বাস্তব আদর্শ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় সাধন, এই ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভাব-মুক্তির সাধনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সাধনা অতিশয় শক্তিমান ব্যক্তিপুরুষের সাধনাই বটে ; কিন্তু সকল ভাবতান্ত্রিক আদর্শকে নিষ্ফল করিয়া মানুষের যে ইতিহাস-জাত নিয়তি আজ শত শতাব্দীর শেষে তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাকে এড়াইয়া চলিবার উপায় আর নাই ; এবার ব্যক্তি-জীবনকে মানব-জীবনে লয় করিতে হইবে ; সেই মানবও ব্যক্তি-মানবের একটা ভাব-বিগ্রহ নয়, রক্তমাংসেরই এক বিরাট শরীরী বিগ্রহ। মানবাত্মার যাহা পরম পদ তাহাও স্বার ভাবসাধনার লভ্য নয় ; জীবনের উপলবন্ধুর পথ, দুর্গম গিরিসঙ্কট ও তপ্ত মরুসৈকত অতিবাহন করিয়া, দুর্ব্বলতম যাত্রীর হাত ধরিয়া, সেই পরম তীর্থে পৌছিতে হইবে। অতএব ওই ভাবমার্গের সাধনা এ যুগের পক্ষে ব্যর্থ হইবারই কথা—যদিও আর এক ক্ষেত্রে আর এক রূপে তাহা সার্থক হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে আশ্রয় করিয়া সেই ভাব-বীজ কালজয়ী কাব্যকুসুমে বিকশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—নবযুগের সমস্যা-সমাধানের সহিত সে

কীর্ত্তির সাক্ষাৎ-সম্পর্ক যে অল্প, এ কথা বিস্মৃত হইলে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিই অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে যুগ, জাতি ও দেশের বাস্তব আঘাত হইতেও নিষ্কৃতি পান নাই; সেই আঘাতে তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত নানা রূপে সাড়া দিয়াছে—সেই সাড়াও তাঁহার সেই আত্ম-সচেতন মনের সহিত নিজেরই বোঝাপড়া। সাময়িক ভাবাবেগে তিনি নিজের কবিধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া বিড়ম্বনা ভোগও করিয়াছেন—রবীন্দ্র-সাহিত্যে কবির অন্তর্জ্জীবনের পাশে পাশে সেই বহির্জ্জীবনের কাহিনীও রেখাপাত করিয়াছে। সেই সকল রেখাবলী হইতে পৃথক করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়া লওয়া দুরূহ নয়, বরং, বাংলার নবযুগের ভাবধারার যে পরিচয় আমি দিয়াছি তাহার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সেই কবিমূর্ত্তিকে স্থাপন করিলে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই সে যুগের সাহিত্যিক আদর্শকেও অস্বীকার করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্য এমনই যে, যতদিন বাংলার ভাবচিন্তায় সে যুগের প্রভাব মন্দীভূত হয় নাই, ততদিন তাঁহাকে কেহ চিনিতেও পারে নাই; তখন তাঁহার ভাবও যেমন—ভাষা ও ছন্দও তেমনই, সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া মনে হইত; প্রায় মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াও এই রবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র আপনার কিরণজাল প্রকাশিত করিতে পারেন নাই! তারপর, যখন কিছুদিনের জন্য (তাঁহার কবিমানসের একটি আকস্মিক ও অভিনব বিকাশে) তিনি জাতীয়তার চারণ-কবিরূপে পথে বাহির হইলেন—এবং গানে গানে জনতার কণ্ঠ ভরিয়া দিলেন; যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মত, বিবেকানন্দেরই প্রায় সমধর্ম্মী, আর এক মহাপ্রাণ মহামনস্বী বীর সন্ন্যাসীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এক দিকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, এবং অপর দিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে, তাঁহারই স্মৃতি-মণ্ডিত 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতায়, জাতির চরিত্রগঠনে ও জাতীয় আদর্শের উদ্ধারসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন, তখনই বাংলার নবযুগের শেষ প্রতিনিধিরূপে তিনি আপন অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দান করিলেন। তাহার পরের ইতিহাস অন্যরূপ; রবীন্দ্র-জীবনের এই অধ্যায়ই বাংলার নবযুগের শেষ অধ্যায়। ইহার পর দেশ ও জাতির ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধনাও ভিন্নমুখী হইয়াছে, অথবা আরও নিশ্চিতরূপে আপন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এই যুগের রচনাবলীর সহিত পরবর্ত্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এই পরবর্ত্তীকালের যে কবিকীর্ত্তি তাহার বিচার-বিশ্লেষণ এ আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাহাতে নবযুগের সেই সাধনার ধারা যে খণ্ডিত হইয়াছে আমি অতঃপর তাহারই কিছু

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

মাধুকরী

১

কল্পনা-গগনে
ভ্রমি আনমনে ;
তরুছায়ে চমকিল তোমার অঞ্চল,
ঝঙ্কারিল বুঝি তব নূপুর চঞ্চল !
বুঝি তুমি হেরিয়া আমারে
পুষ্পিত মালঞ্চ-বক্ষে গভীর আঁধারে
উৎসুক আনন্দে লুকাইলে—
সহসা অন্তরে শুখাইলে
স্ফুটমান আশার মঞ্জরী,
মন্দানিলে মোর 'পরে ঝরি
পড়িল শিশিরকণা শীর্ণধারে
বেদনার অশ্রু সম। আমি যে তোমারে
হারাইনু বাঁধিয়াও নয়নের আলিঙ্গনে,
লভিয়াও স্পর্শ তব নূপুরনিক্কণে !
হে মানসী প্রণয়নী প্রিয়া,
দূর হতে দর্শনের ছবিটুকু নিয়া
কাটিবে কি দীর্ঘ শুষ্ক দিন ?
হতাশার দগ্ধ বক্ষে লীন
হ'ল হায় ক্ষণিকের ক্ষীণস্রোতা আশা
বিফল হইল ভালবাসা !
না না, তুমি যাও নাই ; ঐ দূরে
বাজিল কঙ্কণ তব নব সুরে ;
সুবর্ণখচিত বস্ত্রাঞ্চল
হইল যে আবার চঞ্চল
মেঘবক্ষে ক্ষণপ্রভা সম ;
হে প্রেয়সী মম,
ঘনপত্র যূথিকার ঈষৎ আড়ালে
ঐ যে দাঁড়ালে
ছলনার হাসি হেসে,
গন্ধরাজ বিলম্বিত কেশে
ডা'কছ ইঙ্গিতে,
বিক্ষুব্ধ শোণিতস্রোত মোর ধমনীতে।

২

মুহূর্ত্তের তরে
আমার অন্তরে
জ্ব'লে ওঠে সতেজে আবেগে
তীব্র তালে বজ্রবহ্নি সম ওঠে জেগে ;
সমুদ্র পীড়ন করে ঝড় যেন তেজে
শিরায় শিরায় যায় বেজে
শব্দহীন ঘোর কলরোল ;
দ্রুত হতে দ্রুততর মৃদঙ্গের বোল
কে যেন বাজায় বুকে অদৃশ্য আঙুলে ;
উঠে ফুলে ফুলে
শিরা-উপশিরা
চুনি পান্না মরকত হীরা
ঝ'রে পড়ে অবিরল আমার উপরে,
বিস্ফোরিত অগ্নিকণা ব'য়ে যায় অনন্ত নির্ঝরে।
বুঝি তার শেষ নাই, চিরস্থায়ী এক সে নিমেষে
বহুরূপা বিদ্যুৎ না'চয়া যায় লক্ষবর্ণ বেশে ;
কোটি কুসুমের গন্ধ ভ'রে ওঠে প্রাণে,
শিহরিত অন্তরাত্মা অপূর্ব্ব আঘ্রাণে,
আনন্দের কারাগারে বন্দি আমি
আনন্দ-সায়রে নামি ;
স্বপ্নক্লান্ত জাগি সখী নিঝুম হয়রে
তোমার পরশে।

৩

একটি রজনী সখী, তারই মাঝে
জীবনের আরম্ভ ও শেষ।
একটি রজনী বঁধু, জ্যোৎস্নামাখা
রজনীগন্ধার গন্ধে পুলকিত,
দক্ষিণ সাগরপথে সঞ্চারিত
সুস্নিগ্ধ পবনে সুশীতল।
আজিকার এ নিশীথে উঠেছে চন্দ্রমা
মেঘ ভেসে আসিয়াছে বায়ুভরে
মন্থর গতিতে ক্রমে ধীরে
চ'লে গেছে আকাশের পথে।
তোমার মানসপটে
কত চিত্র বর্ণে বর্ণে উঠেছে ফুটিয়া;
নয়ন হয়েছে সিক্ত অশ্রুজলে,
কভু দৃপ্ত হেরিয়াছি বিদ্যুৎবহ্নিতে,
হাস্যরসে কভু তরঙ্গিত;
অথবা কখন অবসাদে
নিদ্রাক্লান্ত ধূমাচ্ছন্ন দীপশিখাসম।
আমি হেরিয়াছি তব রূপ
মায়ামুগ্ধ চোখে,
চমকিয়া উঠিয়াছি অকারণে,
লভিয়াছি পরশে তোমার
শেষ রসবিন্দু জীবনের।

শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

তাল এবং মিছিল

সেদিন এক বিবাহের নিমন্ত্রিত আসরে একটি ভদ্রলোক বলিতেছিলেন, তাঁহার ভয়ানক বদ অভ্যাস, উচিত কথাটি স্পষ্ট ভাষায় শুনাইয়া দেওয়া। এ বিষয়ে তিনি কাহাকেও পরোয়া করেন না, তা তিনি যত উচ্চপদস্থ লোকই হন না কেন। এই তো সেদিন কালেক্টার সাহেবকে ধরিয়াই দুই কথা অাচ্ছা করিয়া শুনাইয়া দিয়া আসিলেন। বলিলাম, সাহেব, আমাদের দেশের আসল খবর তো আর কিছু রাখ না। দু দিনের জন্য আসিয়া ফপরদালালি করিয়া চলিয়া যাও। এদিকে—

একটি দুষ্টবুদ্ধি যুবক প্রশ্ন করিয়া বসিল, ফপরদালালির ইংরেজীটা কি বলিয়াছিলেন? স্পষ্টবক্তার নিতান্ত মন্দ ভাগ্য। সভাসুদ্ধ লোক একযোগে এমন তুমুল হাস্য করিয়া উঠিল যে, স্পষ্টবক্তার সমস্ত কথা বেমালুম অস্পষ্ট হইয়া গেল।

যুবকটি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। সে সভাসুদ্ধ সমস্ত লোককে এক বিষম বিপত্তি হইতে বাঁচাইয়া দিল। বিপত্তি বইকি। যাঁহারা নিজেদের গুনপনা সম্বন্ধে বড় বেশি স্পষ্ট আলাপ করেন, তাঁহারা সভ্য-সমাজের আতঙ্ক। দেখা হইলে গা ছমছম করে। তাঁহারা যে সকল কীর্তি ধরাধামে রাখিয়া যাইতেছেন, সেগুলি দৈবক্রমে অপরের অজ্ঞাত। তাই যেখানে সেখানে, সুবিধা পাইলেই, জাঁক করিয়া শুনাইতে হয়, নহিলে লোকে

জানিবে কি করিয়া? অথচ লোকে যে জানে না, তাহার কারণই হইল, কীর্ত্তিটা একেবারে কাল্পনিক না হইলেও বলিবার মত কিছু নয়। বহ্বাস্ফোট-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই ওই এক ধরন, যাহা করেন, তাঁহা একেবারে ফলাও করিয়া জাহির করা চাই, যেন এ কর্ম্মটি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম।

জাহির করিবার ধরনটি সাধারণত দুই রকমের দেখা যায়। কেহ কেহ তিলকে তাল করিয়া জাহির করেন, আর কেহ কেহ আসল ব্যাপারটিকে না বাড়াইয়া এমন আড়ম্বর ও সমারোহ সহযোগে উহা ঘোষণা করেন যে, হঠাৎ ভ্রম হয়, সামান্য ব্যাপারটি বুঝি আসলে অসামান্য। প্রথমটি হইল অতিরঞ্জনের কৌশল। ইহার সুবিধা এই যে, বলিবার সময়ে ঢাক-ঢোল বাজাইবার দরকার হয় না। তিলটি তো প্রথমেই তালে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এখন উহা শুধু সকলের নাকের সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলেই হইল। সুতরাং মুখমণ্ডলে পরম ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততার অভিব্যক্তি ফলাইয়া তালটিকে কেবল বর্ণনা করিয়া গেলেই কার্য্যশেষ। ভাবখানা, ইহা লইয়া আর হৈ-চৈ করিব কি? আপনাদের কাছে অবশ্য খুবই অসাধারণ কীর্ত্তি বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আমার নিকট ইহা জলভাত। দ্বিতীয় প্রণালীটি বিবাহের মিছিলের মত। একটা রীতিমত তাণ্ডব সম্মুখে লইয়া জরিমখমল-পরিহিত নাতিসুশ্রী বালকটি দশাশ্বচালিত স্যন্দনে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। কেবল বরটিকে হয়তো দেখিলে নাক সিঁটকাইতেন। কিন্তু সমারোহে হকচকাইয়া গিয়া উহার আসল রূপটি দৃষ্টি এড়াইয়া গেল।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই জাতীয় বিপাকেই আমাকে পড়িতে হইয়াছে। অতিরঞ্জনের কৌশলী রঞ্জনবাবুর কথাই প্রথমে বলি। তিনি ঘরে ঢুকিবামাত্র ঘ্রাণেই যেন টের পাই, আলোয়ানের ভিতর একটি অতি পরিপক্ক তাল ঢাকিয়া ঢুকিয়া আনিয়াছেন। তাল সামলাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। প্রথমটায় এটা সেটা নানারকম ছোটখাট বিষয়ের আলোচনা চলিতে থাকে। উহা গ্রাউণ্ড প্রিপারেশন। অর্থাৎ, আলাপটা উচ্চগ্রামে না চড়াইয়া নীচু পর্দ্দায় বাঁধিয়া রাখিবার আয়োজন। ইহার সার্থকতা অনভিজ্ঞের নিকট প্রথমে ধরা পড়ে না। আমারও প্রথম প্রথম পড়ে নাই। উদ্দেশ্যটা পরে বুঝিয়াছি। আসল কথাটি পাড়িবার সময় আলাপের সুরটা যদি পূর্ব্বাপর একই রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সুরের সহিত 'তাল'এর বৈষম্যটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; এবং তালটা যেন হঠাৎ গাছ হইতে কাটিয়া গিয়া দুম করিয়া পিঠের উপর পড়ে। চুটকি গান গাহিতে গাহিতে সুরটিকে রাখিয়া গানটি বদলাইয়া ভগবদ্গীতার শ্লোক যোজনা করিলে যাহা হয় আর কি। আপনি মনে মনে একেবারে লাফাইয়া উঠেন। ওই মানসিক উল্লম্ফনটাই রঞ্জনবাবুর এবং তাঁহার গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। রঞ্জনবাবুর ব্যবসা ডাক্তারি। পসারও মন্দ নয়। সেদিন নানা কথার ফাঁকে হঠাৎ বলিলেন, সাহেবগুলির

ইংরিজী বোঝা যায় না কেন, বলুন তো ? আমি বলিলাম, কোন্ সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা করতে গিয়েছিলেন ?

না, দেখা নয়। টেলিফোনে কথা হচ্ছিল।

কার সঙ্গে ?

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে।

'পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে ? কেন ?

রঞ্জনবাবুর সুর অতি সহজ ও স্বাভাবিক। বলিলেন, না, বিশেষ কিছু নয়। আমার বাড়ির সামনে একটা ট্র্যাফিক পুলিশের বন্দোবস্তের জন্তে। যা রুগীর ভিড় হয়।

তাসটিকে আলোয়ানের বাহিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াই পর-মুহূর্তে অন্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ইহাই নিয়ম। ভাবখানা হইল, এমন একটা কি কথা বলিলাম, যাহার জন্ত আমার কিংবা আপনার থমকাইয়া থাকিতে হইবে !

দূরের জিনিস যেমন ছোট এবং নিকটের জিনিস যেমন বড় দেখায়, ইহাদের চোখেও তেমনই অন্তের গুণগুলি ছোট লাগে এবং নিজেরগুলি বৃহৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়। নিজের তিলটি তাল বলিয়া মনে হয়, অপরের তালটিকে তিল বলিয়া বোধ হয়। মনশ্চক্ষুর এ রোগের চিকিৎসা নাই। উহাতে চশমা পরানো চলে না। ফলে রোগ বাড়িয়াই চলে।

রঞ্জনবাবুর জুড়ি হইলেন নবনীবাবু। ইনি এম. এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)। মস্ত পণ্ডিত। ইস্কুল হইতে ইউনিভার্সিটি পর্য্যন্ত বরাবর প্রথম হইয়া আসিয়াছেন। কৃতী অধ্যাপক, বক্তৃতায় পারদর্শী, যুক্তিতর্কে অদ্বিতীয়। যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহা দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। কিন্তু হইলে কি হইবে ? ওই মনশ্চক্ষুর ব্যারামে একেবারে সব মাটি ! একদিন তাস খেলিতে খেলিতে বলিয়া বসিলেন, জহরলাল নেহরু নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করিয়াছেন। আমরা স্তম্ভিত। বলিলাম, কেন ?

আমার পুস্তকের একখানি কপি তাঁহাকে উপহার দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম। অথচ এ যাবৎ পাঠাইতেই পারিলাম না।—বলিয়াই নির্লিপ্তভাবে খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

কোন কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত ইহার সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল। উহাই অতিরঞ্জিত হইয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, এমন কি মান-অভিমানের সম্ভাবনায়, পরিণত হইয়াছে।

এখন মিছিলওয়ালাদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাদের কৌশল হইল সমারোহ। পথের ধারে বাজিকরদের খেলা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। সম্মুখে একটি কড়ি কিংবা কাষ্ঠপুত্তলী রাখিয়া খুব করিয়া ডুগডুগি বাজাইতে থাকে। লোকের

ভিড় জমিয়া যায়। সমারোহ দেখিয়া লোকে মনে করে, উহা সামান্ত কড়ি কিংবা পুতুল নহে, আর কিছু। হয়তো এখনই নড়িয়া উঠিবে। আমাদের মিছিলওয়ালারাও ওই বাজিকরদের ন্তায় তাঁহাদের ক্ষুদ্র কীর্ত্তিখানি সম্মুখে রাখিয়া উহাকে জাঁকাইয়া তুলিবার জন্ত খুব খানিকটা হাত-পা ছুঁড়িতে থাকেন। তাঁহারা নিজেদের কীর্ত্তিতে নিজেরাই মুগ্ধ, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, উহা পাঁচজনকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া শোনাইবার মত। বিবাহ-বাড়ির যে স্পষ্টবক্তাটির কথা বলিতেছিলাম, তিনি এই দলের। কালেক্টার সাহেবকে তিনি যাহা "শুনাইয়া" দিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সাধারণ কথা। বিদেশী লোক দুই দিন থাকিয়া এ দেশের কিছুই বুঝিতে পারে না, এই মাত্র। কিন্তু একে সাহেব, তাহার উপর একটা গোটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাহারও উপর এমনই এক প্রসঙ্গ যাহা চাকুরির দরবারও নয়, খেতাবের প্রার্থনাও নয়। সুতরাং এ এক মহা কীর্ত্তি। ইহাদের বাড়াইয়া বলিবার দরকার হয় না। কোন দিন তাহা বলেনও না। সত্য সত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহাই যে এক রাজসূয় কীর্ত্তি।

মাত্রাজ্ঞানের ত্রুটিটি লক্ষ্য করিতেছেন নিশ্চয়ই। ইহার কারণ আর কিছু নয়, কারণ হইল নিজেদের ক্ষুদ্রতা। যে প্রশ্রয় এবং বাহবা আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাহাদুরি দেখিয়া দিয়া থাকি, ইহারা নিজেরাই নিজেদের বাহবা দেন। সাবাস বটে! এত বড় সাহসের কথাটা তুমি কি করিয়া সাহেবকে বলিয়া আসিলে?—স্বগতোক্তিটা যেন কানে স্পষ্ট শোনা যায়।

আপনাকে যদি ঘণ্টাখানেক কাটাইতেই হয়, তাহা হইলে আপনি ইহাদের কোন্ দলে ভিড়িবেন? আমি বিনা দ্বিধায় মিছিলওয়ালাদের দলে ভিড়িব। দুই দলই অসহ্য। কিন্তু তবু যেটুকু তারতম্য আছে, তাহা বোধ করি ইহাদেরই অনুকূলে। ইহারা মানসিকভাবে অপর পক্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ এবং ভদ্র। নিজেদের তথাকথিত গৌরব লইয়া যে জগঝম্পটা বাজান, তাহা কুরুচিপূর্ণ ও মাত্রাবিরুদ্ধ হইলেও অপরের প্রতি তাহা অসম্মানজনক নহে। অনেকে ঘটা করিয়া পুত্রকন্তার জন্মোৎসব করেন। অপত্যলাভ এমন সাধারণ ব্যাপার যে ঘটা দেখিয়া অসহ্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। এ সমারোহ তাঁহাদের নিজেদের আনন্দের জন্ত। অপরের দারিদ্র্য কিংবা অপুত্রক অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়া নয়।

রঞ্জন-নবনী সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। অন্তের প্রতি তাঁহাদের অনতিগোপন মনোভাবটি অসম্মানজনক। তাঁহারা মনে মনে অপরের মাথার উপর সর্ব্বক্ষণ পা তুলিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। কৃপা করিয়া কিংবা দায়ে ঠেকিয়া আজ আপনার সহিত আড্ডা দিতেছেন বটে, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যদি কাল প্রসন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার

"পেচকপক্ষীর পাখায় ভর করিয়া উন্নতির কোন্ অভ্রভেদী শিখরে তিনি উড়িয়া গিয়া বসিবেন, তাহা কি আপনি জানেন না ?" আগামী কল্যের এই সম্ভাবনায় তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ এত মশগুল যে, দুই দণ্ড বসিয়াই হাঁপ ধরিয়া উঠে।

সুবাস

প্রেম

তুমি নেই, তাই অন্ধকারের শূন্য ঘরের মধ্যে
একা একা প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ঝড় এল কালবোশেখী
ঘোলাটে মেঘের উদ্দামগতি এলোমেলো হাওয়া বইছে,
তোমার হাতের সূচীশিল্পের সবুজ পর্দ্দা উড়ছে !
তুমি নেই, তাই মন উদাসীন
স্মরণের বীণা বাজে রিম্‌ঝিম্
বিজন ঘরের স্তিমিত আলোয় প্রদীপের বুক পুড়ছে !

তুমি নেই, তাই প্রতীক্ষাময়ী চঞ্চল ঝ'ড়ো রাত্রে
আচমকা শুনি পায়ের শব্দ। অস্ফুট ভাষা শুনছি
বহিরাকাশের প্রান্তরে কত উদ্দাম ঘোড়া ছুটছে
মেঘলাবরণ চোখে বিদ্যুৎ হ্রেষায় বজ্র হাঁকছে !
অস্ত গিয়াছে মিলনের চাঁদ
মেঘে মেঘে তাই গভীর বিষাদ
আবছা আঁধারে হৃদয়ের দীপে শিখায়িত প্রেম কাঁপছে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পলিসি

পলিসি ধরেছ ভালো গো দাদারা, পলিসি ধরেছ ভালো,
এ গাঢ় তিমিরে যত দীপ জ্বলে, তোমরাই তাহা জ্বালো।
পরিকল্পনা তোমাদেরি জানি যেখানে যা ঘটে কাজ,
তোমাদেরি ওই কোনারক সাঁচী, তোমাদেরি ওই তাজ।
যারা করে কাম, তাহাদেরই নাম লেখা তোমাদের দলে,
যাহা করণীয় ক'রে ব'সে আছ, তাহারি নকল চলে।
পলিসি ধরেছ ভালো গো দাদারা, পলিসি ধরেছ ভালো,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতে পারিলে লাল হবে ঘোর-কালো।

সপ্তর্ষি

২

সোম-শুভ্র

ক

টেবিলের ওপর সাদা একখানি চাদর পাতা। তার ওপর কয়েকটা সাদা প্লেট। এক ধারে একখানি খবরের কাগজ বিছানো। সোম-শুভ্র একটি চকচকে কাঁচি দিয়ে পালংশাক কাটছিলেন। যে পাতাটি পোকায় খেয়েছে অথবা যেখানে সামান্যতম মলিনতার সংস্রব আছে ব'লে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, তা তৎক্ষণাৎ কেটে বাদ দিয়ে খবরের কাগজে জমা করছেন। তিনি যা খাবেন, তা নিখুঁত রকম নির্ম্মল হওয়া চাই এবং সে বিষয়ে তাঁর মন এত বেশি রকম সজাগ যে, তিনি নিজের হাতেই সব করেন। পাশেই চাল এবং ডাল রয়েছে। ইন্দু সব বেছে দিয়েছে একবার, তবু তিনি আর একবার নিজে দেখে দেবেন। কয়েকটি আলু, আধখানা বাঁধাকপি, গোটা দুই বিলিতী বেগুন হাতে ক'রে ইন্দু ঢুকল। সোম-শুভ্র প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তার দিকে হাসি-মুখে চাইলেন।

গরম জলে ধুয়ে নিয়ে এলে? আচ্ছা, রাখ ওই প্লেট দুটোতে। আমার আর কিছু লাগবে না।

আপনার কুকারটা ঠিক ক'রে দিই?

সব আমি ক'রে নেব এখন, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ইন্দু কোন উত্তর না দিয়ে আলু কপি আর বিলিতী বেগুনগুলো প্লেটে সাজিয়ে রাখতে লাগল। সোম-শুভ্র ক্ষণকাল ইন্দুর গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে থেকে যেন তার আবদার রক্ষা করছেন, এই ভাবে বললেন, আচ্ছা, বেশ, তুমিই কর আজ সব। কুকারের বাটিগুলো গরম জলে ধুয়ে নাও একবার তা হ'লে। আমার বেতের বাক্সটাতে জল মাপবার ছোট মগটা আছে। ঠিক এক মগ জল লাগবে ঝরঝরে ভাত হতে। ডালে এক মগের কম দিলেও চলবে, পাতলা ডাল পছন্দ নয় আমার। হাসলেন একটু। ইন্দুর মুখেও সামান্য একটু হাসির আভাস ফুটে উঠল। সে কুকারটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সোম-শুভ্র পালংশাক কাটা শেষ ক'রে চাল বাছতে লাগলেন।

যৌবনকালে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ব'লেই নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন ব'লে বাধ্য হয়ে স্বাবলম্বী হতে হয়েছে তাঁকে। সেকালে, ব্রাহ্মরা

গোঁড়া হিন্দুদের কাছে প্রায় অস্পৃশ্যই ছিলেন। পরিচয় জানতে পারলে হিন্দু রাঁধুনী পর্য্যন্ত থাকতে চাইত না। সোম-শুভ্র কখনও কারও কাছে নিজের পরিচয় গোপন করেন নি। ব্রাহ্মদের কাছে গিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বেধেছিল; অপরিচ্ছন্ন চাকরের হাতে খেতে তাঁর চিরকালই অপ্রবৃত্তি, সুতরাং স্বপাক আহারেই অভ্যস্ত হতে হয়েছে তাঁকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন কিন্তু এমন হয়েছে যে, অপরে রেঁধে দিলে তৃপ্তিই হয় না। সুরেশ্বরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক পরে হয়েছিল; ইকমিক কুকারও অনেক পরের কথা। সে যুগে সনাতন প্রথাতেই পিতলের বোক্‌নাতে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেতেন তিনি। নিজে হাতে রেঁধে খেতে হ'ত ব'লে তরকারি খাওয়ার অভ্যাসটা প্রায় নেই বললেই হয়,—তরি-তরকারি যা খান, তা হয় কাঁচা, না হয় সিদ্ধ। শরীরের জন্যে আর যা দরকার, তা পূরণ করেন দুধ দিয়ে। চাষবাস নিয়েই ছিলেন, সুতরাং গরুর অভাব হয় নি কখনও। তারপর অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে—বিহার-অঞ্চলে নিজের আস্তানাই গ'ড়ে উঠেছে একটা—বন্ধুবান্ধবেরও অভাব হয় নি পরে—সুরেশ্বরদের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতাই হয়েছিল—ইচ্ছে করলে অন্যভাবেও তিনি আহারের ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু স্বপাক ত্যাগ করেন নি তিনি। যে স্বাধীন মনোভাব তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল, সেই স্বাধীন মনোভাব তিনি বরাবর বজায় রেখেছেন। কখনও কোনও কারণে কারও অধীনতা স্বীকার করেন নি। বাল্যকালে হংস-শুভ্রের সঙ্গে বিলাসের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত আদর্শের জন্য অশেষ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে তাঁকে জীবনে। সে আদর্শ স্বাধীনতারই আদর্শ। বিদেশী রাজা আমাদের দেশ দখল করেছে ব'লে প্রাণ-মনও তাদের পায়ে সঁপে দিতে হবে, এই হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের হিড়িকে সবাই যখন সাহেবদের নকল করতে ব্যস্ত, তখন তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধা হয়েছিল সেই মহৎপুরুষটির প্রতি, যিনি সে যুগে মিশনারিদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, হিব্রু আর গ্রীক অধ্যয়ন ক'রে প্রচলিত বাইবেলের ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, শাস্ত্র ঘেঁটে হিন্দুধর্ম্মের কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করেছিলেন, পৌত্তলিকতাই যে হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ কথা নয়, তা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে

পেরেছিলেন। রামমোহনের মনীষাই নয়, তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর আত্মসম্মান-বোধ বেশি মুগ্ধ করেছিল সোম-শুভ্রকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কম মুগ্ধ করে নি। সে যুগে সকলেই যখন বিলাসের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন ওই ধনীর দুলালের সত্য-অনুসন্ধিৎসা, বিষয়ে বীতরাগ, পাশ্চাত্য সভ্যতার মারক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। মহর্ষি নিজেই যে স্বাধীনচিত্ত ছিলেন তা নয়, অপরের স্বাধীনতার ওপর তিনি জোর ক'রে কখনও হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। তাই তাঁর প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যখন মতবিরোধ হ'ল, তখন নিজের মতে নিজের পথেই চলতে দিলেন তিনি তাঁকে। নিজেরও আদর্শ পরিবর্ত্তন করলেন না, তাঁকেও পরিবর্ত্তন করবার জন্যে জবরদস্তি করলেন না। তাঁর সহধর্ম্মিণীকেও তিনি পৌত্তলিকতা থেকে জোর ক'রে বিরত করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর এই স্বাধীনতা-নিষ্ঠা যদিও সোম-শুভ্রের মনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল, তবু তিনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজে ঢোকবার চেষ্টা করেন নি, তার কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, স্বাদেশিকতার ছদ্মবেশে সে সমাজে যে সনাতনী মনোবৃত্তি তখনও ওতপ্রোত হয়ে ছিল, তা ঠিক সংস্কারমুক্ত মনোবৃত্তি নয়। উপবীতধারী ব্যক্তি-মাত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। কেশব সেনের অতি-প্রগতিশীল আন্দোলনেও তাঁর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয় নি, তা যেন বড্ড বেশি পাশ্চাত্য-ঘেঁষা ছিল। যদিও তিনিও মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন, তাঁর 'সুলভ সমাচার' যদিও স্বদেশী ভাবই উদ্দীপ্ত করত তখন সকলকার মনে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি যেন যীশুখ্রীষ্টেরই ভক্ত হয়ে পড়লেন। যীশুখ্রীষ্টের ওপর কারও বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু দেশে তখন 'স্বদেশী' ভাব জেগেছে—বেদান্ত উপনিষদ ছেড়ে বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনবার প্রবৃত্তি ক'মে আসছিল শিক্ষিত যুবকদের। দেশী কুসংস্কার এবং পাশ্চাত্য-বিহ্বলতা—এই উভয়েরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর। তাই হংস-শুভ্র যখন মেতেছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্জের দলে, সোম-শুভ্র তখন দীক্ষা নিচ্ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে দীক্ষা নিচ্ছিলেন ব'লে যে, মহর্ষির দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তা মোটেই নয়। নবগোপাল মিত্রের এবং রাজনারায়ণ বসুর জাতীয়তাবোধ তখন কোন্ যুবকের প্রাণে সাড়া না জাগাত! নবগোপাল মিত্রের নামই ছিল 'ন্যাশনাল' মিত্তির।

তাঁর কাগজের নাম ছিল 'ন্যাশন্যল পেপার'। তাঁর হিন্দুমেলায়, শঙ্কর ঘোষের লেনে তাঁর কুস্তির আখড়ায় সে যুগে কে না গেছে! সেই কুস্তির আখড়ায় সোম-শুভ্রও লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, তরোয়াল-খেলা শিখেছিলেন একদিন। লর্ড লিটন আসবার পর অবশ্য থেমে গেল সেসব। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতেও সাগ্রহে যেতেন তিনি। যেতেন না কেবল 'পলিটিকাল' সভায়। সেকালের বক্তৃতা-মুখর পলিটিকাল আন্দোলনে তাঁর প্রাণ ঠিক সাড়া দিত না। তাঁর মনে হ'ত, সাহেবী পোশাক প'রে বিলিতী মদ খেয়ে সভায় সভায় সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের লম্বা বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি, যদি কার্য্যত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের মর্য্যাদা আমরা না দিতে পারি? আমাদের নিজেদেরই সমাজে যখন জাতিভেদের অসাম্য, স্ত্রীলোকদের পরদা সরিয়ে দেবার সাহস নেই, কুসংস্কারের পঙ্কে সমস্ত দেশ যখন পঙ্কিল, ভ্রাতৃবিরোধই যখন সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনা, তখন সেখানে নিজেরা সেসব দূর করবার চেষ্টা না ক'রে বক্তৃতা করলেই কি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে? স্বায়ত্ত-শাসন তিনিও কাম্য মনে করতেন, কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি কাম্য মনে করতেন স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা অর্জ্জন করাকে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি, তাই এ কথাটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি যে, জনসাধারণ কর্ত্তৃক জনসাধারণের হিতের জন্য যে শাসনবিধি আমরা চাইছি, তা কখনও স্থায়ী হবে না, জনসাধারণ যদি তার উপযুক্ত না হয়। নিজের চিত্ত স্বাধীন না হ'লে সত্যিকার স্বাধীনতা কে দিতে পারে? সমাজের পায়ে অসংখ্য কুসংস্কারের শৃঙ্খল আমরা নিজেরাই পরিয়ে রেখেছি, অথচ তার অগ্রগতির জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি বিদেশী বড়লাটকে। এই হাস্যকর ব্যাপারে তাঁর মন কখনও সাড়া দেয় নি। তাই তিনি কংগ্রেস-সভায় বিদ্রোহমূলক বক্তৃতা করবার চেষ্টা না ক'রে সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে। প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তাঁর পৌরুষ যেন কৃতার্থ হয়েছিল। ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্যে তিনি ব্রাহ্ম হন নি, ব্রাহ্মধর্ম্ম সে যুগে বিদ্রোহের প্রতীক ছিল ব'লেই তিনি সে ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আসলে তিনি বিদ্রোহী ছিলেন। কোন গণ্ডির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তিনি যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি, তার প্রমাণ, ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে

সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেন নি। সে সমাজেরও নানা কুসংস্কার নানা গোঁড়ামি তাঁর মনকে পীড়িত করত। শেষকালে সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মদের 'হামবড়া' ভাব। মুখে যদিও সকলে বিনয়ের অবতার ছিলেন, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্তায় তাঁরা এমন ভাব প্রকাশ করতেন অব্রাহ্ম হিন্দুদের সম্পর্কে যে, সোম-শুভ্রের লজ্জা করত। কারও সঙ্গে খাপ খায় নি ব'লেই তিনি পালিয়েছিলেন বাংলা দেশ ছেড়ে বেহারের দেহাতে, এবং সেখানেই স্কুল ক'রে হাসপাতাল ক'রে নিজের আদর্শ জীবন যাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন এতকাল। এক সময়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, বেহার অঞ্চলে অনেকখানি জমি কিনে নির্য্যাতিত ব্রাহ্মদের জন্যে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবেন, অনেকেই তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্যে নির্য্যাতিত হতেন। অনেককে সাহায্য করতেন তিনি। ভেবে-চিন্তে উপনিবেশ স্থাপন করবার বাসনা ত্যাগ করেছিলেন তিনি শেষকালে। ভেবে দেখলেন, এতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হওয়া সম্ভব। বহু-সম্প্রদায়-বিভক্ত এই দেশে আর একটা সম্প্রদায় বাড়ালে বিরোধের আর একটা বীজ বপন করা হবে মাত্র। এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এড়ায় নি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা প্রত্যঙ্গ— ওটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পৃথক করবার চেষ্টা করা অনুচিত। ওর যেটুকু ধর্ম্ম সেটুকু সনাতন হিন্দুশাস্ত্র থেকেই নেওয়া, আর ওর যেটুকু ঢং সেটুকু বিদেশী জিনিস। উপনিবেশ স্থাপন করলে অনিবার্য্যভাবে সেই ঢংটুকুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। নিছক ধর্ম্মচর্চ্চার জন্যে আলাদা উপনিবেশ স্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-সংস্কার করতে গেলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবার চেষ্টা করাই ভাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পর হয়ে যেতে হয়, তাতে লাভ হয় না,— লোকসান হয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও মনে হয়েছিল তাঁর। ধর্ম্মের জন্যে, আদর্শের জন্যে কষ্টস্বীকার না করলে ঠিক যেন মূল্য দেওয়া হয় না তার। সুতরাং উৎসাহী ব্রাহ্ম-হিতৈষী হিসাবে ব্রাহ্ম-সমাজে তাঁর খুব খাতির ছিল না। বন্ধু সুরেশ্বর ছাড়া আর কারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলেন না তিনি। বেহারের যে অংশে তিনি জমি কিনেছিলেন, তা নেহাতই দেহাত—রেল-স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে—মেশবার মত বাঙালীও কাছে-পিঠে ছিল না বড় একটা। বেহারী জনমজুর, বেহারী চাকর-গোমস্তা, স্কুল, হাসপাতাল আর চাষবাস নিয়েই থাকতেন তিনি। বই প'ড়ে

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশের সঙ্গে যোগ ছিল বাংলা সাহিত্যের মারফত। বাংলা ভাষার প্রত্যেক লেখককে তিনি চিনতেন। সাহিত্য ছাড়া তাঁরা আর একটি শখ ছিল, তা বাগানের—শুধু ফলের নয়, ফুলেরও। প্রকৃতির কোলেই কেটেছে সারাটা জীবন। তাই কোন বিষয়ের কোন গোঁড়ামিই তাঁর মনকে আবিল ক'রে তোলে নি। তিনি মনের শুভ্রতা সত্যিই বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিবাহ করেন নি, কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসেন নি, মিথ্যা কথা বলেন নি, হীন কাজ করেন নি কখনও কোনও রকম। তাঁর মনের আর একটা অবলম্বন ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। কলেজ-জীবনে আর্টের চেয়ে বিজ্ঞানের প্রতিই বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর, বিশেষ ক'রে উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি। উদ্ভিদ-জীবনের গহন রহস্যে নানা তত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন। যশোলিপ্সা থাকলে তাঁর ওই সব অপূর্ব্ব, অদ্ভুত এবং অনেক সময় আজগুবি গবেষণা ছাপিয়ে তিনি নাম করতে পারতেন, কিন্তু সেসব দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। সত্যকে সন্ধান করবার যে আনন্দ, সেই আনন্দেই মশগুল থাকতেন, সেসব লিপিবদ্ধ ক'রে কাজে লাগাবার খেয়াল কখনও হয় নি। এমনও হয়েছে যে, তাঁর কল্পনা, তাঁর গবেষণা অনেক পরে অন্য বৈজ্ঞানিকের যশের কারণ হয়েছে, কিন্তু সেজন্য কখনও ক্ষুব্ধ হন নি তিনি, আনন্দিতই হয়েছেন। গাছেরও যে অনুভূতি আছে—এ কথা জগদীশচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে তাঁর মাথায় এসেছিল। জগদীশচন্দ্র, ঠিক তাঁর সহপাঠী না হ'লেও, সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যখন উদ্ভিদের অনুভূতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন সোম-শুভ্র নিজের কল্পনাকে একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় মূর্ত্ত দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। গাছের অনুভূতিই নয়, গাছ বিষয়ে নানা উদ্ভট কল্পনা আছে তাঁর। তাঁর ধারণা, পশুপক্ষীরাই শুধু যে মানুষের অনুরাগ-বিরাগ বুঝতে পারে তা নয়, গাছেরাও পারে। গাছকে ভালবাসলে সে হৃষ্ট হয়, ঘৃণা করলে ক্লিষ্ট হয়। বায়লজিস্টরা গাছকে জীব-জগতের নিম্নতম স্তরে স্থান দিয়েছেন গাছের পূর্ণ পরিচয় এখনও ঠিকমত পান নি ব'লে। ঘোড়ার শরীরে ডিপ্‌থিরিয়া এবং টেটানাস ঢুকিয়ে যখন প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্সিন তৈরি করা সম্ভব হ'ল, তখন সোম-শুভ্রের মনে হ'ল, গাছের শরীরেও যদি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে গাছও হয়তো প্রতিষেধক

কোনও ঔষধ প্রস্তুত করতে পারে। যে গাছ জীব-জগতের এত আহার এবং ঔষধ যোগাচ্ছে, তার পক্ষে এও অসম্ভব না হতে পারে। এই সব নিয়ে তাঁর কল্পনা-বিলাসের অন্ত নেই। এই সম্পর্কেই বিশেষ ক'রে তিনি এবার কলকাতায় এসেছেন।

হংস-শুভ্র এসে প্রবেশ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন সোম-শুভ্র।

ব'স ব'স। একটা কথা জানতে এলাম। শঙ্খর ছেলের অন্নপ্রাশনের খবর পেয়েছ তুমি?

হ্যাঁ, দু তরফ থেকেই পেয়েছি। শঙ্খর শ্বশুরবাড়ি থেকেও নিমন্ত্রণ করেছেন আমাকে। আগামী রবিবারে তো?

রবিবারে হবে না। ছুটির দিন দেখে অন্নপ্রাশন হয় না, শুভদিন দেখে হয়। পরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ভাল দিন আছে, সেই দিনই ঠিক করছি। তুমি থাকতে পারবে তো? প্রায় দিন দশেক পেছিয়ে গেল।

পারব।

তা হ'লে তো ভালই হ'ল, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা হচ্ছিল। মৃগাঙ্ককেও চিঠি লিখে দিই তা হ'লে, তার এখন বম্বে যাওয়ার দরকার নেই। কংগ্রেসের একটা মীটিঙে ও না গেলে দেশোদ্ধার আটকে থাকবে না। সবাই দেশোদ্ধার করতেই মত্ত—নিজেকে উদ্ধার করা যে আগে দরকার, তা কেউ বুঝবে না।

হীরক এবং রজতের মুখ তাঁর মনে পড়ল। তাঁর এই পৌত্র দুটির জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাঁর। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে আজকাল ভাবাই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। হীরক জেলে; রজতের পেছনে নাকি এখনও পুলিস ঘুরছে, এত খরচ করা সত্ত্বেও। রজতের সম্বন্ধে একটা যা ভরসার কথা, ছোকরা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছে। মেয়েটাও নেহাত তুচ্ছ করবার মত নয়, কালো চোখের চাউনিতে আলো আছে। কাজলের ঢলঢলে মুখখানা মনে পড়ল। মুখে যদিও কিছু বলেন নি তিনি, কিন্তু এক নজর দেখেই এই নাত-বউটিকে ভারী পছন্দ হয়েছিল তাঁর। রজত কি একে ফেলে পালাতে পারবে? কিন্তু রজত সব পারে। একটুও মুখবিকৃতি না ক'রে কুইনিন-মিক্শ্চার খেয়ে বাজি জিতেছিল একদিন ছেলেবেলায়। ট্রেন ফেল ক'রে তুমুল বৃষ্টিতে হেঁটে এসেছিল কেবল কথা রাখবার জন্যে।

সব পারে। আজকালকার এই ডাকাত ছেলেগুলোর অসাধ্য কিছু নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ মনে হ'ল, এর আগে এ দেশে এ রকম ছেলে ছিল কি? ক্ষুদিরাম? কানাইলাল?—বারীনের নামটা মনে পড়তেই মনটা খিঁচড়ে গেল হঠাৎ। না—না...হঠাৎ নজরে পড়ল, সোম-শুভ্র তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

আত্মস্থ হয়ে বললেন, ও, আচ্ছা, তুমি থাকছ তা হ'লে। দেখ, ভাবছি, এই বোধ হয় আমার জীবনের শেষ কাজ, একটু ভাল ক'রেই করব। কাশী থেকে ভাল পুরোহিত আনিয়ে রীতিমত যজ্ঞ ক'রে, বুঝলে—

উৎসাহভরে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন, সোম-শুভ্র চাল বাছছেন—ইতিপূর্ব্বে আরও দু-একবার দেখেছেন, তবু মেজাজটা বিগড়ে গেল নতুন ক'রে। গমনোদ্যত হয়ে বললেন, আচ্ছা, বিকেলে সব কথা হবে এখন।

বিকেলে আমি কলকাতা যাব ভাবছি।

ও, আচ্ছা।

একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সোম-শুভ্র প্রশান্তভাবে চাল বাছতে লাগলেন। মিনিট দুই পরে একটা কাচের কুঁজো হাতে ক'রে তারাপদ প্রবেশ করলে।

এই দেখ, তোমার মনোমত হয়েছে কি না। তিন বার ধুয়েছি।

কুঁজোটা তুলে ধরলে। সোম-শুভ্র ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে দেখলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, এখনও ময়লা ভাসছে। থাক, রেখে দাও তুমি, আমি নেব ঠিক ক'রে এখন।

কোথা ময়লা, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু!

আবার বেরিয়ে গেল তারাপদ। একটু পরেই আবার জল-ভরতি কুঁজো নিয়ে ঢুকল।

নাও, দেখ।

সোম-শুভ্র দেখে বললেন, রেখে দাও। তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, রেখে দাও না, আমি সব ঠিক ক'রে নেব।

তা তো নেবে। কিন্তু ওদিকে বড় কর্ত্তা যদি টের পায় যে, তুমি নিজে সব ঠিক ক'রে নিচ্ছ, তা হ'লে আর আস্ত রাখবে না আমাদের কাউকে।

তোমাদের বংশে রাগটি তো কারও কম নয়, নেপালী চাকরটাকে এমন খড়ম ছুঁড়ে মারলে সেদিন যে—

তারাপদ!

হংস-শুভ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওই শোন। এখন কলকাতা ছুটতে হবে আমাকে। অন্নপ্রাশনের তারিখ-ফারিখ সব উল্টে দিয়ে ব'সে আছে। যজ্ঞ হবে। বাণীকণ্ঠকে তার করা হয়ে গেছে।

বাণীকণ্ঠ কে?

এ বাড়ির তোমরা কেউ চেন না তাকে। ওর এক ক্লাসের ইয়ার ছিল আগ্রায়। চমৎকার সারেঙ্গ বাজায়, এই তার গুণ।

তারাপদ!

উচ্চতর গ্রামে হংস-শুভ্রের ডাক শোনা গেল আবার।

আমি যাই। ইন্দু রইল, সে সব ঠিক ক'রে দেবে।

তারাপদ!

তারাপদ চ'লে গেল। কুকারের বাটিগুলি গরম জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে একটা ফরসা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ইন্দু প্রবেশ করলে একটু পরে।

চালগুলো ধুয়ে আনি?

আন, ছাড়বে না যখন।

ইন্দু নিখুঁত নিপুণতা সহকারে বাছা চালগুলি গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোম-শুভ্র ডালে মন দিলেন।

খ

সোম-শুভ্র কলকাতায় এলে পরমানন্দের বাসাতেই ওঠেন। শশাঙ্কের বাসায় উঠতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় তাঁর। বাসন্তী এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে, কিন্তু তবু তিনি ওঠেন নি। শঙ্খ রজত হীরক—এদের কাউকে তিনি চেনেন না। শশাঙ্ককে চেনেন, কিন্তু— এই 'কিন্তু'টা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তিনি। অন্নপ্রাশনের দিনে যেতে হবেই, ভিড়ে গোলমালে কেটে যাবে কোন প্রকারে, এই ভরসা।

পরমানন্দ এবং অনামিকাকে আগে থাকতেই খবর দিয়েছিলেন। খবর না দিয়ে কোথাও যান না তিনি। পরমানন্দ এবং অনামিকা বিকেলে বেরিয়ে

পড়ে সাধারণত। কোন মহদুদ্দেশ্যে নয়, আড্ডা দিতে যায়। পরমানন্দ যায় নবকুমারের বাড়িতে, অনামিকা ইলার। পরমানন্দের চাকরি হয়েছে, নবকুমারের হয় নি। নবকুমার 'অধরা' নামক মাসিক-পত্রিকার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক। অনামিকার বিয়ে হয়েছে, ইলার হয় নি। ইলাও বিনা বেতনে শিক্ষয়িত্রীগিরি করেন সদ্য-স্থাপিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে। পরমানন্দ নবকুমার শুধু যে এক ক্লাসের লোক তা নয়, এক ধাতেরও। দুজনেই নোট-বই মুখস্থ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জ্জন করেছে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণও করেছে, কিন্তু একজনও ঠিক ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির নয়। সুলভ সংস্করণের নানা পুস্তকের দৌলতে দুজনেই—বিশেষ ক'রে নবকুমার—আধুনিক জগতের অনেক সংবাদ রাখে। ফড়ফড় ক'রে অনেক কিছু আউড়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে সাধারণ যে কোন লোককে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ওরা ঠিক 'ব্রাহ্মণ' নয়, এমন কি শিক্ষিতও নয়। ওরা ভারবাহী মাত্র। ওরা নানা বই থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ ক'রে চতুর্দ্দিকে আস্ফালন ক'রে বেড়ায় নিজেদের জাহির করবার জন্যে এবং সেটাও নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে। শিক্ষাটা মনে প্রবেশ করলে যে সঙ্কোচ, যে দ্বিধা, যে বিনয় আত্মপ্রচারে বাধা সৃষ্টি করে, তা এদের নেই, এবং নেই ব'লেই যেন এরা গর্ব্বিত। অনামিকা ইলারও সেই দশা। লোক-দেখানো শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত হয় নি। মনোজগতের নয়, বস্তুজগতের সুখ-সুবিধা আহরণের জন্যেই ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে সর্ব্বদা নানা ভাবে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে।

তবু সোম-শুভ্র এদের কাছেই আলোচনা করবেন ঠিক করেছিলেন। যদিও তিনি পরমানন্দকে মানুষ করেছেন এবং নিজে পছন্দ ক'রেই অনামিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছেন, তবু এদের যে তিনি ঠিক চেনেন না, তা তিনি নিজেও বুঝতেন। আজকাল কোন ছেলেকে 'মানুষ' করা মানে, তার জন্যে মাসে মাসে নিয়মিতভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করা। সে সত্যিই মানুষ হচ্ছে কি না, তা নির্দ্ধারণ করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব। পছন্দ ক'রে বিয়ে দেওয়াটাও অনেকটা ওই জাতীয় অসম্ভব ব্যাপার। যে মেয়েটিকে পছন্দ করা যায়, সে সত্যিই পছন্দসই কি না, তা এক নজর দেখে বা সামান্য একটু-আধটু খবর নিয়ে বোঝা শক্ত। এসব জানা সত্ত্বেও সোম-শুভ্র এদের কাছেই নিজের

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক করলেন, তার কারণ, যৌবনের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, অসম্ভব এবং আজগুবি কল্পনা পরিহাসের পরিবর্তে স্বপ্ন উদ্রিক্ত করতে পারে কেবল যৌবনের মনেই। যৌবনের প্রতি তাঁর এই আস্থার গভীরতা এত অধিক ছিল যে, আধুনিক ছেলে-মেয়েদের চপলতা, বিলাসপ্রবণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বেচালকেও তিনি সহ্য করতেন। মনে করতেন, প্রাণের জীবন্ত প্রবাহ স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের তৈরি কৃত্রিম গণ্ডি অতিক্রম ক'রে যায় মাঝে মাঝে। চিরকালই যায়। ও নিয়ে বেশি বিচলিত হয় তারাই, যারা সত্যকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তবে এটাও ঠিক যে, তিনি বেচাল পছন্দ করতেন না, সভ্যসমাজের রীতিনীতি মেনে চলাটাই ভাল লাগত তাঁর, নিজেও মেনে চলতেন। জীবন্ত প্রাণের আবেগকে স্বীকার করতেন ব'লেই তার দুর্দ্দমনীয়তাকেও মানতেন। এই আবেগকে শুধু যে মানতেন তা নয়, এর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর।

জীবনের ছিয়াত্তর বছর যখন পূর্ণ হ'ল, এবং হঠাৎ যখন তাঁর পুরাতন ভৃত্য রঘু সন্ন্যাস-রোগে মারা গেল এক ঘণ্টার মধ্যে, তখন তাঁর মনে হ'ল, জমা-খরচ মিলিয়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ এবার ঠিক ক'রে ফেলা উচিত। যে কোন মুহূর্তে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে। বিবাহ করেন নি, উত্তরাধিকারী কেউ নেই। দশ লক্ষ টাকার যে পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি পেয়েছিলেন, তা থেকে কিছুই তিনি প্রায় খরচ করেন নি। হাজার দশেক টাকা খরচ ক'রে জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সস্তায় যে দুশো বিঘে জমি কিনেছিলেন, তা থেকে শুধু তাঁর ভরণ-পোষণ নয়, অনেক উদ্বৃত্তও হয়েছে। স্কুল এবং হাসপাতাল চালাতে কিছু খরচ হয়েছে অবশ্য, বন্ধুবান্ধবরাও মাঝে মাঝে নিয়েছেন কিছু, শশাঙ্ককে কিছু দিয়েছিলেন একবার, পরমানন্দর জন্যেও কিছু গেছে, কিন্তু তবু এখনও সবসুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর ব্যাঙ্কে জমা আছে। এ টাকাটার একটা সুব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া তাঁর যেসব গবেষণা-মূলক অদ্ভুত কল্পনা আছে, সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূর্তি দেবার চেষ্টা করাও উচিত—সম্ভব হ'লে যন্ত্র-সহযোগে সেসবের যাথার্থ্যও প্রমাণ করতে হবে। এই সম্পর্কেই তাই তিনি পরমানন্দ এবং অনামিকাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তারা যেন তাঁদের দু-একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনে

বুধবার সন্ধ্যায়, সেই দিন তিনি কলকাতায় পৌঁছবেন এবং তাদের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে দু-একটা আলোচনা করবেন। পরমানন্দ অনামিকা তাই সেদিন আড্ডা দিতে না গিয়ে নবকুমার ইলাকেই নিমন্ত্রণ করেছিল নিজেদের বাড়িতে। নবকুমার কাগজের সম্পাদক, সবজান্তা, সবাইকে তাক লাগিয়ে কথা বলে। ইলা বি. এস-সি. পড়েছিল, তারও বৈজ্ঞানিক হতে বাধা নেই।

সোম-শুভ্র ঠিক সময়ে এসে পৌঁছলেন এবং পরমানন্দ, অনামিকা, নবকুমার, ইলার সম্মুখে এমন স-সঙ্কোচে তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটি পাঠ করলেন যে, যেন তিনি বিশ্ববিখ্যাত কোন বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মুখে কতকগুলি হাস্যকর উদ্ভটতার অবতারণা ক'রে ধৃষ্টতা প্রকাশ করছেন।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

দ্বিতীয় অঙ্ক

কানাইবাবুর হোটেলের ছোট একটি ঘর। ঘরের মধ্যে তক্তাপোশ, টেবিল, আলনায় কোট প্যাণ্টলুন; ট্রাঙ্ক; টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। মুকুন্দ অর্থাৎ অনঙ্গমোহনের ভৃত্য মনিবের বিছানায় শুইয়া গড়াইতেছে আর নিজের মনে বকিতেছে

মুকুন্দ। ওরে বাবা! খিদের যে এমন তেজ তা আগে টের পাই নি, পেটের মধ্যে যেন রুশ-জার্মানের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।...দু মাস হ'ল কলকাতা ছেড়েছি, বাবু যাবেন বাড়ি—এতদিনে পৃথিবী ঘুরে আসা যায়! কোথায় গেল সব টাকাকড়ি, এখন এই পচা শহরে খিদের জ্বালায় ভুগে মরি। কেন বাপু, নিজের আয় বুঝে ব্যয় করলেই হয়! তা হবে না। নিজে যে মস্ত জমিদার, তা প্রমাণ করা চাই। মাইনের টাকাগুলো কলকাতাতেই শেষ। বুড়ো কর্ত্তা টাকা পাঠালে, তবে বাবু রওনা হলেন। মাঝখানে মাথায় যে কি চাপল, নেমে পড়লেন দিনাজশাহী শহরে। উঃ-হু-হু, পেটের মধ্যে সত্যি রুশ-জার্মানের লড়াই বেধে গিয়েছে। টাকাগুলো বাবুগিরি ক'রে, জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে এখন মুখটি চুন। কিন্তু চাল খাটো হবে না। [তাহার মনিবের বাচন-ভঙ্গীতে] মুকুন্দ,

যাও, হোটেলে গিয়ে সবচেয়ে ভাল ঘরটা রিজার্ভ কর। 'সবচেয়ে ভাল' খানা চাই'। যেন কোন নবাব-পুত্তুর আর কি! 'এদিকে তো কেরানী-গিরি ক'রে কলম ক্ষ'য়ে গেল। নাঃ বাপু, কলকাতার চাকরি এবার ছেড়ে দেব, এর চেয়ে পাড়াগাঁয়ে বেশ আরামে থাকা যায়। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই; পছন্দমত একটা বিয়ে ক'রে ফেল, বউটা সব কাজ করবে, আর আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে—বাঃ, কি সুখের জীবন!

কিন্তু যাই বল, টাকা থাকলে কলকাতার মত আরামের জায়গা আর নেই। একখানা ফরসা ধুতি-চাদর হ'লেই সবাই 'বাবু' বলে, 'মশাই' বলে। গাড়োয়ান, রিক্‌শওয়ালা সবাই 'আসুন' বলবে। ট্রামে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে চ'লে যাও। তোফা! তোফা! সাহেবী দোকানে ঢুকে পড়, কেনো, নাই কেনো, মেমসাহেবরা এসে বলবে 'সার'! নাঃ, আমাদের বাঙালী দোকানগুলো কিছু নয়।

অনেকক্ষণ পথে চ'লে কষ্ট হ'লে ট্রাম আছে, বাস আছে। না হয় ট্যাক্সি নাও। ভাড়া না থাকে তো তাতেই বা কি! 'এই ড্রাইভার, ঠারো, হামারা দোস্তকা কোঠি হ্যায়।—ব'লে এক বাড়ির সামনে নেমে পড়, আর পেছনের দরজা দিয়ে স'রে পড়। হাঃ-হাঃ, এইজন্যেই বড়লোকের বাড়ির দুটো দরজা। খাদ্যি-খানাও চমৎকার। কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেলেই বিপদ, এখন যেমন উপস্থিত। বুড়ো কর্ত্তা টাকা পাঠাচ্ছেনই, কিন্তু বুঝে-সুঝে খরচ করলে তো আর লোকে নবাব বলবে না! ট্যাক্সি ছাড়া বাবু চলবেন না, প্রত্যেক দিন সিনেমা দেখা চাই। তার পরদিন বলবেন, মুকুন্দ, দেখ তো কোটটা বেচে কিছু পাওয়া যায় কি না! আড়াইশো টাকার কোটে পঁচিশ টাকাও ওঠে না।…কেন বাপু, এত নবাবি না ক'রে আর দশজনের মত আপিসে গিয়ে খাটলেই হয়!…বুড়ো কর্ত্তা একবার জানতে পারলে জল-বিছুটির ব্যবস্থা করবে। কি মুশকিলেই পড়া গেছে! হোটেলওয়ালা জবাব দিয়েছে, সমস্ত দাম মিটিয়ে না দিলে আর এক পয়সার জিনিসও দেবে না। উঃ, পেটের মধ্যে কি লড়াইটাই না হচ্ছে! এক মুঠো ভাত পেলেও…ইস্, কি খিদেই না পেয়েছে! মনে হচ্ছে, এক গ্রাসে পৃথিবীটা খেয়ে ফেলতে পারি। কে? [দরজায় ধাক্কা] বাবু নিশ্চয়। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল]

(অনঙ্গমোহনের প্রবেশ)

অনঙ্গমোহন। এই নাও। [টুপি ও ছড়ি মুকুন্দর হাতে দিল] আবার তুমি আমার বিছানায় গড়াচ্ছিলে?

মুকুন্দ। তোমার বিছানায় শুতে যাব কেন?

অনঙ্গমোহন। বটে! আবার মিথ্যে কথা! বিছানা এলোমেলো হ'ল কেন?

মুকুন্দ। বিছানায় আমার কি দরকার? আমার পা নেই? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারি।

অনঙ্গমোহন। [পায়চারি করিতে করিতে] যাক, দেখ তো কৌটোয় সিগারেট আছে কি না!

মুকুন্দ। সিগারেট কোত্থেকে আসবে? চার দিন হ'ল ফুরিয়ে গিয়েছে।

অনঙ্গমোহন। [পায়চারি করিতে করিতে গম্ভীরভাবে] দেখ মুকুন্দ।

মুকুন্দ। আজ্ঞে?

অনঙ্গমোহন। [স্বর আগের চেয়ে কম গম্ভীর] একবার ওখানে যাও তো।

মুকুন্দ। কোথায়?

অনঙ্গমোহন। [স্বর আর গম্ভীর নয়; যেন অনুনয়ে পূর্ণ] নীচে, রান্নাঘরে, ওদের বল, আমাকে খাবার পাঠিয়ে দিক।

মুকুন্দ। আমি তা পারব না।

অনঙ্গমোহন। পারবে না? এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মুকুন্দ। কিছুতেই আর কিছু হবে না। হোটেলওয়ালা বলেছে, আর তোমাকে বিনা পয়সায় কিছু দেবে না।

অনঙ্গমোহন। এতখানি তার সাহস! আর কি করবে শুনি?

মুকুন্দ। সে বলছে, এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সে বলে, তোমার বাবু আজ তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি পয়সা দেয় নি। তোমরা ঠগ। তোমার বাবু জোচ্চোর। সে বলে, এ রকম ঠগ আগেও অনেকবার দেখেছি।

অনঙ্গমোহন। আর তোমার এত আস্পর্দ্ধা, সেই সব কথা আমার কাছে বলছ!

মুকুন্দ। হোটেলওয়ালা বলে, এই রকম লোক আসতে আরম্ভ করলে ছ মাসের মধ্যেই আমাকে লালবাতি জ্বালতে হবে। না, এবার আর

আমি ছাড়ছি না, আমি আজই তাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি, এর পরে যাতে শ্রীঘর যেতে হয় তার ব্যবস্থা করব।

অনঙ্গমোহন। থাক থাক। অনেক হয়েছে। এবার গিয়ে তাকে থানা পাঠিয়ে দিত বল।

মুকুন্দ। তার চেয়ে আমি তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। তাকে দিয়ে আমার কি দরকার? আমার দরকার তার খাবারগুলো। ··আচ্ছা, তাকেই ডেকে নিয়ে এস।

মুকুন্দর প্রস্থান

উঃ, কি খিদেই না পেয়েছে! একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, খিদে দমন হয় কি না! চারগুণ আর বেড়ে উঠল। নাঃ, নৈহাটিতে সাত দিন কাটিয়ে কি ভুলই না করেছি! ওখানে জুয়াড়ীদের পাল্লায় না পড়লে আজ অনেক টাকা থাকত। আর এ কি পচা শহর, বাপ্‌স্! কেউ ধারে এক পয়সার জিনিস দিতে চায় না, প্রগতি ব'লে এখানে কিছু নেই দেখছি।

('মেবার পাহাড়', 'যমুনে তুমি কি সেই যমুনে!' প্রভৃতি সুর শিস দিয়া পায়চারি করিতে লাগিল)

(মুকুন্দ ও হোটেলের একজন খানসামার প্রবেশ)

খানসামা। বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি চাই?

অনঙ্গমোহন। আরে, তুমি যে! ভাল আছ তো?

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। তোমাদের হোটেলের খবর কি? সব ঠিক চলছে?

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। লোকজন কেমন আসছে?

খানসামা। মন্দ নয়।

অনঙ্গমোহন। দেখ, ওরা এখনও আমার খাবার পাঠিয়ে দেয় নি। তুমি চটপট আমার খাবারটা পাঠিয়ে দাও তো। খেয়েই আমাকে একটা জরুরি কাজে বেরুতে হবে।

খানসামা। আমার মনিব বলেছেন, আর আপনাকে খাবার দেবেন না আজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর নালিশ করতে যাওয়ার কথা আছে।

অনঙ্গমোহন। এতে নালিশ করবার কি আছে? তুমিই ভেবে দেখ না, আমার কর্ত্তব্য কি? আমাকে খেতে হবে, না খেয়ে কতদিন থাকব? তাতে যে শরীর শুকিয়ে যাবে। বিষম খিদে পেয়েছে। ভেবো না যে, আমি ঠাট্টা করছি।

খানসামা। মনিব বলেছেন, আগের সব মিটিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত আর আপনাকে কিছু দেবেন না।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো। তুমি তাকে গিয়ে একটু বুঝিয়ে বল না।

খানসামা। এর মধ্যে বুঝিয়ে বলবার আর কি আছে?

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার এখন বিষম খিদে পেয়েছে। পেয়েছে কি না? আচ্ছা, তা হ'লে আমার খাওয়া দরকার। দরকার কি না? এই তো দিব্যি বুঝতে পেরেছ! সত্যি, তোমার কি বুদ্ধি! এইবার তোমার মনিবকে গিয়ে বুঝিয়ে বল। খিদে এক জিনিস, আর টাকা আর এক জিনিস। দুটোকে মিশিয়ে ফেলতে নিষেধ ক'রো। তাকে বল গিয়ে যে, তার মত চাষা দু-চার দিন না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমার মত ভদ্রলোকের পক্ষে এক বেলাও অনাহারে থাকা অসম্ভব। অন্যায়। বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধ। বুঝেছ? এইবার গিয়ে বুঝিয়ে বল দেখি।

খানসামা। আচ্ছা হুজুর। আমি বলি গিয়ে।

খানসামা ও মুকুন্দর প্রস্থান

অনঙ্গমোহন। যদি সত্যিই সে খাবার না পাঠায়, তবে তো বিপদ! এমন খিদেও জন্মে পায় নি। পদ্মার হাওয়ায় খিদের আগুন দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল। কোট আর ট্রাউজার বাঁধা দিলে কিছু পাওয়া যায় না? না না, বরঞ্চ দু দিন না খেয়ে থাকা ভাল, তবু হার্ম্যানের বাড়ির নতুন সুট প'রে বাড়ি পৌছনো চাই।

...ইচ্ছে ছিল, মোটরে ক'রে কলকাতা থেকে ধু্লাশালগুড় যাব। বেটা পেট্রলওয়ালা গোল করলে। নাঃ, বাকিতে দেব না। কেন বাপু? বড়লোক কবে নগদ দাম দেয়? মোটরে ক'রে বাড়ি পৌছতে পারলে শহরের লোক দেখে অবাক হয়ে যেত। কে আসছে? মিঃ অনঙ্গমোহন রায়, বি. এ., অফিসার অব দি সেক্রেটারিয়েট! মুকুন্দটাকে সামনে

বসিয়ে দিতাম, চকচক করছে চাপরাস আর উর্দ্দি! ওঃ, সে কি চমৎকার হ'ত! সব মাটি ক'রে দিলে বেটা পেট্রলওয়ালা। বাকিতে দেব না! নন্সেন্স! বড়লোকে কবে আবার নগদ কারবার করে! কিন্তু, উঃ, কি খিদেই না পেয়েছে!

(মুকুন্দর প্রবেশ)

কি খাব?

মুকুন্দ। খাবার নিয়ে আসছে।

অনঙ্গমোহন। [দুই চেয়ারে ভর দিয়া বার কয়েক ত্বলিল]

খাবার! খাবার! খাবার!
নামটি যেন বাবার।
না পেলে প্রাণ সাবাড়!

চমৎকার! চমৎকার! তুই বলছিলি, দেবে না?

(খানসামার থালা বাটি লইয়া প্রবেশ)

খানসামা। মনিব বললেন, এর পরে আর খাবার দেবেন না।

অনঙ্গমোহন। মনিব! মনিব! তোমার মনিবের আমি ভারি ধার ধারি কিনা! কি এনেছ?

খানসামা। ভাত, ডাল আর মাছের ঝোল।

অনঙ্গমোহন। শুধু ডাল আর মাছের ঝোল?

খানসামা। শুধু এই আজ হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। তোমার মনিবকে বল গিয়ে, ওসব ধাপ্পায় আমি ভুলব না। আর-যা যা আছে, সব পাঠিয়ে দিতে বল।

খানসামা। আর কিছু হয় নি।

অনঙ্গমোহন। মাংস হয় নি?

খানসামা। না।

অনঙ্গমোহন। ফের মিথ্যে কথা! রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ওঠবার সময়ে দেখলাম, মাংস রাঁধছে। আর দুজন লোককে মাংসের চপ খেতে দেখলাম এখুনি।

খানসামা। আছে, কিন্তু নেই।

অনঙ্গমোহন। তার মানে?

খানসামা। তার মানে ওসব ভদ্রলোকদের জন্যে।

অনঙ্গমোহন। রাস্কেল!

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ। ওরা খাচ্ছে আর আমি পাই না কেন? আমি কি খেতে জানি না?

খানসামা। ওরা দাম দিয়ে খায়।

অনঙ্গমোহন। এসব বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা নিষ্ফল। [খাইতে খাইতে] একে মাছের ঝোল বলে নাকি? ঝাল নেই, নুন নেই, কেবল কতকগুলো জল। যাও, ভাল দেখে ঝোল পাঠিয়ে দাও।

খানসামা। মনিব বলেছেন, পছন্দ না হ'লে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে; আর কিছু সে পাবে না।

অনঙ্গমোহন। [পাছে ফিরাইয়া লইয়া যায়, সেই ভয়ে হাত দিয়া বাটি রক্ষা করিতে করিতে] তুমি রাস্কেল। তোমার মনিব ডবল রাস্কেল। আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার চলবে না ব'লে দিচ্ছি। [খাইতে খাইতে] কি ঝোল! আর কি মাছ! বাপ রে, জ'মে পাথর হয়ে গিয়েছে। এ মাছ নদীর, না পাহাড়ের? নাঃ, এ মাছই নয়।

খানসামা। মাছ নয় তো কি?

অনঙ্গমোহন। তোমার মাথা। চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল। এখন দাঁতগুলো না ভেঙে যায়! আর কিছু আছে?

খানসামা। না।

অনঙ্গমোহন। শূয়ার! গাধা! গরু! চাটনি নেই? দই? এ তো খাওয়ানো নয়, ভদ্রলোকদের পকেটমারা!

(খানসামা ও মুকুন্দ মিলিয়া থালা বাটি লইয়া টেবিল পরিষ্কার করিয়া ফেলিল; উভয়ের প্রস্থান)

নাঃ, পেট ভরল না, কেবল খিদে আরও বেড়ে গেল। পয়সা থাকলে বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নেওয়া যেত।

(মুকুন্দর প্রবেশ)

মুকুন্দ। বাবু, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন। তোমার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

নঙ্গমোহন। সর্ব্বনাশ! হোটেলওয়ালা বেটা নিশ্চয় নালিশ করেছে। জেলে নিয়ে যাবে নাকি? সেখানে যদি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করে··· না না, কখনই জেলে যাওয়া হবে না। এ কদিন এখানে মস্ত অফিসার সেজে বেড়াচ্ছিলাম, আর এখন জেলে···না না, সে কিছুতেই হবে না। লোকটার আস্পর্দ্ধা দেখ না, আমাকে ভাবে কি? আমি চোর জোচ্চোর, না মুটে-মজুর। আমি বলব, আমাকে কি ভাব? এত বড় তোমার সাহস! এত—

(সহসা দরজা খুলিয়া গেল; অনঙ্গমোহন ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও বলরাম প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত দুইজন দুইজনের দিকে ভীতভাবে তাকাইয়া থাকিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভীত ভাব কতক পরিমাণে কাটাইয়া বিনীতভাবে] সুপ্রভাত। আশা করি, আপনার সব মঙ্গল।

অনঙ্গমোহন। সুপ্রভাত, সার্।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমাকে মাপ করুন···

অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। এই শহরের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে আমার কর্ত্তব্য, এই শহরের বিদেশী অতিথিদের মঙ্গলামঙ্গল দেখা।

অনঙ্গমোহন। [প্রথমে ভীতভাবে, কিন্তু শেষে ভয় কাটাইয়া উঠিয়া] কিন্তু আমি কি করব বলুন? আমার দোষ নেই, আমি সব পাওনা মিটিয়ে দিতেই যাচ্ছিলাম—আজই বাড়ি থেকে আমার টাকা আসবার কথা। [ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিল] দোষ ওরই···লোকটা মাছ দেয় যেন পাথরে তৈরি, আর মাংস কেবলই হাড়। জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া মুখে দেবার উপায় নেই। চায়ে আঁশটে গন্ধ। কদিন থেকে বেটা আমায় না খাইয়ে রেখেছে। আমি কেন তাকে···কেন যে—

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভয় পাইয়া] মাপ করুন, কিন্তু সত্যি বলছি, আমার দোষ নয়। এখানকার বাজারে চমৎকার টাটকা মাছ ওঠে। তালাইমারির জেলেরা বড় ভাল লোক, বছরে তারা দুবার বারোয়ারী পূজো করে—একবার কালীপুজো, একবার হরিপূজো। ও বেটা যে এ মাছ কোথা থেকে নিয়ে আসে, জানি না। চলুন, আপনাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। না, আমি অন্য ঘরে যাব না। আমি বুঝতে পেরেছি, অন্য ঘর মানে কি—শ্রীঘর! আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাবার আপনার কি অধিকার? আমাকে রামা-শ্যামা মনে করবেন না। আমি কলকাতার অফিসার। আমি দেখে নেব, নিশ্চয় বলছি, দেখে নেব—

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ভগবান, রক্ষা কর! কি দুর্দ্দান্ত লোক! সব ধ'রে ফেলেছে দেখছি, বেটা দোকানদারেরা সব ফাঁস ক'রে দিয়েছে।

অনঙ্গমোহন। [সজোরে] পল্টন নিয়ে আসলেও আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না। আমি এক্ষুনি মন্ত্রীদের লিখে পাঠাচ্ছি। [টেবিল চাপড়াইয়া] এখন কি করতে চান, বলুন? কি মতলব আপনার?

ম্যাজিস্ট্রেট। [কম্পিতভাবে] দয়া করুন। আমার সর্ব্বনাশ করবেন না। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস করি, আমি ছাপোষা মানুষ, এসব ক'রে আমার সর্ব্বনাশ করবেন না।

অনঙ্গমোহন। না, আমি কিছুতেই যাব না। আপনার স্ত্রীপুত্র আছে তো আমার কি? আপনার স্ত্রীপুত্রের খাতিরে কি আমাকে জেলে যেতে হবে নাকি?

(ঘনরাম দরজায় উঁকি দিয়াই ভয়ে অদৃশ্য হইল)

ধন্যবাদ। আমি অন্য ঘরে যাব না।

ম্যাজিস্ট্রেট। [কম্পমান অবস্থায়] আমার সব দোষ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কি করব বলুন, আমি যে মাইনে পাই, তাতে চা-জলখাবারেরও খরচ ওঠে না, তার ওপরে অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা। ওরা বুঝি লাগিয়েছে, আমি ঘুষ নিয়েছি? ওসব কথায় বিশ্বাস করবেন না। হয়তো কিছু কলা-মুলো, হয়তো এক-আধ থান কাপড়। আর কসাই-বুড়ীকে চাবুক মারার গল্প ক'রে গিয়েছে বুঝি? সব মিথ্যে কথা। আমার শত্রুদের সব কারসাজি, ওদের অসাধ্য কিছু নেই, ওরা গলায় ছুরি দিতে পারে।

অনঙ্গমোহন। আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। কসাই-বুড়ীকে চাবুক মেরেছেন ব'লে আমাকেও যদি মারবেন ভাবেন, তবে ভুল করছেন। আমি তো বলছি, সব পাওনা মিটিয়ে দিতে রাজি আছি, কেবল এখন আমার হাতে টাকা নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ওঃ, শয়তান! কিছুতেই ধরা দিতে চায় না!

আমরা যেন এতই বোকা! আচ্ছা, দেখা যাক, এবারে কি হয়! [প্রকাশ্যে] আপনার যদি টাকার দরকার হয়, সেজন্যে ভাববেন না। আমি আছি। বিদেশী লোকদের সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

অনঙ্গমোহন। দিন কিছু টাকা হাওলাত। দেখুন, এক্ষুনি আমি হোটেলওয়ালাকে মিটিয়ে দিচ্ছি। একশো টাকা হ'লেই চলবে, কিছু কম হ'লেও ক্ষতি নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট। [নোট দিল] এই যে, ঠিক একশো টাকাই আছে। কষ্ট ক'রে আর গোনবার প্রয়োজন নেই। ও ঠিক আছে।

অনঙ্গমোহন। [টাকা লইয়া] বিশেষ বাধিত হলাম। বাড়ি গিয়েই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। অনিবার্য্য কারণে হঠাৎ টানাটানিতে প'ড়ে গিয়েছিলাম। আপনি সত্যিই ভদ্রলোক দেখছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] চার গিলেছে দেখছি, এবারে কাজ সহজ হয়ে আসবে। একশো ব'লে দুশো টাকা গছিয়ে দিয়েছি।

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ!

(মুকুন্দর প্রবেশ)

খানসামাকে ডাক দাও। [ম্যাজিস্ট্রেট ও বলরামের প্রতি] আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ঠিক আছি।

অনঙ্গমোহন। সে কি হয়? বসুন, বসুন। এখন বুঝতে পারছি, আপনি কেমন সরল আর কর্ত্তব্যপরায়ণ। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি...[বলরামের প্রতি] বসুন না।

(ম্যাজিস্ট্রেট ও বলরাম বসিল। ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া শুনিবার চেষ্টায় নিযুক্ত)

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] একটু সাহস সঞ্চয় করা দরকার। উনি ওঁর ছদ্মবেশ বজায় রাখতে চান। তাই হবে। আমি এমন ব্যবহার করব, যেন চিনতেই পারি নি। [প্রকাশ্যে] ইনি বলরামবাবু, ইনি এই জেলার একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। এখন বলরামবাবু আর আমি দুজনে শহর পরিদর্শন করতে বেরিয়েছিলাম। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট আছে, শহরের কোন খোঁজ-খবরই রাখে না। আমি সে রকম নই। বিদেশী লোক যদি এখানে এসে বিপদে পড়ে, সে তো আমাকেই দেখতে হবে। কর্ত্তব্য

ছাড়া শাস্ত্রেও তো উপদেশ আছে, অপূজিতো অতিথির্যস্য গৃহাৎ যাতি বিনিঃশ্বসন্। ঘুরতে ঘুরতে এই হোটেলে এসে আপনার মত মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

অনঙ্গমোহন। আমিও আপনার পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছি। আপনি হাওলাত না দিলে আমাকে খুব কষ্টেই পড়তে হ'ত।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ও কথা অন্যকে ব'লো চাঁদ। কষ্টেই পড়তে হ'ত! বটে! ওসব চান্স আমার কাছে দিও না। [প্রকাশ্যে] যদি কিছু না মনে করেন তো জানতে চাই, কোথায় যাচ্ছেন?

অনঙ্গমোহন। শিলিগুড়ি যাচ্ছি। ওখানেই আমার বাড়ি আর জমিদারি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বটে! শিলিগুড়ি! সোনার চাঁদ এত বড় মিথ্যেটা বলতে মুখে বাধল না! এর সঙ্গে খুব সমঝে চলতে হবে। [প্রকাশ্যে] দেশভ্রমণে যদিচ অসুবিধা আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। আপনি অবিশ্যি আনন্দলাভের জন্যে বেরিয়েছেন?

অনঙ্গমোহন। না, বাবা বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। আমি সার্ভিসে চটপট প্রমোশন পাচ্ছি না ব'লে তিনি আমার ওপর বিরক্ত। এই বুড়োদের ধারণা, কলকাতায় যাওয়ার পরদিনেই রায় বাহাদুর হওয়া যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] শোন কথা একবার! কি রকম গল্প ফেঁদে বসেছেন! আবার বুড়ো বাপকেও টেনে আনছে দেখছি। [প্রকাশ্যে] কতদিন দেশে থাকবেন?

অনঙ্গমোহন। কিছুই বলতে পারি না। বুড়োর যে কাণ্ডজ্ঞান আছে, তা মনে হয় না। কলকাতা ছেড়ে আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব। চাষাভুষোর মধ্যে জীবন কাটাবার জন্যে আমার জন্ম হয় নি। মদ ছাড়াও আমি বাঁচতে পারি, কিন্তু কাল্‌চার না হ'লে বাঁচা অসম্ভব। কাল্‌চার! কাল্‌চার! [কাল্‌চার শব্দ এমন ভাবে উচ্চারণ করিল, যেন দুর্লভ শ্যাম্পেন দুই ঢোক গলাধঃকরণ করিল]

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বুদ্ধি আছে বটে! কেমন মিথ্যের সঙ্গে মিথ্যের মালা গেঁথে চলেছে! ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই। আচ্ছা, দাঁড়াও, এখনই সব ফাঁস ক'রে দিচ্ছি। [প্রকাশ্যে] যা বলেছেন, এসব জায়গায় কি মানুষ থাকে! অবশ্য কর্ত্তব্যের খাতিরে, দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে

থাকতে হয়। দিনে রাত্রে দেশের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু গভর্মেণ্ট কি এসব স্বার্থত্যাগের খোঁজ-খবর রাখে? [ঘরের দিকে তাকাইয়া] ঘরটা স্যাঁতসেঁতে ব'লে মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। যাচ্ছেতাই ঘর। আর ছারপোকা কি? এক-একটা যেন আস্ত ইঁদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি অন্যায়! এমন কাল্চার্ড অতিথিকে কতকগুলো নরাধম ছারপোকা কামড়ায়! এই সব হতভাগার জন্মাবার কি প্রয়োজন ছিল? ঘরটা অন্ধকার মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। ঘোর অন্ধকার। হোটেলওয়ালা আমার ঘরে আলো দেওয়া বন্ধ করেছে। কখনও কখনও পড়তে ইচ্ছে করে, আবার একটু-আধটু লেখবার অভ্যাসও আছে। নাঃ, ঘরটা একদম অন্ধকার।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি···কিন্তু—না, সে সাহসও নেই, সে যোগ্যতাও নেই।

অনঙ্গমোহন। ব্যাপার কি? বলুন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, আমি তার যোগ্য নই।

অনঙ্গমোহন। কোন ভয় নেই, খুলে ব'লে ফেলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বাড়ির দোতালায় চমৎকার একটি ঘর আছে। আলো বাতাস, চারদিক খোলামেলা, চমৎকার। ঠিক আপনার যেমনটি দরকার, সেই রকম। কিন্তু না না, আপনাকে যেতে বলবার যোগ্যতা আমার নেই। বেয়াদপি মাপ করবেন। সরলপ্রকৃতির লোক ব'লেই যা মনে এল ব'লে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।

অনঙ্গমোহন। এতে বেয়াদপি কিসের! ওই রকম একটি ঘর পেলে তো আমি বেঁচে যাই। এই নোংরা হোটেলের চেয়ে অনেক ভাল।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি কৃতার্থ হব, আমার স্ত্রী কৃতার্থ হবে, আমার মেয়েরা কৃতার্থতম হবে। ছেলেবেলা থেকে আতিথেয়তাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ব'লে মনে করতে শিক্ষা পেয়েছি। এ খোশামুদি মনে করবেন না। আমার যদি কোন দোষ না থাকে, তবে সে ওই দোষটি।

অনঙ্গমোহন। আমারও ঠিক ওই কথা। আমি নিজেও যেমন সরলপ্রকৃতি, তেমনই সরলপ্রকৃতির লোক ভালবাসি। আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান ছাড়া আপনার কাছে আর কিছু চাই না।

(খানসামা ও মুকুন্দের প্রবেশ। ঘনরাম উঁকি মারিল)

খানসামা। হুজুর, ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

অনঙ্গমোহন। বিল লে আও।

খানসামা। আজ সকালে দিয়ে গিয়েছিলাম। এই নিয়ে দুবার দেওয়া হ'ল।

অনঙ্গমোহন। তোমার বিলের কথা মনে রাখবার আমার সময় নেই। বল, কত হয়েছে ?

খানসামা। প্রথম দিন দুবেলা। তার পরদিন একবেলা, তার পর থেকে সব বাকিতে চলছে।

অনঙ্গমোহন। স্টুপিড! দফাওয়ারি বলবার দরকার নেই। মোটের ওপর কত হয়েছে বল না!

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি ব্যস্ত হবেন না। পরে হবে এখন। [খানসামাকে] যাও এখন, ভাগো। বিলের ব্যবস্থা করা যাবে।

অনঙ্গমোহন। ঠিক বলেছেন। [টাকা পকেটে রাখিয়া দিল]

(খানসামার প্রস্থান। ঘনরাম দরজায় উঁকি মারিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো একবার দেখবেন না ?

অনঙ্গমোহন। দেখবার মত এমন কি আছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট। দাতব্য-বিভাগের বিলি-ব্যবস্থা কি রকম, দেখা তো দরকার।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো, চলুন না।

(ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া মাথা বাহির করিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। তারপরে জেলা-স্কুল পরিদর্শনে যেতে পারেন। সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা কেমন দেখা দরকার।

অনঙ্গমোহন। দরকার বইকি।

ম্যাজিস্ট্রেট। তারপরে থানা এবং জেলখানায় যাওয়া আবশ্যক। আমরা কয়েদীদের কি রকম রাখি, তা জানা প্রয়োজন।

অনঙ্গমোহন। আবার থানা-জেলখানা কেন? তার চেয়ে দাতব্য-প্রতিষ্ঠান-গুলোই দেখব।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার যেমন অভিরুচি। আপনি নিজের গাড়িতে যাবেন, না আমার গাড়ি আনব ?

অনঙ্গমোহন। আপনার সঙ্গেই যাব, গল্পগুজব করতে করতে যাওয়া যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বলরামকে] বলরামবাবু, আমার গাড়িতে আপনার জায়গা হওয়া তো মুশকিল।

বলরাম। কিছু ভাববেন না, আমি ব্যবস্থা ক'রে নেব।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বলরামকে] দুখানা চিঠি নিয়ে এখনই ছুটে যান। একখানা দেবেন আমার স্ত্রীকে। আর একখানা দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের রসময়বাবুকে। [অনঙ্গমোহনের প্রতি] আপনি যদি অনুমতি করেন তো এখানে ব'সে আমার স্ত্রীকে দু ছত্র লিখে পাঠাই যে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার কুটীরে পদধূলি দিতে সম্মত হয়েছেন।

অনঙ্গমোহন। লিখুন না। এই যে দোয়াত। কাগজ! কাগজ কই? যাকগে, এই বিলখানার অপর পিঠে লিখতে পারেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। বেশ তো, চমৎকার হবে। [নিজের মনে লিখিতে ও বলিতে লাগিল] খাওয়ার পরে দেখা যাবে এখন। এক বোতল হুইস্কি আছে। কয়েক পেগ পেটে গেলে দেখা যাবে, বাছাধনের পেটে কি আছে!

(চিঠি বলরামের হাতে দিল। সে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। হঠাৎ দরজা খুলিতেই ঘনরাম ঘরের মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। সে এতক্ষণ দরজায় ঠেস দিয়া সব শুনিতেছিল)

অনঙ্গমোহন। আশা করি, আপনার লাগে নি।

ঘনরাম। না না, এমন কিছু নয়। শুধু নাকটা একটু থেঁতলে গিয়েছে। সিভিল-সার্জনের কাছে গেলে এখুনি সেরে যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [ঘনরামের দিকে রুষ্টভাবে তাকাইয়া অনঙ্গমোহনকে বলিল] না না, এমন কিছু নয়। চলুন, রওনা হওয়া যাক। আপনার চাকর জিনিসপত্তর নিয়ে যাবে। [মুকুন্দকে] ওহে বাপু, আমার বাড়িতে, তার মানে, ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে এস। [অনঙ্গমোহনকে] না না, সে কি হয়! আপনি আগে চলুন। [অনঙ্গমোহনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বাহির হইবার সময়ে ঘনরামের দিকে রুষ্টভাবে তাকাইয়া] ঠিক আপনার মতই কাজ হয়েছে। আর কোথাও কি পড়বার জায়গা পেলেন না!

(সকলের প্রস্থান। নাক ধরিয়া ঘনরামের অনুসরণ)

ক্রমশ—প্র. না. বি

ডিমের সেন্সাস

(ডিম্বের ন্যায় ছন্দও এক রকম নয়)

ব্রহ্মাণ্ডই অণ্ড যখন— অখণ্ড এই বিশ্ব—
ডিম্ব এবং বিম্ব নিয়েই এই চ..চর দৃশ্য,
বসল সভা রাক্ষুসে এক, ছায়ার তলে নিম্বের,
অতি ত্বরিৎ করতে হবে সেন্সাস সব ডিম্বের।
ক্রমে ক্রমে উঠছে বেড়ে সকল ডিমের মূল্য,
মহার্ঘ কি হবে শেষে সেও সোনার তুল্য ?
পাড়ছে নাকো ডিম কি দেশের মুরগী এবং হংস ?
কিংবা তাহা লুকিয়ে রাখে, কিংবা করে ধ্বংস ?
সত্য ব্যাপার বুঝতে হবে, করতে হবে, হোক গো-
বিশ্বজিতের প্রায়ই সমান ডিম্বজিৎ এক যজ্ঞ।

২

যত নিখিল-বঙ্গীয় সব মুরগী এবং হংস,
সকল রকম খেচর ভূচর জলচরের বংশ—
মশা, মাছি, সর্প হতে টিকটিকি আর কুম্ভীর,
বাদ যাবে না সরীসৃপও, ব্যাপারটা খুব গম্ভীর।
খুঁজতে হবে পগার পাহাড়, বন-বাদাড়ের গর্ত্ত
বালুর চর ও ঘুঘুর বাসা, এইটে হবে শর্ত্ত।
তক্তাপোশের তলার বিবর, ছাদের ফাটাল, ভিত্তি
দলে দলে নিপুণভাবে খুঁজতে হবে নিত্যি।
অণুর মত ডিম্ব আছে ঝোপের মাঝে উহু—
মাইক্রস্‌কোপ শক্তিশালী সঙ্গে নেবে বুঝছ।

৩

বোজাবে না গর্ত্ত কেহ, কাটবে না কেউ কাঠ,
দেবে নাকো রৌদ্রে চাটাই মাদুর কিংবা খাট,
সর্প যদি ডিম্ব লুকায় আনবে ডেকে মাল,
বাস্তু-সাপে বাহির ক'রে করবে নাজেহাল,
অণ্ডজেরা বিষম বেকুব বুঝিয়ে দেবে বেশ,
হচ্ছে আদমসুমারি, আর থাকবে নাকো ক্লেশ।

শর কাশ ও বেনার বনে থাকবে যে যথায়
পড়বে সবাই স্মরণীয় আইনের আওতায়।

৪

ধরলে পরে ডিম্ব-সহ কই কি ইলিশ মাছই,
ট্যাংরা, কই, বা মৌরলাদি নেইকো বাছাবাছি,
অবিলম্বে করবে হাজির হোক না যত সের
সম্মুখেতে মাননীয় স্কোয়াড-মাষ্টারের।
তৎপরতার নাইক সীমা চৌদিকে আশ্বাস
সুলভ হবে ডিম্ব, চলে ডিম্বেরি সেন্সাস।
অঙ্কেতে আর কুলায় নাকো দীর্ঘ দু মাস পর
সাঙ্গ হ'ল ঠুকঠুকানি গণকদের সফর।
সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ ক'রে—বিবৃতি এইটাই,
ডিম্ব তেমন সুখাদ্য নয়, ডিম্ব বেশ নাই।
ডিম না পেলে তার বদলে সবাই খাবে ফ্যান,
খোলা না হোক কাটা হ'ল গ্রন্থি গর্ডিয়্যান।
আঙুর-ক্ষেতে হাসল শৃগাল, বার হ'ল গর্দ্দভ,
ডাকল ভেবে কোথায় তাহার আত্মীয়েরা সব।
বংশীতে হায় তবু যে চিড়—পায় না তরী কূল
বাহির হ'ল তালিকাটায় একটা বেজায় ভুল।
ঘোড়ার ডিমের সংখ্যা ল'য়ে বাধল বিসম্বাদ
গণনাটাই বাতিল—বাতিল বেবাক সে তায়দাদ।
ডিম্ব থেকে ছুটল ঘোড়া উষ্ট্রপাখীবৎ—
নেংটি ইঁদুর করলে প্রসব প্রকাণ্ড পর্ব্বত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জীবন

অব্যক্তও ধরা দেয় দুটি ক্ষীণ বাহু বিস্তারিয়া,
তাহারে ধরার নামে মোরা উঠি উৎসবে মাতিয়া—
নবশিশু জন্ম নেয়, মোরা খুঁজে মরি তার নাম,
জীবন কিছুই নয়—অব্যক্তের ক্ষণিক বিশ্রাম।

মঞ্জরী রায়

নীলকণ্ঠ কেবিন।

নামকরণটি ঠিকই হইয়াছিল। স্বয়ং নীলকণ্ঠ ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে কেবিনটি নিরাপদ নহে, এবং এ কেবিনে কয়েকদিন আসিয়া যে টিকিয়া থাকিতে পারিবে, সে প্রায় নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে, ভবিষ্যতে অন্য কোথাও সে সহজে ঘায়েল হইবে না।

তবু সিনেমায় বাংলা ছবি দেখিবার যেমন লোকের অভাব হয় না, তেমনই নীলকণ্ঠ কেবিনেও খরিদ্দারের অভাব হয় না। যাঁহারা ফিরিবার সময় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যান, মনে মনে (কখনও বা প্রকাশ্যেই) প্রতিজ্ঞা করেন, আর কখনও এ'দিককার ছায়াও মাড়াইবেন না, তাঁহারাই পরদিন যথাসময়ে আসিয়া হাজির হন। ইহাদের মধ্যে আমি অন্যতম।

ইহার কারণ আছে। নীলকণ্ঠ কেবিনটি এ পাড়ার বনিয়াদী রেস্তরাঁ এবং দীপালী সিনেমার প্রায় মুখামুখি। ইহার ভয়েই বোধ হয় কাছাকাছি অন্য কেহ রেস্তরাঁ খুলিতে ভরসা পায় নাই। পাড়ার লোক পাড়া ছাড়িয়া অন্য পাড়ার রেস্তরাঁয় গিয়া চা খাইয়া আসিবে, বাঙালী আজিও এতটা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস' হইতে পারে নাই। সুতরাং পাড়ার সবেধন নীলমণি নীলকণ্ঠ কেবিন বেশ দাপটের সহিতই টিকিতেছে।

রোজই বিরক্ত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ফিরি যে, কাল আর আসিব না। কিন্তু পরদিন সে কথা নীলকণ্ঠ কেবিনে ঢুকিবার আগে পর্য্যন্ত আর মনে থাকে না। ঢুকিয়াই বলি, ওরে ছোকরা, চা আন্ দেখি। পেয়ালাটা বেশ ক'রে গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিস বাপু। ঐ বলা পর্য্যন্তই। পেয়ালাটা বাস্তবিক গরম জল দিয়া ধোয়া হইল কি না সেটা দেখার আর প্রয়োজন মনে করি না। আমার বিবেকের কাছে আমি তো পরিষ্কার রহিলাম, এখন ছোকরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অধৌত পেয়ালাতেই আমাকে চা দেয় তো পরলোকে ইহার জন্য ও-ই জবাবদিহি করিবে। আমার কি তাহাতে?

শুনিতে পাওয়া যায়, অনেক বছর আগে নাকি এই কেবিনের পানীয় এবং ভোজ্য ভালই ছিল, কিন্তু পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী ব্যবসায়ীরা সাধারণত যাহা করিয়া থাকে, নীলকণ্ঠ কেবিনও ঠিক তাহাই করিয়াছে।

আমি যে রোজ নীলকণ্ঠ কেবিনে আসি তাহার ব্যক্তিগত কারণও আছে। গল্প লেখা আমার পেশা—শুধু পেশা নয়, নেশাও বটে। কিন্তু নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া লেখার পক্ষপাতী আমি নই। এই কেবিনে আমার গল্প লেখার বাস্তব খোরাক প্রচুর মেলে। আমি কিছু বলি না, শুধু এক পাশে চুপচাপ বসিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিবার ভান করি এবং মাঝে মাঝে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিই। সঙ্গে সঙ্গে কান দুইটি খাড়া রাখি এবং চোখ দুইটিও সর্ব্বদা সজাগ থাকে।

আমার একটি দিনের অভিজ্ঞতা মাত্র নমুনাস্বরূপ বলিতেছি। চায়ের কাপে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিতেছি, এমন সময় রুক্ষচুল সূক্ষ্মদেহ এক ভদ্রলোক ধাঁ করিয়া ঢুকিয়াই আমার পাশের চেয়ারে বসিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। তাঁহার পরনে লংক্লথের পায়জামা, গেঞ্জি-পরা গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে চটি এবং মাথায় মাড়োয়ারী টুপি। আমি তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিতেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, বলছি বলছি মশাই, সব বলছি। আগে একটু জিরিয়ে নিতে দিন। কি রকম হাঁফাচ্ছি, দেখছেন না?

আমি কহিলাম, কই, কিছু তো আমি জানতে চাই নি আপনার কাছে।

হাত ঘুরাইয়া ভদ্রলোক কহিলেন, জানতে না চাইলেও চাওয়া আপনার উচিত ছিল। দুনিয়ায় জ্ঞানযোগটাই হচ্ছে সেরা যোগ। আর এ ব্যাপারে ভেদাভেদ রাখতে নেই, সে হচ্ছে মূঢ়তা। যার কাছ থেকে যতটুকু পারেন ততটুকুই জেনে নেবেন। এইজন্তেই তো শাস্ত্রে বলেছে, স্ত্রী-রত্নং দুষ্কুলাদপি। বলিলাম, তা হয়তো বলেছে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কথার কোনও যোগাযোগ নেই। তিনি বলিলেন, দেখুন, দুনিয়ায় কিসের সঙ্গে যে কিসের যোগ, সেটাও বুঝতে পারা সহজ নয়। এই বোয়, দো কাপ চা, দোঠো ডবল মামলেট। না না, আপনাকেও খেতে হবে। কোনও আবদার শুনছি না। চা ও অমলেট খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোকের কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

বন্ধুর মত পরামর্শ দিচ্ছি মশাই, কখখনও কিন্তু প্রেমে-ট্রেমে পড়বেন না। পড়লেই স্রেফ মারা পড়বেন। উঃ, এসব কি আর ভদ্রলোক সইতে পারে? রীতিমত নুইসেন্স। আমার ব্যাপারটাই সংক্ষেপে শুনুন।

মঞ্জরী রায়ের প্রেমে পড়লুম। তাকে না পেলে আমার কত রকমের সর্ব্বনাশ হবে, তার একটা লম্বা ফর্দ্দ তাকে দিলুম। মঞ্জরী হেসে বললে, বেশ তো। আমি ধনী বাপের একমাত্র ছেলে, টাকা আমার কাছে খোলামকুচি। মঞ্জরী আমার টাকায় খুশিমত থিয়েটার বায়স্কোপ দেখতে লাগল, যখন তখন ফারপো, গ্রেট ইষ্টার্ন, চাংওয়া, গ্র্যাণ্ড হোটেল ক'রে বেড়াতে লাগল। মঞ্জরীর বাপেরও পয়সা কম ছিল না, কিন্তু মঞ্জরী বাপের টাকায় হাত দিতে অপমান বোধ করত। বলত, তোমার টাকা থাকতে আমায় পরের কাছে হাত পাততে হবে কেন? কত বড় সম্মানটা মঞ্জরী আমাকে দিলে, ভেবে দেখুন একবার।—বলিয়া আমাকে ভাবিতে সময় দিবার জন্যই বোধ হয় তিনি পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া ভিতরকার নয় টাকা চৌদ্দ আনা বাহির করিয়া গুনিয়া আবার রাখিয়া দিলেন এবং আবার শুরু করিলেন, কিন্তু বিয়ের কথা তুললেই মঞ্জরী নানা বাজে ওজুহাতে সে কথা এড়িয়ে যেত। জেরা করতে গেলেই তার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠত, কিন্তু কিছু বলত না সে। বোয়, খুব ভাল পুডিং দেখি দুখানা।

চার আনা ক'রে ? আরে বাপু, দাম জানতে চাইছে কে ? সাধে কি আর শাস্ত্রে লিখেছে, 'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্' ?

দুইজনের প্লেটে দুইখানা পুডিং আসিল ও উড়িয়া গেল। আরও দুইখানা এবং আরও দুইখানা। নীলকণ্ঠ-মার্কা হইলেও পুডিংটাই ওই কেবিনের সেরা জিনিস; তাহা ছাড়া পরস্মৈপদী বলিয়া ভোজনে পরমানন্দ লাভ করিলাম। ভদ্রলোক একটি পাঁচ টাকার নোট মনিব্যাগের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ধাঁ করিয়া আমার কোটের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, এই পাঁচটি টাকা এ কেবিনে আজকে খরচা ক'রে যাবই, যেমন ক'রে হোক। ততক্ষণ থাক ও ব্যাটা আপনার পকেটে। গল্প শুনুন। ওরে ছোকরা, দে দেখি তোদের কি কি ভাল জিনিস আছে। ঠিক হিসেব ক'রে পাঁচ টাকা পুরিয়ে দিবি। এক পয়সা কম-বেশি হ'লে গাঁট্টা মেরে মাথা ফাটিয়ে দোব।...তারপর শুনুন মশায়। মঞ্জরীকে একদিন জোর ক'রে চেপে ধরলুম—মানে, চেপে ধরা ঠিক নয়, প্রশ্নের বাণে জর্জ্জর করলুম আর কি—বিয়ের কথাটাকে সে শুধু ধামাচাপা দিয়েই রাখতে চায় কেন ? মঞ্জরী বললে, এবারকার বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরলেই জানতে পারবে। জানতে পারলুম, দু বার ফেল-করা পালোয়ান বঙ্কু তৃতীয় বারে পাস ক'রে এসে আমাকে ঘুষি দেখিয়ে জানিয়ে গেল, মঞ্জরীর আশা যেন আমি ত্যাগ করি, কেন না সে তিন বারের মধ্যে বি.এ. পাস করতে পারলেই মঞ্জরী তাকে বিয়ে করবে ব'লে কথা দিয়েছিল। মঞ্জরী ছলছল চোখে জানালে, আমি জানতুম, টুল-বেঞ্চিরা যতদিন বি.এ. পাস না করছে, ততদিন বঙ্কু কিছুতেই পাস করতে পারবে না। তাই তো ও রকম বলেছিলুম। এখন কি করি বল তো ? তুমি তো বুঝতে পার, মনে মনে তোমাকেই আমি...। ভাবলুম, সত্যিই তাই, কেন না বঙ্কু ছোঁড়ার চেহারা আমার চাইতে ভাল হ'লেও আমার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্টের চেহারার কাছে একেবারে নট কিসসু। কিন্তু বঙ্কু যেমন ষণ্ডা, তেমনই বেপরোয়া, কাউকে কেয়ার করে না। ওকে ডোণ্ট কেয়ার করার মত সাহস আমার ছিল না। বি.এ. পাস না করা পর্য্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞামত চুপ ক'রে ছিল, এইবার সে জোর ক'রে নিজের দাবি জানাতে লাগল। কালীঘাটে গিয়ে বললুম, মঞ্জরীকে বুঝি হারালুম। মা কালী, একটা বিহিত কর মা। মা কালী বিহিত করলেন। হঠাৎ এক-দিন শেষরাত্রে বঙ্কুর বাড়ি সার্চ হয়ে গেল। কাগজপত্র তার সুটকেসে যা পাওয়া গেল, তার ফলে সরকারী অতিথিশালার দুয়ার তার জন্যে খুলে গেল, আর সে ঢুকতেই ঝপাং ক'রে বন্ধ হয়ে গেল। কত তদ্বির, কত দরখাস্ত, কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার কিন্তু মশাই সত্যি এতে কোনও হাত ছিল না—আমি শুধু মা কালীকে একটু বিহিত করতে বলেছিলুম মাত্র, বঙ্কুর এ রকম অহিত করতে আমি বলি নি। অথচ অনেকের সন্দেহ হয়ে গেল, আমিই এ ব্যাপারের জন্যে পুরোপুরি দায়ী, বঙ্কুর কাগজপত্রের গোপন খবর

যথাস্থানে আমিই দিয়েছিলুম। বন্ধুর ডজন খানেক পালোয়ান বন্ধু আমায় শাসিয়ে গেল, আমায় টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে গঙ্গার জলে না ভাসিয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত ওরা টেরি কাটবে না। দেখুন, প্রেম করতে গিয়ে কি ফ্যাসাদ! অজয় ভটাচায্যি সাধে কি আর লিখে গেছে—'প্রেমের পূজায়-এই তো লভিলি ফল'! আমি তো ভয়ে আর বেরোতে পারি না বাড়ি থেকে। বললুম, এ কি করলে মা কালী? মা কালী আর একবার বিহিত করলেন। ষণ্ডারা সবাই বন্দী হ'ল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরলুম। কিন্তু আর এক চিন্তায় প'ড়ে গেলুম। মঞ্জরীর বাড়ি গিয়ে দেখি, সামনে টু-লেট ঝুলছে। পাড়ার কেউ বলতে পারলে না, কোথায় তারা গেছে। তারপর পুরো আটটি বছর চ'লে গেছে, আজও মঞ্জরী রায়ের দেখা পাই নি। খোঁজ করেছি অনেক, তবু খোঁজ পাই নি। আপনি সিগ্রেট খান তো? খান না? বেশ করেন। ফর নাথিং বাজে খরচা। দাঁড়ান সিগ্রেট ধরিয়ে নিই একটা।—বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, মঞ্জরীকে আমার মনপ্রাণ পুরোপুরি দিয়ে ফেলেছিলুম। আর ফিরিয়ে নেবার উপায় ছিল না। তাই ও ব্যাপারের পর মন একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল। বাবাও আবার সময় বুঝে পটল তুললেন। সব সম্পত্তি এল আমার হাতের মুঠোয়। দু হাতে টাকা উড়িয়ে দিতে লাগলুম। মঞ্জরী নেই, কার জন্যে আর টাকার মায়া করব? শেষকালে সব ফুঁকে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। ও কি?

ভদ্রলোক অকস্মাৎ যেন ইলেক্‌ট্রিক শক পাইয়া চমকাইয়া উঠিয়া ওধারের ফুটপাথে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিলাম, একজন বেঁটে ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন লম্বা ভদ্রমহিলা ফুটপাথ ধরিয়া চলিয়াছেন। প্রশ্ন করিলাম, কি হ'ল?

ভদ্রলোক কহিলেন, ওই দেখছেন, ভ্যানিটি-ব্যাগ হাতে ভদ্রমহিলা হাই-হীল জুতো প'রে খটখটিয়ে যাচ্ছেন, উনিই মঞ্জরী রায়।

বলেন কি?

কি আর বলব? এইজন্যেই কবি টেনিসন বলেছেন, 'Men may come and men may go, But I go on for ever.' আপনি একটু বসুন। ওই মঞ্জরী রায়কে যদি আজ এই রেস্তরাঁয় আনতে না পারি তো আমার নাম—।

বলিয়া তিনি মঞ্জরী রায়কে পাকড়াও করিবার জন্য চট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু ভদ্রলোক তখনও ফিরিলেন না। বয় আসিয়া বিল দিল, দেখিলাম পুরাপুরি পাঁচ টাকা হইয়াছে। ভদ্রলোকের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আর অপেক্ষা না করাই ভাল। তিনি যে পাঁচ টাকার নোটটি আমার পকেটে জোর করিয়াই গুঁজিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এইবার বাহির করিয়া দেখিলাম, একটি

পুরাতন সিনেমার টিকেট। প্রথমটা বড় দমিয়া গেলাম। পরক্ষণে নিজের মনিব্যাগ খুলিয়াই পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, লোকসান কিছুই হয় নাই। ভদ্রলোক ধাপ্পা দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু গল্পের যে খোরাক দিয়া গেলেন, তাহার দাম অন্তত পাঁচটি টাকা হইবেই।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নূতন পরিকল্পনা

গত মহাযুদ্ধের পর প্রগতিশীল সকল রাষ্ট্রই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। শিক্ষা যে একটা সমগ্র জাতিকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তা অনেক দেশেই মনীষী এবং সংগঠকরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মোটামুটিভাবে গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালকে আমরা নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনার ও প্রবর্ত্তনের একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ ব'লে মনে করতে পারি।

আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব ও শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ আমাদের দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মনেও একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। আমরাও অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। তা ছাড়া স্কুল-কলেজের পাস-করা ছেলেমেয়েরা জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারছে না, বেকার-সমস্যা ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে, এসব লক্ষ্য ক'রেও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোথাও গলদ আছে—এই সন্দেহটাই মনে জাগছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশ যেমন তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আগাগোড়া বিশ্লেষণ ক'রে নূতন ছাঁচে গ'ড়ে তুলছিল, তেমন ভাবে আমাদের ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করবার বা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার আয়োজন আমরা করি নি। আমাদের দেশটা গরিবের, ছেঁড়া কাপড় আমরা জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। ছেঁড়া-খোঁড়া শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকেও আমরা জোড়াতালি দিয়েই ব্যবহারের উপযোগী ক'রে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের মুখুজ্জে মশাই তাঁর বিরাট শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন স্কুল-কলেজের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া ক'রে তুলতে। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে অনুসরণ ক'রেই আমরা এতদিন পর্য্যন্ত প্রধানত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা করেছি। আমরা কখনও সন্দেহ করি নি যে, গলদটা আমাদের ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। বিষের গাছকে যত্ন ক'রে বাড়ালেই তাতে

অমৃতের ফল ধরে না, বিষ-ছড়ানোর ব্যবস্থাটাই পাকাপোক্ত হয়। বছরের পর বছর ধ'রে আমরা যে শক্তি দিয়ে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, তাতে সমগ্র জাতির মঙ্গল যতটুকু হয়েছে তার চাইতে অমঙ্গলই হয়েছে বেশি, শিক্ষিতদের মধ্যে হিংস্র পশুর মত স্বার্থের কাড়াকাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক অভিযান দেখে এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবু আমরা বিরাট ব্যয়ে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খুলছি, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্দরের থালা-ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে বৈঠকখানা সাজাবার মত।

আমরা যে শুধু অস্বস্তিই বোধ করেছি, গলদটা ঠিক কোথায় তা নির্দ্দেশ করতে পারি নি, তার কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমত পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তিকে নষ্ট ক'রে দেবার আয়োজন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটার মধ্যেই রয়েছে;—নইলে অন্ধভাবে বিদেশী-ভাষার বিরাট ভূতকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা ইংরেজীনবিস হচ্ছি ব'লে গর্ব্ব অনুভব করতাম না বা একটা বিদেশী ভাষা শেখার প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনের এতখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করতাম না।

প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই, সে যে রকমই হোক না কেন, একটা আদর্শ থাকে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, এই আদর্শের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এর প্রভাব এত বড় যে, সমগ্র জাতির ভাগ্য এরই দ্বারা পরিচালিত হয়, যতক্ষণ না পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর চাপে এর ঘোর কেটে যায়। শিক্ষার এই বিরাট প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতাই বিগত মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন জাতির নূতন ক'রে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ'ড়ে তোলার মূলে রয়েছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, শিক্ষার্থীকে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল ক'রে তোলাই এই ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। হাতে-খড়ির পর শিশু যেদিন থেকে বিদ্যালয়ের শীর্ণ পরিসরের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করে, সেদিন থেকে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও চিন্তাকে বলিদান করাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আদর্শ ব'লে ধরা হয়। যার কোন স্বাধীনতার বালাই নেই, সজীব ইচ্ছাশক্তি যার মধ্যে নিষ্ক্রিয়, সেই আমাদের দেশে ভাল ছেলে! বিদ্যালয়ে যে ছেলেটি বিনা প্রশ্নে, নির্ব্বিরোধে বইয়ের ছাপার অক্ষরের মন্ত্রগুলি হজম করে, নিজে পরখ না ক'রে বিনা অনুসন্ধানেই পরের ভাষায় নিজের ঘরের কথা অনর্গল ব'লে যেতে পারে, তাকেই আমরা পুরস্কার লাভের উপযুক্ত ব'লে বিবেচনা করি; বিদ্যালয়কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণীয় না ক'রে তুললেও, যারা কেবল আদেশ ও উপদেশ পালন করার জন্ত নিত্য বিদ্যালয়ে আসে, তাদেরই দিকে আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এই একান্ত মসৃণ বাধ্যতা ও প্রশ্নহীন নির্ভরতা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থারই জারজ সন্তান। আবাল্যের এই অভ্যাসই আমাদের দাসত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতার বনেদকে দৃঢ়তর করেছে।

আমাদের দ্বিতীয় অক্ষমতার কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদ্যুৎস্ফুরণের প্রতি অদম্য শ্রদ্ধা। একে আমরা যাচাই ক'রে গ্রহণ করি নি, ওটা আমাদের ওপর চেপে বসেছে চাষীর কাদা-মাখা গায়ে ফরসা কোটের মত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে যে শক্তি, তা হচ্ছে অন্যের শক্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি। এটা ব্যায়াম ক'রে শক্তি বাড়ানো নয়, নিজকে উন্নত করা নয়, ওটা অন্যের রক্তে নিজের জোর বাড়ানো। এ সভ্যতাটা তাই যখন পরের দিকে তাকায়, তখন অন্যকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজেকে কি ক'রে আরও মহিমান্বিত ক'রে তুলবে এই কথাটাই ভাবে। বাইরের লোকের চোখে এই মহিমাটাই পড়ে, বিরাট প্রাসাদ বিরাট যন্ত্র দেখেই আমরা ভুলি, পর পর দুইটা মহাযুদ্ধের অবতারণা দেখেও আমরা এর গোড়ার দুর্ব্বলতাটুকু ভাল ক'রে দেখতে পাই নি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা এই সভ্যতারই সৃষ্টি, তাই প্রতিযোগিতাকেই এই শিক্ষা পুষ্ট ক'রে তোলে, সহযোগিতাকে নয়।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দুইটি গলদই আমাদের দেশের কোন কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধ'রে কোন কথাই এত বার বার বলেন নি, যতটা বলেছেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই দুষ্ট ব্রণটির কথা। বিদ্যালয়ের পলাতক ছেলেকে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় তার গণ্ডির মধ্যে সসম্মানে আমন্ত্রণ করেছিল, সেদিন তিনি সেখানে প্রবেশ করেছিলেন আনন্দে বিগলিত হয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করতে নয়, দুঃখের কথা জানাতে। হয়তো তাঁর ভরসা ছিল যে, অপাঠ্য পুঁথিতে লেখা তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবাগীশরা উপেক্ষা ক'রেও থাকেন, তবু হয়তো তাঁদের সর্ব্ববিশ্বাসের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদী থেকে উচ্চারিত কথাগুলি একটু আলোড়নের সৃষ্টি করবে। তাঁর সে বিশ্বাস তাঁর অনেক স্বপ্নেরই মত কার্য্যকরী হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল ব্যাধিটাকে সনাক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে শিক্ষাকে জীবনের সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী আদর্শ থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক জগতের বিশ্লেষণের চাঁচা-ছোলা যন্ত্রপাতি নিয়ে কোমর বেঁধে তিনি কাজেতে নামতে পারেন নি, নানা কারণে কবির কল্পদৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের দুরদৃষ্টের কুয়াশা-ঢাকা সত্যের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে যেতে পারেন নি। পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি, যদিচ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এখনকার যান্ত্রিক সিঁড়িহীন, অপাংক্তেয় কাঠামোটাকে বুঝতেন না, কল্পনা করতেন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সজীব সমগ্র শিশু-মূর্ত্তিটিকে। কিন্তু ওই ছিদ্রপথেই শনি তার প্রবেশের পথ ক'রে নিয়েছে,

তাঁর গড়া বিশ্বভারতী মামুলী শিক্ষালয়ের উঁচু-নীচু পরীক্ষার ছাঁচে ঢালা একটু স্বতন্ত্র আর একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, সমগ্র জাতির মধ্যে নূতন একটা প্লাবন আনতে পারে নি, নূতন একটি পথ ও পরীক্ষার নির্দ্দেশের মত এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

দগদগে ঘা-টার ওপর নির্ম্মমভাবে ছুরি চালাবার জন্য গান্ধীজীর মত একজন ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। নিরাসক্ত ডাক্তারের মতই রুচিকে উপেক্ষা ক'রে তিনি প্রাণ-রক্ষার দিকে সমগ্র মনোযোগ দিতে পেরেছেন। আমাদের আসল রোগটা হচ্ছে যে, আমরা কিছু বুঝতে বা করতে পারছি না, কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করে বিদ্যালয়ের ঘরগুলিকে চুণকাম করতে লেগে গিয়েছি। এই বিদ্যালয়গুলি চাষাকে চাষের কাজ শেখায় নি, তাঁতীকে তাঁত বুনতে শেখায় নি, যার যা করার ক্ষমতা আছে তা'কে তা করার সুযোগ এবং শিক্ষা দেয় নি, দেশবাসীকে দেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় নি, অথচ চাষীর ছেলেকে বাবু বানিয়ে, তাঁতীকে কেরানী গ'ড়ে দেশের মধ্যে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল কোম্পানির কাজের জন্য উপযুক্ত কেরানী গড়তে। সে পরিকল্পনা আজ পরিবর্ত্তিত হয় নি, সুতরাং কেরাণী গড়ার যন্ত্র কেরানীই গড়ুক, ওটাকে মানুষ গড়ার কাজে লাগানোর চেষ্টা করা বৃথা। সমগ্র জাতিকে কেরাণীতে পরিণত করা যায় না জেনেও যে আমরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই ব্যাপকতর করবার চেষ্টা করেছি সেটা আমাদেরই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের যে আদর্শের অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছিল. সে ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য শতভাবে পরিবর্ত্তিত করেছে। শিক্ষাকে নিয়ে কতভাবে পরীক্ষা যে ওরা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মরা নদীর মত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বাস্তবের সঙ্গে একে মানিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থা নেই ; তাই অব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে এত বীভৎসতা জন্ম নিয়েছে।

আমাদের শিশুদের ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের কোন শিক্ষা, কোন উপযোগিতাই নেই, এঁরাই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে শিশুর জীবনের শিক্ষার প্রতি প্রথম আগ্রহকে বিভীষিকায় পরিণত করেন ; প্রথম থেকেই আমাদের বিদ্যালয়গুলির কাজ হচ্ছে শিশুকে এইটুকু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যে, বিদ্যালয়টা জীবনের অন্য সব কিছু থেকে আলাদা, এই সময়টা হাসতে মানা, পৃথিবীর দিকে চাইতে মানা, সহজ হতে মানা। বইয়ের পৃথিবীর ভেতর দিয়ে চলতে হ'লে রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকতে হবে। শিক্ষাকে এমন ক'রে স্বাভাবিক জগৎ থেকে আলাদা ক'রেই আমরা শিশুর বিতৃষ্ণাকে জাগ্রত করি। যার পক্ষে ছুরি থেকে কাঁচিকে আলাদা করা কঠিন নয়, বিড়াল থেকে কুকুরকে আলাদা করা কঠিন নয়, তার পক্ষে ক থেকে খ-কে আলাদা করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এইজন্য

যে, আমরা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথটাকে একেবারে উল্টে ধরি, তথ্য দেবার আগেই তত্ত্ব কপচাতে শুরু করি। হাত-পা মুড়ে এক জায়গায় ব'সে থাকা শিশুদের পক্ষে অসহ্য—ওটা তার সজীবতারই লক্ষণ, তাই তারা প্রাণের প্রাবল্যে ছটফট ক'রে একটা কিছু গড়তে বা ভাঙতে চায়। যদি তাদের কিছু শেখাতে হয়, তবে ওই ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়েই শেখাতে হবে, শিক্ষকের কাজ সেই খেলাকে সুপরিচালিত ক'রে অর্থময় কাজে পরিণত করা। আমাদের তাই প্রথম সমস্যা, কি ক'রে কাজকে শিক্ষার বাহন ক'রে তোলা যায়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজের সঙ্গে শিক্ষার কোন যোগ নেই। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা ভিক্ষুক তৈরি করার যন্ত্রস্বরূপ—তাই আমরা এত অবজ্ঞার সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। শিক্ষা আমাদের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে না, তাই জীবনের সব চাইতে সুন্দর, সজীব, কর্ম্মক্ষম সময়টুকু বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েও আমাদের ওর বাইরে এসে কি করব এই ভাবনা নূতন ক'রে ভাবতে বসতে হয়। জগতের চলমান স্রোতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাবার এবং সমস্যার সমাধান করবার মত শক্তি অর্জ্জন করার কোন ব্যবস্থাই বিদ্যালয়ের মধ্যে নেই ব'লেই এই অবস্থা ঘ'টে থাকে। সুতরাং শিক্ষাকে নূতন ক'রে গড়তে হ'লে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীরটা কি ক'রে ভেঙে ফেলা যায়, সে কথা আমাদের ভাবতে হবে। বিদ্যালয়গুলি যে সমাজের বোঝা নয়, সমাজের ঐশ্বর্য্য বাড়াবার কেন্দ্র, সেটা প্রমাণিত করতে হবে।

বইয়ের কতগুলি কথা মুখস্থ করাই আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত; ছাত্র-ছাত্রী জীবনে সেগুলি প্রয়োগ করে কি না, তা দেখার কোন দায়িত্ব বিদ্যালয়ের নেই। যে কোন রকমে পরীক্ষা-পাসের ছাপটা জুটলেই সবাই খুশি। এই ব্যবস্থাই আমাদের বিদ্যালয়ে ভাল ভাল বুলি মুখস্থ করতে এবং জীবনে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে শিখিয়েছে। আমরা 'সত্য কথা বলিবে' 'অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে' ইত্যাদি মুখস্থ করি, কিন্তু সত্য কথা বলি না বা কারও সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করি না। জীবনের মধ্যে খানিকটা পুঁথিগত জ্ঞান আত্মসাৎ করাই আমাদের মতে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, তা ছাড়া জীবনের সমগ্র ব্যাপক অংশটিকেই আমরা অবজ্ঞার সঙ্গে হরিজনের দলে ফেলে রাখি। সুতরাং কি ক'রে শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করার কাজে লাগানো যায়, এই আমাদের আর একটি সমস্যা। এত এত শিক্ষা কি ক'রে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক এবং নৈতিক সংস্কারে সহায়ক হবে, সে কথা আমাদের ভাবা প্রয়োজন।

শিক্ষাকে একটা নূতন রূপ দেবার আশু প্রয়োজন দেশের অনেকেই অনুভব করছেন। ওয়ার্দ্ধায় হিন্দুস্থানী তালিমি সঙ্ঘের উদ্যোগে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে একে ব্যাপকভাবে রূপ দেবার চেষ্টাও চলছে। কিন্তু বাংলা দেশে এখনও পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই

হয় নি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি মোটামুটি চারটি প্রস্তাবের ওপর :—(১) সাত বছরের প্রাথমিক, সার্ব্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, (২) শিক্ষার বাহন হবে কাজ, এবং সমাজ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে হবে, (৩) শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হবে, (৪) সত্য ও অহিংসার ওপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

আমরা শান্তি, পবিত্রতা, সহযোগিতা, ন্যায়নিষ্ঠতা প্রভৃতি অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিসের জন্য চীৎকার করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে যারা ভারতের নাগরিক হবে, তাদের তেমন ভাবে গ'ড়ে তুলছি কি? শূন্য ভাণ্ডারের শিখণ্ডীকে সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের শাসকরা বহুদিন আমাদের শিক্ষা-সম্প্রসারণকে অচল ক'রে রেখেছেন। ওয়ার্দ্ধা-ব্যবস্থা দাবি করছে, শিক্ষার এসব প্রাথমিক সমস্যা জয় করা যায়। তবু যে কেন আমরা দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে এটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখারও সময় পাই নি, সেটাই আশ্চর্য্য। বারান্তরে শিক্ষা-ব্যবস্থার এই নূতন আদর্শটি সম্বন্ধে আলোচনা করার বাসনা রইল।

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত

সংবাদ-সাহিত্য

এশিয়ার পূর্ব প্রত্যন্তের তিনটি মহাদেশ—ভারতবর্ষ, চীন এবং জাপান—তিন মহাদেশেই প্রাচ্য মানুষের বাস, অথচ কত বিভেদ! ভারতবর্ষ পরাধীন, চীন স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার মাঝখানে দোল খাইতেছে, জাপান স্বাধীন। আধ্যাত্মিকতা লইয়া উল্লাস অথবা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে নারকীয় বা পৈশাচিক আখ্যা দিয়া নিন্দা করা সহজ। সেদিক দিয়া বিচার করিব না। ভোগবাদ নয়, জীবনবাদের সহজ বিচারে আমরা মৃত অথবা মুমূর্ষু, চীন অর্ধসচেতন, জাপান সম্পূর্ণ জীবন্ত। আমাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়, চীন মরেও মারেও, জাপান স্বেচ্ছায় মরে অথবা বাঁচে। আয়োজন উপকরণ সবই প্রায় এক, শুধু স্বাধীনতার ইতরবিশেষে একে আরে আসমান-জমিন ফারাক্ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেড় শত পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে আমরা ঠিক কি ছিলাম বলিতে পারিব না; কিন্তু ওই পরিমাণ কাল ইংরেজের সুশাসনে এবং স্নেহচ্ছায়ায় নজরবন্দী থাকিয়া আমরা কি হইয়াছি, ডাঁইনে বাঁয়ে সামান্য একটু চোখ চাহিয়াই তাহা অনুভব করিতে পারি। সুখের বিষয়, মর্মান্তিকভাবে লজ্জিত হইবার মত চেতনা আমাদের অবশিষ্ট নাই।

নাই বলিলে ভুল হইবে, এই চেতনা আমাদের ছিল না। যতদিন ছিল না, ততদিন ইংরেজ আমাদের কি ভালটাই না বাসিত! আমাদিগকে পুতুপুতু করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া শোয়াইয়া খাওয়াইয়া কোমরে ঘুনসি বাঁধিয়া হাতে চুষিকাঠি দিয়া আদর-আপ্যায়নের অবধি ছিল না। উপাধি-চাকুরির চরম করিয়া মৃত ও মুমূর্ষুর মধ্যেও তাহারা রেষারেষি-ঈর্ষার বান ডাকাইয়া ছাড়িয়াছিল। আমরা বিগলিত হইয়াই ছিলাম; মাঝে মাঝে রোগীসুলভ আবদার-বায়না করিতাম—কখনও চোখরাঙানি, কখনও আদর, তাহাতেই আমাদের ক্ষীণ প্রাণবিন্দু টলমল করিয়া উঠিত। সহস্র বৎসরের রোগশয্যায় আমরা কৃতার্থ হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইয়া পড়িতাম। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি সামান্ত রুজির লোভে আমাদিগকে ওই শিক্ষাই দিয়া আসিয়াছিল।

কবে ঘুম ভাঙিল, কবে চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ হইল, সেই ইতিহাস ক্রমশ-প্রকাশ্য। তাহারই উপকরণ সংগ্রহের কাজে আমরা লাগিয়াছি। বিস্ময়ের সঙ্গে বহু বিচিত্র ব্যাপার আমাদের নজরে পড়িতেছে। সব গুছাইয়া এই ইতিহাস যিনি রচনা করিতে পারিবেন, তিনি দ্বিতীয় বেদব্যাসের সম্মান পাইবেন। নব মহাভারত সৃষ্টি হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। শতধাবিদীর্ণ বেদনার কাহিনীতে ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস ইতিমধ্যেই করুণ ও ভারী হইয়া উঠিয়াছে; বহুকে, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া যে মহাকবি মহাকাব্য রচনা করিবেন; আমরা তাঁহারই প্রতীক্ষায় আছি, খণ্ড-খণ্ডভাবে আমরা প্রত্যেকে তাঁহারই কাজ আগাইয়া রাখিতেছি। কবে সর্পযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, কবে আসিবেন ঋষি বৈশম্পায়ন, নৈমিষারণ্যের যুগান্তরের জড়তা ভাঙিয়া কবে আবার নরোত্তম নারায়ণের বন্দনাগান ধ্বনিত হইয়া উঠিবে, প্রাচীন অখণ্ড ভারতবর্ষ তাহারই দিন গণিতেছে। সেই শুভদিন কি আমাদের আয়ুর আয়ত্তে আছে? কে জানে!

* * *

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কবি এবং সাহিত্যিক ই. ভি. লুকাস ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন মাত্র কয়দিনের জন্য। অসহযোগ-আন্দোলন তখনও আরম্ভ হয় নাই, তাহার প্রস্তাবমাত্র অর্ধজাগ্রতদের মধ্যে কৌতুক-কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। ই. ভি. লুকাস দেশে ফিরিয়া 'রোভিং ইষ্ট অ্যাণ্ড রোভিং ওয়েষ্ট' নামক বই লিখিলেন। ভারতবর্ষ-অংশের প্রথম অধ্যায়ের তিনি নাম দিলেন "নয়েজলেস ফীট"—নিঃশব্দ পদচারণ। তিনি লিখিলেন—

"ভারতবর্ষ যদিও পথচারীর দেশ, এখানে কিন্তু পায়ের শব্দ শোনা যায় না।" অধিকাংশ পা-ই নিরাবরণ এবং সবই প্রায় নীরব। পথ চলিতে গেলেই কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলিকে প্রেতের মত বোধ হয়। শহরে গ্রামে যেখানেই যাও, এই পথচারীরা পথ চলিতেছে। গরুর গাড়িও আছে, মোটর-গাড়িও আছে, অন্যান্য বিচিত্র যানবাহনেরও

অভাব নাই, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিতেছে, পথচলার বিরাম নাই। বাজারে যাও—হাজারে হাজারে তাহাদের দেখিতে পাইবে, সুদূরপ্রসারী ধূলিধূসর পথে মাইলের পর মাইল চলিয়া যাও—দেখিতে পাইবে এক বা একাধিক ক্লান্ত পথিক হয় আসিতেছে, নয় যাইতেছে।

এই ক্লান্ত একঘেয়ে পায়েচলা মাত্র একবার দ্রুত ও চঞ্চল হইতে দেখা যায়, যখন ইহারা স্কন্ধে মৃতদেহ বহন করে।...

হাত? ভারতবাসীদের সম্বন্ধে গোড়ার আর একটি অনুভূতি হইতেছে এই যে, উহাদের হাত অক্ষম। তাহাতে শক্তির কোন প্রকাশ নাই।

হাঁ, এই জাতি শুধু যে অবিরাম পায়ে হাঁটিতেছে তাহাই নয়, অবিরাম আরামও করিতেছে। ঘুম পাইলেই যেখানে খুশি ইহারা লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে অথবা দুই হাঁটু জড়ো করিয়া বসে। ইংলণ্ড হইতে প্রথম আসিয়া সারা দেশজোড়া এই জড়তা দেখিয়া বিস্ময় বোধ হয়।...এই বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায় যখন এই পূর্ণশায়িত দার্শনিকের দেশ, সহজেই-ঘুমে-পটুর দেশ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া জাপানে প্রবেশ করা যায়। সেখানে অলসদের ঠাঁইও নাই, কালও নাই। ভারতবর্ষের পথে পথিককে সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, ঘুমন্ত কোনও মানুষকে বুঝি বা মাড়াইয়া দিলাম—পথই সেখানে প্রকৃষ্ট বিশ্রাম-স্থল—জাপানে সম্পূর্ণ বিপরীত—সেখানে কেহ কখনও চুপ করিয়া বসিয়া নাই, কাহাকেও অবসন্ন অথবা গরিব বলিয়া বোধ হয় না।

India, save for a few native politicians and agitators strikes one as a land destitute of ambition. In the cities there are infrequent signs of progress; in the country none. The peasants support life on as little as they can, they rest as much as possible and their carts and implements are prehistoric. They may believe in their gods, but fatalism is their true religion.

—কয়েকজন কালা পলিটিশিয়ান ও হুজুগে লোক ছাড়া ভারতবর্ষকে আশাহীনের দেশ বলিয়া বোধ হয়। শহরে প্রগতির ছিটেফোঁটা দেখা গেলেও গ্রামে তাহার লেশমাত্র নাই। চাষারা সামান্যতম আহার্যে জীবন-ধারণ করে, প্রভূততম বিশ্রাম গ্রহণ করে, এবং তাহাদের যানবাহন হাতিয়ার প্রাগৈতিহাসিক। দেবতাতে তাহাদের বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু আসলে তাহারা অদৃষ্টবাদী।"

* * *

লুকাস সাহেব কবি, মনের আবেগে এই পর্যন্ত লিখিয়াই তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি হঠাৎ অনুভব করিয়াছেন, দেড় শত বৎসর ইংরেজ-শাসনে থাকার পর ভারতবর্ষের এই অবস্থা সমীচীন নয়। ইহাতে স্বজাতির নিন্দা রটিতে পারে, সুতরাং তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া রচনায় একটু প্রাচ্য পাক (twist) দিয়া এই বলিয়া

কৈবল্যমার্গের জয়গান করিতে করিতে শেষ করিয়াছেন—"It is true philosophy to be prepared to live in such a state of simplicity. Most of the problems of life would dissolve and vanish if one could reduce one's needs to the frugality of a fakir.—এই প্রকার অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত হওয়াটা খাঁটি দার্শনিকতা। মানুষ নিজের প্রয়োজন সমূহকে কমাইয়া যদি ফকিরের সংযম অভ্যাস করিতে পারে, তাহা হইলে তো জীবনের সকল সমস্যাই গলিয়া উবিয়া যায়।"

ঠিক। এই মোহগ্রস্ত অবস্থাতেই আমারা 'ইংলণ্ডস ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া' লিখিতে পারিয়াছিলাম, পোষ্টঅফিস টেলিগ্রাফ রেলওয়ে ইলেকট্রিসিটির সমস্ত গৌরব ইংরেজের স্কন্ধে চাপাইয়া বহু কৃতজ্ঞতা বোধ ও প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আজ সামান্য চৈতন্যসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিতেছি, নাকের বদলে নরুনের মত উক্ত জাতীয় যাবতীয় সুবিধা আমরা অর্জন করিয়াছি, ইংরেজ আমাদিগকে দেয় নাই। আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য পুরাদস্তুর শিক্ষা (পাশ্চাত্য মতে) দিতে পারিত, তাহারা তাহা দেয় নাই। আজ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, ইংরেজের তাঁবে না আসিয়াও জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই সকল সুবিধাই প্রভূতভাবে ভোগ করিতেছে, যাহা লইয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ এবং ইংরেজভক্তরা আজিও বড়াই করিয়া থাকেন। আমরা কিছুই পাই নাই, অথচ আমাদের সর্বস্ব গিয়াছে, এই রূঢ় সত্যটি বুঝিবার মত শিক্ষা দেশের মুষ্টিমেয় লোককে দিয়াই প্রভুদের চৈতন্য হইয়াছে, তাই আজ সর্বসাধারণের শিক্ষার পথে সহস্র বাধার উদ্ভব হইতেছে, কম্যুনাল এডুকেশন, সেকেণ্ডারি এডুকেশন, টেক্সট-বুক কমিটি প্রভৃতি ভাঁওতায় আসল শিক্ষা সুদূরপরাহত হইয়াছে—শিক্ষক-সম্প্রদায়, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্প্রদায় আজ অসহায় বিপন্ন ও নিরন্ন। গত ১৬ ডিসেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে সার্ মরিস গয়ার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সারা ভারতবর্ষে শিক্ষকদিগকে যে হীনতার মধ্যে চাকুরি লইতে বাধ্য করা হয়, যে কোনও গবর্মেণ্টের পক্ষে তাহা অতিশয় নিন্দনীয় ও কলঙ্কজনক। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষকেরা নিশ্চিত বিলুপ্তির পথে যাইতেছে জানিয়াও গবর্মেণ্ট নিশ্চেষ্ট আছেন, তাঁহাদের ব্যবহারে একান্ত হৃদয়হীনতাই প্রকাশ পাইতেছে। সার্ মরিস গয়ার যাহাই বলুন, ভারতবর্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান মানেই ইংরেজ-শাসনের অপমৃত্যু। বাতুল ছাড়া নিজের হাতে কেহ নিজের মৃত্যু ঘটাইতে পারে না। ইংরেজ-সরকার বুদ্ধিমানের মতই কাজ করিতেছেন।

এই কাজ আমাদের নিজেদের করণীয়, গবর্মেণ্টের সহায়তা ব্যতিরেকেও জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে। লর্ড ওয়াভেল—ভারতবর্ষের

একচ্ছত্র বড়লাট বাহাদুর গত শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) কানপুরে, সেবকসেবিকাদের অভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, হয়তো এই ক্রন্দনেরই ফলে দেশী-বিদেশী স্বেচ্ছা-সেবিকারা হাজারে হাজারে দয়াধর্মপ্রকাশে অগ্রসর হইবেন, সরকারী ভাণ্ডার অবারিত হইবে, কিন্তু ভারতবর্ষের সার্বজনীন শিক্ষার বারংবার চিন্তিত পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থাকিয়া যাইবে, কোনও দিনই অন্ধের চক্ষু ফুটিবে না। আঘাতে আঘাতে যেটুকু চৈতন্যোদয় আমাদের হইয়াছে, তাহারই ফলে দেশের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় যদি নিরক্ষর অজ্ঞ দেশবাসীর শিক্ষার কাজে অগ্রসর হন, তাহা হইলে অজগরের নাগপাশ খুলিতে বিলম্ব হইবে না।

সকল বাধা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় চেতনা, আমাদের নিঃস্বতার পরিমাণবোধ যে জাগ্রত হইতেছে, তাহার আভাস আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। এইটুকু চাঞ্চল্যই নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমাদের আশা। এই চাঞ্চল্যের ঢেউ শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের বাহিরেও সত্যকার মানুষ যাঁহারা—যাঁহারা লোভী নন, সাম্রাজ্য-বাদী নন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সমবেতকণ্ঠে নিপীড়িত পরাধীন জাতিসমূহের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। জর্জ বার্নার্ড শ বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মহারথীদের কথা বাদই দিলাম—ইঁহারা বিশ্বপ্রাণ ব্যক্তি—ফেনার ব্রকওয়ে, এডওয়ার্ড টমসন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ইংরেজরাও সম্প্রতি ভারতীয় সমস্যার সমাধান-চেষ্টায় কর্তৃপক্ষকে তৎপর হইতে বলিতেছেন। টমসন সাহেব স্বীকারই করিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ সামান্য খবরই রাখিয়া থাকে, তাহাদের অজ্ঞতা লজ্জাকর। আমরা এখানে আর একজন ইংরেজের কথা উদ্ধৃত করিতেছি, যিনি স্বচক্ষে দীর্ঘকাল ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন এবং ভারত-সমস্যার সত্বর সমাধান চাহেন। ইঁহার নাম লায়োনেল ফীল্ডেন। ইঁহার *Beggar My Neighbour* বইখানির ভারতীয় সংস্করণ মাত্র কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন :

No solution of the Indian problem will ever be found until and unless we on our part, and Indians no less on theirs, are willing to recognize these "blind spots" : no solution, that is, which would absolve Britain from tyranny, and make India her friend. A solution of one kind or another is of course coming : it is daily taking shape, but the shape which it is taking is an evil one for Britain, and very possibly for India too. The profound social and economic changes deriving from—and also causing—the disruptive effects of war are not, and will not be, arrested by a political deadlock, though the deadlock may dangerously

obscure their advance. However engagingly His Majesty's Complacent Ministers may tell us that this fog of obscurity is the "restoration of law and order" or "the only thing we could do," it is a fog in which the last remnants of British-Indian collaboration may be irretrievably lost. And for my part I believe that it is important for Britain, for India, and for the world, that that collaboration should continue. India, spurred and awakened by this war, as well as by her own growing nationalism, can hardly fail to become, in another few decades at most, a mighty power. An India permanently alienated from Britain, and falling willy-nilly into an Asian powergroup in a race for material gain, will be a threat not only to Britain herself and to the British Empire, but a threat also to world peace. An India friendly and grateful to a generous Britain could provide, as perhaps no other country, a much-needed link between East and West, and a tempering perhaps, of the Western Creed of Grab. But if, on either side, faces are to be obstinately saved and prejudices mulishly followed, we may await agreement till Kingdom Come. Some prejudices are breaking down : few people, for instance, can now seriously credit the dear old story that England conquered India in a sort of bumbling absent-minded fit, and just had to stay to keep order. Few can deny that England has exploited India. Few can avoid the conclusion—and I think every decent Englishman hates it—that India is a subjected and occupied country: a country in which, between August 1942 and January 1943, the police and troops opened fire on unarmed crowds no less than 538 times. But the prejudices which remain, on the British side, are still serious enough. The first is that Indians are silly, feckless and corrupt, and therefore cannot govern themselves. The second is that British democratic institutions are suitable to India. The third is that Indian "divisions" make it impossible for the British to relinquish power. The fourth is that India should obediently, at the bidding of Britain, commit herself to a war which was none of her making and from which, like Egypt or Turkey, she might herself choose to hold aloof if she were free.

These prejudices, running like an undercurrent through British politics and British publicity, must poison the atmosphere of all negotiations. They are the expression of domination and aggression : the denial of freedom and free choice. Their adoption, subconscious adoption if you like, by British negotiators must arouse in Indians a natural desire to hurl any offer into the dustbin.

(স্থানাভাবে অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হইল না।)

কিন্তু কোনও এক বা একাধিক দেশের মুখ চাহিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। নিজেদের স্বাধীনতার পথ আমাদের নিজেদেরই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। আমাদের মুক্তির উপায় দেশের মাটি হইতেই বাহির হইবে, কোনও সক্ষম ও সফল দেশের স্থানীয় প্রয়োজনে গড়িয়া উঠা মত ও পথ হুবহু অনুসরণ বা অনুকরণ করিলে আমরা ভুল করিব। এ বিষয়ে চীনের সুবিখ্যাত কম্যুনিষ্ট-নেতা মাওৎ-জী-দাং-(Mao Tse-tung)-এর স্পষ্ট নির্দেশ আমাদের দেশের অনেক বিভ্রান্তকে পথ দেখাইবে। তিনি তাঁহার স্বদেশ চীন সম্বন্ধেই বলিতেছেন—

China should absorb on a great scale the progressive culture of foreign countries. This refers not only to the proletarian and progressive democratic culture, but also the classical culture of foreign countries, that is useful to us; for instance, the cultural heritage of the capitalist countries in their earlier period of growth. However, we should in no way *blindy* accept everything foreign without criticism, but should deal with it just as in metabolism; we first chew our food, then finally our system separates it into two portions, the one that is to be absorbed to nourish us and the other which is to be thrown out.

The thesis of "wholesome Westernization" is a *mistaken* viewpoint. *To import things foreign has done China much harm.* The same attitude is necessary for the Chinese Communists in the application of Marxism to China. Marxism should not be applied subjectively and dogmatically. *Such Marxism is useless.* The point is to grasp the general truths of Marxism and apply them to the concrete practice of the Chinese revolution, i.e., to first achieve the Sinonisation of Marxism; subjective and dogmatic Marxism is *to caricature* Marxism and the Chinese Revolution. For Marxists of this type there is no place in the revolutionary camp. Chinese culture must have its own form, that is, a national form. A national form and a new democratic content—this is our new culture of today.

এই কথা ভারতবর্ষ সম্পর্কে আরও কঠিনভাবে প্রযোজ্য। চীন নানাভাবে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হইলেও আমাদের মত পরপদানত নিশ্চেষ্ট ও হীনবীর্য নয়। আমরা শক্তিহীন বলিয়াই গতানুগতিক উদ্যমের অভাবে খোসা-আঁটি বাদ দিয়া কিছু খাইতে অভ্যস্ত নই। ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া তাহার রাষ্ট্র ও সামাজিক চিন্তার যে পরিবর্তনই আসুক, তাহাতে অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। বাহির হইতে সম্পর্কহীনভাবে আরোপিত ভাবধারা সমস্ত জাতিকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও অনেক চিন্তালেশহীন যুবককে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করিয়া মূল লক্ষ্য হইতে আমাদিগকে

বিচ্যুত করিতে পারে। আমাদের অনেক থাকিলে এই ক্ষতির জন্য উদ্বিগ্ন হইতাম না। আমাদের পুঁজি কম বলিয়াই অধিক সাবধান ও সতর্ক হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-গবেষণা করিয়া বিরাট দুই খণ্ডে যে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' লিখিয়াছেন, স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, তাহা সমুদয় আয়ত্তে আনিতে পারি নাই। রক্তমাংস-চামড়া ইত্যাদি থাকিলে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে নানাবিধ মজা লাগে, কিন্তু শুধু পাঁজরার হাড় কাঁহাতক গণনা করা যায়, নিউটেষ্টামেণ্টের বিভিন্ন গ্রন্থেই তো তাহার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে! যাহা হউক, আমাদের উদ্যম ও অবসর না থাকিলেও "বাধ্যতামূলক"ভাবেও স্কুলেবরা বইখানি পড়িবার লোকের অভাব নাই। তাঁহাদেরই একজন, সম্ভবত সেন মহাশয়ের ছাত্রী কেহ, যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া উক্ত নামবীজমালা সম্পূর্ণই জপ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাইয়া পুলকিত হইয়াছি। পাঠকেরাও হইবেন। বিশেষ ধরনের লরির মত বিশেষ ধরনের ভয়ে লেখিকা নাম প্রকাশে অপারগ হইয়াছেন, আমরা বেনামেই তাঁহাকে তাঁহার পাঠনিষ্ঠার জন্য প্রশংসা করিতেছি। তাঁহার পত্রটি মায়-শিরোনামা উদ্ধৃত করিলাম।—

সু-কুমার গবেষণা

মান্যবর 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় ভাগের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমি বিশেষ যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছি। আপনারা পুস্তকে তথ্যগত যে-সকল ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কতকগুলি ভুল আমার নজরে পড়িয়াছে।. কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে আমি এখানে মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

(১) অধ্যাপক সেনের পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠায় আছে, "নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন'-এ লিখিয়াছেন যে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'বুঝলে কি না'-র রচয়িতা।" অধ্যাপক মহাশয় 'আমার জীবন' ভাল করিয়া পড়িলে দেখিতে পাইতেন তাহাতে আছে—"একদিন মতি ভায়ার সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কলেজে থাকিতে এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়িতে তাঁহার রচিত 'বুঝলে কি না' প্রহসনের অভিনয় দেখিতে যাই।"

এখানে নবীনচন্দ্র তাঁহার সুপরিচিত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই লিখিয়াছেন, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম করেন নাই। এবং তিনি বলিয়াছেন,

"তাঁহার বাড়িতে তাঁহার রচিত 'বুঝলে কি না' প্রহসন দেখিতে যাই"; ইহার অর্থ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন রচিত প্রহসন; ইহার অন্য অর্থ নাই।

(২) ডক্টর সেন তাঁহার পুস্তকের ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, রাজকৃষ্ণ রায় "কতিপয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'রসায়ন-শিক্ষা'ও আছে।" কোন কোন গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকায় রসায়ন-শিক্ষা পুস্তকের লেখক হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম আছে বটে, কিন্তু শুধু গ্রন্থতালিকা না দেখিয়া 'সচিত্র রসায়ন শিক্ষা' (ইং ১৮৭৭) বইখানি দেখিলে দেখিতে পাইতেন যে, ইহার গ্রন্থকার রাজকৃষ্ণ রায় নহে, রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী। ইনি শিক্ষা-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথমাবস্থায় তিনি যে উহার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন, নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নিবেদিকা

(বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী)

কু মার আগেই খাইয়াছেন, এত দিনে সু মার খাইয়া সেন মহাশয়ের পৈতৃক নামটি সার্থক হইল।

—

বাংলা দেশের কয়েকজন সাহিত্যিককে কংগ্রেসের প্রতি প্রকাশ্য অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখিয়া 'পরিচয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া "ওয়ান্স আপন এ টাইম" বলিয়া মাতৃস্থলভ মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কার্তিকের 'পরিচয়ে' প্রথম প্রবন্ধ "আমাদের সাহিত্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন" দ্রষ্টব্য। মাকে মামার বাড়ি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিবার দুষ্প্রবৃত্তি আমাদের নাই। গোপালবাবুর প্রভুপাদ পি. সি. জোশী মহাশয় যখন কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর সকল মৌলিক কেরামতি তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত 'কংগ্রেস অ্যাণ্ড কম্যুনিষ্টস' পুস্তিকায় ফাঁস করিয়া একরূপ প্রমাণই করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বর্তমান কংগ্রেসী ভাবগঙ্গার তিনি এবং তাঁহার জনেরাই (Saint John !) ভগীরথ, তখন গোপালবাবুই বা অনুরূপ কিছু না করিবেন কেন? কোলে ঝোল টানিবার ব্যাপক পলিসিই তো আজ সর্বত্র জয়যুক্ত হইতেছে! তবে গোপালবাবু এখনও ঝানু অর্থাৎ দু-কানকাটা হইয়া উঠিতে পারেন নাই, তিনি মনগড়া হউক, যাহাই হউক, একটা ইতিহাসের নজির টানিয়াছেন, একেবারে বেপরোয়া অহং চালান নাই। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। বোম্বাই অঞ্চলে হিষ্টরিকাল ডায়ালেকটিক্স ফাঁসিয়া গেলেও কলিকাতায় ভাঙনের ঢেউ আসিয়া লাগিতে বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে হালদার মহাশয়

ইতিহাস কপচাইয়া ভালই করিয়াছেন। তবে তাঁহার ইতিহাসে কিছু ভুল আছে, অনেকটা শরৎচন্দ্র-বর্ণিত বৃদ্ধা তপস্বিনীর সকড়ি বাঁচাইয়া পা ফেলা গোছের হইয়াছে। বিশদ আলোচনার অবকাশ নাই। এই প্রবন্ধটিকে 'বাজে লেখা'য় স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে তিনি যেন জোনস্ কোলব্রুক কেরী মার্শম্যানের সম্বন্ধে তাঁহার বিদ্যাটা একবার ঝালাইয়া লন, ইঁহাদের কেহ কেহ রামমোহনের জন্মের পূর্বেই প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার রঙ্গমঞ্চেও রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বেই প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রামকমল সেন মোটেই ওরিয়েণ্টালিষ্ট ছিলেন না এবং কেশব সেনের জন্মের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক সরাসরি নয়, মাঝখানে প্যারীমোহন নামধেয় তাঁহার একজন পুত্র ছিলেন, তিনিই কেশবচন্দ্রের জন্মদাতা হিসাবে সে যুগে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধীরে ধীরে একটি সচ্চিদানন্দ আশ্রম হইয়া উঠিতেছে। সৎ-অংশের বিবরণীতে জানা যায় কোনও বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকের পুত্র সেই বিষয়ে পরীক্ষার্থী হইলে তাঁহাকে সেই বৎসর উক্ত পরীক্ষক-পদচ্যুত করা হয়। চিৎ-অংশে দেখিতেছি, সিণ্ডিকেটের সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়েব পরীক্ষক এবং কোনও কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ হইলেও তাঁহার মেড ইজি পুস্তক রচনা ও বিক্রয় করিতে বাধা নাই, দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত জে. কে চৌধুরী প্রণীত 'সহজ শিক্ষা ভারত ইতিহাস' প্রভৃতি। এইরূপ চিৎ হইবার অবশ্য নানা সঙ্গত কারণ আছে। আনন্দাংশের বিবৃতি বারান্তরে দিব।

—

অগ্রহায়ণের 'পরিচয়ে' "পত্রিকা-প্রসঙ্গে" একজন প্রধান-সাহিত্যিক লিখিয়াছেন, "কিন্তু বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের "নিরুদ্দেশ" আমি পড়তে এত ধৈর্য্য হারিয়েছি যে, আমি অবাক হই। বিভূতিবাবুর লেখায় সাধারণত একটি মিষ্টি কৌতুক রস থাকে, তাতে পাঠকের আকর্ষণ বাড়বারই কথা। আমি এতগুলি লেখা পড়তে পেরেছি কিন্তু এবার ওঠালেন।"

ভদ্রলোক (রাণুর) প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ ও কথামালা শেষ না করিয়াই "নিরুদ্দেশ" অবধি ধাওয়া করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছেন। ভাষা দেখিয়াই তাহা মালুম হইতেছে। তাঁহাকে ভাল করিয়া ভিত পত্তনের অনুরোধ জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫১

বাংলার নবযুগ : পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথ

৩

নবযুগের প্রেরণায় মানবধর্ম্মের যে নব-আদর্শ-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা মূলে যেমন সর্ব্বমানবীয়, তেমনই সেই এক আদর্শই বাস্তবের দিক দিয়া কেন যে জাতীয়তা-বিরোধী নয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই জাতীয়তাধর্ম্ম আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন, ইহার নীতি প্রাচীন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি হইতে স্বতন্ত্র; তাহাতে, স্ব-পর-কল্যাণ সাধনের যে মর্ম্ম আমাদের সংস্কারগত হইয়াছিল তাহাও ভিন্নরূপ ধারণ করিল—কোন আকারেই ব্যক্তির আত্মচিন্তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান তাহাতে রহিল না। ইহাতেও অন্তর ও বাহিরের সকল বাধাকে জয় করিবার জন্য যে সংগ্রাম অনিবার্য্য—সেই সংগ্রাম বা সাধনাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন', এবং বিবেকানন্দের 'dynamic religion'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অত্যুচ্চ ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে মানবতার যে আদর্শ স্থাপন করিলেন তাহা বিশ্বজনীন—জাতি-বর্ণ-হীন; তাহাতে মানবসাধারণের পরিবর্ত্তে এক মহামানব বা বিশ্ব-মানব অকূল অচিহ্নিত ভাবসাগরে লীন হইয়া আছে; শেলীর সেই আদর্শের মত, 'pinnacled dim in the intense inane' না হইলেও, তাহা অনেক পরিমাণে পৃথিবীর ধূলামাটির অতীত, সেই আদর্শধর্ম্মী জীবনে বাস্তবের সহিত প্রকৃত বোঝাপড়া নাই, ক্রূর-কঠিন-কুৎসিতের সহিত সংগ্রাম নাই—সে সকলকে একরকম অস্বীকার করিয়া, সকল অসম্পূর্ণতা সেই ভাব-কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করিয়া, আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিতে হয়। অতএব এইরূপ আদর্শ সেই 'dynamic religion'-এর আদর্শ নয়—ইহা জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই আদর্শই রবীন্দ্রনাথের অমৃতগন্ধী লিরিকের প্রাণস্বরূপ, ইহাই তাঁহার অতুলনীয় কাব্য-সাধনায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা শুধু লিরিকধর্ম্মী নয়, তাঁহার সেই রসদৃষ্টি আরও গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টির ফল; সে দৃষ্টিতে, জীবনের নিয়তি-কঠিন নাটকীয় শক্তিরূপের পরিবর্ত্তে, নিয়তি-নিয়মহীন আত্মস্ফূর্ত্তির লিরিক-রূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই জন্য, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা মানুষের বাস্তব-নিয়তি বা প্রবৃত্তি-বিরোধকে সেই আদর্শ-জীবনের বাধা বলিয়া স্বীকার করে নাই; এই জন্যই তাঁহার বাণী শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহাতে সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মশাসনমূলক discipline বা বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক অভ্যাস মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দকেই শক্তি-সাধনার উপরে স্থান দিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস—প্রাণমনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশই মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর; ফুল যেমন আপন অন্তরের রস-প্রেরণায় বর্ণে-গন্ধে দল বিস্তার করে, মানুষও তেমনই স্বচ্ছন্দে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবে। এরূপ সাধনায়

চরিত্র-শক্তির যেমন পৃথক মূল্য নাই, তেমনই পৌরুষের অর্থও সেইরূপ ভাব-জীবনের আদর্শ-নিষ্ঠা। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য-সাধনা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের মত মহাশক্তিমান্ ও স্বতন্ত্র পুরুষের পক্ষেই সত্য ও সম্ভব তাহা আমরাও বুঝি; কিন্তু ঐ মন্ত্র যে অপূর্ব্ব বাণী-রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতেই উহা সাধারণের চিত্তও অধিকার করে; কিন্তু শেষে তাহাতেই আধ্যাত্মিক অভিমান জন্মে—কবির সেই আধ্যাত্মিকতা আমরাও দাবি করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা যে মোহ মাত্র, বর্ত্তমান সমাজে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইবে। জীবনের ক্ষেত্রে সে আদর্শ অচল বলিয়াই তাহা ক্রমেই জীবন হইতে সরিয়া গিয়াছে, শেষে সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেও নির্ব্বাসিত হইয়াছে—বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অরাজক অবস্থা ও চরম স্বৈরাচারনিবারণে তাহা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। শেষ বয়সে জরাগ্রস্ত কবি, কবিধর্ম্মবশে, যৌবনের জয়গান করিতে গিয়া—তাঁহারই সেই জীবনবাদকে সুদৃঢ় করিতে গিয়া, নিজেও বিপন্ন হইয়াছিলেন, এই উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত একরূপ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাহার ফলে, তিনি যে তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ হইতেও কতখানি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার প্রায় শেষ রচনা—'ল্যাবরেটরি' নামক গল্পটি তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হয়, জীবনের আর্ট ও আর্টের জীবন এক নয়। বিশুদ্ধ রসসাধনা সর্ব্ববন্ধন অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু জীবন-সাধনায় ঐ বন্ধনের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে—সমুদ্রের তরঙ্গলীলা ও তটিনীর জলোচ্ছ্বাস এক দৃশ্য নয়। কবির কাব্যপ্রেরণারূপে—বিশুদ্ধ আর্টের পুষ্পপরাগরূপে—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যে কত মূল্যবান, রবীন্দ্রকাব্যের মর্ম্মরস তাহা চিরদিন প্রমাণ করিবে; কিন্তু জীবনকে জয় করিতে হইলে, অশান্ত ও অশিবের দ্বৈতকে স্বীকার করিয়া, পরে সেই অদ্বৈতে উঠিতে হয়; এই উঠিবার তত্ত্বই dynamism বা জীবনের শক্তিবাদ; আনন্দবাদে সকলই 'হইয়া আছে'—কিছুই 'হইতে' হয় না, তাই শক্তিসাধনার প্রয়োজন নাই।

আমি ইতিপূর্ব্বে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' কথাটি বহুবার একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সাধনা সম্পর্কে তাহার বিশেষ অর্থ না করিয়া, তাঁহার রচনা হইতেই কিঞ্চিৎ নমুনা দিব। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে ইহার বিকাশ যে প্রথম হইতেই হইয়াছে—'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র একটি কবিতায় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।—

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি'।
আগে কে জানিত বলো কত কি লুকানো ছিলো
হৃদয়-নিভৃতে,

তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

এখানে কবি যাহাকে সম্বোধন করিতেছেন, তাহার রূপ—তাহার 'আঁখি দুটি'ই—তাঁহাকে মুগ্ধ করিতেছে না, সেই চোখের দৃষ্টি তাঁহার হৃদয়ে যে আলোকপাত করিতেছে, তাহাতে তিনি আপনাকে আপনি দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইতেছেন; তাঁহার নিজেরই হৃদয়-রহস্য তাঁহার নিকটে পরম বিস্ময়ের বস্তু। এই দৃষ্টি শুধুই subjective বা আত্মভাব-রঞ্জিত নয়, ইহা বিশেষভাবে আত্মমুগ্ধ বা egoistic; ইহা এতই স্ব-তন্ত্র ও আত্ম-সচেতন যে, সর্ব্ববিষয়ে আত্মানুভূতি ভিন্ন আর কোন অনুভূতিই যেন নাই। এই ভাব রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায়, তথা মানস-জীবনে, চিরদিন আধিপত্য করিয়াছে; বাল্যের ওই কবিতাটির পর তাঁহার শেষ জীবনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিলেই আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—

"চিরন্তন বিরাট মানবকে আমি ধ্যানের দ্বারা আমার মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করি।···তার মধ্যে অনুভব করতে চাই আমার মধ্যে সত্য যা-কিছু জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে, তার উৎস তিনি। সেই জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আমি আমার ছোট-আমিকে ছাড়িয়ে যাই, সেই যিনি বড়-আমি, মহান্ আত্মা, তাঁর স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই, অমৃতকে উপলব্ধি করি।" [রবীন্দ্রনাথের "পত্রধারা", 'প্রবাসী', ১৩৩৮]

—বলা বাহুল্য, ইহাও নিজের মধ্যে, অর্থাৎ ব্যক্তির মারফতে, বিরাটের উপলব্ধি—বহির্জগতের, বা বহুমানবের মধ্য দিয়া নয়। উপরের পংক্তিগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধিলাভের পরিচয় আছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্র ও তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধন-মন্ত্র একই হইবার কথা, বরং কাব্যের সেই সৌন্দর্য্য-সাধনাতেই তাঁহার অন্তর-পুরুষের আসল পরিচয় আছে। আমি এখানে কবির সেই কবি-স্বপ্নেরও কিছু পরিচয় দিব। প্রথমে এমন একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব যাহাতে কবির সেই প্রাণের সুর যেমন গভীর, তেমনই অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।—

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী—
তুমি অন্তরব্যাপিনী!
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

ঐ 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি', ঐ 'অচপল দামিনী' এবং 'চারিদিকে চির-যামিনী'র যে ভাব-সিদ্ধি, তাহা সাধক-ব্যক্তির সফল সাধনা হইলেও, কবির পক্ষে উহা ধ্যানগম্য, এবং মানুষের পক্ষে একরূপ ক্ষণিক চিত্ত-বিলাসমাত্র; কারণ, 'বিপুল বিরতি' বা 'অকূল শান্তি' জীবনের সত্য নয়; 'চারিদিকে চির-যামিনী'র মধ্যে, 'অসীম চিত্ত-গগনে একটি চন্দ্রে'র ঐ যে ধ্যান, উহাতে যে অদ্বৈত-সাধনার ইঙ্গিত আছে, তাহাতেও সকল দ্বৈতকে জয় করিবার প্রয়োজন হয় না—অন্ধকার হইতে চক্ষুকে ফিরাইয়া আলোকের দিকে নিবদ্ধ করিবার উপায় করিতে পারিলেই হয়; এইরূপ "intellectual attitude in all its naive simplicity" কবির পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনই গৌরবজনকও বটে; কিন্তু জীবনপথযাত্রী মানুষের পক্ষে ইহার মত ভ্রান্তি আর নাই। জীবনের দামিনী অচপল নয়—অতিশয় চপল, এবং তাহার পক্ষে, good ও evil—শিব ও অশিব, দুই-ই সমান সত্য। ইহারই প্রসঙ্গে, মঃ রোলাঁ তাঁহার বিবেকানন্দ-চরিতে, বিবেকানন্দের এই উক্তিটি বিশেষ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমিও তাহা উদ্ধৃত করিতেছি এইজন্য যে, তাহা দ্বারা, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগ যে ভাবান্তর আনিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।—"Learn to recognise the mother in Evil, Terror, Sorrow, Denial, as well as in sweetness and joy"। এই কথাই আর একটু বিস্তারিত করিয়া, মঃ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

Similarly the smiling Ramkrishna from the depths of his dream of love and bliss could see and remind the complaisant preachers of a "good God", that Goodness was not enough to define the force which daily sacrificed thousands of innocents.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের মূলমন্ত্র ঐরূপ। তাঁহার শিল্পী-মন বহু-বিচিত্রের পিপাসায় কত ভাবকেই না রূপ দিয়াছে—কত চিন্তাকে, কত তত্ত্বকে, কত অনুভূতিকে, কত অপরূপকে বাংলা ভাষার বীণা-ধ্বনিতে বাঁধিয়া দিয়াছে! আমি এখানে তাঁহার সেই কবিকীর্ত্তি বা কবিপ্রতিভার আলোচনা করিতেছি না—বাংলার নবযুগের সেই ধারাটির সঙ্গে তাঁহার বাণী, তথা ব্যক্তি-ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিচার করিতেছি। তাহাতে দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ সেই যুগকে যেরূপে বরণ করিয়া তাহার যে গতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের সেই ধারাকে ধরিতে চাহিলেও তাঁহার ব্যক্তিধর্ম্ম অতিশয় স্বতন্ত্র বলিয়া তিনি শেষে সেই ধারাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,

অথচ কোন নূতন ধারার প্রবর্ত্তন বা নায়কত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার মত, রস-শিল্পী কবির পক্ষে কোন একটি বিশেষ জীবন-বাদকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া—তাহারই ভেরী বাজাইয়া জনারণ্যের পথপ্রদর্শক হওয়া যে কতখানি স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাহা তিনিও বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি শেষে আপন ব্যক্তি-সাধনার সেই মন্ত্রটিকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া, ভাবমার্গে বিশ্বাত্মার সহিত ব্যক্তি-আত্মার যোগস্থাপন এবং তাহারই ফলে একটা মহামানবীয় কালচারের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্যকলা ও তন্নিহিত মানস-মুক্তির রস-পিপাসা প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া শিক্ষিত বাঙালী-মনকে যে ভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছিল, তাঁহাতে বাংলার নবযুগের সেই আদর্শ অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াছে—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সেই জয়গান বিংশ শতাব্দীর ভগ্ন-জীর্ণ বাঙালী-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া, তাহার আত্মসুখপরায়ণতাকেই একটি উদার ভাবসাধনার মহত্ত্ববোধে আশ্বস্ত ও চরিতার্থ করিয়াছে। ইহার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ দায়ী নহেন, দায়ী আমাদের চরিত্র ও আমাদের ভাগ্য—অবস্থাবশে অমৃতও এ জাতির পক্ষে বিষ হইয়া উঠিয়াছে। মঃ রোলাঁ বিবেকানন্দের ধর্ম্মমন্ত্র সম্বন্ধে এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলার নবযুগের সেই জীবনাদর্শ কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

Those who have followed me up to this point, know enough of Vivekananda's nature, with its tragic compassion binding him to all the suffering of the universe, and the fury of action wherewith he flung himself to the rescue, to be certain that he would never permit or tolerate in others any assumption of the right to lose themselves in an ecstasy of art or contemplation.

—এই "ecstasy of art or contemplation"—"রস-সাধনা বা ধ্যান-কল্পনার আত্যন্তিক সুখ-সম্ভোগ"—যে-জীবনের আদর্শ, তাহা 'tragic compassion' বা 'fury of action'-এর জীবন নয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন নিজের নিকটে তাহা বার বার স্বীকার করিয়াছেন; এইরূপ স্বীকারোক্তি তাঁহার একটি কবিতায় বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; 'এবার ফিরাও মোরে' নামক সেই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবি ও ব্যক্তি-স্বভাবের সুগভীর আত্ম-পরিচয় আছে। মানুষের বাস্তব-জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিচলিত হইলেও তিনি সেই দুঃখের জগতে বেশিক্ষণ তিষ্ঠিতে পারেন না; যেখানে—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

—সেখানেও তিনি সেই বাস্তব দুঃখকে একরূপ অস্বীকার করিয়া, এই দুর্গত মনুষ্যসমাজের আর্ত্তিনাশনের জন্য অতি উচ্চ ভাবসাধনার পন্থাই নির্দ্দেশ করিলেন; ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির

অস্ত যে অন্নজল তাহার পরিবর্ত্তে পরম সত্যের অমৃত-পায়স, মনুষ্যজীবনের পরিবর্ত্তে বিশ্বজীবন, এবং নিষ্ঠুর নিয়তি-রূপিনীর পরিবর্ত্তে নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার আধ্যাত্মিক আরাধনাকেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

…ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তার পর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভৎ'সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান;
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

—এমন যে দুর্গত সমাজ, যাহারা "শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া"—তাহাদিগের সেই সাক্ষাৎ দুঃখের প্রতিকার-চিন্তা না করিয়া, কবি উপদেশ দিলেন—

মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা—

এবং মুহূর্ত্তে ভাবাবিষ্ট হইয়া, তাহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া, নিজেরই জবানিতে—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

দুর্দ্দিনের অশ্রু-জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'।—কে সে? জানি না কে, চিনি নাই তারে…

তারপর কবি পৃথিবীর এই কঙ্করকণ্টকময় পথ কোনরূপে অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্বপ্রিয়ার—সেই নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার—চরণতলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এই দুঃখের জগতে দুঃখীদের সঙ্গে বাস করিয়া বলিতে পারেন নাই—

নত্বহং কাময়ে স্বর্গং নচরাজ্যং পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্॥

রবীন্দ্রনাথের দোষ নাই; রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা মনুষ্য-সাধারণের জীবন-দেবতা নয়। তিনি যে জীবনের আরাধনা করিয়াছেন, তাহার অধিষ্ঠান-ভূমি বাহিরে নয়—ভিতরে; তাহার যত কিছু অভাব-অভিযোগ, যত কিছু দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম অতি কঠিন

স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার দ্বারা অন্তরেই প্রশমিত ও দমিত হইয়া যায়। বিশ্ব-প্রিয়ার প্রেমমূর্ত্তিখানিই কবির সেই স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠার শক্তি-উৎস ; জীবনের সকল উদ্বেগ ও জ্বর-জ্বালা তাহারই করপদ্মপরশনে জুড়াইয়া যায়—সেই সৌন্দর্য্যকে অন্তরগোচর করিলে জীবনের কোন দৌরাত্ম্যই আর থাকে না ; তখনই—"অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি"। অন্যত্র, রবীন্দ্রনাথ—জীবনকে জয় করিবার নয়—বিস্মৃত হইবার এই মন্ত্র আরও উৎকৃষ্ট কবি-ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—চিত্রাঙ্গদার স্বর্গীয় রূপলাবণ্যদর্শনে মহাভারতের সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুনও গভীর ভাবাবেশে কবির ন্যায় গাহিয়া উঠে—

কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি,
কি আনন্দ কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হ'য়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে।···
চারিদিক হ'তে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ।
···ভাবিলাম
কত যুদ্ধ কত হিংসা কত আড়ম্বর
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষ্ণা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে।

জীবন বলিতে যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—বাধাবিঘ্ন জয়ের যে সংগ্রামশীলতা বুঝায়—এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহার প্রতিষেধক—তাহারই নাম 'জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ'। যে কাম সকল প্রবৃত্তির মূলে তাহাও এই বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্য-প্রতিমার কটাক্ষমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে—রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতায় সেই তত্ত্ব রূপকচ্ছলে অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেও কবি, রঙ রূপ ও রেখাকে ভাষার অধীন করিয়া, নারী-রূপের যে অনবদ্য সৌন্দর্য্য-প্রতিমা গড়িয়াছেন মদন তাহার দ্বারা পরাস্ত হইল—

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গ দেব। সম্মুখেতে আসি'

থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন, নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি' বসি' নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে। (চিত্রা—বিজয়িনী)

এইরূপ সৌন্দর্য্য-সাধনার সাধারণ নাম—Aestheticism; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির মানস-বিলাস মাত্র নয়; ইহার মূলে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রেরণা রহিয়াছে; ইহা আত্মারই লীলারস-সম্ভোগ, এই সৌন্দর্য্য-চেতনার মধ্যে গভীরতর আত্মচেতনার আনন্দ রহিয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যের সেই মর্ম্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারা সেই সনাতন রস-তত্ত্বকেই এক অপূর্ব্ব কাব্যকলায় পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখিয়া যেমন বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন, তেমনই তাহার অন্তর্গত আদর্শের সহিত নবযুগের জীবন-সাধনার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এজন্য তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বাণী বা ভাবদৃষ্টিকে বাস্তব জীবন-সমস্যার সহিত যুক্ত করিয়া তাহার মূল্য বিচার করিবেন না, কবি রবীন্দ্রনাথ, তথা ভাবুক ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের যত কিছু উক্তিকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দান করিবেন। বাঙালীর ভাব-জীবনকে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সমৃদ্ধ করিয়াছেন তেমন আর কেহ করে নাই, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি যে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন এমন বোধ হয় আর কোন সাহিত্যকে কোন একজন কবি করেন নাই। বাঙালী যদি জীবনের অতি দুর্গম দীর্ঘ পথে তীর্থপর্য্যটনের শক্তি লাভ করে, যদি সেই পথের পাথেয় সে কখনও সঞ্চয় করিতে পারে, তবেই হিমালয়ের পারে কবিকল্পিত সেই মানস-সরোবরের স্বর্ণকমল-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া সে তাহার সেই পৌরুষ ও প্রাণশক্তির পুরস্কার লাভ করিবে। তৎপূর্ব্বে সেই ফুলকে অলস সুখ-স্বপ্নের লীলা-কমল করিয়া তুলিলে, শুধুই জীবনের প্রতি মিথ্যাচার নয়—রবীন্দ্রনাথেরও অসম্মান, এমন কি তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করা হইবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা মনে পড়িল। খাঁটি পাশ্চাত্যসংস্কারবতী ও আধুনিক বিজ্ঞান-বুদ্ধিশালিনী এক ইংরেজ বিদুষী, একদা তাঁহার আদর্শ-মানব ঋষি রাসেলের (Bertrand Russel) গৃহে ভক্তদল-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দর্শনদান উপলক্ষ্যে দুই মনীষীর দুই মূর্ত্তির তুলনা করিয়া, এবং ভক্তদলের রবীন্দ্র-পূজা ও সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনুমান করিয়া, যে সকৌতুক কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা যেমন অজ্ঞতামূলক, তেমনই

স্বাভাবিক। আমাদের দেশের ধাতুগত যে mysticism—যে mysticism এর অপচারকে রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই এ যুগের সাধনা হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহা পাশ্চাত্য প্রকৃতির পক্ষে এতই বিজাতীয় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সেই ভারতীয় ভাবের গন্ধমাত্র সহ্য করিতে না পারিয়া, এই পাশ্চাত্য বিদুষী যখন মন্তব্য করেন—

I like the picture of Tagore with his flowing beard and his oriental mysticism, his exotic pseudo-philosophic poems, with his pomegranate and lotus-bud imagery...his flowing robes, his reverent disciples, his crescent moon idealism....It is an amusing picture.

—তখন এইরূপ উক্তিকে বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই, ইহার মূলে যে অজ্ঞতা আছে তাহাও যেমন বুঝি, তেমনই, ইহা হইতে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবন এই দুয়েরই আদর্শ একটা বিপরীত সংস্কারে কিরূপ আঘাত করে, এবং কেন করে, তাহা বুঝিবার পক্ষে আমাদের সুবিধা হয়। কিন্তু আমার মনে লাগিয়াছে ঐ ভক্তগণের কথা। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার—তাঁহাকে যথার্থভাবে ভক্তি করিবার মত শিক্ষা বা সংস্কৃতি ঐ বিদেশিনীর অবশ্য নাই, কিন্তু আমাদের জীবনেও কি রবীন্দ্রনাথের আসন প্রস্তুত হইয়াছে? রবীন্দ্রভক্তির যে আতিশয্য আমাদের মধ্যে প্রায় একটা ফ্যাশন হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে কি কোন জ্ঞান-বিচার আছে? গড্ডালিকাবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহা কি সত্য নয় যে, বর্ত্তমান কালে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যাহারা একটা Cult বা ভক্তি-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অতিশয় কৃত্রিম জীবন যাপন করে—দেশ, জাতি বা সমাজের সহিত তাহাদের যেমন নাড়ীর যোগ নাই, তেমনই তাহারা অতিশয় সুখী ও শৌখিন সমাজে বাস করিতে পারিলেই জীবন ধন্য মনে করে। আমি এখানে, প্রসঙ্গক্রমেই, অতিশয় দুঃখের সহিত ইহার উল্লেখ করিলাম, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও তাঁহার সাধনা এযুগে এ জাতির পক্ষে যে কিরূপ নিষ্ফল হইয়াছে ইহাও তাহারই একটা প্রমাণ।

কিন্তু ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা যায় না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি যদি তাঁহার স্বকীয় সাধনার ও লোকোত্তর প্রতিভাবলে এমন এক স্থানে পৌঁছিয়া থাকেন যেখানে সৃষ্টির সকল পদার্থই জ্যোতির্ম্ময়, অথবা অন্ধকার যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, যেখানে ধ্বনিমাত্রেই সুরময়, অগ্নিরও আলো আছে—তাপ নাই; যেখানে সকল অন্যায় ও অসত্যকে কেবল অস্বীকারের দ্বারা নিরস্ত করা যায়; তবে তাঁহার মত পুরুষের সেই প্রাচীন ঋষি-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার দ্বারা সে অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন। বাংলা দেশে ঠিক ঐ কালে বাঙালীর

বংশে এমন এক প্রতিভার উদয় যে কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইহাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি নব-পুষ্পিত রূপ, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'—এই যে বাণী, রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল ইহাতেই নিহিত আছে। অতএব বাংলার নবযুগ যে পথে যুগ-সমস্যা, তথা জগদ্ব্যাপী আসন্ন মন্বন্তর-সঙ্কটকে বরণ করিয়া তাহার সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এই খাঁটি সনাতনী সাধনা জীবনের রূপ-রসকে আশ্রয় করিয়াও, সেই পথে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং তাহার অন্তরায় হইয়াছে। তাহার কারণ, এই সাধনা আদৌ ব্যক্তিমুখী—সমাজমুখী নয়; বিশ্বকে বিরাটকে নিজ-আত্মায় সংহরণ করিয়া সেই মুকুরবিম্বিত আত্মানুরূপ ছায়ার রূপ-রস-প্রীতিই ইহার সাধন-বস্তু; এই প্রীতিও একরূপ বিশ্বপ্রীতিই বটে, কিন্তু ইহা সেই প্রেম নয়, যে প্রেম আপন আত্মাকে—নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে—বিশ্বে বিলাইয়া দিয়া, সেই বিশ্বের ছায়া নয়—কায়াকে আলিঙ্গন করিয়া; "with its tragic compassion binds him to all the sufferings of the universe", এবং 'ecstasy of art or contemplation'এর পরিবর্ত্তে 'fury of action'কেই বরণ করিয়া লয়।

৪

রবীন্দ্রনাথের সাধনা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাধনাই বটে, তাহাতে সেই ব্যক্তিস্বতন্ত্র ভাবদৃষ্টিই আধিপত্য করিয়াছে; তথাপি যুগধর্ম্ম এমনই যে, সেই প্রাচীন, আপন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই, আধুনিক বেশ ধারণ করিয়াছে; সেই ভাবদৃষ্টিতেই একটি নূতন রঙ লাগিয়াছে—মন্ত্র সেই একই বটে, কিন্তু তাহাতেই একটি নূতন পিপাসা যুক্ত হইয়াছে—জীবনে যাহা সম্ভব নয়, কাব্যে তাহা হইয়াছে। যে ভূমানন্দের অনুভূতি এককালে ঋষিকেই কবি করিলেও, জগৎ ও জীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার অবকাশ দেয় নাই, সেই রসই একালের কবিকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছে, সেই বৈচিত্র্যকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবার—অসীমকে সীমার মধ্যে উপলব্ধি করিবার—বিপুল উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছে; যেন সেই রসকে জীবনের পাত্রেই আস্বাদন করিতে হইবে; শুধুই মর্ম্মকোষের মধু নয়—সৃষ্টি-শতদলের প্রত্যেকটির বর্ণ, গন্ধ ও রূপরস পঞ্চেন্দ্রিয়-মুখে পান করিতে হইবে। এই যে অরূপের রূপ-পিপাসা, ইহাতে জীবনের যেটুকু আরাধনা আছে, তাহাকেই কালের প্রভাব বলা যাইতে পারে। এবার সেই অমৃতপিপাসু আত্মা দেহেরই দুয়ারে দুয়ারে মাধুকরী করিয়াছে—

> বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
> অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে;
> পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা—

—এমন কথা বাঙালী কবির মুখে আদৌ অসম্ভব নয়—শাক্ত ও বৈষ্ণবের বংশগত ভাবধারার সেই প্রভাব ব্যর্থ হইবার নহে ; তথাপি জীবনের এমন আরতি—মর্ত্ত্যের ধূলামাটিকেও এমন ভাবের ভরে আলিঙ্গন—পূর্ব্বে আর কেহ করে নাই। যুগের সহিত রবীন্দ্র-প্রতিভার যদি কোন গূঢ়তর যোগ থাকে, তবে তাহা ইহাতেই আছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আদর্শে যুগপ্রবৃত্তির এই যে নূতনতর প্রেরণা রহিয়াছে, ইহাতেই অতঃপর বাংলা সাহিত্যের আদর্শ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনুষ্যজীবনকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে অন্যবিধ গৌরব দান করিয়াছেন। তিনি মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠতাকে, তাহার কীর্ত্তি বা প্রতিভার উচ্চতম শিখরকে, মহিমান্বিত করেন নাই ; যে-মনুষ্যত্ব জীবনের সমতলভূমিতে, সাধারণ জীবনযাত্রায়, তাহার মর্ম্মের মাধুরী বিকাশ করিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে, শত শত পুষ্পবৃন্তে ঝরিয়া যায়, তিনি সেই মনুষ্যত্বের পূজা করিয়াছেন। যদিও কাব্যমন্ত্ররূপে ইহার বীজ আরও পূর্ব্বে বিহারীলালের কবিতায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তথাপি রবীন্দ্রনাথই যেমন ইহাকে সাহিত্যসৃষ্টিতে সার্থক করিয়াছেন, তেমনই সজ্ঞানে এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।—

> আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজকেও ভালরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখ বেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্ত্তব্য। (পঞ্চভূত : 'মনুষ্য')

অন্যত্র—

> 'জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
> অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
> অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্ত্তির ধূলা
> কত ভাব, কত ভয় ভুল ,
> সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
> ঝর ঝর বরষার মত,
> ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি—
> শব্দ তার শুনি অবিরত। (সোনার তরী : 'বর্ষাযাপন')

এই যে মানুষ-পূজা, ইহা লোকোত্তর-চরিত্রের বা বীর মানুষের পূজা নয়—মানুষমাত্রেরই মধ্যে যে মনুষ্যহৃদয় বা মনুষ্যসুলভ সুখদুঃখ-চেতনা সর্ব্বত্র তরঙ্গিত হইতেছে—ইহা তাহারই পূজা। এই মনুষ্যত্বও 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'র মত, ইহার জন্যও ঋষির সেই

দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন; ঐ সাধারণ মানুষের উপরে সেই 'কাব্যের আলোকনিক্ষেপ' করিতে হইবে, যাহাকে ইংরেজ কবি আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—'the light that never was on sea or land, the Consecràtion and the Poet's dream"; অর্থাৎ, এখানেও রবীন্দ্রনাথের সেই Idealism—ভাবের আলোকে বস্তুসকলকে মণ্ডিত করিয়া দেখিবার সেই দৃষ্টি—জয়ী হইয়াছে; এবং ইহারই ফলে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে কবিকল্পনার মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। সে কল্পনা, প্রকৃতির মধ্যেও যেমন, মানুষের জীবনেও তেমনই, একটি শান্ত-স্থির সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, উভয়কে একটি আধ্যাত্মিক ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মন্ত্র ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিদৃষ্টির সম্পূর্ণ অনুরূপ। সাহিত্যিক ভাষায় এই আদর্শকে লিরিক আদর্শ বলা যাইতে পারে; মানবপূজা হিসাবে সেই যুগের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও, এই লিরিক আদর্শ পূর্ব্ববর্ত্তী এপিক বা নাটকীয় আদর্শকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা বিবেকানন্দের আদর্শ ও এই আদর্শ এক নয়, বরং বিপরীত; পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শে মানুষ একটা বিরাট শক্তির আধার—কেবল সুখদুঃখ-চেতনার আধার নয়; জীবন একটা নিস্তরঙ্গ সরোবর নয়, ভাবস্থির রস-সাগরও নয়; মানুষের দেহদশাধীন আত্মা বিকাশের অপেক্ষা রাখে—জীবনের গণ্ডি যত বৃহৎ হইবে, কার্য্যের ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হইবে, মানুষের চেতনাও তত উদ্বুদ্ধ হইবে, জীবন ততই সমৃদ্ধি লাভ করিবে। অতএব মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহতের প্রভেদ, অথবা, মহত্ত্বের মাত্রাভেদ না মানিলে, সৃষ্টিগত জীবন-ধারাকে অস্বীকার করিতে হয়, বস্তুকে বাদ দিয়া ভাবের সাধনা করিতে হয়। তাহাতে মানুষের সমাজে মিথ্যাচারই বাড়িয়া উঠে। বস্তু ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর করিবার জন্য ভাব-সাধনাই যদি যথেষ্ট হয়, বস্তুর অসম্পূর্ণতা যদি ভাবের দ্বারাই পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে কোন দুঃখ, কোন অভাবই আর থাকে না, জীবনের সহিত যুঝিবার প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি Idealist; বঙ্কিমচন্দ্র বা বিবেকানন্দও Idealist বটেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হয় জীবনের বাস্তব-সাধনা দ্বারা; এজন্য সে ক্ষেত্রে, ভাব-সাধনা নয়—শক্তি-সাধনাই প্রকৃত সাধনা। তথাপি তত্ত্বের দিক দিয়া এই দুই সাধনাই সত্য; একটি সমাজ-জীবনের সাধনা, অপরটি ব্যক্তি-জীবনের—একটি স্রোতে ঝাঁপ দিয়া, অপরটি কূলে বসিয়া; একটি শাক্ত সাধনা, অপরটি বৈষ্ণব। রবীন্দ্রনাথ যে খাঁটি বৈষ্ণব তাহাতে সন্দেহ নাই; তিনি বিরাট-বিপুলকে ক্ষুদ্রের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত দেখিয়া চরিতার্থ হন, তাঁহার ভগবান তুচ্ছতম জীবকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল—

> "আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
> তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"

শিশিরের বুকে আসিয়া কহিল তপন হাসিয়া
"ছোট হ'য়ে আমি তোমারে বুহিব ভরি'
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি'।"

"অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বম্" বলিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাটের শক্তির দিকটিকে বড় করিয়া দেখেন নাই। জীবনের যে রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহার কাব্যে তিনি যে নর-নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি বড় যথার্থ বলিয়া মনে হয়। অপর এক সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয়প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচক বলিতেছেন—

In many ways he was a tremendously intelligent child who, playing on the sea-shore, did not concern himself with the sweep of the great tides, but splashed ecstatically in the less menacing ripples, with the keenest eyes for the adorable jetsam they flung up. He was not at ease, nor at his best in the presence of high tensions, they made him feel uncomfortable, as if a thunderstorm was brewing.

এই যে "keenest eyes for the adorable jetsam"—ইহা রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু এইরূপ জীবন-দর্শন কাব্যের পক্ষে যতই সত্য ও সঙ্গত হউক,—'Criticism of life', বা বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয়-মূলক জীবন-সত্যের দিক দিয়া, সম্যক্-দর্শন নহে। বাংলার নবযুগের সাধনায় মানুষের যে পৌরুষ-ধর্ম্মের উৎকর্ষই ছিল একমাত্র লক্ষ্য, এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে; এখানে জীবন মানুষের অধীন নয়, মানুষই জীবনের অধীন, এবং সে জীবনে কর্ম্মের উপরে ধ্যান, বস্তুর উপরে ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই ভাবধারা সম্পূর্ণ নূতন—ইহার অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া—বাস্তব ও আদর্শের ভেদ ঘুচাইয়া দিয়া—জগৎব্যাপী মহা-বিপ্লবের মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এক দিকে সর্ব্বমানব-দেববাদ ও অপর দিকে সর্ব্বমানব-পশুবাদের সাম্য-ঘোষণা হইতেছে। বাংলার নবযুগের সাধনা ও তাহার আদর্শ যে ইহা হইতে কত স্বতন্ত্র, তাহার সেই মানব-বাদ বা মানব-ধর্ম্ম যে এইরূপ বিশ্বমানব-বাদকে—এই universalismকে—স্বীকার করে নাই, বরং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরেই সর্ব্বজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এবং জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও জাতিধর্ম্মকেই—তাহার সেই স্বধর্ম্মকেই, সেই এক আদর্শে আরোহণ করিবার সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এক কালে রবীন্দ্রনাথও জাতীয়তা বা জাতিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। যথা—

"গোলাপফুল ত বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য্য ত সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল ত বিশেষ ভাবে গোলাপ গাছেরই সামগ্রী,

তাহা ত অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকে প্রকাশ করিতেছে। (আত্মপরিচয়)

* * *

এই বিশ্বধর্ম্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই—এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়; আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়া সত্যের এই রূপটিকে—এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। (আত্মপরিচয়)

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোন ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়।

(হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়)

—ইহা জাতীয়তা-ধর্ম্মেরই কথা, ইহাই বঙ্কিম-বিবেকানন্দের কথা; রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলার নবযুগের সেই সাধনাকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই আদর্শ একেবারে ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানববাদ প্রচার করিলেন, একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন মানুষের জাতিভেদ, স্বধর্ম্ম ও সংস্কৃতিভেদ আর নাই—মানুষের নাম হইল 'বিশ্বমানব', তাহার দেশ হইল—'সর্ব্বমানবলোক'। সেই মানুষের প্রকাশ যেখানে তাহাই স্বদেশ।—

সত্য কথা বলি, বিদেশেই তাদের বেশি দেখলুম, কিন্তু তারা যে দেশে থাকে সে দেশ বিদেশ নয়, সে যে সর্ব্বমানবলোক। সেই দেশেরই দেশাত্মবোধ আমার হোক, এই আমার কামনা।

* * *

বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র যে একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

তার মানে হচ্ছে, এই মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি ক'রে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না, কেন না, অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্ব্বলোকে। ("পত্রধারা", 'প্রবাসী', ১৩৩৮)

'নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না'—রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি বড় সত্য ও মূল্যবান। 'স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি' একদিন তিনিও করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা তাঁহার পক্ষে পরধর্ম্ম, শেষে স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সনাতন'-পন্থী, ভারতের সেই ভূমাবাদে দেশ কাল বা জাতি, কোনটারই স্থান নাই, তাই বাংলার নবযুগের সাধনা রবীন্দ্রনাথকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ সেই সাধনমন্ত্রকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অসংখ্য রচনা ও অসংখ্য উক্তি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথা এই পর্য্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ হইলেও তাঁহার স্থান বিংশ শতাব্দীতেই, তাহার কারণ, তাঁহার প্রতিভা ও মনীষার যে দৃঢ়তর অভিব্যক্তি, এবং কাব্যসাধনার বাহিরেও নব নব ভাব-চিন্তার নায়করূপে তাঁহার যে আত্মপ্রকাশ, তাহা এই বিংশ শতাব্দীতেও ঘটিয়াছে; এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের যাহা কিছু প্রভাব তাহাও এই কালের শিক্ষিত-সমাজের উপর পড়িয়াছে। তাঁহার সেই কবিজীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং সেই প্রভাবের ফলাফল বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়, এজন্য বাংলার নবযুগের পরিশিষ্ট হিসাবেই, সেই যুগকে অনুসরণ করিয়া, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

৫

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সেই নব-জাগরণের কাহিনী শেষ করিবার পূর্ব্বে সমগ্রভাবে দুই-চারিটি কথা বলিব। এই কাহিনীতে আমি বাঙালী-জাতির প্রতিভা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এবং বিশেষ করিয়া, একটা যুগের যুগ-সমস্যার পরিচয় দিয়াছি। আজ এই জাতি প্রায় মরণোন্মুখ বলিলেও হয়; জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে আজ আত্মচৈতন্যহীন ও হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থা তাহার কখনও হয় নাই। বহু পূর্ব্বকালের না হইলেও, দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসরের যে অসন্দিগ্ধ ইতিহাস আজও স্মরণাতীত হয় নাই, তাহাতে এই জাতির মনীষা ও প্রাণশক্তির, এবং জাতি হিসাবে একটি অতিশয় বিলক্ষণ সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার যে অসাধারণ উদ্দীপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহারই আলোকে তাহার সেই অতীতকে যেমন, তেমনই তাহার ভবিষ্যৎকেও ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়। আজিকার এই মহা দুর্দ্দিনে—এই মোহ ও মস্তিষ্কবিকার এবং পরধর্ম্মপিপাসার প্রবল উপসর্গ-পীড়ার মধ্যে, প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য অতিশয় ধীরভাবে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন আছে। সেই আত্ম-পরিচয় লাভ করিবার জন্য বেশি দূরে দৃষ্টি করিতে হইবে না, মাত্র দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে বাঙালী কি ছিল তাহা জানিলেই যথেষ্ট হইবে। এই উদ্দেশে, আমি আমার অভ্যস্ত

সাহিত্য-চিন্তা ত্যাগ করিয়া, অতিশয় স্বাস্থ্যভগ্ন অবস্থায়, এই দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি জানি, আমার এই আলোচনায় বহু ভ্রম-প্রমাদ আছে, বিশেষত ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি ইতিহাস লিখি নাই; সে যুগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জাগৃতির লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করিয়া, কেবল সাহিত্যিক ভাব চিন্তার সাহায্যে, জাতির গূঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রেরণা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি; তাহাতেই তাহার যে প্রতিভা ও প্রাণশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, সে পরিচয় মিথ্যা নহে। ইহাও সত্য যে, আমি সেই নব-জাগরণের একটা দিক ধরিয়াই আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আর একটা দিকও আছে, এইবার সেই দিকটির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব। এই নব-জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল একটি মাত্র কারণে—জাতির দেহও যেমন সুস্থ ছিল, তেমনই তাহার প্রাণশক্তিও ছিল অটুট; যেন বহুকালসঞ্চিত শারীরিক শক্তি ও হৃদয়বল একটা অভাবনীয় সুযোগে শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল—শুধুই মনের নয়, প্রাণের প্রাবল্যও ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। সে কি উল্লাস! কি উৎসাহ! অতি দরিদ্র নিঃসহায় পল্লীবালকও কেবল দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনশক্তি ও প্রাণের অদম্য পিপাসায় শহরের বিদ্বৎসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। ধনীর সন্তান নিশ্চিন্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, নূতনতর জীবনযাপনের জন্য দারিদ্র্য বরণ করিতেছে। কোথাও বা নবশিক্ষার সেই আলোক প্রাণের আতশ কাচে পড়িয়া অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিতেছে; গোঁড়া হিন্দুর সন্তান দারুণ ম্লেচ্ছাচারে মাতিয়া উঠিতেছে। আজন্ম সংস্কারে আচারে অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ থাকিয়াও, শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতও গুরুতর সমাজসংস্কারে সর্ব্বস্বপণ করিতেছে—জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য উচ্চশিক্ষা হইতেও ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনকে বহিষ্কার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে! যে নিজে জাগিয়াছে সে অপরকে জাগাইবার জন্য অধীর হইয়াছে। যে নিজে খ্রীষ্টান হইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক হইয়াছে, মাতৃভাষার উন্নতি ও স্বজাতির জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য তাহারও কি উৎসাহ! অসাধারণ মেধাশক্তির বলে দেশী ও বিদেশী বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া যাহার প্রত্যয় হইল যে জীবনের বাহিরে আর কিছু নাই, সে সারাজীবন নাস্তিক হইয়া কাটাইয়া দিল, কোন মোহ মানিল না, নিজের অমূল্য প্রতিভার কোন মূল্য চাহিল না! আর একজন আরও বলিষ্ঠ, আরও প্রতিভাশালী—জীবনের সমস্যাকে এমনই দুর্ব্বোধ্য ও মূল্যহীন মনে করিল যে, পূর্ণযৌবনে, সম্পূর্ণ সুস্থদেহে আত্মহত্যা করিল; সে আত্মহত্যা দুর্ব্বলের আত্মহত্যা নয়। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে। সাহিত্যসেবার পূর্ণ উৎসাহ এবং নিশ্চিত কবিখ্যাতি সত্ত্বেও একজন সুস্থ ও হৃদয়বান ব্যক্তি কেন যে আত্মহত্যা করিল, তাহার কারণ কেহ

(ইহার শেষ অংশ ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সপ্তর্ষি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরমানন্দ অনামিকা সোম-শুভ্রের কাছে নানা ভাবে উপকৃত। এমন কি তাদের আশাও আছে যে, হয়তো সোম-শুভ্র তাদেরই তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে যাবেন। সুতরাং সোম-শুভ্রের যে কোন প্রকার অদ্ভুত আচরণই তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তারাও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল (নবকুমার ইলার কাছে) যখন তিনি অবিচলিত গাম্ভীর্য্য সহকারে ব্যক্ত করলেন যে, গাছেরাও মানুষের মতই কথা কয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করে। তাঁর মতে আমরা যাকে 'মর্ম্মর' বলি, তা ঠিক একই ধরনের ধ্বনি নয়। বিভিন্ন গাছেরই মর্ম্মর যে বিভিন্ন তাই শুধু নয়, একই গাছের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ঋতুতে মর্ম্মরধ্বনি বিভিন্ন—এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। বাতাসের গতি-বেগ এবং পত্রের আকৃতির ওপরই মর্ম্মরধ্বনি প্রধানত নির্ভর করে তা তিনি জানেন, কিন্তু এ-ও তিনি অনুভব করেছেন এবং তার কতকটা প্রমাণও পেয়েছেন যে, কেবল বাতাসের গতি-বেগ ও পত্রের আকৃতি দিয়েই সর্ব্বপ্রকার মর্ম্মরধ্বনির ব্যাখ্যা করা যায় না। এ বিষয়ে গাছেদের নিজেদেরও যেন সজ্ঞান কিছু প্রচেষ্টা আছে ব'লে মনে হয় তাঁর। যন্ত্র দিয়ে তিনি মেপে দেখেছেন যে, একই উত্তাপে ও বায়ুমণ্ডলের চাপে একই বাতাসের গতি-বেগে একই গাছ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকম মর্ম্মরধ্বনি শোনায়। ফোনোগ্রাফ-যন্ত্র থাকলে তিনি প্রমাণ রাখতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর মতে গাছের ভাষা শুধু শ্রাব্য নয়, দর্শনীয়ও। চক্ষু এবং কর্ণ উভয় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে সে ভাষার মর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়। গাছের সব পাতা একসঙ্গে কাঁপে না, সব পাতার ওপর সূর্য্যালোক সমভাবে প্রতিফলিত হয় না। শুধু ফোনোগ্রাফ নয়, সিনেমাটোগ্রাফও দরকার, যদি কেউ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছের ভাষাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণা করতে চান। গাছের ভাষা শ্রাব্য এবং দৃশ্য তো বটেই, তা ছাড়া আর একটা জিনিস আছে ব'লেও তাঁর মনে হয়। সিম্বায়োসিস ব'লে যেমন এক ধরনের জীবনযাত্রাপ্রণালী উদ্ভিদ ও পশু জগতে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন—যাতে দুটি বিভিন্ন প্রাণী অথবা উদ্ভিদ যৌথভাবে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে প্রাণ ধারণ করে—তেমনই, সোম-শুভ্রের ধারণা, গাছের ভাষা ও পাখীর গান, গাছের ভাষা ও পতঙ্গের গুঞ্জন, পরস্পর-পরিপূরক। একের সাহায্য ব্যতিরেকে অপরে ঠিক যেন মূর্ত্ত হতে পারে না।

তাই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে গাছের ভাষার রূপও বিভিন্ন। সোম-শুভ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, তারা তাদের এই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাব-বিনিময়ও করে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কলকে ফুলের গাছের পাতায় পাতায় হঠাৎ একটা শিহরণ জাগল, একটা কোকিল ডেকে উঠল তার ডালে। ঠিক পাশেই একটা আতা গাছ, একই রকম হাওয়া বইছে, কিন্তু তাতে শিহরণও নেই, কোকিলও নেই। কিন্তু আর একটু দূরে আর একটা কলকে ফুলের গাছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাগল অনুরূপ শিহরণ, তার ডালেও ডেকে উঠল কোকিল। মনে হ'ল, দুটো গাছ যেন কথা ক'য়ে উঠল একই ভাষায়। এসব ঘটনা এত বার তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, এদের তিনি কাকতালীয়বৎ ব'লে উড়িয়ে দিতে চান না। তবে তাঁর এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য যে সব প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তা ঠিক ক'রে উঠতে পারেন নি তিনি। তবু তিনি এগুলো ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে চান এই উদ্দেশ্যে যে, ভবিষ্যৎ যুগের কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো এ নিয়ে কাজ করতে পারবেন, তাঁর এ কল্পনাও হয়তো সত্যরূপে মূর্ত্ত হবে কোনদিন ভবিষ্যৎ কোন জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাবলে।

সম্পাদক নবকুমারের মনে হ'ল, সোম-শুভ্র বোধ হয় এই সব প্রলাপ তার 'অধরা' পত্রিকায় ছাপাতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাকে বোধ হয় নিমন্ত্রণ করিয়েছেন আজ। এই হাস্যকর ব্যাপার বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই নিবৃত্ত করা উচিত, নবকুমারের মনে হ'ল। কর্ত্তব্য-প্রণোদিত অপ্রিয় কার্য্যটাকে কৌশলে মোলায়েম করবার উদ্দেশ্যে তাই সে বললে, আপনার প্রবন্ধটা আমার কাগজে নিতে পারতাম; কিন্তু তাতে এত গম্ভীর প্রবন্ধ ঠিক চলবে কি না, বুঝতে পারছি না। আমার কাগজ ঠিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা তো নয়। তবে—

সোম-শুভ্রকে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকতে দেখে নবকুমার থেমে গেল।

তোমার কাগজ আছে নাকি?

আমার ঠিক নয়। প্রোপ্রাইয়েটর হচ্ছেন রামদাস মল্লিক। আমি সহকারী সম্পাদক।

প্রোপাইটার না ব'লে প্রোপাইয়েটর বললে, কারণ তার গর্ব্ব, ইংরেজী কথা যখন বলে, তখন অভিধান-সম্মত শুদ্ধ উচ্চারণই ক'রে থাকে সে।

সব সময় সফল হয় না যদিও, কারণ সে ইংরেজ নয়, তবু চেষ্টা করে। বেণীমাধবের অভিধান উলটে পালটে আজই সকালে 'প্রোপাইয়েটর' তার চোখে পড়েছিল। তাক মাফিক লাগিয়ে দিলে।

সোম-শুভ্র প্রশ্ন করলেন, রুবি মিলের রামদাস মল্লিক নাকি?

হ্যাঁ।

কাগজের নাম কি?

অধরা।

রামদাস মল্লিক সোম-শুভ্রের অপরিচিত নন। তিনিও ব্রাহ্ম। এই ওজুহাতে এবং অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এই কারণ দেখিয়ে বহুকাল পূর্ব্বে তিনি সোম-শুভ্রের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা চাঁদা নিয়েছিলেন। অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন,—হাজার টাকা অবশ্য আর কেউ দেন নি, কিন্তু দশ, বিশ; পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশো—যার কাছে যতটুকু নেওয়া যায় তিনি নিয়েছিলেন। অবলা বিধবাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য হয় নি, কিছুকাল পরে একটি তেলের কল স্থাপিত হয়েছিল। বিধবার সঙ্গে এই তেলের কলটির কিছু সম্পর্ক যে ছিল না, তা নয়। রুবি-নাম্নী যে বিধবা মেয়েটির প্রেমে প'ড়ে রামদাস মল্লিক দ্বিতীয় পক্ষে তাকে বিয়ে করেছিলেন, তার নামের সঙ্গে মিলটির নাম যুক্ত ক'রে বিধবা-প্রীতির কিছু পরিচয় মল্লিক মশায় দিয়েছিলেন। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যায় না যে মল্লিককে, তিনি আজকাল 'অধরা' নামক এক পত্রিকারও স্বত্বাধিকারী হয়েছেন—এই বার্ত্তা শুনে সোম-শুভ্রের মনের নেপথ্যে যে রসিকতা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তার আভাস মুখে অবশ্য ফুটল না কিছু। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, ও। তোমাদের কাগজে চলে না বুঝি এ ধরনের লেখা?

আজ্ঞে না। আমরা পোস্ট জর্জিয়ান লিটারারি 'মুউভ্‌মেণ্ট' নিয়েই আছি। তারই রূপটা বাংলা ভাষায় ফোটাতে চেষ্টা করছি।

হচ্ছে না কিন্তু কিছুই।—কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে ব'লেই সোম-শুভ্রের মুখের দিকে চেয়ে ইলা বুঝলে যে, কথাটা এখন এ ভাবে বলাটা অশোভন হয়েছে। ইলার অপ্রতিভ ভাবটা দেখে অনামিকাকে ঘাড় ফিরিয়ে হাস্য গোপন করতে হ'ল। পরমানন্দ দৃষ্টির ইঙ্গিতে নবকুমারকে অনুরোধ করতে লাগল, যেন সোম-শুভ্রকে খুব বেশি নিরুৎসাহিত না করা হয়। সোম-শুভ্র প্রবন্ধের পাতাতেই

নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। এসব তিনি দেখতে পেলেন না। বলা বাহুল্য, 'অধরা' পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপাবার কোন আগ্রহ তাঁর জাগল না। জাগলেও তার জন্যে নবকুমারের অনুগ্রহপ্রার্থী হবার দরকার হ'ত না তাঁর, রামদাস মল্লিক যখন সে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। কিন্তু এত কথা তিনি নবকুমারকে বললেন না। ক্ষণকাল নীরব থেকে একটু সসঙ্কোচেই তিনি বললেন, আমি যা লিখেছি তা বিশেষ কিছু নয় হয়তো, কিন্তু তবু এটা ছাপাব ঠিক ক'রে ফেলেছি। ছাপালে পঞ্চাশ ষাট পাতার একখানা চটি-বই হবে। এক হাজার কপি ছাপাতে কত খরচ পড়তে পারে?

নবকুমারই উত্তর দিলে, দেড়শো টাকার মধ্যেই হবে।

দেড় হাজার টাকায় তা হ'লে দশ হাজার কপি হবে।

একেবারে দশ হাজার কপি ছাপাবেন? অত কি বিক্রি হবে?

বিক্রি করব না, বিতরণ করব।

এর জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। চতুর্দ্দিকে সকলের যখন এত অভাব, তখন শুধু শুধু দেড় হাজার টাকার এই অপব্যয়! পরমানন্দকে মানুষ করেছিলেন ব'লেই বোধ হয় তার ধারণা ছিল যে, সোম-শুভ্রের টাকাকড়ির ওপর তার একটা ন্যায্য দাবি আছে। তাই সে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, তার মানে?

মনে করেছি, লাখ খানেক টাকা কোনও ভাল ব্যাঙ্কে জমা ক'রে যাব। তারই সুদ থেকে প্রতি বছর এই বই ছাপা হয়ে বিতরিত হবে। হাজার দুই-তিন সুদ হবে বোধ হয়। দেড় হাজার যদি বই ছাপানোর খরচ হয়, বাকিটা হবে বিতরণের খরচ। যিনি বিতরণ করবেন, তাঁকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে, টিকিট প্রভৃতিও লাগবে কিছু—

ইলা আবার কথা ক'য়ে উঠল অপ্রত্যাশিতভাবে, আপনার টাকা অবশ্য আপনি যেমন ভাবে খুশি খরচ করতে পারেন—

তারপর একটু হেসে বললে, এদেশে এখনও সে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতগুলো টাকা আরও ঢের ভালভাবে 'ইউটিলাইজ' করা যেত।

সোম-শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন এবং চুপ ক'রেই হয়তো থাকতেন, যদি না তাঁর মনে হ'ত যে, তাঁর নীরবতাকে হয়তো উপেক্ষা ব'লে মনে করবে মেয়েটি। মৃদু হেসে তাই উত্তর দিলেন, সেটা নির্ভর করে ইউটিলিটি কাকে বল

তুমি, তার ওপর। তোমার শাড়ি দেখে আমার কিন্তু ভরসা হচ্ছে যে, আমাদের দুজনের আদর্শে খুব বেশি তফাত নেই।

ইলার দামী রেশমের শাড়িটার দিকে সস্নেহে চাইলেন তিনি।

ইলা লজ্জিত মুখে বললে, এর দামই বা কত? আর এ কটা টাকা দিয়ে কটা লোকেরই বা উপকার হবে? কিন্তু আপনার ওই এক লাখ টাকা দিয়ে—

তেত্রিশ কোটি লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভাবলে এক লাখ টাকাও কিছু নয়। আর একটা স্কুল তৈরি ক'রে আরও গোটাকতক লোককে কেরানী হবার সুযোগ দিতে চাও? না, আর কোন হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে কতকগুলো চোরকে প্রশ্রয় দিতে চাও? তোমার মতে কি হ'লে ভাল হয়, শুনি?

আপনার ওই বই ছাপিয়েই বা কি হবে?

হয়তো কিছুই হবে না। আবার এমনও হতে পারে যে, আজ যা আজগুবি ব'লে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাই হয়তো কোন বৈজ্ঞানিকের প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয়ে মানব-সভ্যতার রূপই বদলে দেবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—

কথাটা বলতে গিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে থেমে গেলেন তিনি। ঘড়িতে আটটা বাজল। অনামিকাকে উঠে পড়তে হ'ল। সোম-শুভ্রের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। রাত্রে অবশ্য দুধ ছাড়া তিনি খাবেন না কিছু এবং সে দুধটুকুও নিজের প্যানে নিজের স্টোভে গরম ক'রে নেবেন, কিন্তু তারও ব্যবস্থা করতে হবে অনামিকাকেই। অনামিকা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি, সোম-শুভ্রের কথাবার্ত্তা শুনে কিছু বলবার আর প্রবৃত্তিও ছিল না তার। অলেয়াকে নির্ভরযোগ্য আলো মনে ক'রে বিভ্রান্ত পথিক অবশেষে যেমন বিক্ষুব্ধ হয়, সোম-শুভ্রের আলোচনা শুনে অনামিকার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনই হয়েছিল। নিরীহ নির্দ্দোষ পরমানন্দের ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তার। একেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ। সোম-শুভ্রের টাকার ওপর নির্ভর ক'রে বালীগঞ্জের চৌমাথার ওপর জমির দর করা হচ্ছিল। দেড়শো টাকা মাইনের কেরানীর আশাও কম নয়! বামন হয়ে চাঁদে হাত! মনের মধ্যে তুষানল জ্বলছিল অনামিকার। সে আর ব'সে থাকতে পারলে না, উঠে গেল। পত্নীর মনের অবস্থা পরমানন্দেরও অজ্ঞাত রইল না। হঠাৎ বেফাঁস কিছু ব'লে না বসে! অনামিকার পিছু পিছু সেও উঠে গেল।

নবকুমার বললে, আপনার সবচেয়ে বড় কথাটা কি, তা তো বললেন না?

আমার নিজের তৃপ্তি।

একটু চুপ ক'রে থেকে সোম-শুভ্র আবার বললেন, লম্বা লম্বা বক্তৃতার আড়ালে এই সত্য কথাটা ঢাকা প'ড়ে যায় অনেক সময়। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ, পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক, কবি দার্শনিক, দেশনেতা সকলেই যা সন্ধান করেছেন, তার নাম আত্ম-তৃপ্তি। দৈবক্রমে তাতে আর পাঁচজনের উপকার হয়ে গেছে। না-ও যদি হ'ত, তা হ'লেও তাঁরা স্বধর্ম্মচ্যুত হতেন না।

এতটা ব'লে সহসা তাঁর মনে হ'ল, আত্ম-প্রশংসা করা হচ্ছে। সসঙ্কোচে চুপ ক'রে গেলেন।

ইলা মুখরা মেয়ে। ব'লে উঠল, দশজনের উপকার ক'রে যাঁরা তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁরাই পৃথিবীতে পূজনীয় কিন্তু।

ঈষৎ হেসে সোম-শুভ্র বললেন, পৃথিবীতে এ রকম লোক থাকাও অসম্ভ নয়, যাঁরা দশের পূজা এড়াতে চান। মানুষ অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণাকেই পূজো করে কিনা। গ্যালিলিও যদি লোকের পূজা চাইতেন—

এখন কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই পূজনীয় নন কি?

এখন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মতকে সমসাময়িক বিজ্ঞেরা শুধু আজগুবি ব'লেই মনে করে নি, তাঁকে লাঞ্ছিতও করেছিল সেজন্যে।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা ব'লে আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে, আমি গ্যালিলিওর সমকক্ষ। এটা হয়তো আমার বাজে খেয়াল মাত্র। তর্কের খাতিরেই তর্ক করছিলাম শুধু।

এই পর্য্যন্ত ব'লে স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

একটু পরে নবকুমার কথা কইলে, ইলা দেবী কম্যুনিস্ট, তাই আপনার খেয়াল বোধ হয় ভাল লাগছে না ওঁর।

সোম-শুভ্র সস্নেহে ইলার দিকে চাইলেন।

ইলা ব'লে উঠল, যে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক কম্যুনিস্ট না হয়ে পারে না। বর্ত্তমান যুগে কম্যুনিজ্‌মই মুক্তি। আপনার মনে হয় না তা?

সোম-শুভ্র বললেন, হ্যাঁ, যাদের প্লেটে খেতে হবে, তাদের পক্ষে মুক্তি বইকি।

সকলেরই খেটে খাওয়া উচিত এবং প্রত্যেক সভ্যসমাজের উচিত—প্রত্যেক কর্ম্মীকে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া।

সব মানুষের পক্ষে কি এক নিয়ম খাটে? তুঁতগাছ গুটিপোকার পক্ষে হিতকর স্বীকার করি, কিন্তু সব পোকার পক্ষে নয়। এমন কি সেই গুটি-পোকাই যখন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, তার পক্ষেও নয়। সেও তখন তুঁতপাতায় আবদ্ধ থাকে না, ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। গুটিপোকার চক্ষে যেটা নিরর্থক বিলাস, প্রজাপতির পক্ষে সেইটেই সার্থক কর্ম্ম। এক নিয়ম কি খাটে সকলের বেলায়? বিশেষত মানুষের বেলায়?

উপমা দিয়ে কথা কইলে পারব না। নবকুমারবাবুর মত সাহিত্যিক তো আমি নই, লেখাপড়া শিখে বেকার ব'সে আছি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই। তাই মনে হয়, সোভিয়েটের দেশে থাকলে হয়তো সসম্মানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতাম।

সোম-শুভ্র চুপ ক'রে রইলেন। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল তাঁর। তাঁর বিশ্বাস যে, প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম-অনুসারে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য। মানুষের তৈরি সাম্যবাদের ছদ্মবেশ এত বার ধরা পড়েছে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, জীবনটা সত্যিই যদি একটা যুদ্ধ হয় এবং তার প্রধান অস্ত্র যে শক্তি, তা প্রকৃতিই সকলকে যদি সমানভাবে না দিয়ে থাকেন, তা হ'লে নিখুঁত সাম্যের আশা দুরাশা মাত্র, আদর্শবাদীর স্বপ্ন শুধু। বাস্তব-জগতে সেটাকে মুখোশরূপে ব্যবহার ক'রে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে নিজেদের কাজ হাঁসিল ক'রে নেবেন হয়তো, কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গরাজ্য অথবা খ্রীষ্ট-বিরোধী লেনিনের সাম্যরাজ্য দুর্ব্বলের কল্পলোকে অথবা আদর্শবাদীর স্বপ্নলোকেই থেকে যাবে। জীবলোকে তা কোন দিনই মূর্ত্ত হবে না, হবার উপক্রম করবে, কিন্তু হবে না। এ সবই জানেন তিনি। তবু রঙিন-শাড়ি-পরা ছিমছাম এই মেয়েটির—বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, যার কোন দুঃখই নেই, অথচ অন্তরে যার এত গ্লানি—এর স্বরূপ জানতে পেরে এবং নিজের সচ্ছলতার সঙ্গে তার তুলনা ক'রে তাঁর ভদ্র-অন্তঃকরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

নবকুমার একটু অধীর হয়ে উঠেছিল। সোম-শুভ্র অথবা ইলা কাউকেই

তাক লাগাতে না পেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। অবশেষে সে উঠে পড়ল।

কিছু যদি মনে না করেন, আমি উঠি এখন।

খাবে না এখানে ?

পরমানন্দ খেতে বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ এখন মনে পড়ল, সার্ নীলরতনের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে আমার—থাকতে পারব না।

আচ্ছা।

নবকুমার রাস্তায় বেরিয়ে মোড়ের পানের দোকানে একটা পাসিং-শো সিগারেট কিনে দেশলাইয়ের ওপর সেটা লঘুভাবে ঠুকতে ঠুকতে আগের মতই অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল। ওখান থেকে উঠে এসে বা মিছে ক'রে সার্ নীলরতনের নাম ক'রে অস্বস্তির কিছুই উপশম হ'ল না। নবকুমার চ'লে যাবার পর ইলা সোম-শুভ্রের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে বললে, আমি কিন্তু অত সহজে নিস্তার দিচ্ছি না আপনাকে। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব।

আমি বুড়ো মানুষ, তোমার সঙ্গে পারব কি ?

দ্বারপ্রান্তে অনামিকাকে দেখা গেল। সমস্ত মুখ থমথম করছে তার।

স্টোভ জ্বেলেছি, আসুন। ইলা তুমিও এস, খাবার দেওয়া হচ্ছে। নবকুমারবাবু কোথা গেলেন ?

তাঁর একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ছিল, চ'লে গেছেন তিনি।

সকলে উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন।

গ

সোম-শুভ্র নিবিষ্ট চিত্তে ব'সে হিসেব লিখছিলেন। প্রত্যহ নিখুঁতভাবে পাই-পয়সার হিসেব মিলিয়ে তবে তিনি শুতে যান। বহুকাল থেকে এ কাজ ক'রে আসছেন। আধ পয়সার হিসেব গোলমাল হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না—আধ পয়সার জন্যে নয়, হিসেব গোলমালের জন্যে। কোন হিসেবের একচুল গোলমাল অসহ্য তাঁর পক্ষে। সারাজীবন তিনি এমন নিখুঁতভাবে হিসেব রেখেছেন যে, যে কোন মুহূর্তে ব'লে দিতে পারেন জীবনে কত কুলি-ভাড়া দিয়েছেন, কত কাপড় কিনেছেন, কত চাল-ডাল কিনেছেন। সমস্ত প্রকার খরচের নির্ভুল হিসেব আছে তাঁর কাছে। শুধু টাকাকড়ির ব্যাপারেই নয়,

সব ব্যাপারেই তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ম-নিবদ্ধ। কোন প্রকার অনিয়ম তাঁর সহ্য হয় না। এমন কি বিছানার চাদর কোথাও যদি সামান্য কুঁচকে থাকে, তা হ'লেও তাঁর অস্বস্তি বোধ হয়। ঘুম আসতে চায় না, সেটা ঠিক ক'রে না নেওয়া পর্য্যন্ত মনের ভেতর খচখচ করতে থাকে। এ রকম লোকের জীবন অশান্তিপূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু সোম-শুভ্রের জীবন আশ্চর্য্য রকম শান্তিপূর্ণ, কারণ তিনি স্বাবলম্বী, কারও কাছে—এমন কি নিজের চাকরদের কাছেও—জোর গলায় কিছু দাবি করবার আত্মম্ভরিতা তাঁর নেই। বরং তাঁর ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয়, তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, যেন নিজের অস্তিত্ব দ্বারাই তিনি অপরের জীবনযাত্রায় বাধা-সৃষ্টি করছেন এবং সকলে তা সহ্য করছে ব'লে সকলের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ।

ইলা এসে প্রবেশ করলে।

আমি আপনার বিছানাটা ঠিক ক'রে দিয়ে যাই।

না না, কিছু দরকার নেই, তুমি বাড়ি যাও। আমি নিজেই ক'রে নিতে পারব। অনু কেমন আছে?

ভাল আছে। সে-ই আসছিল, আমিই মানা করলাম তাকে। একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাকুক।

এর আগে কি ওর ফিট হয়েছিল কখনও?

কই, শুনি নি তো।

ইলা সোম-শুভ্রের বিছানা খুলে পাড়তে লাগল। সোম-শুভ্র বাধা দিতে পারলেন না, কোন ব্যাপার নিয়ে বেশি বাদ-প্রতিবাদ করাটাও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি হাসি-মুখে হিসেব লিখতে লাগলেন।

মশারির দড়ি নেই বুঝি? নিয়ে আসি।

সব আছে; দাঁড়াও, দিচ্ছি।

সোম-শুভ্র উঠে তোরঙ্গ খুলে (স্যুটকেস পছন্দ করেন না তিনি) এক গুলি টোয়াইনের শক্ত সুতো, চারটি ছোট পেরেক এবং একটি ছোট হাতুড়ি বার ক'রে ইলাকে দিলেন।

এসব আপনি সঙ্গে রাখেন বুঝি?

সোম-শুভ্র একটু হাসলেন শুধু। ওই তোরঙ্গের মধ্যে কত রকম জিনিস যে তাঁর সংগ্রহ করা আছে, তা দেখলে ইলা অবাক হয়ে যেত। খাম,

পোস্টকার্ড, টিকিট, মনিঅর্ডার ফর্ম, চিঠি লেখার কাগজ, কলম, নিব, আলপিন, ফাউণ্টেন পেন, ব্লটিং, সাধারণ পেন্সিল, লাল-নীল পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, দেশলাই, গালা, শিলমোহর, হরিতকী, মাজন—এসব তো আছেই, অনেকেরই থাকে; কিন্তু এসব ছাড়াও এমন অনেক জিনিস আছে, যা অনেকের থাকে না। কয়েকটা ছোট ছোট কৌটোতে আধলা, পয়সা, আনি, দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা, এমন কি কয়েকটা গিনিও আলাদা আলাদা করা আছে। কয়েকটা শক্ত খামে আছে নানা মূল্যের নোট। এসব ছাড়া ছোট একটা পুঁটুলিতে নানা রকমের কাপড়ের টুকরো, নানা রঙের সুতোর গুলি, সরু মোটা ছুঁচ, নানা ধরনের ছোট বড় বোতাম সংগ্রহ করা আছে। যখনই যে কাপড়ের জামা অথবা মশারি করান, তখনই তার খানিকটা ছাঁট সংগ্রহ ক'রে রেখে দেন, ভবিষ্যতে যদি তালি দিতে হয়—এই ভেবে। পড়বার সময় চশমা লাগে, দু জোড়া করিয়ে রেখে দিয়েছেন—এক জোড়া হঠাৎ হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেলে অসুবিধেয় যেন পড়তে না হয় অথবা অপরকে যেন অসুবিধেয় ফেলতে না হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সোম-শুভ্র এটা বুঝেছেন যে, অ-গোছালো হ'লে নিজের তো অসুবিধে হয়ই, আশপাশে যারা থাকে তারাও অস্বস্তি ভোগ করে। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি না পেলে জীবনযাত্রার ছন্দে তাল কেটে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায় যেন।

না না, ও ঠিক হচ্ছে না, ঠিক সমান ক'রে মেপে নাও, যেখানে সেখানে পেরেক ঠুকলে ঠিক হবে না। মশারির চারটি খুঁট ঠিক সমান হওয়া চাই তো।

আপনি কি লিখছেন লিখুন না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। সোম-শুভ্র আর বাধা দিলেন না, লিখতে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে বুঝলেন, ঠিক হচ্ছে না, ও চ'লে যাবার পর ঠিক ক'রে নিলেই হবে। যথাসাধ্য ভাল ক'রেই ইলা মশারি টাঙানো বিছানা-পাতা শেষ ক'রে বললে, দেখুন।

চমৎকার হয়েছে।

যাবার আগে ইলা লীলাভরে হেসে বললে, আপনার যে এত কাজ ক'রে দিচ্ছি, আমার একটু স্বার্থ আছে।

কি?

আমি যে স্কুলে পড়াই; সেখানে আমাকে মাইনে দেয় না। ভবিষ্যতে

মাইনে পাব—এই আশায় ঢুকেছিলাম। স্কুলের যিনি সেক্রেটারি, তিনি এখন বলছেন, বি. টি.-পাস লোক নেওয়া হবে। আমি যদি এক বছরের মধ্যে বি. টি. পাস করতে পারি, তা হ'লে তাঁরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন, না পারলে অন্য লোক নেবেন। স্কুলের সেক্রেটারি অনাদি সেন আপনাকে খুব খাতির করেন, আপনি যদি একটু রেকমেণ্ড ক'রে দেন আমাকে—

কি রেকমেণ্ড করব ?

আমাকে যেন চাকরি করতে করতে বি. টি. পাসের সুযোগ দেওয়া হয়। ওঁরা ইচ্ছে করলে তিন বছর পর্য্যন্ত সময় দিতে পারেন। আমি তা হ'লে টাকা কিছু জমিয়ে নিতে পারি, বি. টি. পড়ার অনেক খরচ তো।

কত খরচ ?

তা মাসে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। এক বছরে ছ-সাতশো টাকা লাগবে। আপনি একটা চিঠি লিখে দিলেই কিন্তু হয়ে যায়।

তাদের স্কুলের বিষয় তো আমি কিছুই জানি না। তারপর একটু হেসে বললেন, তোমার বিষয়েই বা এমন কি জানি ! চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে ?

বেশ, তবে দেবেন না।

প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল ইলা। সোম-শুভ্র লক্ষ্য করলেন, তার হাসি-হাসি মুখখানি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। খুব খারাপ লাগতে লাগল তাঁর। কিন্তু কি করবেন তিনি, এমন ভাবে চিঠি দেওয়াটা কি উচিত হ'ত ? উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব মেটাতেই সারাজীবনটা কেটে গেল ! কি যে কর্ত্তব্য, তা ঠিক করা এত কঠিন ! ইলার মুখখানা বারম্বার ভেসে বেড়াতে লাগল মনের ওপর। একখানা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেই বোধ হয় ওর সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু এমনভাবে মহত্ত্ব আস্ফালন ক'রে অপরিচিত একজন মেয়েকে একটা চেক ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে যে ইতরামি আছে, তার মধ্যে যেতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তারপর হঠাৎ আর একটা কথাও মনে হ'ল। যে শিব-শুভ্রের টাকা তিনি পেয়েছেন, তাঁর আত্মা যাতে তৃপ্ত হবে, টাকাটা কি সেই ভাবেই খরচ করা উচিত নয় ? শশাঙ্ক-শুভ্রের কথা মনে হ'ল। কে জানে, তার ব্যবসা কেমন চলছে আজকাল ! বহুদিন তার কোন খবর পান নি। গায়ে প'ড়ে খবর নিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। সে-ও বোধ হয় সঙ্কোচভরেই তাঁর কাছে

আসতে পারে না। নিতান্ত প্রয়োজনবশেই সেবার আসতে হয়েছিল ব'লে মনে মনে লজ্জিত হয়ে আছে বোধ হয়। শশাঙ্কের ছেলে শঙ্খ, তারও আবার ছেলে হয়েছে! শিশু শশাঙ্ক-শুভ্রের মুখটা মনের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

তৃতীয় অঙ্ক

(ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো। বনমালা, রমলা ও কমলা প্রথম অঙ্কের মত জানালায় দণ্ডায়মান)

বনমালা। সেই থেকে আমরা জানলায় দাঁড়িয়ে আছি। নাঃ, কারও দেখা নেই। এত ভোগান্তি তোমার জন্যেই বাপু! মাগো, আমার পিনটা গুঁজে নিই; মাগো, আমার পাউডার লাগানো হয় নি! কেন যে ওসব কথা শুনতে গেলাম! পথে কি একটা জনপ্রাণীও আছে! শহরের সব লোক যেন মরেছে।

কমলা। মা ব্যস্ত হ'য়ো না। এখনই সব জানতে পারা যাবে। মিছরি অনেকক্ষণ হ'ল গিয়েছে, এখনই ফিরবে। [জানালায় উঁকি মারিয়া] মা, দেখ দেখ, কে যেন আসছে! ওই যে, পথের মোড়ে।

বনমালা। কই? সেই থেকে কেবলই আসছে আসছে বলছ! তোমার মাথা আর মুণ্ডু! হ্যাঁ, একজন লোক বটে! কে লোকটা? বেঁটে!...ভদ্র-লোকের মতই পোশাক। লোকটা কে হতে পারে? কি মুশকিল!

কমলা। আমার মনে হয় বলরামবাবু।

বনমালা। বলরামবাবু! কখনই বলরামবাবু নয়। [রুমাল নাড়িয়া] এদিকে এদিকে—তাড়াতাড়ি।

কমলা। ও বলরামবাবু ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

বনমালা। আবার তর্ক! আমি বলছি, কখনই বলরামবাবু নয়।

কমলা। দেখ মা, তখনই বলেছিলাম বলরামবাবু। এখন তো বুঝতে পারছ?

বনমালা। বলরামবাবুই তো বটে। তোমার বাপু মিছিমিছি তর্ক করা। আমি যেন বুঝতে পারি নি—এমনই তোমার ধারণা। [চীৎকার করিয়া] তাড়াতাড়ি আসুন। এত ধীরে হাঁটেন আপনি! ওঁরা সব কোথায়? বাড়িতে ঢোকা অবধি অপেক্ষা করবেন না। কি রকম লোক? খুব কড়া? আর ওঁর খবর কি? কি বিপদ! বাড়িতে না ঢোকা অবধি একটি কথাও বলবেন না?

(বলরামবাবুর প্রবেশ)

আচ্ছা, আপনার কি লজ্জা করছে না? এমন ক'রে একজন অবলাকে কষ্ট দিচ্ছেন? আপনার ওপরেই আমি আশা-ভরসা ক'রে ব'সে আছি। সেই যে গেলেন, আর দেখাটি নেই। সকলেই চুপচাপ! এতেও কি লজ্জা করছে না? আমি আপনার সিন্ধু-বিন্দুর ধর্ম্ম-মা—আর আপনার শেষে এই ব্যবহার!

বলরামবাবু। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি ব'লেই ছুটতে ছুটতে আসছি। ওঃ, ঘাম ঝরছে দেখেছেন! কমলা যে, কেমন আছ?

কমলা। আপনি ভাল বলরামবাবু?

বনমালা। ব্যাপার কি এবার খুলে বলুন।

বলরামবাবু। রায় বাহাদুর আপনাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন?

বনমালা। লোকটা কি? জেনারেল, না—

বলরামবাবু। না, ঠিক জেনারেল নয়, কিন্তু কোন জেনারেলের চেয়ে কম নয় —যেমন কালচার, তেমনই ব্যবহার!

বনমালা। তা হ'লে এঁরই বিষয়ে উনি চিঠি পেয়েছিলেন।

বলরামবাবু। সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ঘনরামবাবু আর আমি—আমরা দু'জনেই প্রথমে তাঁকে আবিষ্কার করি।

বনমালা। ভাল ক'রে সব খুলে বলুন।

বলরামবাবু। ভগবানের কৃপায় এখন সব ভালই চলছে। প্রথমে রায় বাহাদুরকে···হ্যাঁ প্রথমে রায় বাহাদুর বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব খুব রেগে ছিলেন, তিনি বললেন যে, হোটেলের ব্যবস্থা

খারাপ, শহরের অবস্থা ততোধিক খারাপ। তিনি কিছুতেই ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে আসবেন না, আর তাঁর জন্যে জেলে যেতেও পারবেন না। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, রায় বাহাদুরের দোষ নেই, তখন ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা বলতে শুরু করলেন, তার পর থেকে ভালই চলছে। ওঁরা সব দাতব্য-বিভাগ পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। রায় বাহাদুরের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন রিপোর্ট গিয়েছে—আমিও যে একেবারে ভয় পাই নি, তা নয়।

বনমালা। কিন্তু আপনার ভয়টা কিসের? আপনি তো সরকারী চাকরে নন।

বলরামবাবু। সে আপনি কি ক'রে বুঝবেন? একজন বড়লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, বিশেষ যখন তিনি কথা বলতে শুরু করেন—তখন ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

বনমালা। ওসব বাজে কথা যাক। এখন বলুন, তাঁকে দেখতে কেমন? বুড়ো, না ছোকরা?

বলরামবাবু। ছোকরা, একেবারে ছোকরা। তেইশের বেশি কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু কথা বলেন বুড়োর মতন। আমরা বলি—ওখানে যাবই। কিন্তু নাঃ, ও রকম ক'রে তিনি বললেন না, তিনি বললেন—হ্যাঁ, ওখানে বোধ করি যেতেই হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। দেখুন, কথার ভাঁজে ভাঁজে কি রকম বুদ্ধি আর কালচারের গন্ধ! তারপরে বললেন, আমার একটু লেখা-পড়ার বাতিক আছে, কিন্তু ঘরে হোটেল-ওয়ালা বাতি দেওয়া বন্ধ করেছে। বাতি আর বাতিক! দেখুন, কি কাল্‌চার! শুনে আমি আর রায় বাহাদুর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

বনমালা। রঙ কি রকম? ফর্সা না, কালো?

বলরামবাবু। ফর্সাও নয়, কালোও নয়—বাদামী। আর চোখ দুটো যেন কাঠবিড়ালির কাছে থেকে ধার ক'রে নেওয়া, সর্ব্বদাই নড়ছে। ওঃ, সে চোখের দিকে তাকালে বুকের ভেতরে চাকরির ইতিহাসের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বনমালা। গোঁফ আছে?

বলরামবাবু। বনমালা দেবী, একজন বড়লোকের, যাকে গ্রেট ম্যান বলে, তার মুখের দিকে তাকালে গোঁফের মত তুচ্ছ জিনিস চোখেই পড়ে না।

বনমালা। গোঁফ হ'ল তুচ্ছ! আরও কত কি শুনতে হবে! দেখি এবার, চিঠিতে কি আছে। (পাঠ) প্রথমে আমার অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভগবানের কৃপায় কচুভাজা, পুঁইচচ্চড়ি আর আড়াই টাকা হিসাবে দুই বোতল বিয়ার—(থামিয়া) নাঃ, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ভগবানের কৃপার সঙ্গে কচুভাজা পুঁই-চচ্চড়ির সম্বন্ধ কি?

বলরামবাবু। রায় বাহাদুর তাড়াতাড়িতে হোটেলের বিলের ওপরে লিখেছেন।

বনমালা। ওঃ, তাই বলুন। (পাঠ) কিন্তু আমি চিরদিন ভগবানে বিশ্বাসী, তাই সমস্তই এখন আমাদের অনুকূলে আসিয়াছে। শীঘ্র দোতলার দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরটা পরিষ্কার করাইয়া ফেলিবে। গ্রেট ম্যান দয়া করিয়া আমাদের বাড়িতেই···পাঁউরুটি, মাখন, ডিমের মামলেট, মোট ছ আনা।

বলরাম। ওটুকু বিলের, ও কিছু নয়।

বনমালা। সে কি আর আমি বুঝতে পারি নি! (পাঠ) পদধূলি দিবেন। দুপুরবেলা আমরা দাতব্য-বিভাগে আহার করিব। কাজেই কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। কিন্তু মদের ব্যবস্থা রাখিবে। আবদুল্লার দোকানে এখনই লোক পাঠাইবে। সে যদি ভাল মাল না পাঠায়, তবে হতভাগাকে দেখিয়া লইব। ইতি তোমারই একান্ত আলুর দম এক প্লেট। আলুর দম—এ কি রকম ঠাট্টা!

বলরামবাবু। ওটা হোটেলের বিলের অংশ।

বনমালা। আপনি ভাবছেন, আমি বুঝতে পারি নি! এই যে পরেই আছে—একান্ত অনুগত স্বামী। কি সর্বনাশ! আর তো সময় নেই। এসে পড়ল ব'লে। মিছরি! মিছরি! সে ছুঁড়ীর কি আর দেখা পাওয়া যাবে – পাড়ার ছোঁড়াগুলোর পেছনে···ঝগড়ু! ঝগড়ু!

(ঝগড়ুর প্রবেশ)

এখনই আবদুল্লার দোকানে যাও, দাঁড়াও, আমি চিঠি দিচ্ছি তাই নিয়ে যেতে হবে। (টেবিলে বসিয়া লিখিতে লিখিতে বলিতে লাগিল) কোচম্যানকে বল, এই চিঠিখানা নিয়ে আবদুল্লার দোকানে যেন যায়—

আর ক বোতল মদ নিয়ে আসে। আর তুমি গিয়ে দোতলার ঘরটা পরিষ্কার ক'রে টেবিল চৌকি দিয়ে সাজিয়ে ফেল্লো গিয়ে—শিগগির।

বলরামবাবু। আমি তা হ'লে যাই। দাতব্য-বিভাগের পরিদর্শন কি রকম হচ্ছে, দেখি গিয়ে।

বনমালা। আপনাকে আমি ধ'রে রাখতে চাই না, আপনি শিগগির যান।

বলরামের প্রস্থান

কমলা মা, এবার আমাদের কঠিন পরীক্ষা। মেয়েদের পোশাক-নির্বাচনের চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছু আছে? এমনটি পরতে হবে, যাতে দশজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সকলের আগে তোমার দিকে নজর পড়ে। বিশেষ ইনি আসছেন কলকাতা থেকে, ওঁদের রুচিই অন্য রকম। লক্ষ্য রাখতে হবে, পাড়াগেঁয়ে ব'লে নিন্দে না হয়।

কমলা। আমি বলি কি মা, তুমি সেদিনের মত কানন-শাড়িখানা পর। তোমাকে সেদিন পেছন থেকে ঠিক কানন দেবীর মত দেখাচ্ছিল।

বনমালা। আমি তো ভাবছি, বেনারসীখানা পরব।

কমলা। না মা, সত্যি বলতে কি, বেনারসীতে তোমাকে মানায় না।

বনমালা। কেন?

কমলা। আরও রঙ ফর্সা দরকার।

বনমালা। আমার রঙ ফর্সা না হ'লে এ পাড়ায় আর কার রঙ ফর্সা শুনি?

কমলা। বাড়ির বাইরে যেতে হবে না। রমলাদি তোমার চেয়ে অনেক ফর্সা।

বনমালা। বটে! বটে! সেই মা-মরা জলার পেত্নী? তবু যদি না হ'ত টব-চাপা-পড়া ঘাসের মত গায়ের রঙ। কই, সে ছুঁড়ী কই?

কমলা। রমলাদি, এদিকে এস।

(রমলার প্রবেশ)

রমলা। কেন মা?

বনমালা। (রমলার গায়ে খদ্দরের শাড়ি দেখিয়া) আবার খদ্দর পরা হয়েছে?

রমলা। কেন মা, এ তো বেশ ভাল জিনিস।

বনমালা। সেদিন পোস্ট-মাস্টার বলেছিল, খদ্দরে তোমাকে বেশ দেখায়—

সেই থেকে আর খদ্দর ছাড়তে চাও না। তুমি ভাবছ, ও তোমাকে বিয়ে করবে! ও যে আড়ালে তোমাকে মুখ ভেংচায়। তবু হ'ত, যদি কমলা—

কমলা। কেন মা, দিদিকে খদ্দরে তো বেশ দেখায়!

বনমালা। হ্যাঁ, বেশ দেখালেই হ'ল! ওতে যে তোমার বাবার চাকরি যেতে পারে। (এমন সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল) ওই বুঝি ওঁরা সব আসছেন। চল, সাজগোজ ক'রে নিই।

কমলা। কিন্তু মা, আর যাই কর, বেনারসীখানা প'রো না।

বনমালা। ফের তর্ক!

তিনজনের প্রস্থান

(মুকুন্দর একটি বাক্স কাঁধে লইয়া প্রবেশ। অন্য দিক দিয়া মিছরির প্রবেশ)

মুকুন্দ। কোন্ দিকে?

মিছরি। এই দিকে এস।

মুকুন্দ। একটু জিরিয়ে নিই। খালি পেটে বোঝা দ্বিগুণ ভারী মনে হয়।

মিছরি। জেনারেল সাহেব কখন আসবেন?

মুকুন্দ। কোন্ জেনারেল?

মিছরি। কেন, তোমার মনিব।

মুকুন্দ। একেবারে চার পুরুষের জেনারেল।

মিছরি। মাগো! আমরা শুধু এক পুরুষের ভেবেছিলাম।

মুকুন্দ। দেখ, আমাকে কিছু খেতে দিতে পার?

মিছরি। তোমাদের খাবার তো এখনও তৈরি হয় নি।

মুকুন্দ। না হয় তোমাদের খাবারই কিছু নিয়ে এস।

মিছরি। তবে তুমি এদিকে এস।

মুকুন্দ। চল। তোমার নামটি কি?

মিছরি। মিছরি।

মুকুন্দ। মিছরির মতই মিষ্টি।

মিছরি। হাত দিতে গেলে দেখতে পাবে, মিছরির মত ধারও আছে।

মুকুন্দ। বাঃ, বেশ বলেছ! (গুনগুন করিয়া গান)

মেরেছিস্ মিছরির দানা
তাই বলে কি প্রেম দেব না!

মিছরি। চল ওই ঘরে—ওঁরা সব আসছেন।

দুইজনের প্রস্থান

(একজন কন্‌স্টেব্‌ল সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া ধরিল। অনঙ্গমোহনকে অনুসরণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাষ্টার, ঘনরাম ও বলরাম প্রবেশ করিল। ঘনরামের নাকে একটা পটি। ম্যাজিষ্ট্রেট মেঝের উপরে এক টুকরা কাগজ দেখাইয়া দিতেই—কয়েকজন পুলিস দৌড়িয়া গিয়া তাহা কুড়াইয়া লইল)

অনঙ্গমোহন। চমৎকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠান। আপনারা যে ভাবে শহরের সব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করালেন, তা বাস্তবিক চমৎকার। অন্যান্য শহরে আমাকে কেউ কিছু দেখায় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট। সত্য কথা বলতে কি, অন্যান্য শহরের ম্যাজিস্ট্রেট ও অফিসাররা কেবল নিজেদের স্বার্থই চিন্তা ক'রে থাকে। কিন্তু এখানে আমরা কর্ত্তব্য-পালন দ্বারা উচ্চতর অফিসারদের সন্তুষ্টি-বিধান ছাড়া আর কিছু কখনও ভাবি না।

অনঙ্গমোহন। দাতব্য-বিভাগের আহারটিও খুব উপাদেয় হয়েছিল। উঃ, খুব বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে! আপনারা কি প্রত্যেক দিন এমনই খান নাকি?

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার মত সম্মানিত অতিথির জন্যেই আজ বিশেষ আয়োজন হয়েছিল।

অনঙ্গমোহন। সুখাদ্য আমার অত্যন্ত প্রিয়। জীবন তো এইজন্যেই—জীবন মালঞ্চ থেকে সুখের পুষ্প চয়নের জন্যেই। মাছটার কি নাম?

দাতব্য-কর্ত্তা। (ছুটিয়া আসিয়া) বাঁশপাতা মাছ, সার্‌।

অনঙ্গমোহন। চমৎকার! কোন্‌ প্রতিষ্ঠান আমরা দেখে এলাম? হাসপাতাল না?

দাতব্য-কর্ত্তা। আজ্ঞে হ্যাঁ। শহরের দাতব্য-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা।

অনঙ্গমোহন। তাই বটে। চারদিকে বিছানা দেখলাম। সব যেন খালি ছিল—রুগী অবশ্যই সব সেরে উঠেছে। বেশি লোক তো দেখি নি।

দাতব্য-কর্ত্তা। হ্যাঁ, জন বারো মাত্র এখন আছে। বাকি সব সেরে বাড়ি গিয়েছে। এর মূলে আছে আমাদের ব্যবস্থা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। আমি এখানে আসবার পরে থেকে এই রকমই চলছে—রুগী ভর্ত্তি হবা মাত্র,

বাস্—সেরে ওঠে। অবশ্য ওষুধের গুণ আছে—কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান ছাড়া ওষুধ কি করতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট। আর সার্, ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ত্তব্যের মত এমন দায়িত্ব আর নেই। কি বলব, এত কাজ! শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথাই ধরুন না কেন—অন্য লোক হ'লে পাগল হয়ে যেত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এখানে সব ঠিক চলছে। অন্য সবাই যখন নিজের স্বার্থ চিন্তা করছে, আমি রাত্রে বিছানাতে শুয়েও কেবলই ভাবতে থাকি—ভগবান, আমি যেন দায়িত্ব-পালন দ্বারা উচ্চতর অফিসারদের সন্তুষ্টি সাধন করতে সক্ষম হই। তাঁরা যদি পুরস্কার দেন ভাল—না দেন, তবু আমি মনে শান্তি পাব। শহরটি যদি পরিষ্কার থাকে, কয়েদীরা যদি যথানির্দ্দিষ্ট বরাদ্দমত খাদ্য পায়, শহরে যদি গণ্ডগোল না হয়—তার চেয়ে আর কি বেশি প্রার্থনা করতে পারি? আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সম্মানের প্রত্যাশী আমি নই। অবশ্য সম্মান লোভনীয়, কিন্তু কর্ত্তব্যের তুলনায় তা ধূলিমুষ্টি।

দাতব্য-কর্ত্তা। (স্বগত) ওঃ, লোকটা কি ভণ্ড! এ গুণ ভগবদ্দত্ত!

অনঙ্গমোহন। ঠিক বলেছেন। আমিও মাঝে মাঝে ওই রকম চিন্তা ক'রে থাকি। অধিকাংশ সময়েই সাদা গদ্যে—কিন্তু কখনও কখনও কবিতাও এসে যায়।

বলরাম। (ঘনরামকে) চমৎকার বলেছেন। ঘনরাম, দেখ, ওঁর কথা শুনলেই বুঝতে পারা যায়, খুব পড়াশুনো আছে।

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি সময় কাটাবার মত কোন আড্ডা নেই—যেমন ধরুন একটা ক্লাব, যেখানে তাস খেলা যেতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট। (স্বগত) বুঝেছি চাঁদ, তুমি কি খবর জানতে চাও! (প্রকাশ্যে) সর্ব্বনাশ! ওরকম ক্লাব থাকা তো দূরের কথা, কেউ এখানে কানেও শোনে নি। জীবনে আমি কখনও তাস খেলি নি—কি ক'রে যে লোকে তাস খেলে, তা আজও জানতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, চিড়িতনের সাহেব দেখলেই আমার মাথা ঘুরে ওঠে। একদিন ছেলেদের সঙ্গে ব'সে একটা তাসের ঘর তৈরি করেছিলাম, সেদিন সারারাত ঘুম হ'ল না—নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখলাম। কি ক'রে যে লোকে জীবনের অমূল্য সময় তাস খেলে কাটায়— ভগবান!

হেডমাস্টার। (স্বগত) কাল রাত্রেই আমার কাছে থেকে একশো টাকা জিতেছে। রাস্কেল!

ম্যাজিস্ট্রেট। দেশের মঙ্গলের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।

অনঙ্গমোহন। এ আপনার বাড়াবাড়ি। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি তাস খেলেন, তার ওপরেই সব নির্ভর করে। আপনারা মফস্বলের লোক জানেন না, কিন্তু আমরা কলকাতায় জানি, দেশের মঙ্গলের জন্যেও তাস খেলা যেতে পারে।—ধরুন, মনটা খারাপ আছে, কর্ত্তব্যে মন লাগছে না—একবাজি তাস খেলে নিলাম, মনটা ভাল হ'ল, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হ'ল—এতে কি দেশের মঙ্গল করাই হ'ল না? না না; আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না—মাঝে মাঝে এক-আধ বাজি ভালই লাগে।

(বনমালা ও কমলার প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার স্ত্রী; আর আমার মেয়ে কমলা।

অনঙ্গমোহন। (মাথা নীচু করিয়া) আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি।

বনমালা। আপনার মত সম্মানিত অতিথি লাভ ক'রে আমাদের আনন্দ আরও বেশি।

অনঙ্গমোহন। কি বলছেন আপনি! আমার আনন্দ আপনাদের চেয়েও বেশি।

বনমালা। সে কি ক'রে সম্ভব? অবশ্যই আপনি ভদ্রতা ক'রে এসব কথা বলছেন। দয়া ক'রে বসুন।

অনঙ্গমোহন। আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবার আনন্দই কি কম? তবে যদি ইচ্ছা করেন, বসতেও পারি। এতক্ষণে আমি সত্যিই সুখী—আপনার পাশে উপবেশন ক'রে।

বনমালা। এ কেবল আপনি ভদ্রতা ক'রেই বলছেন। কলকাতা থেকে যাত্রা ক'রে অবধি নিশ্চয় অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। অসুবিধা ব'লে অসুবিধা! কলকাতা ছেড়ে মফস্বলে বেরুনো যেন স্বর্গ ত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্যে অবতরণ। নোংরা হোটেল, ছারপোকাওয়ালা

গদি, লোকের অজ্ঞতা! কিন্তু এখানে এসে সমস্ত কষ্ট ভুলে গেলাম। (বনমালার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত)

বনমালা। নিশ্চয় এখানেও আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। বিশ্বাস করুন, এই মুহূর্ত্তে আমি সুখের চূড়ায় অবস্থান করছি।

বনমালা। সে কি ক'রে সম্ভব? এ সম্মান আমার আশাতীত।

অনঙ্গমোহন। আশাতীত! বলুন, যোগ্যতার চেয়ে অনেক কম।

বনমালা। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—

অনঙ্গমোহন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কি সৌন্দর্য্য নেই? পাড়াগাঁয়ের বিল খাল নদী? ধান বাঁশ বেত? অবশ্য কলকাতার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। কলকাতাই তো জীবন, না জীবন-দুধের চাঁছি। বোধ করি আপনারা ভাবছেন, আমি সামান্য একজন কেরানী। ভুল করছেন। আমার আফিসের বড় সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বলে—চল না হে, ফিরপোতে ডিনার খেয়ে আসা যাক। আমি আফিসে কেবল দু-চার মিনিটের জন্যে একবার ঘুরে আসি—তারপরে বেচারা কেরানীর দল সারাদিন ধ'রে কলম পিষে পিষে মরে। আফিসে যখন আমি ঢুকি…তিন-চারজন জুতো-বুরুশ আমার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে…হুজুর বুরুশ, হুজুর বুরুশ…আমি তাদের তাড়াবার জন্যে এমনই ভাবে পা ছুঁড়ি…[পা ছুঁড়িল] ওঃ, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন, বসুন।

ম্যাজিস্ট্রেট, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাস্টার। [সমস্বরে] পদমর্য্যাদার বিচারে আমরা বসতে পারি নে, আমরা দাঁড়িয়েই থাকব। আমাদের জন্যে আপনি ভাববেন না।

অনঙ্গমোহন। পদমর্য্যাদা চুলোয় যাক। বসুন, আমি অনুরোধ করছি, বসুন। [সকলে বসিল] পদমর্য্যাদানুসারে চলাফেরা আমি পছন্দ করি নে। বরঞ্চ লোকে যাতে আমার পদমর্য্যাদা বুঝতে না পারে, তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু বিপদ কি জানেন—কিছুতেই আমি লোকের চোখ এড়াতে পারি নে। অসম্ভব! পথে বেরুলেই লোকে বলতে আরম্ভ করে—ওই যাচ্ছে মিঃ এ. এম. রায়। মহা মুশকিল! একবার তো লোকে আমাকে স্বয়ং কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ব'লে মনে করলে। দেখতে দেখতে পথের দুধারে সিপাহীর দল জুটে গেল। সে কি স্যালুট করবার ধুম! সিপাহী-দলের

কর্নেল—সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার পিঠ চাপড়ে বললে, জান তোমাকে প্রথমে সবাই আমরা কম্যাণ্ডার ব'লে মনে করেছিলাম।

বনমালা। না শুনলে এ ঘটনা কখনও বিশ্বাস করতাম না।

অনঙ্গমোহন। থিয়েটারের সুন্দরী সব অভিনেত্রীদের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বোধ করি আপনারা খোঁজ রাখেন যে, থিটোরের জন্যে দু-চারখানা নাটক লিখেছি। সাহিত্যিকদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব আছে—বুদ্ধদেব সজনীকান্ত তারাশঙ্কর—এরা তো আমার chums, মানে···একদিন এস্প্ল্যানেডের মোঁড়ে তারাশঙ্করের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। পিঠ চাপড়ে বললাম, কি রকম আছ হে? সে চমকে উঠে বললে—কে, অনঙ্গমোহন বটে! কথায় আজও বীরভূমী টান গেল না। অদ্ভুত লোক ওই তারাশঙ্কর!

বনমালা। তা হ'লে আপনি লিখেও থাকেন? আহা, সাহিত্যিক হওয়া, সে কি দুর্লভ সৌভাগ্য! নিশ্চয় কাগজে আপনার লেখা বের হয়।

অনঙ্গমোহন। কাগজে লেখা পাঠাই বইকি। অনেকগুলো বই লিখে ফেলেছি। কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকুমারী, গীতাঞ্জলি, গৃহদাহ। সবগুলোর নাম আবার এখন মনে পড়ছে না। আমার নতুন নাটক মানময়ী গার্লস স্কুল নিশ্চয় দেখেছেন? সেখানার রচনার ইতিহাস অদ্ভুত। ক্লাবে থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। সে বললে, ভাই, চটপট কিছু লিখে দাও না—থিয়েটার তো আর চলে না। তখনই বললাম, বেশ, দাও কাগজ। কিন্তু ক্লাবে কাগজ কোথায়? শেষে মদের বিল জোড়া দিয়ে দিয়ে এক রাত্রের মধ্যে লিখে ফেললাম মানময়ী গার্লস স্কুল। শরৎ চাটুজ্জের ছদ্মনামে যত লেখা বেরিয়েছে, সব আমার।

বনমালা। আপনারই ছদ্মনাম তা হ'লে শরৎ চাটুজ্জে।

অনঙ্গমোহন। সব সাহিত্যিকের লেখা আমি সংশোধন ক'রে দিয়ে থাকি। প্র. না. বি.-র লেখা সংশোধন করবার জন্যে আমি মাসে দু হাজার ক'রে পেয়ে থাকি।

বনমালা। পথের পাঁচালী নিশ্চয় আপনার লেখা?

অনঙ্গমোহন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওখানা তো দু সপ্তাহে লিখে ফেলা।

কমলা। মা, বইয়ের মলাটে তো বিভূতি বাঁড়ুজ্জের নাম—

বনমালা। কমলা, কিছুতেই তোমার তর্ক করার স্বভাব গেল না!

অনঙ্গমোহন। উনি যা বললেন, তা সত্যি। ওখানা বিভূতি বাঁড়ুজ্জের বটে। কিন্তু আরও একখানা পথের পাঁচালী আছে, সেখানা আমার লেখা।

বনমালা। [কমলার প্রতি] নাও, হ'ল তো? কর এখন তর্ক। আমি আপনার খানাই পড়েছিলাম। কি মিষ্টি ভাষা!

অনঙ্গমোহন। সাহিত্যের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। কলকাতায় আমার বাড়ি সবচেয়ে শৌখিন। সকলেই এক ডাকে চেনে। [সকলকে সম্বোধন করিয়া] আপনারা যখন কলকাতায় যাবেন, আমার বাড়িতে উঠবেন। এ আমার বিশেষ অনুরোধ রইল। আমি প্রায়ই পার্টি দিয়ে থাকি।

বনমালা। সেসব পার্টিতে যে কি রকম ধুমধাম হয়ে থাকে, তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি।

অনঙ্গমোহন। সে ধুমধাম আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। অসম্ভব। এক-একটা বোম্বাই আমের দাম অষ্টআশি টাকা। বরাবর বোম্বে থেকে এরোপ্লেনে ক'রে আমদানি করা। আর স্যুপের কথা যদি বলেন। প্যারিস থেকে তৈরি করিয়ে বরাবর জাহাজে ক'রে কলকাতায় আনানো। ঢাকনা তুলতেই সে কি গন্ধ!

নিজের বাড়ি যেদিন পার্টি না থাকে, সেদিন হয় দ্বারভাঙ্গার বাড়িতে, নয় বর্দ্ধমানের বাড়িতে, নয় তো কুচবিহারের বাড়িতে। একদিনও বেকার ব'সে থাকবার উপায় নেই।

সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে প্রায়ই তাস খেলবার ডাক পড়ে। হয়তো গিয়ে দেখব, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, চীফ মিনিস্টার আর আমেরিকার কন্‌সাল আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। খেলতে খেলতে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি—থাকি সেই পাঁচতলার ওপরে, অমনই একসঙ্গে ষোলজন খানসামা দৌড়ে আসে···কি বাজে বকছি, একতলাতেই থাকি। ওরকম সিঁড়ি আপনারা কখনও দেখেন নি—সিঁড়িটার দামই হবে······ভোরবেলা ঘুম ভাঙবার আগেই আমার ড্রয়িংরুম লোকে ভ'রে যায়···রাজা, জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী···ঘরখানা মৌমাছির চাকের মত সরগরম হয়ে ওঠে··· এমন কি মাঝে মাঝে মন্ত্রীরা···

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ভীত বিস্ময়ে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

চিঠিপত্র আমার নামে ইওর এক্সেলেন্সি ব'লে আসে। একবার এক মজা হ'ল! গভর্মেন্টের এক ডিপার্টমেন্টের বড় সাহেব কোথায় উধাও হ'ল। কোথায় গেল? খোঁজ, খোঁজ। কোন পাত্তা নেই। আফিস তো চালাতে হবে। কাকে বসানো যায়? কে যোগ্য লোক? পুরনো সব আই. সি. এস., বড় বড় জেনারেল কত জনে গেল। যত শিগগির যায়, তার চেয়ে শিগগির বেরিয়ে আসে—সবাই বলে আমাদের সাধ্য নয়। আপনারা ভাবছেন, কাজ খুব সহজ, কিন্তু আপনারা গেলেও ওই কথাই বলতেন। গভর্মেন্টের নিয়ম হচ্ছে, যখন আর যোগ্য লোক খুঁজে যায় না, তখন আমার শরণাপন্ন হয়। তখনই গভর্মেন্টের চাপরাসী আসতে শুরু হ'ল। চাপরাসীর পর চাপরাসী; চাপরাসী আসবার জন্যে পথের ট্রাম, বাস, ট্র্যাফিক বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল—ক্রমে ক্রমে পঁয়ত্রিশ হাজার চাপরাসী এসে আমার বাড়িতে পৌছল। সকলেরই মুখে এক কথা—মিঃ রায়, আপনি ভার নিন। আমার ইচ্ছা ছিল, রিফিউজ করব। তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউনে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু মনে হ'ল, গভর্নরের কানে কথাটা যেতে পারে। ভাবলাম, কাজ কি, অ্যাক্সেপ্ট ক'রে ফেলি। কিন্তু তখনই সাবধান ক'রে দিলাম, দেখুন, এ আর কেউ নয়—স্বয়ং অনঙ্গমোহন চম্পটি। আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না। বললে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু যখন আমি আফিসে গিয়ে ঢুকলাম, মনে হ'ল, ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। আফিসের চাপরাসী আরদালী থেকে আরম্ভ ক'রে বড়বাবুর দল পর্য্যন্ত সব কাঁপতে শুরু ক'রে দিলে।

(এই কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কাঁপিতে শুরু করিয়া দিল)

আমার কথা অমান্য করে এমন সাহস কার? সকলেই আমার নামে কাঁপে? স্বয়ং মন্ত্রীমণ্ডল আমাকে ভয় ক'রে চলে। তাদের আর দোষ কি? আমাকে কে না জানে? আমি তাদের বলি, দেখ, আমাকে শেখাতে এসো না। সব জায়গায় আমার যাতায়াত। গভর্নরের বাড়িতে হামেশাই আসা-যাওয়া করছি···কালই আমাকে ফিল্ড মার্শাল উপাধি দেবে···

(পা হড়কিয়া মেঝেতে পতনোন্মুখ। সকলে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিল)

ম্যাজিস্ট্রেট। [কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে ভয়ে] ইওর···ইওর···ইওর···

অনঙ্গমোহন। (তাড়া দিয়া) কি হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। (ভীত কম্পিত) ইওর···ইওর···ইওর···

অনঙ্গমোহন। (তাড়া দিয়া) কি মাথামুণ্ডু বকছেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। ইওর···ইওর···সেন্সি···একটু শুলে ভাল হ'ত। পাশের ঘরেই আপনার বিশ্রাম করবার জায়গা প্রস্তুত।

অনঙ্গমোহন। মন্দ কি! শুলে মন্দ হ'ত না। আপনি আজ খুব খাইয়েছেন। আপনাদের ওপর আমি খুব খুশি হয়েছি। মাছটার কি নাম যেন?

দাতব্য-কর্ত্তা। বাঁশপাতা।

অনঙ্গমোহন। (নাটকীয় ভঙ্গীতে) বাঁশপাতা! বাঁশপাতা! (পুনরায় পতনোন্মুখ; সকলে তাহাকে ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল)

বনমালার প্রস্থান

বলরাম। ঘনরাম, এতদিনে একটা মানুষ দেখলাম বটে! মানুষের মত মানুষ বটে। এতবড় লোকের সামনে জীবনে আমি পড়ি নি। উনি কি?

ঘনরাম। আমার তো বিশ্বাস, জেনারেল হবেন।

বলরাম। কি যে বলছ? জেনারেল ওঁকে দেখলে টুপি খুলে সেলাম করবে। শুনলে তো, মন্ত্রীরা ওঁর ভয়ে কি রকম জড়োসড়ো! চল, শিগগির গিয়ে জজ সাহেবকে সব বলা যাক।

উভয়ের প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তা। (হেডমাস্টারের প্রতি) আমার বিষম ভয় করছে, কাঁপছি, কিন্তু কেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছি না। দেখুন, আমরা আফিসের পোশাক প'রে আসি নি। উনি জেগে উঠে, তখন নেশা ছুটে যাবে, যদি কলকাতায় রিপোর্ট পাঠান, তখন কি হবে?

হেডমাস্টার। চলুন, যাওয়া যাক।

দুইজনের প্রস্থান

রমলা। কি চমৎকার লোক!

কমলা। সত্যি, এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি।

রমলা। কি কাল্‌চার! কাল্‌চার্‌ড মানুষ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আচার, ব্যবহার, পোশাক, চেহারা সবতাতেই কাল্‌চারের ছাপ-মারা।

এমনি ধারা অল্প বয়সের লোক আমার খুব পছন্দসই। আমার সমস্ত মন উতলা হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তুই লক্ষ্য করিস নি, আমার দিকে উনি ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন?

কমলা। কি যে বলছ দিদি! উনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

রমলা। কি যে বলিস! কথা বলছিলেন বটে তোদের সঙ্গে, কিন্তু চোখ ছিল আমার দিকে।

কমলা। কখখনো না।

রমলা। ফের তর্ক! ওইজন্যেই তো তুমি মার কাছে বকুনি খাও। তোমার দিকে তাকাবার আছে কি শুনি?

কমলা। যখন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন দেখ নি—এমনই ক'রে দু-তিন বার আমার দিকে তাকালেন। (দেখাইয়া দিল) আর সেই কন্‌সালের সঙ্গে তাস খেলবার সময়ে—মনে পড়ে না?

রমলা। আচ্ছা, না হয় তাই হ'ল। কিন্তু সে চাহনিতে কোন অর্থ ছিল না।

(ম্যাজিষ্ট্রেটের ধীরে প্রবেশ। অন্য দিক দিয়া বনমালার প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ।

বনমালা। কি হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। মদের মাত্রা কিছু বেশি হ'য়ে গিয়েছিল। যা বললেন তার যদি সিকিও সত্যি হয়! হুঁ হুঁ বাবা, পেটের কথা টেনে বের করতে মদের মত আর কিছু নেই। একবার নেশা মাথায় গিয়ে চড়লে মনের কথা উপচে মুখে চ'লে আসে···মন্ত্রীদের সঙ্গে তাস খেলে; গভর্মেণ্ট হাউসে নিত্য যাতায়াত। যতই চিন্তা করছি, ততই মাথা বেশি ক'রে ঘুরছে—মনে হচ্ছে, যেন গভীর খাদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা ফাঁসি দেবার জন্যে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বনমালা। আমার তো আদৌ ভয় করে নি। আমি ওঁর পদমর্য্যাদার কেয়ার করি নে। আমি ওঁর মধ্যে কি দেখলাম জান তো—শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শ।

ম্যাজিস্ট্রেট। এই মেয়েদের নিয়ে কিছুতেই পারা গেল না। ওরা কখন যে কি ক'রে বসবে, তা জানতে পারা যায় না। ওদের আর কি? হয়তো ক ঘা

চাবুক দিয়ে ছেড়ে দেবে, স্বামীদের সর্ব্বনাশ! তুমি এমন ভাবে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলে, যেন উনি ঘনরামবাবু কি বলরামবাবু।

বনমালা। আমি তুমি হ'লে কিছুমাত্র চিন্তা করতাম না। 'আমরাও মানুষ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি।

ম্যাজিস্ট্রেট। (স্বগত) মিছি মিছি ব'কে কি লাভ? কি বিপদেই পড়েছি, এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি। (দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া) ঝগড়ু, চন্দন সিং আর ডুলবাজ খাঁকে ডেকে দাও—ওরা ওখানেই আছে। (কিছুক্ষণ পরে) কালে কালে কত কি যে দেখব! হ্যাঁ, গভর্ণমেণ্ট-ইন্সপেক্টর একটা দর্শনধারী লোক হবে—এই তো সবাই আশা করে। ইয়া গোঁফ, টলমল করছে সোনালী ইউনিফর্ম, বুক-ভরা মেডেল! এই রকম ছোকরাকে আশা করেছিল কে? ইউনিফর্ম পরলে একটা ইঁদুরকেও মানুষের মত দেখায়। হ্যাঁ, ইউনিফর্মের ওই এক মস্ত গুণ। কিন্তু লোকটার মধ্যে কি যেন আছে, বিনা ইউনিফর্মেই যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে! ভগবানের কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত ফাঁদে পা দিয়েছে। অনেক গুপ্ত তথ্য ফাঁস ক'রে ফেলেছে। নেহাত ছোকরা কিনা!

(মুকুন্দর প্রবেশ। সকলে দৌড়িয়া তাহার কাছে গেল)

বনমালা। এস বাপু, এস।

ম্যাজিস্ট্রেট। উনি কি ঘুমোচ্ছেন?

মুকুন্দ। না, হাই তুলছেন আর এপাশ ওপাশ করছেন—এইমাত্র জাগলেন।

বনমালা। তোমার নামটি কি বাপু?

মুকুন্দ। মুকুন্দ, মা-ঠাকরুণ।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমাকে ভাল ক'রে খেতে দিয়েছে তো?

মুকুন্দ। হ্যাঁ হুজুর, খুব খাওয়া হয়েছে।

বনমালা। তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয় অনেক রাজা-মহারাজা আসেন?

মুকুন্দ। ঠিক ধরেছেন মা-ঠাকরুণ। রাজার নীচের ধাপের কোন লোকের মনিবের সঙ্গে দেখা করবার হুকুম নেই।

কমলা। মুকুন্দ, তোমার মনিব বড় সুপুরুষ।

বনমালা। আচ্ছা মুকুন্দ, তোমার মনিব কিসে খুশি হন?

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমাদের বাজে কথা রাখ। আচ্ছা বাপু, তোমার মনিব—
বনমালা। কি চাকরি করেন ?
ম্যাজিস্ট্রেট। আবার সব বাজে কথা। কাজের কথা কইতেই দেবে না। আচ্ছা বাপু, তোমার মনিব খুব কড়া? দোষ ধরতে কি ভালবাসেন ?
মুকুন্দ। কাজকর্ম্ম ঠিকমত হ'লে তবে তিনি খুশি হন।
ম্যাজিস্ট্রেট। তোমার চেহারাটি বেশ বাপু। তোমাকে ভাল লোক ব'লেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বল তো—
বনমালা। তোমার মনিব বাড়িতে কি রকম পোশাক পরেন ?
ম্যাজিস্ট্রেট। আঃ, চুপ কর না। আমার পক্ষে এ যে জীবন-মরণের সমস্যা। (মুকুন্দকে) শীতের দিনে খাওয়া-দাওয়া একটু ভাল হওয়া দরকার। এই নাও, দুটো টাকা রাখ।
মুকুন্দ। (টাকা লইয়া) ভগবান আপনার ভাল করুন হুজুর।
ম্যাজিস্ট্রেট। কিছু না, কিছু না। আচ্ছা বাপু, বল তো—
রমলা। আচ্ছা মুকুন্দ, তোমার মনিব কি রকম চোখ পছন্দ করেন ?
কমলা। মুকুন্দ, তোমার মনিবের নাকটি কি সুন্দর !
ম্যাজিস্ট্রেট। আঃ তোমরা একটু চুপ কর না। (মুকুন্দকে) আচ্ছা বাপু, দেশভ্রমণের সময় তোমার মনিব সবচেয়ে কি বেশি পছন্দ করেন ?
মুকুন্দ। সে কি সব সময়ে বলা যায় হুজুর! যখন তাঁর যে রকম মেজাজ থাকে, সেই রকম।
ম্যাজিস্ট্রেট। খুব মেজাজী লোক, নয় ?
মুকুন্দ। খু-ব, হুজুর।
ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! তবু কি শুনি ?
মুকুন্দ। ভাল খাওয়া-দাওয়া। ভাল বাড়িতে থাকা।
ম্যাজিস্ট্রেট। কি বললে, ভাল খাওয়া-দাওয়া ?
মুকুন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। আমি তো সামান্য চাকর মাত্র—, কিন্তু আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মনিবের খুব নজর। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন—মুকুন্দ, কি রকম খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। ভাল নয়? আচ্ছা, বাড়ি পৌছুলে মনে করিয়ে দিও। তবে আমি ওসব কথায় বড় কান দিই নে হুজুর, আমি গরিব লোক—যা পাই তাই যথেষ্ট।

ম্যাজিস্ট্রেট। কখখনও যথেষ্ট নয়। নাও নাও, আরও কিছু নাও। বাজার থেকে কিছু কিনে খেও। (টাকা দিল)

মুকুন্দ। হুজুরের বাড়-বাড়ন্ত হোক।

বনমালা। এস বাপু, আমার কাছে এস, আমিও কিছু দেব এখন।

কমলা। (মুকুন্দকে, নীচু স্বরে) মুকুন্দ, তোমার মনিবকে ব'লে দিও। ওর (রমলাকে দেখাইয়া) রঙ পাউডার ঘ'ষে ফর্সা করা—আসলে কালো।

(এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে অনঙ্গমোহনের কাশির শব্দ শ্রুত হইল)

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ। আর যাই কর, গোলমাল ক'রো না। বরঞ্চ তোমরা এখন ভেতরে যাও, সেখানে গিয়ে যা হয় করগে।

কমলা। সেই ভাল দিদি, ভেতরে গিয়ে আমরা কথা বলিগে। এমন অনেক কথা আমার বলবার আছে, যা লোকের সামনে বলবার নয়।

রমলা। চল, তাই ভাল।

উভয়ের প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট। (বনমালাকে) তুমি যাও না।

বনমালা। কি আপদ! আচ্ছা বাপু, তুমি আমার সঙ্গে এস।

মুকুন্দকে লইয়া বনমালার প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান কেবল যদি মেয়েদের বোবা আর পুরুষদের কালা ক'রে দিতেন!

(চন্দন সিং ও ছুলবাজ খাঁর প্রবেশ)

ম্যাজিস্ট্রেট। অত জোরে পায়ের শব্দ ক'রো না। যেন পাঁচমণি হাতুড়ি পড়ছে! কোথায় ছিলে সব এতক্ষণ ?

ছুলাবজ খাঁ। হুজুরের হুকুম মাফিক—

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ। (মুখে আঙুল দিয়া) ঢাকের আওয়াজের মত গলার স্বর! (তাহাকে অনুসরণ করিয়া) হুজুরের হুকুম মাফিক—মাথা আর মুণ্ডু! শোন, সদর-দরজায় খাড়া থাকবে—এক মিনিটের জন্যেও সরবে না। সাবধান, কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না—বিশেষ ক'রে দোকানদারদের। কেউ যদি ভেতরে ঢুকে পড়ে, তবে…তবে…বুঝতেই পারছ—। আর দেখ, দরখাস্ত নিয়ে, এমন কি না নিয়েও, মানে চেহারা

দাতব্য-কর্ত্তা। অদৃষ্টের হাত নেই হেডমাস্টার মশায়, এ হচ্ছে গিয়ে পুণ্যের পুরস্কার। [স্বগত] যত সৌভাগ্য এই নরাধমগুলোরই হয় দেখছি!

জজ। সেই কুকুরের বাচ্চাটা আপনাকে দিয়ে যাব।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন কুকুরের বাচ্চার বিষয়ে ভাববার সময় আমার নেই।

জজ। আচ্ছা, ওটা না নেন, সেই বড়টা নিতে পারেন।

কামিনী। এখন হিজ একসেলেন্সি কোথায়? শুনলাম, হঠাৎ কি কারণে যেন তিনি কোথায় গিয়েছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। জরুরি কাজে একদিনের জন্যে গিয়েছেন।

বনমালা। তাঁর মাতুলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্যে।

ম্যাজিস্ট্রেট। গিয়েছেন বটে, কিন্তু আগামী কালই…[হাঁচি]

সকলে সমস্বরে। জীব সহস্র।

ম্যাজিস্ট্রেট। ধন্যবাদ। আগামী কালই ফিরবেন। [হাঁচি]

সকলে সমস্বরে। জীব সহস্র।

বনমালা। আমরা শীঘ্রই কলকাতায় উঠে যাচ্ছি। এ রকম পাড়াগাঁয়ে বাস করা কঠিন। সেখানে ওঁকে জেনারেল ক'রে দেবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। সত্যি, জেনারেল হ'লে তবে আমার যোগ্য চাকরি হয়।

হেডমাস্টার। তা আপনি হবেন।

রঘুনাথবাবু। ভগবান এখন আপনার মুরুব্বি, কিছুই অসম্ভব নয়।

জজ। বড় জাহাজেই বেশি জল লাগে।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ আপনার যোগ্য সম্মান।

জজ। [স্বগত] জেনারেল হ'লেই প্রহসন সম্পূর্ণ হয়। গরুর পিঠে লাগাম ক'ষে উঠলে ঠিক মানায়। যাক, কর্ত্তার নেমন্তন্ন, না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই।

দাতব্য-কর্ত্তা। [স্বগত] সব মাটি করলে! আরও কত কি দেখতে হবে! অযোগ্য লোকেই বড় পদ পায়। হতেও বা পারে জেনারেল। [প্রকাশ্যে] আমাদের যেন ভুলবেন না রায় বাহাদুর।

জজ। আমাদের দরকারের সময়ে যেন সাহায্য পাই।

কামিনী। আগামী বছরে আমার বড় ছেলেটিকে চাকরির খোঁজে কলকাতা

নিয়ে যাব। আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে, এখন থেকেই ব'লে রাখছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না।

বনমালা। তুমি তো সকলকেই ভরসা দিচ্ছ। কিন্তু এসব কথা ভাববার সময়ও তোমার হবে না। আর এসব দায় বইতেই বা যাবে কেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। বইব না কেন? পুরনো বন্ধুদের কাজ কি করতে নেই?

বনমালা। নিশ্চয়ই করতে আছে। কিন্তু এসব ছোটখাটো লোকদের কাজ করলে বড়লোকদের কাজ করবার সময় পাবে কি ক'রে?

কুমুদিনী। [স্বগত] ও মাগী চিরদিনই ওই রকম। ছোটর সৌভাগ্য হ'লে এমনিই হয় বটে।

বনমালা। আমাদের এই সৌভাগ্যে সবাই আনন্দিত। কেবল ঘরের শাঁকচুন্নি মুখ ভার ক'রে কোথায় গিয়ে ব'সে আছে।

হেডমাস্টারের পত্নী। কে গো?

বনমালা। ওই যে সাধ ক'রে নাম রাখা হয়েছে রমলা! রমলা, না 'কানমলা'।

(কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

কমলা। দিদি কি ছেনালিই না আরম্ভ করেছিল। উনি যত তাড়াতে যান, তত যেন জড়িয়ে ধরে।

বনমালা। সত্যি, মাগো! আমি যেতেই আমাকে বললেন, আপনার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে—

কমলা। ও কথা তো আমাকে বললেন মা।

বনমালা। ফের তর্ক!

(হেনকালে পোষ্টমাষ্টার ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একখানা চিঠি)

পোস্টমাস্টার। অদ্ভুত ঘটনা! আশ্চর্য্য সংবাদ! যাকে আমরা গভর্ণমেন্ট-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে করেছিলাম, সে মোটেই গভর্ণমেন্ট-ইন্সপেক্টর নয়।

সকলে। কি? ইন্সপেক্টর নয়?

পোস্টমাস্টার। মোটেই নয়, আদৌ নয়। একখানা চিঠি থেকে আমি আবিষ্কার করেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি সর্ব্বনাশ! কার চিঠি?

পোস্টমাস্টার। আমি ডাকঘরে ব'সে আছি। মেলব্যাগ বাঁধা হচ্ছে—এখনই সীল করা হবে। এমন সময়ে আপনার বাড়ির চাকর দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে বললে, একখানা চিঠি আছে। আমি বললাম, আজ আর হবে না। সে বললে, সে হবে নি, স্বয়ং হুজুরের চিঠি, খুব জরুরি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ হুজুর? বললে, হুজুর আবার কে? কলকাতার হুজুর। আজই যাওয়া চাই। আমি বললাম, দাও। ব্যাগে ভরতে যাব, হঠাৎ কি ভেবে খুলে ফেললাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি ভরসায় খুললেন? সর্ব্বনাশ!

পোস্টমাস্টার। জানি না কিসের ভরসায়। মনে হ'ল, কোন দৈবশক্তি যেন আমাকে ভরসা দিলে। ঠিকানা দেখি, পরশুরাম, বকুল বাগান, কলিকাতা। মনে মনে ভাবলাম, বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি! আমি ত্রিশ বছর এই কাজ করছি। বেশ বুঝতে পারলাম, এ নাম হচ্ছে গিয়ে ছদ্মনাম। নিজেও যেমন ছদ্মবেশে এসেছে, তেমনই ছদ্মনামে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। কার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, কে জানে? হয়তো খোদ গভর্নরের হাতে। একবার দেখা দরকার—কি লিখল, পোস্টাফিসের কোন গলদের কথা আছে কি না! কি বলব, মশায়, কত চিঠিই তো রোজ খুলি, কিন্তু এ তো চিঠি নয়, যেন জলন্ত অঙ্গার। হাত যেন পুড়ে যায়। এক কানে কে যেন বলতে লাগল, সাবধান, খুলো না। আর এক কানে কে যেন বললে, খোল, খোল, কোন ভয় নেই। গা কাঁপতে লাগল, কপালে কাল-ঘাম দেখা দিলে। কেমন ক'রে যে খুলে ফেললাম, তা নিজেই জানি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি সাহস আপনার! এতবড় অফিসারের চিঠি খুলে ফেললেন!

পোস্টমাস্টার। সেই তো রহস্য। লোকটা মোটেই অফিসার নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। তা হ'লে আপনার মতে উনি কি, তাই শুনি?

পোস্টমাস্টার। কেউ নয়, কিচ্ছু নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [রাগিয়া] 'কেউ নয়, কিচ্ছু নয়' ব'লে আপনি কি বোঝাতে চান? আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি, জানেন?

পোস্টমাস্টার। কে? আপনি? সে আপনার সাধ্য নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন নয়? জানেন, উনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?

শীঘ্রই আমি কলকাতায় গিয়ে মস্ত অফিসার হব? আপনাকে ধ'রে আমি আন্দামানে পাঠাতে পারি?

পোস্টমাস্টার। আন্দামানের কথা এখন রাখুন, বরঞ্চ চিঠিখানা প'ড়ে শোনাই। কি, পড়ব তো?

সকলে। পড়ুন, পড়ুন।

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] প্রিয় পরশুরাম, এই চিঠিতে এক অভিনব সংবাদ তোমাকে পাঠাচ্ছি। কলকাতা থেকে রওনা হবার পরে নৈহাটিতে একবার নামি। সেখানে তাস খেলায় হেরে টাকা-পয়সা যা ছিল সব গেল। কোন রকমে দিনাজসাহীতে এসে এক হোটেলে উঠলাম। এমন অবস্থা হ'ল যে, হোটেলের বিল শোধ করতে পারি না, হোটেলওয়ালা জেলে দেয় আর কি! এমন সময়ে আমার কলকাতার পোশাক এক আশ্চর্য্য ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ক'রে দিলে। এখানকার লোকেরা হঠাৎ আমাকে এক মস্ত গভর্মেণ্ট অফিসার ব'লে মনে করলে। তারপরে আর কি? এখন আমি ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় তোফা আরামে আছি, আর তার স্ত্রী ও মেয়ে দুটির সঙ্গে দিবারাত্রি প্রেম করছি।...কাকে দিয়ে যে আরম্ভ করব, জানি না। আচ্ছা, ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। সে এক নম্বরের ছেনাল, যা খুশি ওকে দিয়ে তাই করানো যায়। সেই সেদিনকার কথা মনে আছে, যখন এক হোটেলে খেতে গিয়ে দেখি, পয়সা নেই? হোটেলওয়ালা গলা-ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিলে? এখন আমার অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম, সবাই টাকা ধার দিচ্ছে। এরা সব অদ্ভুত জীব, তুমি দেখলে হাসতে হাসতে মরতে। তুমি তো হাসির গল্প লেখ। এদের কাহিনী নিয়ে একটা কিছু লেখ না। মাইরি, সে বেশ হবে! প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরা যাক। সে একটি নিরেট গর্দ্দভ···

ম্যাজিস্ট্রেট। এ হতেই পারে না। নিশ্চয় এ কথা নেই

পোস্টমাস্টার। [চিঠি দেখাইয়া] নিজেই প'ড়ে দেখুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। [পড়িয়া] একটি নিরেট গর্দ্দভ। হতেই পারে না, এ কথা আপনি বসিয়ে দিয়েছেন।

পোস্টমাস্টার। আমার প্রয়োজন কি?

দাতব্য-কর্ত্তা। পড়ুন, পড়ুন।

হেডমাস্টার। তার পরে কি ?

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] ম্যাজিস্ট্রেট একটি নিরেট গর্দ্দভ।

ম্যাজিস্ট্রেট। থাক থাক। ফিরে ফিরে পড়তে হবে না। আমরা সবাই জানি, কি লেখা আছে।

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] এই যে…এই যে…নিরেট গর্দ্দভ। পোস্টমাস্টারটি মন্দ নয়। [থামিয়া] আমার সম্বন্ধেও খানিকটা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। থামলে চলবে না, পড়ুন।

পোস্টমাস্টার। কি দরকার ?

ম্যাজিস্ট্রেট। পড়ছেন যখন সবটা পড়তে হবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। আচ্ছা, আমাকে দিন, আমি পড়ছি। [চশমা পরিয়া পাঠ] এখানকার পোস্টমাস্টারটির চেহারা ঠিক তোমার অফিসের দরোয়ানজীর মত। তার ওপরে লোকটা আবার পাঁড় মাতাল।

পোস্টমাস্টার। লোকটাকে আচ্ছা ক'রে চাবুক মারা দরকার।

দাতব্য-কর্ত্তা। [পাঠ] আর দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা…কর্ত্তা…ইয়ে, ইয়ে—

কামিনীবাবু। থামলেন কেন ?

দাতব্য-কর্ত্তা। হাতের লেখা অস্পষ্ট। লোকটা যে বদমাইশ, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কামিনীবাবু। আমাকে দিন, আমার চোখ ভাল আছে। [চিঠিখানা লইল]

দাতব্য-কর্ত্তা। ওটুকু বাদ দিলেই হয়। পরের লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট।

কামিনীবাবু। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমি সবটাই পড়তে পারব।

পোস্টমাস্টার। না না, সবটা পড়তে হবে।

সকলে। কামিনীবাবু, পড়ুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। আচ্ছা, তবে এখান থেকে পড়ুন। ওপরের ওটুকু থাক।

পোস্টমাস্টার। না না, কোন অংশ বাদ দিলে চলবে না। সবটুকু পড়ুন।

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা আস্ত একটি টুপি-পরা ভোঁদড়।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ কি রকম রসিকতা ! টুপি-পরা ভোঁদড় ! ভোঁদড় আবার কবে টুপি পরে ?

কামিনীবাবু। [পাঠ] আর হেডমাস্টারটির সর্ব্বাঙ্গে রসুনের গন্ধ।

হেডমাস্টার। রসুনের গন্ধ! জীবনে আমি রসুন স্পর্শ করি নি।

জজ। [স্বগত] ভগবান্ রক্ষা করেছেন, আমার সম্বন্ধে কিছু নেই—

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার জজ…

জজ। এই মাটি করেছে! [জোরে] দীর্ঘ চিঠি অত্যন্ত বিরক্তিকর। এসব বাজে জিনিস প'ড়ে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করা?

হেডমাস্টার। মোটেই বিরক্তিকর নয়।

পোস্টমাস্টার। পড়ুন, পড়ুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। বাদ দেবেন না, সবটা পড়ুন।

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার জজ সাহেবটি একটি 'অজস্তুশ'।…ওটার মানে কি?

জজ। ভগবান্ জানেন, মানে কি! 'বদমাইশ' হ'তে পারে, কিম্বা হয়তো তার চেয়েও কিছু খারাপ।

কামিনীবাবু। [পাঠ] কিন্তু এরা সবাই ভালমানুষ, আর এদের মস্ত গুণ, এরা চাইবামাত্র টাকা ধার দেয়। ভাই পরশুরাম, আমি ঠিক করেছি, কেরানীগিরি ছেড়ে দিয়ে তোমার মত সাহিত্যিক হতে চেষ্টা করব। আজ আসি। আমাকে শিলিগুড়ির ঠিকানায় চিঠি দিও; গাঁয়ের নাম মনে আছে তো?—কদমকুঁড়ি।

একজন মহিলা। কি দুঃসংবাদ!

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। কোথায় গেল সে বেটা? গ্রেপ্তার ক'রে আন তাকে, গ্রেপ্তার ক'রে আন।

পোস্টমাস্টার। আর গ্রেপ্তার! এতক্ষণে সে পগার পার। আমি আবার বেছে বেছে তাকে শহরের সেরা ঘোড়া দুটো যোগাড় ক'রে দিয়েছিলাম।

কুমুদিনী। মাগো!—এ রকম ঘটনা কখনও শুনি নি।

জজ। ঘটনা! ঘটনা! এদিকে যে আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা ধার নিয়েছিল।

দাতব্য-কর্ত্তা। আমার কাছ থেকেও তিনশো।

পোস্টমাস্টার। আমিও তিনশো—

বলরাম। আমি আর ঘনরাম মিলে পঁয়ষট্টি টাকা দিয়েছিলাম।

অজ। কিন্তু এ কেমন ক'রে ঘটল? আমাদের পক্ষে এ রকম ভুল কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

ম্যাজিস্ট্রেট। [কপাল চাপড়াইয়া] আমি এমন ভুল কি ক'রে করলাম! হায় হায়! আমাকে কি এখনই বাহাত্তুরে পেল? ত্রিশ বছর চাকরি করছি, কোন দোকানদার, কোন কন্‌ট্রাক্টার আমাকে ঠকাতে পারে নি। বড় বড় ঠক বদমাশ আমার কাছে কাত। তিন-তিনটে কমিশনারের চোখে ধুলো দিয়েছি···আর শেষে—

বনমালা। কিন্তু এ যে অসম্ভব। উনি যে কমলাকে বিয়ে করবেন বলেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। [রাগিয়া] বিয়ে করবেন! বিয়ে করবেন! কোথাকার ধাপ্পাবাজ! [পাগলের মত] দেখ, দেখ, সকলে চেয়ে দেখ, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট নির্ব্বোধ, বাহাত্তুরে, নিরেট গর্দ্দভ। [নিজের প্রতি] তোমার উচিত দণ্ড হয়েছে। এই রকম একটা ছোঁড়াকে গভর্ণমেণ্ট-অফিসার ব'লে কল্পনা করা! যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। ওই ছোকরা যেখান দিয়ে যাবে, এই গল্প করতে করতে যাবে। তারপর হয়তো কোন কলম-বাজ নাট্যকার এই নিয়ে এক ফার্স লিখে ফেলবে। দেশ-বিদেশের লোক হাসবে। এই কলম-বাজ কালি-ছুঁড়নেওয়ালারা কাউকে খাতির করে না—না ধনীকে, না মানীকে। সবাই হাসবে আর হাততালি দেবে। [দর্শকের প্রতি] দাঁত বের ক'রে এত হাসি কিসের? নিজেদেরও এমন ঘটতে পারে। [মেঝেতে পা ঠুকিয়া] এই সাহিত্যিকদের একবার আমি দেখে নেব। দেখে নেব এই সরস্বতীর দিনমজুর-গুলোকে, দু আনা ক'রে পৃষ্ঠা লিখনে-ওয়ালাদের, ভদ্রলোকের গায়ে কালি-ছুঁড়নে-ওয়ালাগুলোকে। সবগুলোকে ঠেলে আমি যমের বাড়ি পাঠাব। এগুলো না থাকলে অপমানের কথা লোকে দুদিন বাদে ভুলে যেত! এগুলোই যত···এগুলোই যত···আবার হাসি! [মেঝেতে পা ঠুকিয়া, বক্ষে করাঘাত। কিছুক্ষণ পরে] নাঃ কিছুতেই এ অপমান ভুলতে পারছি না। এমন ভুল কেমন ক'রে হ'ল? ওই ছোঁড়াটার মধ্যে কি ছিল, যাতে তাকে গভর্ণমেণ্ট-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে করলাম? হঠাৎ কি হ'ল, সকলেই 'ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর' ব'লে রব তুললে? কে প্রথম এ রব তুললে? কে?

দাতব্য-কর্ত্তা। বাস্তবিক, কেমন ক'রে সকলের যে একই ভুল হ'ল, তা বুঝতে পারছি না!

জজ। বাস্তবিক, প্রথমে কে রব তুললে? এই যে, এঁরাই প্রথমে এই সংবাদ এনেছিলেন। [ঘনরাম ও বলরাম বাবুকে দেখাইয়া]।

বলরাম। কখ্‌খনও আমি নই।

ঘনরাম। আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।

দাতব্য-কর্ত্তা। আপনারাই প্রথমে এই রব তুলেছিলেন।

হেডমাস্টার। আমার বেশ মনে আছে, এঁরা দুজনেই প্রথমে ছুটতে ছুটতে এসে বললেন—তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন, হোটেলে আছেন, অথচ বিল শোধ করছেন না। খুব লোক চিনেছিলেন বটে!

ম্যাজিস্ট্রেট। ঠিক ঠিক, এঁদেরই কীর্ত্তি। হতভাগা গুজবদার সব।

দাতব্য-কর্ত্তা। গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টরের গল্পও এঁদের রটানো।

ম্যাজিস্ট্রেট। গুজব রটিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই আপনাদের? —আপনারা দুজনে শয়তানের ডুগি-তবলা।

জজ। কেচ্ছা-কাহিনীর ঝাড়ুদার।

হেডমাস্টার। জোড়া গাধা।

দাতব্য-কর্ত্তা। টুপি-পরা জোড়া ভোঁদড়। [সকলে তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

বলরাম। সত্যি বলছি, আমি নই, ঘনরামবাবুই প্রথমে—

ঘনরাম। কি বলছ বলরাম? তুমিই তো প্রথমে—

বলরাম। তুমিই প্রথমে—

ঘনরাম। তুমিই—

(এমন সময়ে ইউনিফর্ম-পরা একজন আরদালী প্রবেশ করিল)

আরদালী। কলকাতা থেকে গভর্মেণ্টের হুকুম নিয়ে যে ইন্সপেক্টর এসে পৌচেছেন, তিনি আপনাদের সেলাম জানিয়েছেন। তিনি ডাকবাংলোতে আছেন।

(এই সংবাদে সবের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল। যে যেমন বসিয়া ছিল তেমনই রহিল, যেন সব পাথরে তৈয়ারি মূর্ত্তি। এমন কি ভয় পাইবার শক্তিও যেন তাহাদের লোপ পাইয়াছে। ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দ্বার দিয়া হাসিমুখে রমলার প্রবেশ। বনমালা ও কমলা এমনই পাথর হইয়া গিয়াছে যে, রমলার হাসিমুখ দেখিয়াও রাগিতে ভুলিয়া গেল। মিনিট-খানেক এই ভাবে পাষাণ-সংঘ থাকিবার পরে যবনিকা পড়িয়া গেল)

সমাপ্ত প্র. না. বি.

আগস্ট, ১৯৪২

মহাত্মাজী বললেন, শেষবারের মত বড়লাটের কাছে দুতিয়ালি করব। ব্যর্থ হ'লে অসহযোগের দরকার হবে হয়তো।

কিন্তু দরকার হয় নি কোন কিছুরই। কারাগারে তাঁরা নিস্তব্ধ। কংগ্রেস বে-আইনী।

পান্নালাল মুষড়ে গেছে। যেন কাণ্ডারীহীন নৌকায় ভেসে যাচ্ছে। উমাকে বলে, কি আর করব! খাই-দাই, খবরের কাগজ পড়ি, আর রাজা-উজির মারি লড়ায়ের ম্যাপ দেখে দেখে। খুশি তো এবার?

কিন্তু গোলমাল খবরের কাগজেও। আমেরি সাহেব সগৌরবে বলছেন, চিরকেলে বজ্জাত বাংলা দেশ কেমন ঠাণ্ডা এবারে দেখ!

অনন্ত মাস দুই জেল থেকে বেরিয়েছে। আগুন হয়ে সে বলে, অসহ্য!

চা পরিবেশন করতে এসে উমা দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। অনন্ত তবু বলতে লাগল, কি লজ্জার কথা দাদা! রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দেশ—বাঘেরা নির্বংশ হ'ল নাকি?

পান্নালাল ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক তাই। সুন্দরবনে অতি-সুন্দর ধানের আবাদ হচ্ছে। যেখানে বাঘ ডাকত, চাষারা সেখানে লাঙল ঠেলে।

তাড়াতাড়ি উমা রেডিও খুলে দিলে। গানের গোলমালে এই সব বেয়াড়া কথার অবসান হোক। কিন্তু কপাল মন্দ, গান সে সময়টা নেই। রেডিওরও ওই এক খবর—সুশীল সুবাধ্য ভক্তিমান বাংলা দেশ। মিঃ আমেরি টিটকারি দিয়ে বলছেন—

অনন্ত উঠে এসে রেডিওর চাবি বন্ধ করলে।

অসহ্য দাদা, পাগল হয়ে যাবার শামিল।

পান্নালাল সায় দিলে, ঠিক।

উমার প্রদীপ্ত চোখ দুটি অনন্তর মুখের উপর পড়ল। পান্নালাল বলে, এমনিতেই মানুষ এত কথা বলে যে টেঁকা মুশকিল। তার ওপর আবার এক-একটা কথা এই রকম যদি লাখ বার হুক্কানোর বন্দোবস্ত হয়, উপায় কি পাগল না হয়ে?

অনন্ত বলে, আর কথাটাও ভাবুন দিকি! পরশুরাম একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তবু জড় মারতে পারেন নি। এরা এমন বাহাদুর যে, দু-চার মাস জেল কি দু-দশ ঘা বেতের বাড়ি দিয়ে ঠাণ্ডা করবে চারিদিক!

উমা টিপ্পনী কেটে বলে, বাহাদুর সত্যিই। পরশুরাম শুধু ডান হাতেই কুড়ুল চালিয়েছিলেন, তাই পেরে ওঠেন নি। সব্যসাচী এরা, ডান হাত বাঁ হাত সমানে চালাচ্ছে। জেল, জরিমানা, অথবা মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট, প্রকাশ্য ও গোপন চাকরি—

চারিদিকে নানা গুজব, ছাপানো ও সাইক্লোষ্টাইল-করা নানারকম কাগজ হাতে আসছে, আর উমা বিষম উদ্বিগ্ন হচ্ছে মনে মনে। ভিন্ন জাতের মানুষ এই এরা। চড়কের সময় ঢাকের বাজনা শুনলে সন্ন্যাসীর পিঠ চড়চড় ক'রে ওঠে, এদেরও তেমনি। তার উপর সময় নেই অসময় নেই, অনন্ত 'দাদা' 'দাদা' ক'রে আসছে।

সন্ধ্যার পর একদিন অনন্ত টিপিটিপি এসে উঠল একেবারে তেতলায়। উমা নেই। স্বস্তির শ্বাস ফেলে সে দরজায় খিল এঁটে দিলে। চোখে কালো গগ্‌ল্‌স্; চিনতে পারা যায় না। পুঁটলি থেকে বের করলে চকচকে ছোরা একখানা।

আর ওই টিনের ভিতর কি হে—অত যত্নে কাপড় মুড়ে এনেছ?

অনন্ত বলে, এখন খালি। বাবার মুখে পেট্রোল ভরতি করে দেবে।

একটা যন্ত্র বের ক'রে বলে, দেখে নিন দাদা, তার কাটতে হবে এই রকম ক'রে। টেলিগ্রাফ-লাইন সাবাড় ক'রে তারপরে কাজেষ আরম্ভ কিনা!

শুনেছ? ম্লানমুখে পান্নালাল বলে, আজ দুপুরেই একটাকে মেরে ফেলেছে রাস্তায়।

অনন্ত বলে, কাটছিল না, মেরামত করছিল—ইলেকৃট্রিক কোম্পানির লোক। কারও মাথার ঠিক নেই দাদা, না ওদের, না আমাদের।

উমা এসে খিল-দেওয়া দরজা ঝাঁকাচ্ছে। খুলে দিতে অনন্তর দিকে কটমট ক'রে সে তাকালে।

পান্নালাল বলে, বিশ-পঁচিশটা টাকার দরকার প'ড়ে গেল যে!

কি হবে?

কলকাতায় থাকা যাচ্ছে না।

উমা অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বলে, তাই চল পান্নুদা, আমার সঙ্গে সুপ্রিয়াদের গাঁয়ে। তোমার বিশ্রামের দরকার।

পান্না হেসে উঠে বলে, বিশ্রামের তো তোফা জায়গা রয়েছে ভাই। পাকা বাড়ি, পরের খরচ।

গান্ধীর ছোট্ট একটা ছবি টেবিলে, সত্যাগ্রহে চলেছেন, সেই সময়কার। হিমালয়ের প্রত্যন্ত থেকে বঙ্গের সমুদ্র-বিস্তার অবধি নিখিল মানব-মানসের সত্য ও দুঃখের পথে বিজয়-যাত্রা চলেছে যেন। ছবির দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস পড়ল পান্নালালের। বলে, যেমন ওই ওঁরা হাজারে হাজারে বিশ্রাম করছেন আজকে। জবরদস্তি ক'রে বিশ্রাম করাচ্ছে।

উমা শান্ত হয়ে ওঠে। বলে, শোন পান্নুদা, দরজার শত্রু—হুজুগের সময় নয়। শেষ কথাগুলো ওঁর মনে রেখো।

পুণ্য বৈদিক মন্ত্রের মত পান্নালাল গান্ধীবাণী আবৃত্তি করলে, অহিংসায় স্বাধীনতা যদি না আসে, আমি মরব। আমি মরলে দেশ যেন যে উপায়ে পারে স্বাধীনতার চেষ্টা করে।

অনন্ত বললে, তা গান্ধী তো মারাই গেছেন।

উমা চমকে ওঠে।—বলছ কি?

মরা নয় তো কি! যাকে বলে সিভিল ডেথ।

সহসা ভীষণ হৈ-চৈ উঠল রাস্তায়। অসংখ্য ভারী জুতোর সমবেত ধ্বনি।

পান্নালাল বলে, দিব্যচক্ষে দেখছি, জেলের দুয়োর খুলতে হ'ল ব'লে। বিক্ষুব্ধ কোটি কোটি মানুষকে ঠেকাতে পারে টিয়ার-গ্যাস বা পিস্তলের গুলি নয়—বেঁটে ওই বুড়ো মানুষটি ও তাঁর দলবল।

ট্রামে চলেছে পান্নালাল আর অনন্ত। বড় রাস্তার মোড়ে থামতে জন আষ্টেক উঠল গাড়িতে। বলছে, নামুন তো মশায়েরা। শিগগির নেমে যান, শিগগির।

ট্রলির দড়ি টেনে ধ'রে কেটে দিলে একজন।

দেশলায়ের কাঠি ফুরিয়েছে যে, ও সোনাদা! কণ্ডাক্টরকে হেসে বললে, দাও তো ভাই তোমারটা, সিগারেট ধরাই।

দাউদাউ ক'রে গাড়ির সামনেটা জ'লে উঠল। সারি সারি পিছনে আরও খানদশেক দাঁড়িয়ে গেছে। সমস্ত জালিয়ে দেবে, লঙ্কাকাণ্ড চলবে সমস্ত রাত রাস্তায় রাস্তায়!

ধুলো উড়িয়ে তীরের মত আসে একটা লরি। মানুষ পালাচ্ছে। লরি থামতে না থামতে লাফিয়ে পড়ল লাঠি আর রিভলভারধারী লালমুখ পুলিসেরা। এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে, যাকে পাচ্ছে বেদম পিটাচ্ছে, ছুঁড়ে মারছে হাতের লাঠি।

ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে মাথার উপরে অকস্মাৎ আগুনের গোলা লোফালুফি শুরু হ'ল। বর্মার পাহাড়ে জঙ্গলে যে কাণ্ড চলছে, এই কলকাতার বুকের উপর এ-ও প্রায় তেমনি। বড় বাড়ির দোতলার বারান্দা—কংক্রিটের বেষ্টনী। তারই আড়াল থেকে অগ্নিপিণ্ড একের পর এক এসে পড়ছে অবিরল ধারায়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিসের দল গুলি ছুঁড়ছে, কিন্তু মানুষ দেখা যাচ্ছে না, দেয়ালের বালি খসিয়ে গুলি নিচে পড়ছে।

ফটক গলির মধ্যে, ভিতর থেকে বন্ধ। লাথির উপরে লাথি মারছে—সেকেলে ভারী দরজা একটু নড়ে না। রাস্তার ওপারের পুরানো লোহার দোকান থেকে একটা জয়েষ্ট নিয়ে আসে সাত-আটজনে। তারই আঘাত দিতে দিতে খিল ভেঙে পড়ল।

বারান্দায় কেউ নেই—কা কস্য পরিবেদনা। আধেক ভর্তি কেরোসিনের টিন আর

অজস্র পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি প'ড়ে রয়েছে। আর গোটা কুড়িক ন্যাকড়ার পুঁটলি একদিকে—এক-এক টুকরা দড়ি ঝোলানো তাতে। এই এক নূতন অস্ত্র বের করেছে। একজনে দড়ি ধ'রে পুঁটলি ভেজায় কেরোসিনে, পাশের মানুষ দেশলাই জ্বেলে দেয়, অনল-গোলা অবিরাম নিচে পড়তে থাকে।

প্রহর দেড়েক রাত্রি। পান্নালালেরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল শহরের বাইরে বটতলায়। সবসুদ্ধ বাইশজন হাজির; ভোরের ট্রেনে রওনা হবে। নিরন্ধ্র আঁধার—মুখ দেখা যায় না। ফিসফিস ক'রে তালিম দেওয়া হচ্ছে, কে কোথায় নামবে, আত্মগোপন ক'রে কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে। আঠারোই আগষ্ট—মঙ্গলবার। নিশিরাত্রে চাঁদ ডুবে গেলে ছোট লাইনের সমস্ত ষ্টেশন একসঙ্গে জ্ব'লে উঠবে; পরদিন সকালবেলা লোকে দেখবে ছাইয়ের গাদা।

খুব স্ফূর্তি পান্নালালের। আজকে এই রাত্রেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত সৈন্য যুদ্ধে যাচ্ছে। এরাও যেন তেমনই একটা দল। কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নেই, এক যাত্রায় চলেছে মৃত্যু-আকীর্ণ রাস্তায়।

পান্নালালের হাতে ছোট সুটকেস। তাতে নানারকম জিনিসপত্র—আর আছে গান্ধীজীর ছবিখানা—উমার টেবিল থেকে নিয়ে এসেছে। মনে মনে জপমন্ত্রের মত আবৃত্তি করছে, আঠারোই—রাত্রি যখন ঠিক একটা। কেন চলেছে, পান্নালাল তা জানে না। সে সৈনিক, জানবার গরজ নেই। শুধু এক দুরন্ত ক্ষোভ কালকূটের মত দেহমন আচ্ছন্ন ক'রে আছে। লক্ষ কোটি নরনারীর চিত্তবিজয়ী ষাট বছরের ত্যাগ আর দুঃখ-বরণে মহিমান্বিত কংগ্রেস রাজার আইনমতে আর জীবিত নেই। নির্লোভ নির্মোহ তার নেতৃবৃন্দ—শ্বেত শুদ্ধ খদ্দরে আবৃত-দেহ, আলাপ করতে যাও,—যা বলছ তাতেই হাসি, হাতজোড় করছেন কথায় কথায়, প্রবলের সঙ্গে শক্তি ও বুদ্ধির যখন মারপ্যাঁচ চলছে, তখনও প্রতি কথায় রসিকতা! বন্দী এঁরা চোর-ডাকাতের মত। ভারতের নির্মল আত্মা কঠিন কারাগারে নিপীড়িত।

কলকাতা থেকে অনেক—অনেক দূরে ছোট লাইনের ছোট ষ্টেশনটি। দুখানা আপ আর দুখানা ডাউন—সাকুল্যে এই চারখানা গাড়ি দিনে রাত্রে চলাচল করে। বাকি সময় প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত অবধি বিস্তৃত আশশ্যাওড়া ও ভাঁটের জঙ্গলে মশার গুঞ্জনটুকুও পরিষ্কার শোনা যায়। দিনেও কখন কখন শিয়াল ডেকে ওঠে।

ষ্টেশন-মাষ্টার জয়চন্দ্র সরকারের দশ বছর কাটল এখানে। অন্য লোক এসেই পালাই পালাই করে, তিনি কিন্তু দিব্যি আছেন। পেন্‌শনের আর দু বছর সাত মাস বাকি,

এর মধ্যে আর কোনখানে ঠেলে না দেয়—তালর তালর এই আড়াইটা বছর কেটে গেলে বাঁচেন। স্ত্রী শহরের মেয়ে, অহরহ খিটমিট করছেন; সুবিধা পেলেই বাপের বাড়ি কিংবা মামার বাড়ি ঘুরতে যান, মেয়ে অণিমাও যায় সঙ্গে। কিন্তু জয়চন্দ্রকে নড়ানো যায় না, পয়েন্টস্‌ম্যান পুরন্দর সিং ঘর-গৃহস্থালীর ভার নেয় সেই সময়টা। কোম্পানির পেন্‌শন কিংবা যমরাজের পরোয়ানা ছাড়া কেউ তাঁকে নড়াতে পারবে না এ জায়গা থেকে।

দুপুরের গাড়িতে ধবধবে পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক নামলেন। দেখতে পেয়ে জয়চন্দ্র ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁকে অফিস-ঘরে বসালেন। অণিমা জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ির সাড়া পেলে সে জানলায় এসে দাঁড়ায়। হাসিখুশি মেয়েটা, কিন্তু ভদ্রলোক দেখে মুখ অন্ধকার হ'ল, স'রে এল তাড়াতাড়ি জানলা থেকে।

এবং যা ভাবছিল—জয়চন্দ্র এসে স্ত্রীকে ডাকলেন, শুনছ ?

এর পরের ব্যাপারও মুখস্থ অণিমার। খবর যাবে ছোটবাবুর বাসায়। ছোটবাবুর বউ এসে পড়বেন, তাকে নিয়ে প্রাণপণে ঘষামাজা লেগে যাবে। কালো রঙে একটু চিকণ আভা ধরানোর চেষ্টা।

কিন্তু গিন্নির আজ মেজাজ খারাপ। তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ভাত চাপাতে হবে তো ? পারব না, যা করবার কর। এত বলছি, রেণুপদ আসব আসব করছে, মচ্ছব থামাও এখন কয়েকটা দিন।

অনুচ্চকণ্ঠে জয়চন্দ্র বলেন, ইনি তা নন গো।

আরও আগুন হয়ে গিন্নি বলেন, সকলে যা, উনিও তাই। বোকা পেয়ে গেছে তোমাকে। পথ-চলতি মানুষ ষ্টেশনে নামে, মেয়ে দেখার ছুতো ক'রে ভালমন্দ খেয়ে স'রে পড়ে।

আর কথা না বাড়িয়ে জয়চন্দ্র স'রে পড়লেন। গিন্নিও গজর-গজর করতে করতে সরু চাল বের করলেন এ হাঁড়ি ও হাঁড়ি হাতড়ে।

কুটুম্বটি কোয়ার্টারেই এলেন না। ষ্টেশনে ভাত গেল, পুরন্দর সিং দিয়ে এল। মেয়ের বাপ হয়ে জয়চন্দ্র যেন বুকর্কর গরুড়পক্ষী হয়ে আছেন; ছেলেওয়ালারা এসে যা বলবে, তাতেই রাজি। খবর শুনে কাজের কাঁকে ছোটবাবুর বউও একবার এসেছেন, গালে হাত দিয়ে তিনি বলেন, মেয়েটাকেও সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অফিস-ঘরে ? ওমা, কি ঘেন্না!

খাওয়াটা গুরুতর হ'ল। কুটুম্ব এসে এইটে উপরি লাভ। জয়চন্দ্র গড়াচ্ছেন। অণিমা টিপিটিপি এসে বাপের পাকাচুল তুলতে বসল।

সহসা অণি কাতর কণ্ঠে ব'লে ওঠে, আমি পারি না বাবা, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি—আর আমায় টানাটানি ক'রো না।

চমকে ঘাড় তুলে তাকালেন জয়চন্দ্র। মেয়ের দু চোখে জল টলটল্ করছে।

কি বলছিস ?

অণিমা বলে, গুরুঠাকুরের মত এত খাতির-যত্ন কর, সবাই তো মুখ বেঁকিয়ে চ'লে যায়। রাস্তার লোক ডেকে ডেকে এত অপমান কেন সহ্য কর ? আমায় দুটো পেটে খেতে দাও ব'লে ?

জয়চন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠে বসলেন। এই দেখ কাণ্ড !

মেয়ের চোখ মুছে দিলেন কোঁচার কাপড়ে। তবু কাঁদে। বিব্রত হয়ে বলেন, সে সব কিছু নয়—তোকে দেখতে আসে নি। মানুষ এলেই মায়ে-বেটীতে তোরা আঁতকে উঠবি ?

বিশ্বাস করছে না দেখে বললেন, আজ রাত্রে বিষম কাণ্ড হবে এই ষ্টেশনে।

গলা খাটো ক'রে বলতে লাগলেন, খবরদার, খবরদার ! কেউ জানতে না পারে, তা হ'লে চাকরি থাকবে না। ষ্টেশন জ্বালিয়ে দেবে স্বদেশিরা, লাইন ওপ্ড়াবে।

চোখের জলের উপর রামধনু ঝিকমিক ক'রে উঠল অণিমার মুখে। ছোটবাবু খবরের কাগজ রাখেন, তাঁদের পড়া হয়ে গেলে বিকেলবেলা সেটা নিয়ে এসে প্রতিটি ছত্র সে যেন গোগ্রাসে গেলে। আইন বাঁচিয়ে এবং নিজেদের ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা আখের বাঁচিয়ে যা লেখে কাগজওয়ালারা, তার ভিতর দিয়েও এতদূরে অণিমা দেশের দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পায়। এল বুঝি এতদিনে ভাটপাড়াওড়ায় আচ্ছন্ন ষ্টেশনে, পানা-ভরা নিঃস্রোত ভৈরবের ধারে দুর্মদ সৈনিক-দল—স্বাধীনতার স্বপ্ন অনারোগ্য ব্যাধি হয়েছে যাদের ! লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চলার মত নির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা জীবন। লাইন ওলটাতে আসছে—অণিমার মন কেমন নেচে ওঠে, লাইন-বাঁধা জীবনটাও উলটে যাবে বুঝি আজকে রাত্রির অন্ধকারে !

ছুটে সে জানলায় গেল, অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে ষ্টেশনের মানুষটিকে। ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন, ফরসা জামার হাতা আর মাথার খানিকটা মাত্র দেখা যাচ্ছে।

বেশ মানুষ তুমি বাবা। ষ্টেশনে রেখে এলে, নিয়ে এলে কি হ'ত ? আনবে তো বিকেলবেলা ? আলো থাকতে থাকতে এনো, ভাল ক'রে দেখব।

কাছে এসে দেখে, জবাব দেবেন কি—জয়চন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আকাশ মেঘে থমথম করছে। ষ্টেশন নির্জন। পুরন্দর সিং অবধি ওজন-কলের

পাশে চট পেতে প'ড়ে আছে। কেউ দেখতে পাবে না, একটি বার সে শুধু দেখে আসবে তাঁকে।

একিন্তু ভদ্রলোকই অণিমাকে দেখে ফেললেন।

এস, এস মা। খবর কি? ভাল আছ?

অপ্রতিভ অণিমা তাড়াতাড়ি বললে, ঘুম ভেঙেছে কি না দেখতে এলাম কাকাবাবু। ডাব কেটে আনিগে যাই।

আসতে আসতে ভাবে, এই রকম পোশাকে এসেছেন! বেল্টে আঁটা রিভলভারটা খপখপে ওই আদ্দির পাঞ্জাবির নিচে?

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। প্ল্যাট্‌ফর্মে আলো মাত্র একটি। তিনটি জ্বালাবার কথা, খোটের উপর জ্বলছেও তাই। একটি এখানে, আর দুটো জয়চন্দ্র আর ছোটবাবুর কোয়ার্টারে। পুরন্দর সিং কেরোসিন নিয়ে রোজ হ্যারিকেন ভর্তি ক'রে দিয়ে আসে।

অণিমা জিজ্ঞাসা করলে, কি করছেন রে এখন কাকাবাবু?

পুরন্দর বলে, চুল বাগাচ্ছেন হাত-চিরুনি দিয়ে, দেখে এলাম।

ঘণ্টা বাজল। অনেক দূরে অস্পষ্ট গুমগুম আওয়াজ। ডিবা হাতে অণিমা এসে অফিস-ঘরে ঢুকল।

কাকাবাবু, পান।

গাড়ি আসার সময়টায় এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েকে দেখে জয়চন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন, আঁধারে লাইন পার হয়ে এলি, পুরন্দর সিংকে দিয়ে পাঠালেই হ'ত।

অণিমা বলে, রেণুদা আসছেন যে এই গাড়িতে। তুমি বেরিয়ে আসার পর চিঠি এল।

আসছে নাকি? উল্লাসে প্রায় আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটল জয়চন্দ্রের মুখে। আগন্তুকের কাছে পরিচয় দিতে লাগলেন, এর নমাসীর ভাগুরের ছেলে রেণুপদ—এম. এ. পড়ে। মাসতুতো বোনের বিয়েতে গিয়ে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। বড্ড ভাল ছেলে—বাড়ির ওদেরও খুব পছন্দ। এসেছিস, ভাল হয়েছে খুকী, আমি তো চিনি নে।

গাড়ি এল চারিদিক কাঁপিয়ে। আবছা অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। অণিমা পাগলের মত ইঞ্জিন থেকে শেষ গাড়ি অবধি ছুটছে। ছোট্ট স্টেশন—যারা ওঠা-নামা করে, তারা প্রায় সবাই আশপাশের দু-তিনখানা গ্রামের। সকলের মুখ চেনা। এই রাত্রে বর্ষার জল-জঙ্গল ভরা গ্রামে কাদা-জোঁক আর কেউটে সাপের মধ্যে নূতন কেউ আসছে না, নিতান্ত যাদের কাঁধে ভূত চেপে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সেইরকম মানুষ ছাড়া।

পান্নালাল নামল। নেমে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সাব্যস্ত ক'রে ফেললে, কোন্ দিক দিয়ে বেরুনো সুবিধা।

পিছন থেকে হাতে টান আর উচ্ছ্বসিত হাসি।

এই যে রেণুদা, হাঁ ক'রে দেখছেন কি?

সুট্‌কেসের দিকে নজর পড়তে অণিমা সেটা ছিনিয়ে নেয়।

কি ওতে—কাপড়চোপড়? দিন আমাকে, আমি নিয়ে যাচ্ছি। থাক থাক, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে না। চলুন।

এক হাতে সুট্‌কেস ঝোলানো, আর এক হাত দিয়ে যেন সে পান্নালালকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলল। এমন বিপাকে পান্নালাল কখনও পড়ে নি। গেটের দিকে গেল না, নিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে।

ওই যে আমাদের বাসা। গুমটির ওখান থেকে গুঁড়ি মেরে তার পেরুতে হবে। সত্যি রেণুদা, ভাবতেই পারি নি, আপনি আসবেন এই জংলী পাড়াগাঁয়ে!

নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত গা ঘেঁষে চলেছে। হঠাৎ সামনে অণিমার কাকাবাবুটি। যেন সমস্ত দৃষ্টি পুঞ্জিত ক'রে তাদের দিকে তাকাচ্ছেন। অন্ধকারে উজ্জ্বল হিংস্র চোখ দুটি। কাছাকাছি গিয়ে অণিমা বললে, আমাদের কাকাবাবু। বড্ড ভালমানুষ আর বড্ড ভালবাসেন সকলকে। দাঁড়াবেন না রেণুদা, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসে তারপরে আলাপ-টালাপ করবেন।

পান্নালাল যুক্তকরে ভদ্রলোককে নমস্কার ক'রে অণিমার সঙ্গে চলল।

প্লাট্‌ফর্মের শেষে ঢালু জমি, এক-পেয়ে পথ। লাইনের তার ডিঙিয়ে শাপলা-ভরা বিলের কাছে অণিমা থমকে দাঁড়ায়।

আপনার নাম রেণুপদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. পড়েন। বুঝলেন তো?

মুগ্ধচোখে চেয়ে পান্নালাল বললে, বুঝেছি। হাওয়া খেতে এসেছি আপনাদের এখানে, কেমন?

এমন অবজ্ঞার মৃদু হাসির আভা খেলে গেল অণিমার মুখে। বলে, শুধুই হাওয়া খেতে নয় অবিশ্যি। সে থাকগে। খাওয়া হয় নি নিশ্চয়? চলুন। যাকে কাকাবাবু আর ভালমানুষ বললাম, ভালমানুষ উনি মোটেই নন। পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর—পীরনগরের পথে খুব আসা-যাওয়া আছে এখানে। আজ সকাল থেকে জাল পেতে ব'সে আছেন।

পান্নালাল দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, তা হ'লে নাই বা গেলাম আপনাদের বাসায়। অসুবিধা কিছু আছে সুট্‌কেসে। ওতেই চলবে। দুঃখিত হলেন?

অণিমা সুট্‌কেসটা নিঃশব্দে তার হাতে তুলে দিলে।

পালান, ওইদিক দিয়ে অমনই মাঠ ভেঙে। ছুটে চ'লে যান।

মেয়েটিকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে পান্নালাল দ্রুতপদে চলল। আর কোনদিন জীবনে দেখা হবে না। মুখ ফিরিয়ে একবার বললে, নমস্কার।

মাঠ পেরিয়ে দূরবিস্তৃত খেজুর-বনের আড়ালে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে পা কাঁপছে অণিমার। পুলিস-লোকটার সন্দেহ হয়ে থাকে যদি? রেণুপদর সম্পর্কে যদি তদন্ত করতে আসে কোয়ার্টারে? তাকে ধরবে, বাপের চাকরি-সুদ্ধ টান প'ড়ে যাবে, 'কাকাবাবু' ব'লে ত্রাণ পাওয়া যাবে না। নিপাট ভালমানুষ তার বাবা, বাংলা দেশের ছা-পোষা ভদ্রলোকেরা যেমন হয়।

কি হচ্ছে ওদিকে, আশাভগ্ন ইন্‌স্পেক্টর কি করছে—একটু না দেখে বাসায় ফিরতে পারে না। গাড়ি চ'লে গেছে, ষ্টেশন আবার চুপচাপ। বৃষ্টি এসেছে? ওয়েটিং-রুমের পিছনে বকুলগাছের নিচে ভিজতে ভিজতে অণিমা দেখতে লাগল। না, খাঁচা ভর্তি ওদের। একটা কোথায় স'রে পড়েছে, অতি আনন্দে সে খেয়াল নেই। তারপর মেলা ওয়েটিং-রুমে। স্বাস্থ্যবান হাসিমুখ ছেলেগুলি, কোমরে মোটা মোটা দড়ি বাঁধা। অনাহারে শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল উড়ছে, চোখের দৃষ্টিতে তবু বিদ্যুতের আলো। খবরের কাগজে যুদ্ধবন্দীদের ছবি দেখে থাকে, সেই রকম যেন কতকটা।

অনন্তও এদের মধ্যে। অণিমা তাকে চেনে না, কাউকেই সে চেনে না। দলের মধ্যে থেকেও ছেলেটি যেন তবু দলছাড়া।

দিন তো আর একটা সিগারেট।

ইন্‌স্পেক্টর তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেস এগিয়ে ধরে। একটা তুলে নিয়ে বিজয়ীর মত অনন্ত ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে অণিমার মনে। রেণুপদ সত্যিই যদি আসে, বিয়ে হয়ে যায়—স্বর্গ হাতে পাবেন তার গরিব বাবা-মা। সুন্দর পাত্র, ভাল অবস্থা, এম. এ. পড়ছে কলকাতায় হষ্টেলে থেকে, বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে তপস্যা করছে এমন বরের জন্য। কুশ্রী মেয়েটা কিন্তু আরও বেশি চায়। যাকে রেণুপদ বলে ডাকল, সত্যি সত্যি যদি এইরকম হ'ত তার রেণুদা। কপালের ঘামের মত জীবন থেকে সুখ-দুঃখ যারা মুছে ফেলেছে, দুটো দিন শান্তিতে ঘরে থাকবার জো নেই, যুদ্ধের সৈনিক—প্রিয়তমার মুখে হেসে কথা বলবার সময় কখন?

পান্নালাল ছুটছে, ছুটে পালাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে অণিমার কথা। কুরূপা কিন্তু চোখ দুটো ভারি উজ্জ্বল। খনির মধ্যে হঠাৎ-দেখা একজোড়া দামী হীরের মত, অন্ধকারের মধ্যে চোখের আলো ছড়িয়ে সাবধান ক'রে দিচ্ছে—

পালান—ছুটে চ'লে যান।

ক্লান্ত পান্নালাল এক পুকুর-ঘাটে জিরিয়ে নিচ্ছে। শান্তিতে বসা যায় না, কানের কাছে সমুদ্যত চাবুকের মত কালো মেয়েটার কণ্ঠ, পালান।

সুটকেসটা খুললে। রুটিখানা চিবিয়ে নেওয়া যাক। খেতে খেতে সে গান্ধীজীর ছবিখানা দেখে। তপঃকৃশ একখানি শান্ত মুখ—দূর-দূরান্তর পুণ্যনগরে আগাখাঁর প্রাসাদ-কারা থেকে মমতা-মাখা চোখে যেন চেয়ে আছেন। পান্নালালের দু চোখ অকস্মাৎ জলে ভ'রে যায়। মনে মনে বলতে থাকে, পথ আমাদের অন্ধকার, আলো দেখতে পাচ্ছি নে। কিছু বুঝতে পারছি নে। কি করব আমরা? কোন্ পথে চলব?

যখন পনরো-ষোল বছর বয়স, লাঠির বাড়ি আর কারাগারে সে জীবন শুরু করেছে। সামনে অনির্বাণ স্বাধীনতার শিখা, পথের দিকে দেখে নি তাকিয়ে। যখন জেলে থেকেছে, দু-চার মাস তখনই যা একটু অবসর। আজ সন্দেহ হচ্ছে, ব্রতভ্রষ্ট হ'ল কি এতকাল পরে? গ্রামোপান্তে ভাঙা ঘাটের উপর বিভ্রান্তের মত সে ব'সে রইল।

শ্রীমনোজ বসু

সংবাদ-সাহিত্য

তেরো শ পঞ্চাশের অন্নঘটিত মন্বন্তরলব্ধ অর্ধকোটি বাঙালীর অকালমৃত্যুর বিনিময়ে জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা আমাদিগকে কি কি দিয়াছেন—তাহারই একটা ফিরিস্তি মনে মনে প্রস্তুত করিতেছিলাম। কারণ তেরো শ বাহান্নর বস্ত্রঘটিত আসন্ন মন্বন্তরের ফলে আরও কিছু বিনিময় ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পূর্ব ফিরিস্তি লইয়া আগে হইতে প্রস্তুত থাকিতে পারিলে আমাদের ঠকিবার সম্ভাবনা কম। দুর্গতদের দুর্গতিনিবারণী রিলিফ ফণ্ডের দুর্গে যাঁহারা সুকৌশলে আত্মগোপন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের তালিকার ভিতর পড়িবেন না, যাঁহারা সরকারী সতর্কতার ফাঁদে পড়িয়া মামলায় ঝুলিতেছেন তাঁহারাও আমাদের ফিরিস্তি-বহির্ভূত থাকিবেন, ইস্পাহানী প্রমুখ যে সকল সহৃদয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ন্যায্যলাভে চাউলাদি বিক্রয় করিয়া মাত্র কয়েক কোটি টাকার মুনাফা করিয়া দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমরা হিসাবের মধ্যে ধরিব না, কারণ আর্থিক ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিবার মত পারমার্থিক শিক্ষা আমাদের আছে। মৃত্যুর বিনিময়ে যে যে অমৃত আমরা লাভ করিয়াছি, ক্ষয়শীল জীবন উৎসর্গ করিয়া যে অক্ষয় সম্পদ আমরা অর্জন করিয়াছি, সেইগুলির কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। সে অমৃত আমরা লাভ করিয়াছি সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়া। পাঁচখানি উপন্যাস, দুইখানি

নাটক, এক শ তেরোটি গল্প, দুই হাজার সাত শ বিয়াল্লিশটি কবিতা এবং তিন শ বাইশ-খানি ছবি—অর্ধকোটি প্রাণের মূল্য হিসাবে নিতান্ত কম নয়। মৃত্যুর দুস্তর সমুদ্রে অমৃতত্বের এই যে কোকনদগুলি বিকসিত হইল, একদা মৃত্যুর সমুদ্র যখন শুকাইয়া সাহারা হইয়া যাইবে সেদিনও এইগুলি মরুভূমির মধ্যে স্থলপদ্মের মত ফুটিয়া থাকিয়া অতীতের স্মৃতি বহন করিবে। বাংলা দেশের চিহ্নও হয়তো ইতিহাস বা ভূগোলের পৃষ্ঠায় থাকিবে না, কিন্তু মরমী কবির টাকার চারখানি কবিতা, অথবা দরদী নৃত্যশিল্পীর "ক্ষুধায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল" নৃত্য সেই অনাগত ভবিষ্যতে নূতন গণমনের বিস্ময় উৎপাদন করিবে, ইণ্ডিয়া রসাতলে গেলেও তাহার "স্পিরিট" মৌতাতী জনের নেশা জমাইতে কসুর করিবে না।

• • • •

এইরূপই হয়। স্বর্ণলঙ্কা এবং এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি সমেত বিলকুল ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া দশমুণ্ড বিশহস্ত রাবণ কবি বাল্মীকির কৃপায় মহাকালের বক্ষে রামায়ণ হইয়া ফুটিয়া আছে। আমরাও থাকিব। তেরো শ পঞ্চাশের মন্বন্তর ছানিয়া কবি ঔপন্যাসিক ও শিল্পীরা অমৃত তুলিয়াছেন, তেরো শ বাহান্নের বস্ত্র-সঙ্কটও বৃথা যাইবে না। গণশিল্পীরা পেন্সিল-তুলি শানাইতেছেন—সময়ের সাদা পর্দায় আমাদের অমৃতায়ন কল্পনাচক্ষে এখনই দেখিতে পাইতেছি; কালো, মোটা, বেঁটে, লম্বা, রোগা, লিকলিকে, ভুঁড়িওয়ালা, ভুঁড়িহীন, শীর্ণা ও নিবিড়নিতম্বা পুরুষ নারীর দিগম্বর মিছিল—ভবিষ্যৎ মানবের দৃষ্টিক্ষুধার কি পরিপূর্ণ ভোজ! ডুমুরপত্রেরও আবরণ নাই, মরি মরি শোভা—

গোপালদা প্রবেশ করিলেন। "এক অপূর্ব দৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাধারী মহাপুরুষে"র বেশ, হাতে কমণ্ডলু। ঠিক 'আনন্দমঠে'র শেষ দুই অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসকের মত; একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিলেন, বৎস, আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।

আমি সত্যানন্দ নহি, সুতরাং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। গোপালদা কমণ্ডলু হইতে খানিকটা জল লইয়া আমার মুখে ছিটাইয়া দিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ তুলিয়া দাও, উহাতে আর প্রয়োজন নাই। তোমাদের সাহায্য ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষ অচিরাৎ স্বাধীন হইবে।

রহস্যটা কোন্ দিকে গড়াইতেছে, ঠাহর করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। গোপালদা গলায় বজ্রনির্ঘোষ আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, আমি ঠিকই বলিতেছি। এগারো শ ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তরের পরের অবস্থা স্মরণ কর। তখন বুঝিয়াছিলাম, এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত,

লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। তাই ইংরেজকে রাজা করিয়াছিলাম।' ইংরেজী-শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্বকে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে, ইহা জানিতাম। আমার সে ধারণা আজ সার্থক হইয়াছে। তোমরা বহিস্তত্বে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছ।

আশ্চর্য, গোপালদা কি হিপ্‌নটিজ্‌ম জানেন? তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ আমার বোধ হইল, আমিই সত্যানন্দ।' বলিলাম, প্রভু—

গোপালদা হাসিলেন, বলিলেন, বল বৎস।

কিছু বলিতে পারিলাম না, ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

গোপালদা বলিলেন, বৎস, অবিশ্বাসী হইও না। প্রমাণ চাও? দিব।

গোপালদা কমণ্ডলু হইতে আবার জল লইয়া আমার মুখে ছিটাইলেন। অকস্মাৎ আমার মাথা কেমন ঘুরিয়া গেল। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতেই অনুভব হইল, আমি বৃত্তমহল প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া আছি। আমার বাম পার্শ্বে আকলেজ-সুহৃদ্ গোপাল হালদার; দক্ষিণে বন্ধু বলাই অর্থাৎ বনফুল, ষ্টেটসম্যান-সম্পাদকের সহিত ঘনিষ্ঠ বাক্যালাপরত পি. সি. যোশী ও গ্লোব নিউজ এজেন্সীর আমেরিকান কার্যাধ্যক্ষের পাশে সত্যেন মজুমদারকেও দেখিলাম। সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের পাটাতনে নাচ চলিতেছে, অন্ধ্র দেশের ধোবারা সোভিয়েট লাল-বাহিনীর বিজয়ে উদ্দাম উল্লাস-নৃত্য করিতেছে। সে কি উন্মাদনা! আমার মাথা আবার ঘুরিয়া গেল, বোধ হইল, ধোবাদের আনন্দোৎসবে গাধারাও যোগ দিয়াছে। সমবেতকণ্ঠে ঐক্যতান-সঙ্গীত রুশবিজয়কে মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে।

কমণ্ডলু-জলস্পর্শে আত্মস্থ হইতেই গোপালদা বলিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় একবার ইংরেজের বহিস্তত্ত্ব শিক্ষার সামান্য একটু পরিচয় পাইয়া প্রসন্ন হইয়াছিলাম। ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মনস্বী রামমোহন রায়ই মাত্র সেদিন দীর্ঘদিনের জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগিয়াছিলেন, স্পেন দেশে স্বাধীন নিয়মতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্তনে আনন্দোৎফুল্ল রামমোহন কলিকাতার টাউনহলে ভোজ দিয়াছিলেন। সেদিন একা রামমোহন, আর আজ? দেখিলে না বৎস, মাদ্রাজী ধোবীরা সুদূর রুশের বিজয়ে কি কাণ্ডটাই না করিল! এ নৃত্যগীত তাহাদিগকে শিখাইয়াছে অন্ধ্রদেশের কৃষাণকর্মীরা। বোঝ, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বহিস্তত্ত্বের শিক্ষা আজ সমাপ্তপ্রায়।'

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইংরেজ?

গোপালদা নির্ভয় দিয়া বলিলেন, সেদিন ইংরেজ বণিক ছিল, অর্থ সংগ্রহেই তাহার মন ছিল; রাজ্যশাসনের ভার সে লইতে চাহে নাই। মন্বন্তরের পর তোমাদের বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইয়াছিল, কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইত না। আজ তেরো শ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর রাজা আবার বণিকবৃত্তি ধরিয়াছে, সস্তায় চাউল-আটা খরিদ করিয়া অধিক মূল্যে প্রজার নিকট বেচিয়া

তাহারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। তেমো শ যাহাদের বস্ত্রসঙ্কটেও যে তাহারা যান্তচেষ্টারের বিলুপ্ত-প্রায় বস্ত্রব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করিবে, তাহার আভাস পাইতেছি। শাসক-জাবার বণিকবৃত্তি ধরিয়াছেন, সুতরাং তোমাদের আত্মনিগ্রহকারী আন্দোলনের আর কোনই প্রয়োজন নাই। বহিস্তত্বে যাহারা চূড়ান্ত শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদেরই থাকিতে দাও বৎস, আইস আমরা চলিয়া যাই।

আমার কণ্ঠে, আমার অজ্ঞাতসারে ধ্বনিত হইল, কিন্তু প্রভু, আমরা যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, তাহা পালন করিব না?

—বৎস, তাহার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস-লীগ এক হইতেছে, আজ ইংরেজের যুদ্ধ তোমাদের জনযুদ্ধ। দেখিতেছ না যুদ্ধজয়ে এ-দেশের কামার-কুমার-চাষা-ধোপারাও নাচিতেছে! বলিতে বলিতে গোপালদা আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি মূঢ়ের মত তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আর লেখা হইল না। বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

—

"তৃতীয় বার্ষিক ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে"র নিমন্ত্রণ-পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি: "আজ আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সম্মিলিত হ'য়ে জনসাধারণকে নতুন আশায় ও নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়োজন যে কত বড়, তা বিস্তারিত-ভাবে বলা বাহুল্য। গত তিন বছর ধ'রে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আমাদের এই দেশ ছারখার হয়েছে; বিপদ এখনও কাটে নি। বিপদকে প্রতিরোধ করবার এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজীবনের সৌধ গড়ে তুলবার কাজে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব কারো চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশি। কারণ তাঁরাই দেখিয়ে দিতে পারেন, বাঁচবার কী উপকরণ দেশবাসীর মধ্যে রয়েছে এবং বাঁচবার পথে তাঁরাই সর্বসাধারণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করবার ক্ষমতা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের হাতে। সেই পুনরুজ্জীবনই বর্তমান সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

উদ্দেশ্য অর্থাৎ থিওরি চমৎকার। কাহারও কিছু বলিবার নাই। এবার কার্য অর্থাৎ প্র্যাকটিসে কিরূপ দাঁড়াইতেছে দেখা যাক। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। সচরাচর সভাপতি এবং সম্পাদকেরাই হন সভা বা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিবার মত এই যে, এই কম্যুনিষ্টশাসিত প্রতিষ্ঠানেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য—অব্রাহ্মণ-নহ-ভূমিরা অর্থাৎ সুধী প্রধানেরা এখনও প্রধান হইবার সুযোগ পাইতেছেন না। অবশ্য এই উক্তি

ঐই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর এবং আমাদের রসিকতায় সামান্য প্রগল্‌ভতামাত্র !] এখন এই প্রাণের আধুনিক চাঞ্চল্য বিচার করা যাক। উক্ত সম্মেলনের সময়েই শৈলজানন্দের একটি সবাক্ ছায়াছবি কলিকাতার কোনও চিত্রগৃহের "রূপালি" পর্দায় মুখর হইয়াছে। ছবিটি আমরা দেখিয়াছি এবং দেখিয়া এত ঘৃণাবোধ করিতেছি যে, নিজেদের সাহিত্যিক বলিয়া প্রচার করিতে লজ্জানুভব করিতেছি। উপরোক্ত নিমন্ত্রণ-পত্রের প্রত্যেকটি পংক্তিকে শৈলজানন্দের গল্প এবং সংলাপ অন্তত দশ-দশবার জুতাপ্রহার করিয়াছে। "সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারে"র ইহাই যদি নমুনা হয়, তাহা হইলে 'চুম্বনে খুন' 'কিসমিস' প্রভৃতি কাসিট শিল্পসৃষ্টি কি দোষ করিল? উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের একবার সভাপতির কীর্তি দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি।

অন্যতম সম্পাদক ন্যাশনাল ফ্রন্টের শিরোভূষণ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণে'র সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন, তিনি কি ভাবে "ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজীবনের সৌধ" গড়িয়া তুলিবার কাজে তৎপর আছেন। মাণিকবাবু-বিবৃত "সুস্থ জনসংস্কৃতির আদর্শে"র কিঞ্চিৎ আধুনিক নমুনা দিতেছি।

—ওমা, সুবলবাবু যে! পেন্নাম।

—এ তোমার কেমন ব্যাভার সুখময়ী?

—তোমারি বা কেমন ব্যাভার সুবলবাবু, দিন দুকুরে নাগাল ধরা?

দুহাতে কানা ধরে কলসীটা সে নামিয়ে রাখল। যে কাঁখে কলসী ছিল তার উল্টো দিকে বেঁকে বেঁকে সোজা করে নিল কোমরটা। অবহেলার সঙ্গে কাঁধে ফেলা ভিজে আঁচলটি নামিয়ে ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে আবার ভালো করে গায়ে জড়াল।

—গোড়ায় তো ডরিয়ে গেলাম, কোন্ মুখপোড়া উঁকি মারছে গো? শেষে দেখি মাসির সুবলবাবু। নিশ্চিন্দি হয়ে তখন সাঁতার কেটে চান করলাম। ফিক্ করে হেসে লজ্জায় মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, তোমার জন্যে। সত্যি তোমার জন্যে—কাল ফিরে যেতে হল তোমায়!

সুবল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, কাল ইতো প্রথম নয়। ফিরেই তো যাচ্ছি। এলে না কেন কাল? রাত দুপুর তক্ শিরীষতলায় মশার কামড় খেলাম। মা মনসা না করুন,—দুহাত জোড়া হয়ে সুবলের কপালে ঠেকে গোক্ষুর সাপের কামড়ে মরব একদিন।

সুখময়ী আপসোসের আওয়াজ করল চকচক, বালাই ষাট। কিন্তু কী করি. তেনা যে ফিরে এল গো!

—একবার জানান দিয়ে তো যেতে পারতে, সবাই ঘুমুলে পর? ঘুরঘুটি আঁধারে একটা মানুষ হাঁ করে—"

—ঘুমিয়ে পড়লাম যে! ওনার সাথে ঝগড়া করে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়লাম।

—ঝগড়া হল? বেশ, বেশ! তা ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?

—সোয়ামির সাথে মেয়েমানষের আবার কী নিয়ে ঝগড়া হয়? শাড়ি গয়না নিয়ে।

সুবল হঠাৎ উত্তেজিত, উৎসুক হয়ে বলল, তুমি যত শাড়ি গয়না চাও—

—ইস্? ফতুর হয়ে যাবেন। ছায়ায় চাপা আলো লেগে সুখময়ীর পান খাওয়া দাঁতের ঘষামাজা অংশগুলিতে ভোঁতা ঝকমকি খেলে গেল।—ফতুর নয় হলে। মোর তরে ফতুর হতেই তো চাইছ তুমি হাজারবার। কিন্তু শাউড়ি সোয়ামি যখন শুধোবে মোকে, অ বউ, শাড়ি গয়না কোথা পেলি লো, কী জবাব দেব শুনি? বলব নাকি, কুড়িয়ে পেইছি গো, ঘাটের পথে কুড়িয়ে পেইছি?"

—কাল নিয়ে চারবার ঠকালে আমায়।

—ওগো মাগো, ঠকালাম! আমি তোমায় ঠকালাম! ভেস্তে গেল তো কী করব আমি? হাত-পা বাঁধা মেয়েলোক বই তো নই! ঘরের বউ, পরের দাসী, কী খ্যামতা মোর আছে বলো? তোমায় ঠকাব, তোমার জন্যে মরণ হয়েছে আমার? কিন্তু ভালো লাগে না সুবলবাবু, একদণ্ড ঘরে মন বসে না। মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি।

আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দ্বিধা-সঙ্কোচের ভঙ্গি করে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বুক দিয়ে সে সুবলকে গাছের সঙ্গে চেপে ধরল, মুখ উঁচু করল, সুবলের মুখের [illegible] পৌছল না।"

* * *

অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিত 'অরণি'র "কথাপ্রসঙ্গে হিটলার-মুসোলিনির ব্যক্তিগত শ্রাদ্ধের সহিত যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা "আমাদের বিমানবন্দরে"র যোগাযোগ নির্ণয় করিতে পারিবেন, তাঁহারাই উপরে উদ্ধৃত পত্রের "বিপদকে প্রতিরোধ করবার" সঠিক আদর্শের সন্ধান পাইবেন। অন্য অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

"কবি অমৃতকুমার দত্ত আমাদের বর্তমান বস্ত্রসমস্যার চমৎকার সমাধান করিয়াছেন। "শকুন্তলাকে" সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"এখন যদি ডাক দি, যদি বলি—এসো।
এসো তোমার আভিজাত্যকে অতিক্রম করে'

শান্তি আর সাম্যর মিথ্যা মোহকে ছেড়ে
ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের আলো-কে অন্ধ করে'
এসো, আমার এই রিক্ত শূন্য হাতে
রাখো তোমার নরম হাত।"

কাগজওয়ালারা যদি শান্তি আর সাম্যর মিথ্যা মোহকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা হয়তো বা কোন্ মুক্তি-সুক্তির মোহ ছাড়িতে পারিব। "তোমার আভিজাত্যকে অতিক্রম করে" হইতেই মানুষ হইতেছে লেখক কোন্ সম্প্রদায়ের। ইহারা যদি একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আসন্ন যৌবিতর বক্সসংকটে সারা বাংলা দেশই মিথ্যা মোহ ছাড়িয়া সরকারকে এবং পুঁজিবাদীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে পারিবে।

—

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ করিতেছেন, তাঁহারা সম্ভবত এ যুগের গণমনের খবর রাখেন না। রাখিলে এতখানি উত্তম প্রকাশ না করিয়া তাঁহারা বিরত হইতেন। গণমন (শ্রী) বলিতেছেন—

"কালধর্মী রবীন্দ্রকাব্য-দর্শন মুখ্যত অনেকগুলি বাদের ঐক্যতান—ভারতীয় অতিপ্রিয়বাদই যার মূল সুর। ওটা আবার ভাববাদী দর্শনের অকৃত্রিম ধারাবাহকও। কিন্তু যে ফিউডাল ও যৌবন-বুর্জোয়া সমাজে ওর কার্যকারিতা সক্রিয় ছিল, সাম্প্রতিক বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার গঙ্গাযাত্রায় তার স্বরূপ গলিতকুষ্ঠের মতন ফেটেফুটে বেরিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ

যৌবন-বুর্জোয়া-র সামাজিক পরিবেশে মন তাঁর দানা বেঁধেছিল। ফিউডাল সমাজের গলিত অংশগুলোর ওপর অস্ত্রোপচার করে শিশু-বুর্জোয়া সমাজ-জীবনে যে নবজাগরণের স্পন্দন এনেছিল তারই প্রাণবন্ত সংগীত রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন, শুনিয়েছিলেন উদাত্তকণ্ঠে। বুর্জোয়ার উদারতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন···কিন্তু সশ্রেণী সমাজে মানুষের শুভবুদ্ধির ভ্রূণহত্যা যে অবশ্যম্ভাবী শেষবয়সে তার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেও দিশাহারা ছিলেন।"

কিটিংছট হইলেও "অতিপরিকার তাব নব আবিকার"। রবীন্দ্রনাথ আর বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে মারা পড়িতেন। স্মৃতিসমিতির কর্মকর্তাদের এ সংবাদ কাজে লাগিতে পারে।

স্মৃতিসমিতি বলিতে মনে পড়িল, গত ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ম্যানিসিপ্যাল গেজেটে' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম "নিখিল-ভারত রবীন্দ্রনাথ-স্মৃতিসমিতি" সম্বন্ধে যাহা

বলিয়াছেন তাহা বিবেচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে নিখিল-ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অপর কোনও বাঙালী এই কমিটিতে থাকিলে কাজ সহজে সিদ্ধ হইত। কমিটির গঠন সম্পর্কেও শ্রীযুক্ত ঘোষের মত আমরা সমর্থন করি। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এফ. আর. এস., শ্রীযুক্ত অমল হোম ও শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লইলে কমিটির গৌরব বৃদ্ধি হইত। শ্রীযুক্ত হোম নানাভাবে রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে যে যেরূপ পরিশ্রম ও সহায়তা করিয়াছেন—তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সমিতি সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। আর এক কথা, এই ঘোরতর সন্দেহবাদীদের দেশে একই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে জেনারেল সেক্রেটারি করিয়া অন্যতম ডিরেক্টরকে অডিটার নিযুক্ত করিয়া কর্মকর্তারা ভাল করেন নাই। আশা করি, কমিটি কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিবেন।

—

কাপড়ের বাজারে যে ভাবে আগুন লাগিয়াছে, এখন ঢাকেশ্বরী মিলের মত প্রতিষ্ঠাপন্ন বাঙালী-পরিচালিত মিলের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অব্যবস্থার কথা উঠিলে দেশের সমূহ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানা গুরুতর অভিযোগ আমাদের কানে আসিয়াছে, শুনিতেছি অংশীদারদের তরফ হইতে একটি মামলাও দায়ের করা হইয়াছে। এই অবস্থায় মিলের কর্তৃপক্ষের উচিত প্রকাশ্যভাবে সকল অভিযোগ খণ্ডন করা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দ সমস্ত দেশের ভালমন্দের সহিত জড়িত বলিয়া এই মন্তব্য করিতে বাধ্য হইলাম।

—

গোপালদার ডাইরি হইতে—

"এ যুগের জনযুদ্ধ ঘটিতেছে দুটি বস্তু লাগি—
দুটি পুরাতন বস্তু—এক ধন, আর অধিকার।
ধনী আর অধিকারী তাই সর্ব কুকৃত্যের ভাগী।
অধম গোপালদের এ অর্ণবে লগি ঠেলা সার।"

—

বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেনের "কংগ্রেসের অর্থনৈতিক দৃষ্টি" সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। তারাশঙ্করের উপন্যাস '[illegible]' ওই সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।